বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা

শ্রীবৈদ্যনাথ শীল, এম. এ., ডি.-ফিল.

অধ্যাপক, হুগলি মহসীন কলেজ, হুগলি।

প্রাক্তন অধ্যাপক, মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ, আগরতলা।



এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং

১১-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট : কলিকাতা-১২

BANGLA SAHITYE NATAKER DHARA

by

Dr. BAIDYANATH SIL

প্রকাশ করেছেন : এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং-এর পক্ষে শ্রীঅনিলকুমার সরকার, ১।১-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ছেপেছেন : লক্ষ্মীশ্রী প্রেসের পক্ষে শ্রীপঞ্চানন পাল, ১৫।১, ঈশ্বর মিল লেন, কলিকাতা-৬

॥ সূচীপত্র ॥

॥ লেখকের নিবেদন ॥

বর্তমান গ্রন্থে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছি। এ 'ধারা'র উৎস নির্ণয় করা সম্ভব ; ইহার গতি-প্রকৃতির আলেখ্য রচনা করাও যাইতে পারে ; কিন্তু কোথায় এ ধারার শেষ হইবে তাহা বলা কঠিন। আলোচ্য গ্রন্থে প্রাচীন যাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের রচনা পর্যন্ত আলোচনা করিয়াছি। তবে প্রাচীন যাত্রাওয়ালা হইতে ক্ষীরোদপ্রসাদ পর্যন্ত যত নাট্যকার যত কিছু লিখিয়াছেন তাহা সমস্তই আমার আলোচনার বস্তু নহে, তাহা হইলে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া' রচনা করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথকে আমার আলোচনার বাহিরে রাখিয়াছি, তাহার কারণ রবীন্দ্র-নাট্য-সাহিত্য আপন বৈশিষ্ট্যে পৃথক্‌ভাবে আলোচনার দাবী রাখে। বাংলা নাট্য-সাহিত্যের শৈলীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের আনুগত্য যতখানি, তাহা হইতে তাঁহার মৌলিকত্ব অনেক বেশি। তাই ভবিষ্যতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পৃথক্ আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

বাংলা নাট্য-সাহিত্যের কোষ্ঠী রচনা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। আমাদের আধুনিক কালের নাটকের জন্মের আগে এদেশে যত প্রকার অভিনেয় সাহিত্য ছিল, সেগুলির মধ্যে প্রধান হইল 'যাত্রা'। এই যাত্রার নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করা সবচেয়ে কঠিন। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ প্রভুচরণ গুহঠাকুরতা, ব্যোমকেশ মুস্তফী প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় পর্যন্ত অনেকে নানা প্রবন্ধে ও নানা গ্রন্থে এই সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। তাঁহাদের বক্তব্যের সঙ্গে আমিও আমার মতো করিয়া দুই একটি কথা জুড়িয়া দিয়াছি।

প্রাচীন যাত্রা-পাঁচালীর আদর্শে বাংলা নাটকের উৎপত্তি হয় নাই —একথা যেমন সত্য, তেমনি ইহাও সত্য যে যাত্রা-পাঁচালীর প্রভাব

বাংলা নাটকের অঙ্গে অঙ্গে পরিদৃশ্যমান। বাংলা নাটক ইংরাজী নাট্য-শৈলীর কতটুকু অনুসরণ করিয়াছে, সংস্কৃত শৈলীকে কতটুকু গ্রহণ বা বর্জন করিয়াছে তাহা যেমন আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, তেমনি বাংলা নাট্য-শৈলীর উপর প্রাচীন যাত্রার প্রভাব নির্ণয়েরও প্রয়াস পাইয়াছি। অর্থাৎ এক কথায় বলিতে গেলে ইংরাজী, সংস্কৃত ও প্রাচীন যাত্রার 'নাট্যশাস্ত্র'ই আমার আলোচনার মানদণ্ড। শৈলীর ক্রমবিকাশের আলোচনা প্রসঙ্গে যে সকল নাট্যকার গণ্ডীর মধ্যে আসিয়াছেন, তাঁহাদের রচনার নাটকীয় গুরুত্ব ও মূল্য মোটামুটিভাবে আলোচিত হইয়াছে। সামগ্রিকভাবে কোনো নাট্যকারের সমুদয় রচনার আলোচনা করা হয় নাই। ফলে আলোচনায় হয়তো কিছু অপূর্ণতা থাকিয়া যাইতে পারে। তাহার বিচারভার সুধী পাঠকসমাজের উপর রহিল।

গ্রন্থখানি রচনাকালে আমি অনেকের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছি। আজ কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদিগকে স্মরণ করিতেছি। আমার শিক্ষাচার্য ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থের একটি মনোজ্ঞ সমালোচনা লিখিয়া দিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ প্রণয়নকালেও তাঁহার নিকট হইতে প্রচুর উপাদান ও নানারূপ সাহায্য পাইয়াছি। বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, আমার শিক্ষাচার্য ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের নিকট হইতে এই গ্রন্থরচনার প্রথম প্রেরণা ও সাহায্য পাই। এই সময়ে অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী মহাশয়ের অনেক উপদেশ ও পরামর্শ পাইয়াছি। শ্রদ্ধেয় ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের নিকটও আমি ঋণী। রচনার প্রথম দিকের খানিকটা অংশ তিনি দেখিয়া দিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই আমার আচার্য। তাই ইঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ইঁহাদিগকে আমার সভক্তি প্রণাম জানাই। ইঁহাদের শুভেচ্ছার উপর নির্ভর করিয়াই গ্রন্থখানি সুধী-সমাজের নিকট উপস্থিত করিতে সাহসী হইলাম।

রচনাটির সঙ্গে সিউড়ীর স্মৃতি অনেকখানি জড়িত। সিউড়ীর জুবিলী গ্রন্থাগারের সহাধ্যক্ষ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী মহাশয় ও সুপ্রসিদ্ধ রতন গ্রন্থাগারের বর্তমান উত্তরাধিকারী শ্রীঅমলেন্দু মিত্র মহাশয় তাঁহাদের গ্রন্থাগার ব্যবহার করিতে দিয়া আমার অশেষ উপকার করিয়াছেন। এই দুই বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির সাহায্য না পাইলে পুস্তকের অনেক অংশ রচনা সহজসাধ্য হইত না। শ্রীশবাবু ও অমলবাবুকে আমার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অভিবাদন জানাই।

সিউড়ীর সহকর্মী অধ্যাপক শ্রীদেবরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, এম. এ., ডাঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (বর্তমান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) এবং অধ্যাপক শ্রীশান্তিরাম চট্টোপাধ্যায় মহোদয়গণকে স্মরণ না করিয়া পারি না। ইহাদের উৎসাহ ও উপদেশ এই পুস্তক রচনায় আমাকে নিত্য প্রেরণা যোগাইয়াছে। ইঁহাদের সঙ্গে আমার আত্মিক সম্পর্ক এত নিবিড় যে কৃতজ্ঞতা জানানো প্রহসন মাত্র। শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত মহাশয় গ্রন্থখানির নির্দেশিকা অংশ প্রস্তুত করিয়া আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

এই প্রথম প্রয়াসে নানারকম ত্রুটি ও অপূর্ণতা থাকা স্বাভাবিক। এ সম্বন্ধে পাঠকসমাজের নিকট হইতে যাহা কিছু উপদেশ ও মন্তব্য পাওয়া যাইবে সেগুলি বিশেষভাবে অবধান করিয়া পরবর্তী সংস্করণকে ত্রুটিহীন করিবার প্রয়াস পাইব। আশা করি তাঁহাদের সহানুভূতিমূলক উপদেশ ও মন্তব্য আমার এই দুরূহ বিষয় আলোচনার প্রথম অপূর্ণ প্রয়াসকে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিবে।

বালিয়া
পোঃ গরীবপুর, নদীয়া

শ্রীবৈদ্যনাথ শীল

॥ দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা ॥

'বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা' বইখানির প্রথম সংস্করণ পাঁচ-সাত বৎসর আগেই নিঃশেষ হইয়া যায়। তখন নানা জনের নিকট হইতে বইখানি পুনর্মুদ্রণের তাগিদ আসিতে থাকে। কয়েকজন প্রকাশকও গ্রন্থখানি পুনর্মুদ্রণের জন্য অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। কিন্তু জনৈক প্রকাশক বইখানির এক ফর্মা ছাপাইয়া প্রায় চার-পাঁচ বৎসর ফেলিয়া রাখেন, নানা অনুরোধ উপরোধেও তিনি কিছুতেই আর বইখানি ছাপাইবার আগ্রহ প্রকাশ করেন না। শেষপর্যন্ত তাঁহার বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হই। পরে অবশ্য বুঝিতে পারি যে অদৃষ্টদেবী তাঁহার প্রতি একেবারেই বিরূপ হইয়াছেন। বিদ্যাদায়িনী বীণাপাণিও তাঁহাকে বিদায় দিয়াছেন। আমি আগে ভাগে তাঁহার অবস্থা বুঝিতে না পারিলেও প্রকাশক মহাশয় তো নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আমাকে তো তিনি অযথা হায়রানি না করিতেও পারিতেন।

বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণে পরিবর্তন বা পরিবর্জন বলিয়া বিশেষ কিছুই নাই। তবে কিছুটা নূতন সংযোজন হইয়াছে মাত্র। এই সংস্করণে গ্রন্থের শেষে 'নির্দেশিকা'-অংশটি বর্জিত হইল।

প্রথম সংস্করণে ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটি অমূল্য ভূমিকা দান করিয়া গ্রন্থখানির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ভূমিকাটিকে আমার শিক্ষাগুরুর আশীর্বাদস্বরূপ সযত্নে পুনর্মুদ্রিত করিলাম। আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয় আজ দিব্যধামে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার হাতে দ্বিতীয় সংস্করণের গ্রন্থখানি তুলিয়া দিতে না-পারার বেদনা অন্তরে বহন করিয়া তাঁহার স্বর্গত আত্মার উদ্দেশে অসংখ্য প্রণাম জানাই।

প্রথম অধ্যায়

যাত্রা—উপক্রমণিকা

[বাংলা নাট্য-সাহিত্যের আলোচনা পদ্ধতি,—যাত্রা জীবন্ত সাহিত্য,—যাত্রাসাহিত্য আলোচনার উপকরণ অপ্রচুর, যাত্রার মুদ্রিত পালা, যাত্রার প্রধান অবলম্বন পৌরাণিক কাহিনী—পৌরাণিক কাহিনীর বৈশিষ্ট্য, যাত্রার কাহিনী বহুজনবিশ্রুত বা পরিচিত, কাহিনী পরিচিত হওয়ায় যাত্রার নাটকে ঘটনার চমৎকারিত্ব ও চরিত্রের জটিলতা নাই, গানের তারতম্য অনুসারে যাত্রার শ্রেণীবিভাগ ও ক্রমবিকাশের স্তর নির্ণয়, প্রস্তাবনা সংস্কৃতে ও যাত্রায়, কৃষ্ণকমলের প্রস্তাবনা, গোবিন্দ অধিকারীর প্রস্তাবনা, গোবিন্দ অধিকারীর প্রস্তাবনা সংস্কৃতের অনুসরণ নয়—নিবদ্ধ পদাবলী ও বাংলা কৃষ্ণায়ণ কাব্যের দূতী বড়াই ও মহান্ত জাতীয় চরিত্র সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা, দৃশ্যপট না থাকায় যাত্রার কাহিনী-বিন্যাসের স্বাধীনতা, নাট্য কাহিনীর বীজত্বের অর্থ, অনুকূল প্রতিকূল ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় বীজের বৃক্ষায়ণী পরিণতিই নাট্য ঘটনা, সংস্কৃতের ন্যায় যাত্রারও নাটক বিষাদান্ত হয় না, কৃষ্ণকমলের শৈলী প্রাচীনতম, কৃষ্ণকমলের দিব্যোন্মাদ যাত্রার কাহিনী, দিব্যোন্মাদের শৈলী সঙ্গীতসর্বস্ব, মুক্তালতাবলীর কাহিনী, কৃষ্ণকমল হইতে গোবিন্দ অধিকারীর শৈলীর পার্থক্য ও গোবিন্দের বৈশিষ্ট্য, কৃষ্ণকমল ও গোবিন্দের সাদৃশ্য, যাত্রার ভাব-ব্যাকুলতা ও দার্শনিকতা চরিত্রের স্বতঃস্ফূর্ত পরিণতি নহে, বক্তব্যের গাম্ভীর্যের জন্য গোবিন্দ অধিকারীর ভাষার গাম্ভীর্য, পরবর্তী যাত্রাওয়ালাদের গদ্য সংলাপে গোবিন্দ অধিকারীর প্রভাব, ব্রজমোহনের বৈশিষ্ট্য, চুম্বকে যাত্রা শৈলী বিশ্লেষণ।]

বাংলা নাট্য-সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে সর্বপ্রথম যাত্রা-সাহিত্যের আলোচনা করা প্রয়োজন। কেননা বাংলা নাটক মিশ্র সাহিত্য। উনবিংশ শতকে ইংরাজী রঙ্গমঞ্চ এবং ইংরাজী নাট্য-সাহিত্যের প্রভাবে আমাদের বাংলা নাট্য-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার পূর্বে আমাদের এই বাংলা দেশে যাত্রা নামে একপ্রকার নিজস্ব জনপ্রিয় অভিনেয় সাহিত্য ছিল। যাত্রার উপর সংস্কৃতের প্রভাব নিতান্ত কম নহে। পরে থিয়েটারের নাটক সৃষ্টি হইলে তাহার প্রভাবে উনবিংশ শতকের শেষের দিকে যাত্রা-সাহিত্যেরও রূপান্তর হইল। সখের যাত্রা নাম করিয়া এক নূতন যাত্রা-সাহিত্য ঐ সময় গড়িয়া উঠিল।* আবার থিয়েটারের নাটকও ওদিকে

* প্রায় ৬০ বৎসর হইতে চলিল, এই সখের যাত্রা প্রথম আরম্ভ হয়।

—বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন, ১২৮১ সাল

যাত্রার প্রভাব এড়াইতে পারিল না। সুতরাং বাংলা নাট্য-সাহিত্যের আলোচনা করিতে হইলে যাত্রা, সংস্কৃত নাটক ও ইংরাজী নাটকের বৈশিষ্ট্য আলোচনা সর্বাগ্রে করিতে হয়।

আজ যদিও বাংলার পল্লীতে পল্লীতে থিয়েটারের নাটকের অভিনয় হইতেছে এবং প্রাচীন পদ্ধতির যাত্রা ক্রমে লুপ্ত হইয়া আসিতেছে, তবুও যাত্রা মৃত সাহিত্য নহে। বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা, যশোহর, রাজসাহী, পাবনা প্রভৃতি জেলায় এখনও গুণাবিবির যাত্রা গান হইয়া থাকে। ময়মনসিংহের মুসলমানেরা এখনও পর্যন্ত মাধব-মালঞ্চ যাত্রার পালা গাহিয়া আসিতেছেন। সতের-আঠার বৎসর আগে কুমিল্লার দলের নিমাই-সন্ন্যাস নাম করিয়া প্রাচীন পদ্ধতির একখানা যাত্রার পালা মুদ্রিত হইয়াছিল। কুমিল্লার দল উহা সাফল্যের সহিত অভিনয় করিতেন। বর্ধমান জেলার ধবনী গ্রাম-নিবাসী নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের কালীয়দমন বা কৃষ্ণ-যাত্রার গানে বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি জেলা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার পৌত্র শ্রীদুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট নীলকণ্ঠের যাত্রার পুঁথি রক্ষিত আছে। ইনি নিজে যাত্রার দল করিয়াছেন।

তবে যাত্রা-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনার উপকরণ সুপ্রচুর নহে। আগেকার দিনে গ্রন্থের মুদ্রণ-সত্ব না থাকায় অধিকারীরা কিছুতেই নিজেদের পুঁথি কাহাকেও নকল করিতে দিতেন না। তাই একদিকে যেমন যাত্রার পুঁথির প্রসার হয় নাই, অন্যদিকে তেমনি অধিকারীর মৃত্যুর পর যত্নের অভাবে অনেক পুঁথি নষ্ট হইয়া গিয়াছে বা হারাইয়া গিয়াছে। সেই জন্য আজ শ্রীদাম, সুবল, বদন অধিকারী প্রভৃতি নামেই আছেন।*

তবুও কিন্তু যে সকল যাত্রাওয়ালার পালার পাণ্ডুলিপি বা মুদ্রিত গ্রন্থ পাওয়া যাইতেছে, তাহা অবলম্বনে যাত্রা-সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। বর্তমান প্রবন্ধে সেই

---

* যাত্রা পালা-গ্রন্থের এই স্বল্পতার জন্য অনেকে বলিয়া থাকেন, এত কম উপকরণ থাকার জন্য সাহিত্যের এই বিশেষ শাখাটির সুষ্ঠু আলোচনা সম্ভব নহে। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে ইংরাজীর মতো সুসমৃদ্ধ সাহিত্যেও আদি স্তরের নাটকের উদাহরণ অতি বিরল। ইংরাজী সাহিত্যের সমালোচকগণও একথা স্বীকার করিয়াছেন। তবুও কিন্তু তাঁহাদের আলোচনা বন্ধ রহে নাই।

চেষ্টাই করিব। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস-লেখক পাঁচকড়ি দে মহাশয় গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা-পালা পাঁচ খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় কৃষ্ণকমল গোস্বামীর পালাগুলি মুদ্রিত হইয়াছে। বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে ব্রজমোহন রায়ের যাত্রা-পালার মুদ্রণ হইয়াছিল। গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর পালার মুদ্রিতগ্রন্থ পাওয়া যায়। এই গুলিকেই আলোচনায় অবলম্বন করা হইল।

সর্বপ্রথম যাত্রার বিষয়-বস্তুর আলোচনা। প্রাচীন এবং মধ্য-যুগের প্রায় সমস্ত বাংলা সাহিত্য মূলতঃ ছিল ধর্মীয় সাহিত্য। তাহার বিষয়-বস্তু পৌরাণিক বা অর্ধ-পৌরাণিক। অর্ধ-পৌরাণিক বলিতে আমি বাংলার দেশজ পুরাণ মঙ্গলকাব্যগুলিকেই বুঝাইতেছি। যাত্রার কাহিনীও ছিল ধর্মমূলক। হয় রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা না হয় রাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিত শ্রীচৈতন্যের অপূর্ব জীবনলীলা, না হয় পৌরাণিক দেব-দেবীর কাহিনী, ইহাই ছিল যাত্রার অবলম্বন। সংস্কৃত পৌরাণিক কাহিনী-গুলির একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। বেদ-উপনিষদের সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব জনসাধারণ বুঝিবে না। তাই গল্পচ্ছলে তাহাদিগকে নীতি-শিক্ষা দিবার জন্য পুরাণের সৃষ্টি। ব্যক্তি, দম্পতি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণের নীতিগুলি পুরাণের গল্পের অন্ত· ‘ অন্তরে অনুস্যূত থাকিত। পদ্মপুরাণ ভূমি-খণ্ডে সুনীথার উপাখ্যান তাহার উদাহরণ। পুংশ্চলী রমণীর অনিয়ন্ত্রিত পুরুষ-সংস্রব যে পরবর্তীকালে দাম্পত্যজীবন কতখানি বিষময় করিয়া দিতে পারে; কাম, রূপমোহ এবং প্রতারণা যদি নর-নারীর বিবাহের ঘটক হয়, তহা হইলে সেই বিবাহের সন্তান যে কি করিয়া জাতি ও সমাজের ধ্বংসকারী হয়, মৃত্যুকন্যা সুনীথার উপাখ্যান তাহাই প্রমাণ করে। সংস্কৃত পুরাণের অনুকরণে বাঙ্গালী কবিগণ যখন দেশী মঙ্গলকাব্য রচনা শুরু

আবার আর এক শ্রেণীর পণ্ডিত আছেন, যাঁহারা বলিয়া থাকেন, “উপকরণ কি নাই? তবে সংগ্রহ করিতে ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন। বটতলার অলিতে গলিতে ঘুরিলে প্রাচীন যাত্রার বহু পুঁথিই সংগ্রহ করা যাইতে পরে।” কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাঁহারা নিজেরা কিন্তু ঐ কল্পতরুর স্বজাতি বটবৃক্ষের নিকট ঘুরিয়া তাহার তলা হইতে যাত্রা-সাহিত্যের একটি ছিন্ন-পত্রও সংগ্রহ করিতে পারেন নাই; পারিবেন কিনা সন্দেহ। এক্ষেত্রে তাঁহাদের উপদেশে আলোচনাকে “আরো ভাল” করিবার ব্যর্থ চেষ্টা না করিয়া যাহা উপকরণ মিলিতেছে, তাহার সাহায্যে ইহাকে “যথাসাধ্য ভাল” করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

করিলেন, তখন তাঁহারা সংস্কৃত পুরাণের এই সুহৃদসম্মিত উপদেশদানের দিকটাকেও অনেকখানি গ্রহণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের কাব্যে বর্ণিত দেবতার প্রচারটি বেশী-ভাবে করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে ভাগবত, বৈষ্ণবপদাবলী প্রভৃতি কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কাব্যে দার্শনিক-তত্ত্ব ও কবিতা পাশাপশি ঘর বাঁধিয়াছিল। সুতরাং যাত্রা যে যে সাহিত্য হইতে তাহার উপাদান গ্রহণ করিয়াছে তাহার ভিতরই ধর্মভাব, উপদেশ দানের প্রচেষ্টা, সমাজ সংস্কারের প্রয়াস, দার্শনিকতা ও কাব্যগুণ বর্তমান ছিল। রিকৃথ সূত্রে যাত্রা তাহাই গ্রহণ করিয়াছে। তবে কখন কোথা হইতে কী ভাবে কতটুকু লইয়াছে সেইটিই হইবে আলোচনার বিষয়।

যাত্রার কাহিনী সুপরিচিত হওয়ায় গল্পাংশের অভিনবত্ব যাত্রাসাহিত্য হইতে নির্বাসিত হইল। বহুজন-পরিচিত সুপ্রাচীন গল্পগুলি যাত্রার অবলম্বন। পরবর্তী কালে যে সমস্ত লৌকিক কাহিনী লইয়া যাত্রাগান রচিত হইয়াছিল, তাহাও অপরিচিত বা নূতন নহে। তোতামিয়া নামক জমিদারের সুন্দরী স্ত্রী গুণাবিবির রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার পিতৃব্য ধলুমিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের বিরুদ্ধে যে হীন ষড়যন্ত্র করেন, সে কাহিনী পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে উপকথার পর্যায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। মাধব-মালঞ্চ তো উপকথাই বটে।

কাহিনীটি সুপরিচিত থাকায় যাত্রা-পালার পাত্র-পাত্রীগণ সিদ্ধ-রস-বিগ্রহের মতো দর্শকদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। তাহাদের জীবনের ঘটনা, চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সমস্তই দর্শকদের আগে হইতে জানা থাকে। সুতরাং থিয়েটারের নাটকের যেটি প্রধান আকর্ষণ, (ঘটনার চমৎকারিত্ব এবং চরিত্রের জটিলতা), যাত্রার নাটক হইতে তাহা একেবারে বাদ পড়িয়া যায়। আর ইহাই যাত্রার নাটকের অন্যতম প্রধান দুর্বলতা—যে জন্য পরবর্তী থিয়েটারের নাটকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যাত্রার নাটক জয়লাভ করিতে পারিল না।

কিন্তু যাত্রার প্রধান আকর্ষণ উহার গান। যাত্রাকে আমরা নাটক বলি না, এখনো যাত্রা-'গান' বলিয়া থাকি। গানের ন্যূনাধিক্য হিসাবে যাত্রা-সাহিত্যকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

প্রথম শ্রেণীতে পড়ে কৃষ্ণকমল-রচিত গীতিনাট্যগুলি। ইহা মুখ্যতঃ কীর্তন-পালারই নাট্যরূপ। ইহার ভিতর গদ্য নিতান্ত কম, এক একটি পালায় কয়েক লাইন মাত্র। তাহা ছাড়া আগাগোড়া পালাটিতে মনোহরসাহী কীর্তন ও পয়ার-ত্রিপদীর ছড়া স্থান করিয়া বসিয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইবে

গোবিন্দ অধিকারী এবং তাঁহার অনুসরণকারী নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের পালা-গুলি। উহাদের মধ্যে কথা ও গান প্রায় সমান অংশ গ্রহণ করিয়াছে। ব্রজমোহন রায়, মতিলাল রায় হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক সখের যাত্রাওয়ালা অনেকেই তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত হন। ইঁহাদের রচনায় সংলাপের নামে কথকতার ধরনে দীর্ঘ বক্তৃতার প্রয়োগ হইয়াছে। আর প্রায় প্রত্যেক উচ্ছ্বাস-পূর্ণ বক্তৃতার সঙ্গে প্রায় প্রত্যেক চরিত্রের মুখেই এক একখানি গান আছে। কখনো বা গানখানি বক্তৃতার আগে থাকে, কখনো পরে ; কখনো বা আদি ও অন্ত্যে, কখনো বা আদি, মধ্য ও অন্ত্য তিন স্থানেই থাকে। এই তিনশ্রেণীর যাত্রাপালার শৈলী বিশ্লেষণ করিলে এই সিদ্ধান্তে পৌছান যায় যে, যাত্রা আদিতে সঙ্গীতসর্বস্ব ছিল, পরে ধীরে ধীরে তাহার ভিতর গদ্য সংলাপ প্রবেশ করিয়াছে। যাত্রা-সাহিত্যে গদ্যের একটা ক্রমবিকাশ আছে ; গদ্য পালার ভিতর ক্রমশঃ অধিক স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে এবং সঙ্গীত সেই অনুপাতে ধীরে ধীরে কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু কমিতে কমিতে নিজের প্রাধান্য হারায় নাই। ব্রজমোহন রায় প্রভৃতি যাত্রাওয়ালার পালায় কথকতার ধরনের বক্তৃতার যে একটা প্রধান স্থান স্বীকৃত হইয়া ছিল তাহাও অনুমান করা যায়। আবার ব্রজমোহনাদি্র রচনায় স্থানে স্থানে অহেতুক ভাড়ামি বা তরল হাস্য-রস সৃষ্টির প্রচেষ্টা দেখা যায়। পক্ষান্তরে কৃষ্ণকমল ও গোবিন্দ অধিকারীর রচনায় যে ভক্তিরস প্রবাহিত রহিয়াছে, তাহার অভাবও পরিলক্ষিত হয়। যাত্রার মূল প্রেরণা (ভক্তির ভাব) হইতে বিচ্যুতি এবং ইতর জনগণের মনস্তুষ্টির জন্য ভাড়ামির আমদানিই যে যাত্রা-সাহিত্যের পতনের অন্যতম কারণ, ইহাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে।* পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এই সকল বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হইবে। তাহার পূর্বে সর্বযুগের যাত্রার কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

---

* "পূর্বে বাংলায় করুণ রস প্রধান ছিল। এই যাত্রা দ্বারা বোধ হইতেছে যে, এক্ষণে তৎপরিবর্তে এদেশে হাস্য রসের প্রাধান্য জন্মিয়াছে।"

—বঙ্গদর্শন, পৌষ, ১২৭৯ সাল, পৃষ্ঠা ৪১৩

"আধুনিক যাত্রার উদ্দেশ্য চিত্তবৃত্তির পরিচয় দিয়া লোকের তৃপ্তি সাধন করা...আধুনিক যাত্রার দোষে কৃষ্ণ-রাধাকে গোয়ালা বলিয়া বোধ হয়, পূর্বে কবির গুণে তাহাদিগকে দেবতা বলিয়া বোধ হইত।"

—বঙ্গদর্শন, ১২৮০ সাল, পৃষ্ঠা ৩১৮

যাত্রা-পালার কোনটির আরম্ভে আমরা গৌরচন্দ্রিকা পাইতেছি, কোনটির আরম্ভে গৌরচন্দ্রিকা ও প্রস্তাবনা এবং কোনটির আরম্ভে বন্দনার পদ পাইতেছি। অবশ্য সকল যাত্রাওয়ালার সমস্ত পালায়ই গৌর-চন্দ্রিকা, বন্দনা ও প্রস্তাবনার পদ নাই। কিন্তু নিজেদের রচনায় কোনো না কোনো পালায় প্রায় প্রত্যেক যাত্রাওয়ালাই গৌরচন্দ্রিকা বা বন্দনা বা প্রস্তাবনার পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং গৌরচন্দ্রিকা, বন্দনা এবং প্রস্তাবনা যাত্রা-পালার এক বিশেষ অঙ্গ।

প্রস্তাবনা শব্দটি সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে। নান্দী বা আশীর্নমস্ক্রিয়া প্রভৃতি সমাপ্ত হইলে সূত্রধার পালার স্থাপনা করেন। এই ব্যাপারে তাঁহার স্ত্রী, পারিপার্শ্বিক বা বিদূষক তাঁহার সাহায্য করিয়া থাকেন। নিজেদের উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়া তাঁহারা নাটকের বস্তু, বীজ, পাত্র, মুখ বা রঙ্গমঞ্চে প্রথম প্রবেশকারী পাত্রের উক্তির পূর্বসূত্র স্থাপন করিয়া থাকেন।* ব্রজমোহন রায়ের যাত্রার প্রস্তাবনা বস্তু-নির্দেশ করে মাত্র। কৃষ্ণকমলের পালাগুলির প্রস্তাবনা এক একখানি ত্রিপদী বা পয়ার। উহার শৈলীর বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, সর্বপ্রথম উহাতে একটি পরিবেশ-বর্ণনা থাকে। যে বিশেষ স্থলে নাট্য-কাহিনী সংঘটিত হইতে যাইতেছে সেই স্থলের বর্ণনা। তারপর, পূর্বের কোনও একটা ঘটিয়া-যাওয়া পরিস্থিতির উল্লেখ। সেই বিশেষ পরিস্থিতিকে অবলম্বন করিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশোন্মুখ পাত্র-পাত্রীর অন্তরে নিশ্চয়ই কোনো প্রতিক্রিয়া শুরু হইয়াছে; শোক, আনন্দ, অভিমান প্রভৃতির কিছু না কিছু তাহাদিগকে অভিভূত করিয়াছে। সেই অভিভূতির বেদনায় তাহাদের মুখে যে উচ্ছ্বসিত

"কালীয়দমন, বিদ্যাসুন্দর, নলোপাখ্যান প্রভৃতি যাত্রার আমোদ আছে কিন্তু তত্তাবৎ অত্যন্ত ঘৃণিত উপায়ে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে আমোদ-প্রমত্ত ইতর লোক ব্যতীত ভদ্র সমাজের কদাপি সন্তোষ বিধান হয় না।"

—সম্বাদ প্রভাকর, ২৮ জুন, ১৮৪৮

"অনেকে যাত্রার পবিবর্দ্ধনে নিযুক্ত হইয়া অনেকাংশে কৃতকার্য হইয়াছে কিন্তু যে পর্যন্ত তাহা আপন আদিম নাটকের অবয়ব ধারণ না করে সে পর্যন্ত দেশের বিনোদন ব্যাপারে পরিশুদ্ধ হইবে না।"

—বিবিধার্থ সংগ্রহ, মাঘ ১৭৮০ শক, পৃষ্ঠা ২৩৫

ভাষা ফুটিয়াছে, তাহারই সূত্র ধরাইয়া দিয়া কৃষ্ণকমলের প্রতিটি পালার প্রস্তাবনা শেষ হয়। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর দিব্যোন্মাদ পালার প্রস্তাবনাটি এইরূপ,—নন্দ শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় রাখিয়া নিরানন্দে ব্রজপুরীতে ফিরিয়াছেন। তদবধি যশোদার মনে আনন্দ নাই। তিনি শোকে উন্মাদিনী। কখনো হাতে ক্ষীর, সর লইয়া 'গোপাল আয়' বলিয়া ডকিতেছেন, কখনো ক্রন্দন করেন, কখনো অচেতন হন। রাত্রিতে ঘুমাইয়াও শান্তি নাই। স্বপ্নে কৃষ্ণমূর্তি দেখিয়া হাহাকার করিয়া উঠেন। একদিন এমনি স্বপ্ন দেখিয়া নন্দরাণী জাগিয়া উঠিয়াছেন। নিজের শিরে আঘাত করিয়া তিনি বলিতেছেন,...। এই পর্যন্ত প্রস্তাবনা শেষ। কি বলিতেছেন তাহা প্রস্তাবনা শেষ হইলে নন্দরাণী রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া গানে বলিতে থাকেন।

গোবিন্দ অধিকারীর প্রস্তাবনায় এটুকু তো আছেই। ইহা হইতে আর একটু বেশী আছে। পাত্র-পাত্রী রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া পরস্পর কি কি বলিবে বা করিবে তাহার অনেকখানি প্রস্তাবনার মধ্যে বলা থাকে। প্রস্তাবনায় যাহা উক্ত হইল অনেক সময় তাহারই পুনরাবৃত্তি হয় সংলাপে অথবা সংলাপে ও গানে। গানটি সংলাপের আগেও থাকিতে পারে, পরেও থাকিতে পারে। একটি উদাহরণ দিতেছি। গোবিন্দ অধিকারীর মুক্তা-লতাবলী পালার আরম্ভ এইরূপ,—

"গোষ্ঠভূমি।

বড়াইয়ের প্রবেশ।

বড়াই,

সঙ্গে সখাগণ নন্দের নন্দন গোধন চরাতে যায়।
নাচিয়া নাচিয়া বেণু বাজাইয়া রাধানাম গুণ গায়।
চৌদিকে রাখাল মাঝে নন্দলাল অদূরে গো পাল ভ্রমে।
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গীতে অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে চলে সবে ক্রমে ক্রমে॥
দেখি কানু-ভাব ভাবে কত ভাব যে জন যেমন ভাবে।
মনোহর তনু বেণু-করে কানু ভুবন ভুলালো ভাবে।
চলে ধীরি ধীরি সখা সঙ্গে করি গোষ্ঠ মাঝে বংশীধারী।
সুধীর গমনে যমুনা পুলিনে উতরিল ঘুরিফিরি॥
রাখাল গোপাল লইয়ে গো-পাল পিয়ায় যমুনা বারি।
হরষে সরসে খেলা নবরসে সিরজিলা গোঠে হরি॥

কত খেলা খেলি হয়ে কুতুহলী বসিলেন কূলে কালা।
বলে সখাগণে সাজাও বৎস গণে গাঁথিয়া মুক্তার মালা ॥
মুক্তামালা দিয়ে গো-গণে সাজিয়ে আমরা সাজিব শেষ।
মুক্তার বাহার অতি চমৎকার বাছুরে সাজাব বেশ ॥
কানুর বচন করিয়ে শ্রবণ যতেক ব্রজ-রাখাল।
মুচ্‌কি হাসিল সকলে কহিল একি কথা নন্দলাল ॥
গাভী বৎস সবে মুক্তায় সাজাবে এত মুক্তা পাবে কোথা।
দ্বাদশ রাখাল ন-লক্ষ গোপাল চাই সাজাতে অনেক মুক্তা ॥
হাসি কহে হরি মুক্তা দিতে পারি এক মুক্তা যদি পাই।
করিব বপন স্থজিয়া কানন গাছেতে মুক্তা ফলাই ॥"

ইহার পর একখানা গানে গোবিন্দের চমৎকার অলৌকিক লীলার কথা বলা হইয়াছে। গানখানির মধ্যে নূতন কথা মাত্র একটি, "মুক্তা আছে শ্রীরাধিকার।" গানখানি শেষ হইয়া গেলে রাখালগণসহ শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করেন। প্রস্তাবনায় যাহা বলা হইল, শ্রীকৃষ্ণ ও রাখালগণের কথোপকথনে তাহারই পুনরাবৃত্তি হইতেছে মাত্র,—

"শ্রীদাম। ও ভাই কানাই, আজ গোষ্ঠে এসে মনের সাধে খেলা হয়েছে গো।

সুদাম। ওগো শ্রীদাম, আমার এখনও খেলার সাধ মেটেনি গো।

দাম। ওগো সুদাম, কানাইয়ের সঙ্গে খেলতে গেলে কি খেলার সাধ মেটে গো?

বসু। ওগো দাম, কি করে তা মিটবে গো? কৃষ্ণ ত আর নিত্যই এক খেলা খেলে না, রোজ নতুন নতুন খেলা খেলে। যা নিত্য নিত্য নতুন রকমের হয়, তাতে কি সাধ মেটে গো?

কৃষ্ণ। ও ভাই, যদি তোমাদের খেলার সাধ না মিটে থাকে, তবে আরো খেলা খেলি এস গো।

সুবল। ওগো কানাই, তোমার গুণের তুলনা নাই গো। আমাদের সাধ মিটাতে তোমার এত দয়া গো।

কৃষ্ণ। ওগো সুবল, তোমরা যে আমার খেলার সাথী গো। তোমাদের খেলার সাধ না মিটালে কি চলে গো?

সুবল। ওগো কানাই, আজ কি করে আমাদের সাধ মিটাবে গো?

কৃষ্ণ। ওগো সুবল, কি করে তোমাদের খেলার সাধ মিটাবো, বলি শোন গো।”…

শুনাইবার জন্য কৃষ্ণ একখানা গান ধরিলেন। গানের বক্তব্য, তিনি আজ গোষ্ঠে নূতন খেলা খেলিবেন। মুক্তা দিয়া গরুগুলিকে সাজাইবেন। এ খেলা তাঁহার পক্ষে বিচিত্র নয়। কেননা তিনি কুঞ্জে, রাসে, দোলে, গোষ্ঠে এবং সংসারে নিত্য নূতন খেলা খেলিয়া বেড়ান।

দেখিতেছি প্রস্তাবনার ব্যাখ্যা বা বিস্তৃতি হিসাবে আসিল সংলাপ,—সরল কাহিনী-বর্ণনা। তাহার সূত্র ধরিয়া আপনা হইতেই দার্শনিকতা আসিয়া পড়িল। কিন্তু কখন যে প্রস্তাবনা ত্যাগ করিলাম তাহা লক্ষ্য করা গেল না, অর্থাৎ আরম্ভের গদ্য সংলাপকে অতি সুকৌশলে প্রস্তাবনা হইতে টানিয়া বাহির করা হইল। সমগ্র নাট্য কাহিনী হইতে এই প্রস্তাবনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া যবনিকার আড়ালে ফেলিয়া দিয়া নাটকের কথা-বস্তুর আরম্ভ হইল না। অন্য দিকে তেমনি দার্শনিকতা যে বিনা নিমন্ত্রণে হঠাৎ আসিয়া পড়িল, তাহাও বুঝিতে অসুবিধা হয় না। বিনা নিমন্ত্রণে বলার অর্থ এই যে, এই দার্শনিকতা চরিত্রের নিজ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আসে নাই। প্রেমময়, লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কবি এবং দর্শকের পূর্ব-সংস্কার যাহা রহিয়াছে, কৃষ্ণ-চরিত্রের পর তাহাই আরোপ করা হইতেছে। এই দার্শনিকতার অবতারণার মূলে কোন্ প্রেরণা রহিয়াছে তাহা আলোচনা করিবার পূর্বে আমরা প্রস্তাবনা সম্বন্ধীয় আলোচনাটি শেষ করিয়া লই।

পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে, গোবিন্দ অধিকারীর প্রস্তাবনা সংস্কৃত নাটকের অনুসরণ নয়। কারণ সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনায় পাত্র-পাত্রীর ভাবী সংলাপের সারসংক্ষেপ আগে হইতে দেওয়া হয় না। তবে গোবিন্দ অধিকারী ইহা কোথায় পাইলেন? তিনি ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন কি? না। নিবদ্ধ পদাবলীর বহু পালার আরম্ভ এইভাবে হইয়াছে। দীন চণ্ডীদাসের গৌণ রাস অধ্যায়ের “বণিকিনী বেশে মিলন” পালাটির আরম্ভের পদখানি অবিকল গোবিন্দ অধিকারীর মুক্তালতাবলীর প্রস্তাবনার পদের মতো। তাহাছাড়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কোনো কোনো পালার আরম্ভ এমনি ধরনের পদ দিয়া হইয়াছে।* সুতরাং গোবিন্দ অধিকারী এই সকল কৃষ্ণায়ণ কাব্য

* শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, তাম্বুল খণ্ড, ১ম ৩টি পদ দ্রষ্টব্য।

এবং বৈষ্ণব নিবন্ধ-পদাবলী গ্রন্থের আদর্শে এই ধরনের প্রস্তাবনার পদ সৃষ্টি করিয়াছেন।

প্রস্তাবনার পর মূল নাট্যবস্তু রূপায়ণের সূচনা। শৈলীর দিক দিয়া তিনজন যাত্রাওয়ালার রচনার মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য বিদ্যমান। সে বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করিতেছি। তাহার আগে সমস্ত যাত্রাওয়ালার রচনায় যে যে বিষয়ে ঐক্য আছে তাহার আলোচনা করিব।

প্রত্যেক যাত্রাওয়ালার রচনায়ই দেখা যায় গল্পের রূপায়ণ করিতে করিতে নাট্যকার এমন একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছেন, যাহার কোনো আভাস-ইঙ্গিত তিনি আগে দেন নাই, এমন চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন নাটকে যাহার কোনো পূর্ব-পরিচয় আমরা পাই নাই।* এই সকল বিষয়ের রূপায়ণের জন্য নাট্যকার গোবিন্দ অধিকারী এক বিশেষ ধরনের চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রার পালার কোনোখানিতে সে বৃন্দা দূতী, কোনোখানিতে সে বড়াই, এবং নিমাই-সন্ন্যাস পালায় সে মহান্ত। গল্পের যে অংশ বা ভাবের যে দিক পাত্র-পাত্রীর সংলাপের দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে না, যাত্রার এই চরিত্রটি তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়। অনেকখানি কথকের কাজও এই চরিত্রটিকে করিতে হয়। অর্থাৎ যাত্রায় যে দার্শনিকতা, নীতি-উপদেশ ইত্যাদি থাকে, তাহা এই চরিত্রটিকেই সম্পাদন করিতে হয়। অধিকারী নিজেই এই ভূমিকায় অভিনয় করিতেন। গোবিন্দ অধিকারীর নিমাই-সন্ন্যাস পালার প্রথম অঙ্ক। নিমাই ছাত্রদিগকে হরি নাম শিখাইতেছেন। ইহার পরেই নিত্যানন্দ আসরে প্রবেশ করিবেন। কিন্তু আগে হইতে নাট্যকার নিত্যানন্দের প্রবেশের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন নাই। সুতরাং মহান্ত নিত্যানন্দকে প্রবেশ করাইতেছেন,—

---

* কোনো কোনো বুদ্ধিমান পাঠক এই উক্তিটির সঙ্গে পূর্বগামী আর একটি উক্তির বিরোধ আবিষ্কার করিবেন বলিয়া কিছুদিন আগে হইতে ভাবিতে বাধ্য হইয়াছি। রচনার সময় তাহা মনে হয় নাই। তাই একটু টিপ্পনী জুড়িয়া দিবার প্রয়োজন বোধ করিলাম। খানিক আগে আমি লিখিয়াছি, "কাহিনী সুপরিচিত থাকায় যাত্রা-পালার পাত্র-পাত্রীগণ সিদ্ধ-রস-বিগ্রহের মতো দর্শকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। তাহাদের জীবনের ঘটনা, চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সমস্তই দর্শকের আগে হইতে জানা থাকে।" বলা বাহুল্য, আগের উক্তিটি, অর্থাৎ এই টিপ্পনীর মধ্যে উদ্ধৃত উক্তিটি, নাটকের 'বস্তু' সম্বন্ধে এবং বর্তমান উক্তিটি নাট্যের 'রূপায়ণ' সম্বন্ধে। সুতরাং বিরোধ কোথাও নাই। একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারা যাইবে

"জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয় অদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ॥
সর্ব অবতার কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
তাঁহার অপর দেহ সেই শ্রীবলরাম॥
একই স্বরূপ দোঁহে ভিন্ন মাত্র কায়।
অন্য কায়ব্যূহ কৃষ্ণলীলার সহায়॥
সেই কৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র।
তাই নদীয়ায় আসেন শ্রীনিত্যানন্দ॥
দুহুঁ গুণ বর্ণিবারে নাহি সরে ভাষ।
আভাষে প্রকাশে ভাষে শ্রীগোবিন্দদাস॥"

ইহার পর মহান্তের একখানা গান। তারপর এই আবৃত্তি এবং সঙ্গীত-রূপ **introduction**-এর সূত্র ধরিয়া নিত্যানন্দ রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী ও ব্রজমোহন রায়ের রচনায় মহান্ত, দূতী বা সখী-জাতীয় এমন কোনো চরিত্র নাই। কিন্তু পরিস্থিতির সহিত পরিস্থিতির সংযোজক বা নূতন চরিত্রের পরিচায়ক পদ রহিয়াছে। তবে সেগুলি কাহার ভূমিকা তাহার কোনো উল্লেখ পালাগ্রন্থে নাই। পদের প্রয়োগ দেখিয়া কিন্তু মনে হয় ইহা অবশ্যই অধিকারীর জন্য রচিত। দুই একটি উদাহরণ দিতেছি। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর দিব্যোন্মাদ যাত্রা। সুবল প্রভৃতি রাখাল শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে কাঁদিয়া কাঁদিয়া চলিয়া যাইতেছে। ইহার পরের দৃশ্যেই শ্রীরাধিকা ও সখীগণ প্রবেশ করিবেন। তাহার জন্য চার পংক্তি পরিচায়িকা রহিয়াছে। কিন্তু উহা কাহার উক্তি তাহার নির্দেশ নাই। পংক্তি কয়টি এই,—

"প্রভাতে উঠিয়া রাধার প্রিয় সখীগণ।
সকলে মিলিয়ে এল শ্রীরাধা সদন॥
দেখে বিধুমুখী বসে অধোমুখী হয়ে।
জিজ্ঞাসা করেন সবে রাই সম্বোধিয়ে॥"

—দীনেশবাবু-সম্পাদিত 'কৃষ্ণকমল গ্রন্থাবলী', ৬৯ পৃঃ।

ব্রজমোহন রায়ের সাবিত্রী-সত্যবান পালা। তৃতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কের আরম্ভেই কয়েক লাইন পয়ার আছে,

"তপোবন ত্যজি সবে দেশে চলে যায়।
সাবিত্রীর বনবাসে চক্ষে ধারা বয়॥

মহাদুঃখে ভাসি রাজা স্বরাজ্যেতে গেল।
সতী রূপে হেথা তপোবন হল আলো॥
* * * * *
উপযুক্তকালে পতি সহ ব্রত করি।
সতত চিন্তায় দিন গণেন সুন্দরী॥
ব্রত উপলক্ষে তিন দিন উপবাস।
রজনী প্রভাতা হলে হবে সর্বনাশ॥"...

সাবিত্রীর বিবাহ ও তাহার মাতা-পিতার বিদায়ের দুঃখে দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ হইয়াছে। হঠাৎ যখন তৃতীয় অঙ্কের আরম্ভ হইল, তখন এক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এই এক বৎসর পরে কোথা হইতে নাট্যবস্তুর আরম্ভ হইয়াছে তাহা দর্শককে ঠিক মতো বুঝাইয়া দিবার জন্য ভূমিকা হিসাবে এই কয়েক পংক্তি পয়ারের প্রয়োগ। কিন্তু ইহা কাহার উক্তি? কোনো পাত্র-পাত্রীর উক্তি বলিয়া ইহার নির্দেশ নাই। ইহা গানও নহে যে জুড়িদারগণ-সঙ্গে অধিকারী গাহিবেন। নিশ্চয়ই ইহা আবৃত্তি। সমস্ত পালাটিকে রূপায়ণের প্রধান দায়িত্ব যাঁহার সেই অধিকারীই ইহার আবৃত্তি করিতেন।

যাত্রার নাটকে কোনো দৃশ্যপট ছিল না। সুতরাং সংস্কৃত নাটক এবং আধুনিক চলচ্চিত্রের মতো যাত্রার কাহিনী-বিন্যাসে অনেকখানি স্বাধীনতা ছিল। থিয়েটারের নাটক হইতে এ বিষয়ে যাত্রার পার্থক্য অনেক। থিয়েটারের নাটকে একটি দৃশ্য-পট পিছনে রাখিয়া একটি দৃশ্য অভিনয় করিতে হয়। ঐ পশ্চাদ্‌বর্তী দৃশ্যপটে যে বিশেষ স্থলের ছবি আঁকা রহিয়াছে নাটকের সংযোগ-স্থলকে তাহা হইতে সরাইয়া লওয়া যাইবে না। তাই থিয়েটারের নাটকে একটি দৃশ্যে দুইটি সংযোগস্থল থাকিতে পারে না। কিন্তু সংস্কৃত ও যাত্রার নাটকে একই অঙ্কের মধ্যে যে ভাবে বার বার সংযোগস্থল পরিবর্তিত হয়, তাহাতে তাহার পশ্চাতে দৃশ্যপট স্থাপনের কোনো উপায়ই থাকে না। অবশ্য সংস্কৃত নাটকের মধ্যে এমন অনেক প্রসঙ্গ বা প্রয়োগ-নির্দেশ আছে, যাহা আধুনিক যুগের ঘূর্ণ্যমান রঙ্গমঞ্চ না থাকিলে অভিনয়ে ঠিক ঠিক রূপ দেওয়া যায় না। শুধু অঙ্গভঙ্গী, মুদ্রা বা বর্ণনার দ্বারা ঐ অংশ সারিয়া দেওয়া সম্ভব নয়। যেখানে প্রবেশ অর্থে গমন বা চলমানতা বুঝায়, সেখানে মানুষ হাঁটিয়া, নাচিয়া বা হামাগুড়ি দিয়া প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু মৃচ্ছকটিকে কি করিয়া "ততো প্রবিশতি শয়ানঃ

চারুদত্তঃ" সম্ভব হয় তাহা ভাবিয়া পাই না। যাহা হউক যাত্রার নাটকে আদৌ কোনো দৃশ্য বা অঙ্কের ভাগ ছিল না। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর পালায় অঙ্ক বা দৃশ্যের উল্লেখ নাই। গোবিন্দ অধিকারীর পালাগুলির সম্পাদন কালে পাঁচকড়ি দে মহাশয় নাটকের মতো অঙ্ক-নির্দেশ করিয়াছেন। ব্রজমোহন রায়ের পালায় মধুসূদনের অনুকরণে অঙ্ক এবং গর্ভাঙ্ক শব্দের প্রয়োগ আছে। কোনো কোনো পালা হয়ত নাট্যকার ঐভাবে ঠিক সাজাইয়াছেন। ব্রজমোহন রায়ের যাত্রার মধ্যে দুই ধরনের পালা পাওয়া যায়। রামাভিষেক প্রভৃতি পালা একেবারে পুরাপুরি যাত্রার শৈলীতে রচিত এবং অভিমন্যুবধ, তারকাসুরবধ, দানববিজয় প্রভৃতি কয়েকটি পালা যাত্রা-রীতির সহিত মধুসূদন-দীনবন্ধুর নাট্য-রীতির মিশ্রণের ফলে রচিত হইয়াছে। আবার ইহাও সত্য যে কয়েকখানি পালা ব্রজ রায়ের নিজের রচনা নয়। সুতরাং যে সকল পালায় প্রাচীন যাত্রা-রীতির সহিত আধুনিক নাট্য-রীতির মিশ্রণ হইয়াছে, সেগুলি ব্রজ রায়ের রচনা কিনা তাহাও সন্দেহ করিবার অবকাশ থাকে। কিন্তু ব্রজমোহনের রামাভিষেক, শতস্কন্ধ-রাবণ-বধ প্রভৃতি পালার আলোচনা করিলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে অঙ্ক বা দৃশ্যে ভাগ করিয়া এই নাটক রচিত হইতে পারে না। কেন? 'কেন'র উত্তর এই যে অঙ্ক থাকিতে হইলে সন্ধির প্রয়োজন। সংস্কৃত বা ইংরাজী নাটকে এই সন্ধি আছে। সংস্কৃত নাটকে দেখানো হয় জীবনের রস-রূপ এবং ইংরাজী নাটকে দেখানো হয় জীবনের ঘটমান রূপ। সুতরাং উভয় নাটকেই রসের বা ঘটনার একটি বীজ থাকে। বীজ উভয় দিকেই গজায়,—মাটির নীচে ও উপরে। বীজের ভিতর নিহিত থাকে ভবিষ্যৎ-বৃক্ষের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। যতক্ষণ পর্যন্ত বাহিরের আলোবাতাস, বর্ষণ প্রভৃতির অনুপোষণী প্রেরণা না পায়, ততক্ষণ পর্যন্ত বীজ গজায় না। ভবিষ্যৎ-বৃক্ষ-সৃষ্টির সমস্ত সম্ভাবনা লইয়া সে এই অনুকূল প্রেরণার অপেক্ষা করে মাত্র। উপযুক্ত মাটি ও জলবাতাস পাইয়া যখন সে গজাইতে আরম্ভ করে, তখন দেখা যায় অঙ্কুরাবস্থা হইতে পূর্ণ-পরিণতি পর্যন্ত মাটির নীচে ও উপরে বৃক্ষ-জীবনের এক সংগ্রাম শুরু হয়। অনুকূল প্রেরণা ও অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি, কীট পতঙ্গের উৎপাত-রূপ প্রতিকূল-সংঘাত একসঙ্গেই আরম্ভ হয় বৃক্ষের জীবনে। কিন্তু বৃক্ষের সত্তানুস্যূত জীবন-প্রেরণা প্রতিকূল সংঘাতকে পরাজিত ও অভিভূত করিয়া এবং অনুকূল পোষণকে

গ্রহণ করিয়া বৃক্ষকে বিকশিত করে। আর ইহা না করিতে পারিলে ধ্বংস হয়। নাটকের রসস্ফুরণ বা ঘটনাসৃষ্টিও এইরূপ। নাটক প্রধানতঃ নায়ক-সর্বস্ব। নায়ক বা প্রধান-চরিত্র সমস্ত ঘটনার নিয়ামক বা নেতা। এই নায়কের অন্তরের কোনো সুপ্ত-সংস্কার বা বাসনা যখন বাহিরের সংঘাতে অন্তরে সক্রিয় হইয়া প্রকাশ পায় তখনই হয় নাট্য-ঘটনার সৃষ্টি বা নাট্য-রস-স্ফুরণের সূচনা। ঐ অন্তর-নিহিত সংস্কারের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় স-পারিপার্শ্বিক নায়কের যাহা কর্মপ্রচেষ্টা তাহাই নাটকের ঘটনা। সুতরাং নাটককে বলিতে পারি নায়ক-চরিত্রের রূপায়ণ। বাহিরে যে ঘটনার প্রকাশ তাহা অন্তরের প্রেরণার, আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারণা-ভাবনার বাণী-রূপ। নাট্যকাহিনীর একটি আরম্ভ আছে; আরব্ধ ঘটনা সহজ ভাবে সমাপ্তির দিকে ছুটিয়া যায় না। প্রতিকূল ক্রিয়ার সংঘাতে তাহার গতি হয় বক্র, জটিল ও দ্বন্দ্বময়। নাট্য ঘটনার তাই একটা উত্থান-পতন, আরম্ভ ও পরিণতি আছে। এ ঘটনা নিরবচ্ছিন্ন হইলেও ইহার উত্থান-পতনের কয়েকটি বিশেষ শৃঙ্গ স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষীভূত হয়। এই শৃঙ্গ বা তুঙ্গাবস্থানগুলিকে বলা হয় সন্ধি। নাটকে যে কয়টি সন্ধি থাকে, সাধারণতঃ সেই কয়টি অঙ্ক দেখা যায়। যাত্রার নাটকে গল্প বা কাহিনী আছে। কিন্তু তাহা ঘটনা নয়। অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার সত্তা-বিধৃত সংস্কার-বীজের বৃক্ষায়ণী পরিণতির ইতিহাস এই যাত্রার কাহিনী নহে। যাত্রার পাত্র-পাত্রী নিজেদের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা চিন্তা বা কর্ম দিয়া পালার কাহিনীটি সৃষ্টি করে না। শ্রোতা বা দর্শকদের একটা জানা-কাহিনীর জানা-চরিত্র হিসাবে তাহারা গল্পের স্রোতে ভাসিয়া আসে মাত্র। যাত্রাওয়ালার একমাত্র লক্ষ্য থাকে কি করিয়া কোন্ মূহূর্তে কাহিনীর কোন্ ফাঁকে এতটুকু উচ্ছ্বাসের বাষ্প সৃষ্টি করা যাইবে। হয় তাহা অতিকান্নার বর্ষণে গলিয়া পড়িবে, না হয় অতিক্রোধের উত্তাপে একটা আকস্মিক দাহ সৃষ্টি করিবে। সুতরাং যাত্রার কাহিনীতে অঙ্ক-সৃষ্টির বালাই নাই। তারপর দৃশ্য বা গর্ভাঙ্ক। যেখানে ঘন ঘন ঘটনাস্থলের পরিবর্তন হইতেছে, একটি বা দুইটি মাত্র উত্তর-প্রত্যুত্তরে যেখানে সংযোগ-স্থল বদলাইয়া যাইতেছে, সেখানে দৃশ্য বা গর্ভাঙ্কের অবকাশ কোথায়? ব্রজমোহন রায়ের রামাভিষেক নাটকের প্রথম অঙ্কটির বিচার করা যাউক। প্রথম গর্ভাঙ্কের আরম্ভে একখানা বন্দনা-গীতি। তারপর প্রতিহারী রাজাকে বলিল,—

"মহারাজ আসন পরিগ্রহ করুন।" রাজা আদেশ করিলেন,—"প্রতিহারী, কুলগুরু বশিষ্ঠ দেবকে শীঘ্র অত্র ভবনে আনয়ন কর।" "মহারাজ আপনার অনুমতি মতে চল্লাম।" বলিয়া প্রতিহারী প্রস্থান করিল। প্রথম গর্ভাঙ্কের শেষ। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে বশিষ্ঠ-ভবনে গিয়া প্রতিহারী ডাকিতেছে,— "কোথায় প্রভু বশিষ্ঠদেব কোথায়? বশিষ্ঠ উত্তর করিলেন,— "প্রতিহারী আমাকে কি জন্য ডাকছো?" প্রতিহারী বলিল,—"মহারাজ আপনাকে আহ্বান করেছেন।" বশিষ্ঠ বলিলেন,—"প্রতিহারী তুমি মহারাজকে বলগে আমি সত্বরই যাচ্ছি।" দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক শেষ। নাটকের দৃশ্য ও সংযোগ-স্থল নির্দেশ করা দৃশ্যপটের ব্যবহারের জন্য। কিন্তু দুইটি বা চারিটি বাক্যের পর দৃশ্যপট উত্তোলন বা ক্ষেপণ করা সম্ভব নহে। মনে হয় এই দৃশ্য-নির্দেশ নাট্যকারের দেওয়া নহে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যেমন সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ করিতে গিয়া ইংরাজী নাটকের সংস্কার-বশে প্রতি অঙ্ককেই অনেকগুলি দৃশ্যে ভাগ করিয়াছেন, এখানেও ব্রজমোহন-গ্রন্থাবলীর সংকলয়িতা সেই একই সংস্কারের বশবর্তী হইয়া দুই চারিটা মাত্র বাক্য অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

আরম্ভের প্রস্তাবনার ন্যায় যাত্রার সমাপ্তিও লক্ষ্য করিবার মতো। সংস্কৃতে বিষাদান্ত নাটক নাই। যাত্রার নিমাইসন্ন্যাস, অভিমন্যুবধ প্রভৃতি পালার সমাপ্তি বিয়োগান্ত হওয়া উচিত। কিন্তু যাত্রাওয়ালারা বিয়োগের মধ্যেও মিলনের ইঙ্গিত দিয়া প্রায়ই তাঁহাদের পালা শেষ করেন। মূল নাট্য-কাহিনীর সঙ্গে এই শেষের মিলনাত্মক অংশের কোনো বিশেষ সংযোগ-সূত্র অনেক সময় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবুও তাঁহারা কিন্তু দর্শকের মন বিষাদে ভারাক্রান্ত করিয়া পালা শেষ করেন না! গোবিন্দ অধিকারীর স্বপ্নবিলাস পালা সমাপ্ত হয় রাধাকৃষ্ণের বিচ্ছেদের মধ্য দিয়া নয়,—নবদ্বীপে অন্তর-কৃষ্ণ-বহির্গৌর শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে। কেননা শ্রীচৈতন্যের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ চির অবিচ্ছিন্ন রূপে বিদ্যমান। গোবিন্দ অধিকারীর নিমাই-সন্ন্যাস পালার নিমাই গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেছেন। নাট্যকার একখানি গানের মধ্য দিয়া পালার সমাপন করেন। গানের বক্তব্যে আমরা বুঝিতে পাই বৃহত্তর জগতের কল্যাণে প্রেম বিলাইবার জন্য আজ চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস। তখন এই দারুণ বিষাদময় ঘটনার মধ্যেও একটি মহান অর্থ খুঁজিয়া পাই। ব্রজমোহন রায়ের অভিমন্যু-

বধ যাত্রার শেষ অভিমন্যুর মৃত্যুতে নহে। মহাদেব অর্জুনকে যখন আশীর্বাদ করেন যে কাল সন্ধ্যার মধ্যেই অর্জুন পুত্রহন্তা জয়দ্রথকে বধ করিবেন, তখন এতবড় একটা অন্যায়ের বিচার হইল বলিয়া আমরা খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। তেমনি মহাদেবের সমাপনী সঙ্গীতে জানিতে পারি যে অভিমন্যুর মৃত্যু—মৃত্যু নয়, লীলামাত্র; শাপমুক্ত চন্দ্র নিজ পত্নী রোহিণীসহ চন্দ্রলোকে আনন্দে বিরাজ করিতেছেন। অবশ্য এই সমস্ত সমাপ্তিতে নাটকের পুঞ্জীভূত বেদনা ধুইয়া মুছিয়া যায় না। তবুও বলা যায়, যাত্রাওয়ালারা নাটকের বিষাদান্ত পরিণতি পছন্দ করেন নাই বলিয়া এইভাবে ক্ষতি পূরণের চেষ্টা করিয়াছেন।

যাত্রার নাটকের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির মোটামুটি আলোচনা হইল। এইবার কয়েকখানি পালার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করিব।

কৃষ্ণকমল গোস্বামীর পালাগুলি নিতান্ত আধুনিক কালের রচনা হইলেও শৈলীর দিক দিয়া উহা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। আনুমানিক ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে কৃষ্ণকমল স্বপ্নবিলাস পালা রচনা করেন।* এই স্বপ্নবিলাস পালার ভূমিকায় তিনি লিখিতেছেন,—"যদিও প্রচলিত অভিনয় (যাত্রা) অনায়াস-দৃশ্য, কিন্তু তাহা সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিতান্ত বিরক্তিকর, কারণ অনভিজ্ঞ অভিনেতৃগণ সামান্য লোকের প্রীতিপ্রদ রহস্য সাধনের উদ্দেশ্যে প্রবন্ধগত প্রকৃত ভাব পরিত্যাগ-পূর্বক অসাময়িক অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে, নানা প্রকার কদর্য রঙ্গভঙ্গী ও নিতান্ত অবিধেয় বেশ-বিন্যাস করিয়া থাকে।" এই দোষের হাত হইতে যাত্রা সাহিত্যকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি লেখনী ধারণ করিলেন। ব্রজমোহন রায়কে উদ্দেশ্য করিয়া অবশ্য কৃষ্ণকমল গোস্বামী এই উক্তি করেন নাই। কেন না ব্রজমোহন রায় বিচিত্র-বিলাস রচনার বহু পরে, অর্থাৎ ১২০০ সালে যাত্রার দলের সৃষ্টি করেন। চার বৎসর কাল উন্নতির সহিত ঐ দল চালাইয়া তিনি অক্ষয় স্বর্গে গমন করেন।† কৃষ্ণকমল যে ধরনের যাত্রার উল্লেখ করিলেন, তাহার উদাহরণ স্বরূপ আমরা ব্রজমোহনের রচনাকে গ্রহণ করিতে পারি। ব্রজমোহন অনেক সময় প্রবন্ধগত মূলভাব

---

* "অনুমান ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রতিভার প্রথম উজ্জ্বল কুসুম স্বপ্ন-বিলাস রচিত হয়।"—ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন-সম্পাদিত 'কৃষ্ণ-কমল গ্রন্থাবলী'র ভূমিকা, পৃঃ ৫।

† ব্রজমোহন রায়ের রচনাবলীর অন্তর্গত, গোপীমোহন রায় লিখিত, ব্রজমোহন রায়ের জীবনী, পৃঃ ২।

পরিত্যাগ করিয়া জন-সাধারণের তুষ্টির জন্য অকারণ অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। একটা উদাহরণ দিতেছি।

অভিমন্যুবধ যাত্রা। তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক। দূত আসিয়া সংবাদ দিতেছে, "মহারাজ, আমি দেখে এলাম যুগান্তকালীন যমের ন্যায়, মধ্যাহ্নকালীন সূর্য-সদৃশ, তৃতীয়-পাণ্ডব-অর্জুন-কুমার অভিমন্যু সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছেন। এক্ষণে আপনার অভিরুচি।" দুর্যোধন কর্ণ, দুঃশাসন, শকুনি, প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এক্ষণে কর্তব্য কি?" শকুনি বিরাট একখানি বক্তৃতা করিয়া বলিলেন,—"তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে গিয়ে বসে থাক, আমি একলা সাহসী হয়ে দর্পের সহিত তোমার সমস্ত কাজ নির্বাহ করছি।"

মনে রাখিতে হইবে স্থান যুদ্ধক্ষেত্র, এখানে সমস্ত কাজ নির্বাহ অর্থ উপযুক্ত সৈনাপত্যের দ্বারা শত্রুসংহার। কিন্তু ধান ভানিতে শিবের গীত আরম্ভ হইয়া গেল। দুর্যোধন উত্তর করিলেন,—"মামা, এটা যে বড় কৌতুকের কথা। আমার সমস্ত কার্যের ভার তুমি নেবে তাহলে ত আমার আসনে বস্‌তে হবে, আমার শয্যায় শয়ন করতে হবে, ছি ছি বড় লজ্জার কথা, আর ভেঙ্গে চুরে বলব না, এই পর্যন্ত থাক। বলি লক্ষ্য বেঁধাটাও তোমার মনে সাধ ছিল নাকি?" ইত্যাদি। যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহ পরিস্থিতি ভুলিয়া মামা-ভাগ্‌নে দুইজন ভাঁড়ামি করিতে শুরু করিলেন। পরিস্থিতি বা চরিত্র কোনটির পক্ষে এই ধরনের উক্তি শোভন নয়। এইরূপ ভাঁড়ামি ব্রজমোহনের রচনায় বিরল নহে,—সুপ্রচুর।

কৃষ্ণকমল তাঁহার পূর্ববর্তী গোবিন্দ অধিকারীর শৈলীর অনুকরণ করেন নাই। কেননা দার্শনিকতা-বহুল গদ্য সংলাপ (যাহা গোবিন্দ অধিকারীর বিশেষত্ব) কৃষ্ণকমলের রচনায় নাই। গোবিন্দ অধিকারীর শৈলীর নিন্দাও তিনি করেন নাই। কেননা পরবর্তী যুগের যাত্রাব যে ভাঁড়ামি এবং রসের তারল্যের নিন্দা সমালোচকেরা করিয়াছেন, গোবিন্দ অধিকারীর রচনায় তাহা নাই। সুতরাং কৃষ্ণকমলের রচনা-শৈলীই যাত্রার আদিম শৈলী। যাত্রার উৎপত্তি-বিষয়ক প্রবন্ধে একথা আলোচনা করিব। তাহার পূর্বে কৃষ্ণকমল, গোবিন্দ অধিকারী ও ব্রজমোহন রায়ের শৈলীর বিশিষ্টতা খুঁজিয়া বাহির করা যাক।

কৃষ্ণকমল গোস্বামীর দিব্যোন্মাদ, গোবিন্দ অধিকারীর মুক্তালতাবলী এবং ব্রজমোহন রায়ের সাবিত্রী-সত্যবান এই তিনখানি পালাগ্রন্থ লইয়া আলোচনা করা যাক।

দিব্যোন্মাদ যাত্রার বিষয়বস্তু অতি পরিচিত। বৈষ্ণব কবিরা ভিন্ন ভিন্ন পদে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-যাত্রা, নন্দের নিরানন্দ হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন এবং যশোদার খেদ প্রভৃতি উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী রাধিকার অন্তর-বেদনা বৈষ্ণব সাহিত্যে মাথুর-আখ্য পদ-সমূহের সৃষ্টি করিয়াছে। চৈতন্য-আস্বাদিত রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের মধ্যে যে তন্ময়তা ছিল, কবিগণ অতি নিপুণভাবে তাহা ফুটাইয়াছেন। মেঘদর্শনে শ্রীরাধিকার মূর্ছা, তমাল-তরুর নিকট গিয়া কৃষ্ণের বার্তা জিজ্ঞাসা প্রভৃতি বৈষ্ণব-পদসাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রভাব। কৃষ্ণকমল যাহা কীর্তনে গান করিতেন, তাহাই রূপায়িত করিলেন যাত্রায়। তাঁহার কাব্যে যে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকাহিনী রূপায়িত হইয়াছে তাহা প্রকৃত প্রেমিক-প্রেমিকার ভালবাসার ঘটনাগর্ভ-ইতিহাস নহে। মহাভাব-স্বরূপিণী রাধা ঠাকুরাণীর অলৌকিক দিব্য প্রেমের সঙ্গীতময় রসৈকসর্বস্ব রূপদান করিয়াছেন ভক্তকবি কৃষ্ণকমল।

নিবদ্ধ পদাবলী বা পালাগ্রন্থের বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে উহার ভিতর কাহিনী-অংশ থাকে নিতান্ত যোগসূত্র রক্ষার জন্য। ঐ সামান্যতম সূত্রের সাহায্যে ভাবের পারম্পর্যজ্ঞাপক পদাবলীর সংযোজন করা হয় মাত্র। কৃষ্ণকমল তাঁহার যাত্রা-পালায় তাহাই করিয়াছেন।

দিব্যোন্মাদ যাত্রার কাহিনী এই,—

যে অবধি গোপরাজ নন্দ শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় রাখিয়া আসিয়াছেন যশোদা সে অবধি কৃষ্ণশোকে উন্মাদিনী হইয়াছেন। তিনি ক্ষীর সর হাতে করিয়া "গোপাল আয়" বলিয়া ডাকিতেছেন। রাত্রিকালে শ্রীকৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখিয়া হাহাকার করিয়া উঠেন। সখীগণ প্রবোধ দেয়, বসুমতীর মতো ধৈর্যশীলা যশোমতীর এমন অধীর হওয়া উচিত নয়। কিন্তু যশোদা সেই প্রবোধে শান্ত হন না। তিনি বিধাতার নিষ্ঠুরতার নিন্দা করিতে থাকেন। ব্রজের রাখালগণ আজ রাখালরাজের অভাবে নিরানন্দ। সুবল পথে আসিয়া শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম প্রভৃতিকে গোষ্ঠে যাইতে ডাকিতেছে। কিন্তু গোকুলের মধু ফুরাইয়া গিয়াছে; বৃন্দাবন আজ অন্ধকার। রাখালগণ তাই শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেছে। সুবল গত রাত্রিকালে শ্রীকৃষ্ণের কথা ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। স্বপ্নে দেখিয়াছিল শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া ডাকিতেছেন। স্বপ্ন ভাঙিয়া গেলে আর কৃষ্ণকে দেখা গেল না। সুবল মনে করিয়াছে শ্রীকৃষ্ণ বোধ হয় অন্যান্য সখাগণের সহিত দেখা করিতে গিয়াছেন।

তাই সুবল ব্রজ-রাখালদের খোঁজ লইতে আসিয়াছে। শুনিয়া রাখালগণের ক্রন্দন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাহারা বলিতে লাগিল সুবল ভাগ্যবান, কেননা সে স্বপ্নেও অন্ততঃ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছে। ইহার পর যদি আবার কখনও শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ মেলে সকলে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে রাখিয়া দিবে।

শ্রীরাধিকা আপন মন্দিরে একাকিনী বিষণ্নমুখে বসিয়া আছেন। তাঁহার প্রিয় সখীগণ সকাল বেলা উঠিয়া সেখানে আসিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিতেছে শ্রীরাধিকা এত বিষণ্ণা কেন ? রাধা বলেন, শ্রীকৃষ্ণ এখনও ফিরিলেন না। দারুণ বিরহের আগুনে রাধার সর্বাঙ্গ পুড়িয়া যাইতেছে, নিজের জীবনকে তিনি ধিক্কার দিতেছেন ; যখন শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলেন তাহার সঙ্গে সঙ্গেই রাধার প্রাণ কেন বাহির হইল না। বিশাখা শ্রীরাধিকাকে সান্ত্বনা দিতেছে। কিন্তু রাধা প্রবোধ মানিতেছেন না। তিনি শেষ পর্যন্ত প্রাণ ত্যাগের সংকল্প করিলেন। চিত্রা তখন বলিতেছে, হয়তো শ্রীকৃষ্ণ রাধার প্রেম-ব্যাকুলতা পরীক্ষা করিবার জন্য বৃন্দাবনের বনে কোথাও লুকাইয়া আছেন। তখন আরম্ভ হইল বনে বনে কৃষ্ণান্বেষণের পালা। রাধা বিরহে ক্ষীণা, রুগ্‌ণা। কিন্তু কৃষ্ণান্বেষণের ব্যাকুলতায় সিংহের বিক্রমে ছুটিয়া চলিয়াছেন। সখীগণ ধীরে ধীরে চলিতে অনুরোধ করিতেছে। নহিলে প্রেমের জন্য যে প্রাণ হারাইতে হইবে। শ্রীরাধিকা বলিতেছেন বিজন বনে আঁধার রাতে পিছল পথে চলার অভ্যাস তাঁহার আছে।

রাধিকা চলিয়াছেন। কদম্ব-কাননে গিয়া তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, এই বৃক্ষের মূলে শ্রীকৃষ্ণকে ঘিরিয়া চাঁদের হাট বসিত। গোপ বালকদের সঙ্গে খেলিতে খেলিতে হঠাৎ একদিন চাঁপা ফুল দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের রাধা-রূপ মনে পড়িয়া গিয়াছিল। অমনি সুবলকে তিনি রাধাকে আনিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তখন কি করিয়া সুবল-বেশে শ্রীরাধিকা আসিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন তাহাই রাধার মনে পড়িয়া যায়। বিগত দিনের সুখের স্মরণ আজ দুঃখকেই বর্ধিত করিতেছে।

নিকুঞ্জ বনে প্রবেশ করিয়া রাধার দিব্যোন্মাদ শুরু হইয়া গেল। সারসপক্ষীর কণ্ঠস্বরকে তিনি মুরলী-ধ্বনি মনে করিয়া উৎকর্ণা হইতেছেন। আকাশের জল-ভরা মেঘ দেখিয়া তিনি মনে করিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন। মেঘকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি তাই প্রেম-নিবেদন করিতেছেন। মেঘ চলিয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ কথা না বলিয়া চলিয়া যাইতেছেন মনে করিয়া রাধা মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

বিশাখার পরামর্শে রাধার কানে কানে কৃষ্ণ নাম জপ করিয়া সখীগণ রাধার চৈতন্য সম্পাদন করিল। চৈতন্য ফিরিয়া আসিল বিস্মৃতিকে সঙ্গে লইয়া। চক্ষু মেলিয়া রাধা সখীগণকে চিনিতে পারিতেছেন না, নিজেকেও তিনি ভুলিয়াছেন। তিনি প্রশ্ন করিতেছেন, রাধা কে? কি জন্যই বা সে বনে আসিয়াছে? সখীগণ যখন বলিল যে শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরের রথে মথুরায় গমন করিলে রাধা তাঁহারই সন্ধানে বনে আসিয়াছেন, তখন রাধার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তাঁহার বিরহ-সমুদ্র আবার উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি শোক করিতে করিতে আবার মূর্ছিতা হইলেন। রাধাকে জাগাইবার জন্য সখীরা সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিল। নাকের কাছে তুলা ধরিয়া দেখা গেল নিঃশ্বাস চলে না। নাড়ী ধরিয়া দেখা গেল স্পন্দন নাই। তখন রাধা দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন মনে করিয়া সখীগণ মৃত্যুসংকল্প করিতেছে। অবশেষে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহারা মূর্ছিত হইয়া পড়িল। তখন চন্দ্রাবলী সেখানে প্রবেশ করিলেন। চন্দ্রা দেখিলেন সখীগণ-সঙ্গে রাধিকা মূর্ছিতা। তিনিও খেদ করিতে লাগিলেন। তারপর ধীরে ধীরে সখীগণ জাগিয়া উঠিল। চন্দ্রা তখন পরামর্শ দিলেন,—কৃষ্ণ-অঙ্গ-পরিমল-বাসিত মৃগমদ ও নীলোৎপলের গন্ধে রাধাকে জাগানো হইবে। রাধা জাগিয়া উঠিলে তাঁহার সম্মুখে কৃষ্ণের চিত্রপট ধরা হইবে। কিন্তু চিত্রপট দর্শনে রাধিকার ব্যাকুলতা আরো বাড়িয়া গেল। তিনি যোগিনী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে যাইবেন মনস্থ করিলেন। শুনিয়া চন্দ্রা শ্রীকৃষ্ণকে আনিবার জন্য মথুরায় যাত্রা করিল।

মথুরাপুরী। চন্দ্রার মুখে রাধার নাম শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা মনে পড়িয়া গেল। তিনি চন্দ্রাকে আশ্বাস দিলেন, অতি সত্বর গোকুলে শ্রীরাধার সঙ্গে মিলিত হইবেন।

রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলনে পালার শেষ হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্বে নাট্যকার চৌদ্দ পংক্তি পয়ারে এই দৃশ্যের একটি ভূমিকা রচনা করিয়াছেন। উহা রাধাকৃষ্ণ-প্রেমতত্ত্বের গোস্বামী-সিদ্ধান্ত মতে ব্যাখ্যা, অর্থাৎ দার্শনিকতা। রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবনে নিত্যই লীলা করেন। তাঁহাদের বিচ্ছেদ নাই। শুধু প্রোষিত-ভর্তৃকা-রসাস্বাদের জন্য এই বিরহ কল্পনা করা হয়। কৃষ্ণ যখন সম্মুখে থাকেন তখন গোপীগণ মনে করে, কৃষ্ণ বৃন্দাবনে আছেন; যখন তিনি অদর্শন হন, তখনই গোপীগণ মনে করে, তিনি মথুরায় গিয়াছেন। যাহা হউক মিলন-সঙ্গীতে পালা সাঙ্গ হয়।

এইবার পালাটির শৈলীর আলোচনা। পালাটির আরম্ভে একখানি গৌরচন্দ্রিকা ও একটি প্রস্তাবনা আছে। পূর্বেই সে বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। গদ্য সংলাপ পালাটিতে নাই বলিলে খুব ভুল হইবে না। কারণ সমস্ত পালার মধ্যে অতি সামান্য প্রয়োজনে পাঁচ সাতটি মাত্র গদ্য বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রায়শঃ এক একখানি দীর্ঘ গান। সেই গানের সূত্র ধরাইবার জন্য বা ভূমিকা প্রস্তুত করিবার জন্য কিছু কিছু ছড়ার বা পয়ারের ব্যবহার হয়। আবার অতি সামান্য স্থানে দেখা যায় পয়ারের শ্লোকে শ্লোকে সংলাপ সৃষ্টি হইতেছে। গানগুলি প্রায় সর্বত্র কীর্তনাঙ্গ। প্রায়ই গানটি হয় পূর্ববর্তী ছড়ার বিস্তৃত ব্যাখ্যা। আবার কখনও আগের বক্তব্যকে স্পষ্ট করিতে গানের আরম্ভ হয়, কিন্তু সঙ্গীতের গন্ধে আরো দুই চারিটি নূতন কথা জুড়িয়া দেওয়া হয়। দুই একটি উদাহরণ দিয়া বক্তব্যটি পরিষ্কার করা যাউক।

শ্রীকৃষ্ণ মধুপুরে গমন করিলে শ্রীরাধিকা একদিন বিষণ্ণ মনে আপন সদনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। প্রভাতে রাধার প্রিয় সখীগণ তাঁহার নিকটে আসিয়াছে। ["প্রভাতে উঠিয়া রাধার প্রিয় সখীগণ" প্রভৃতি পরিচয়-জ্ঞাপক চার পংক্তির আলোচনা পূর্বে করিয়াছি, সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি করিলাম না]। তাহাদের সহিত রাধার আলাপ শুরু হইল—

"সখীগণ। উঠ উঠ বিনোদিনী, কথা বল গো শুনি
কেন কমলিনী হয়েছ মলিনী,
কি ভাব গো বসে একাকিনী ?

রাধিকা। এস সবে মোর প্রিয় নর্মসহচরী,
বঁধু ত এল না ব্রজে বল কি আচরি ?
(রাগিনী—জংলাট, তাল—একতালা।)
মরি হায় কি হইল।
সই কি করি বল, বিচার করেই বল,
ছিল যার বলেতে আমার করি বল,
ও সে হরি বলকে বল্ কে হরিল ?

তাল—যৎ।

আমার মনোসাধ না পুরিতে, শ্যাম গেল মধুপুরীতে
ত্বরিতে আসার আশা দিয়ে প্রাণসজনী গো
আমার প্রাণ রলো তার আশাবদ্ধ, হল যে তার আসা বন্ধ

সে যে আসব বলে আর ত ব্রজে এল না গো—
বুঝি কার আশাবদ্ধ হয়ে, প্রাণ সজনী গো।”

সম্পূর্ণ গানটি উদ্ধার করা সম্ভব নহে। ভিন্ন ভিন্ন তালে বিভক্ত হইয়া, ছোট ছোট. আখর সহযোগে বিস্তৃত হইয়া গানটি পুস্তকের প্রায় দুইখানি পৃষ্ঠা জুড়িয়া বসিয়াছে। গান শেষ করিয়া রাধা আবার সুরে চার পংক্তি পয়ার আবৃত্তি করিলেন।—

“শুন প্রাণসখী মোর দুঃখের নিদান,
প্রাণনাথ গেল তবু নাহি যায় প্রাণ।
ওরে অভাগীর প্রাণ, তোরে তাই বলি,
শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখ হয়ে কোন্ কাজে রলি ?”

আবৃত্তি শেষ করিয়াই রাধা আর একখানি অতিদীর্ঘ গান ধরিলেন,—

“কি কাজ নিলাজ প্রাণ তোরে আর,
এ দুঃখে কি সুখে অন্তরে রলি ?
ওরে যখন শ্যামরায় গেল মথুরায়,
তুই কেন তার সনে নাহি বাহির হলি ?” ইত্যাদি।

গান শেষ হইলে পয়ারের দুইটি শ্লোকে বিশাখা ও রাধার উক্তি প্রত্যুক্তি আছে,—

“বিশাখা। ভেবনা ভেবনা ধনি বসিয়ে বিরলে।
উদ্বেগ কলহ কণ্ডু বাড়য়ে সেবিলে॥
রাধিকা। মনোদুঃখ কারে কই কেবা বুঝে সই ?
কি ছিলাম কি হলেম আর কি বা হই।”

বলিয়াই রাধা আবার গান ধরিলেন,—

“সখী শ্যাম-প্রেম-সুখ-সাগরে,
সদা আমি মীনের মত ডুবে রইতেম।”

গানখানির ব্যাপ্তি দীর্ঘ চার পৃষ্ঠা। পয়ার এবং গান প্রয়োগের বিশেষত্ব এই যে, পয়ার শুধু গানের সূত্র-স্থাপনের জন্য [connecting link] ; গানে গানে পালাটি অগ্রসর হইয়া চলে। যেখানে ভাব শান্ত, সংযত অথচ উচ্চ-দার্শনিকতা-পূর্ণ সেখানে পয়ারের পংক্তিতে পংক্তিতে কিছুটা সংলাপ অগ্রসর হইয়াছে মাত্র। কিন্তু এই ধরনের প্রয়োগ নিতান্ত অল্প। দ্বিতীয় বারের মূর্ছাভঙ্গের পর রাধা ও সখীগণের মধ্যে আলাপ হইতেছে,—

"রাধিকা। এখানে বসিয়ে তোরা কে গো বল দেখি ?
সখীগণ। একি বল সুধামুখী আমরা তব সখী।
রাই কি চিন না চিন না।
রাধিকা। তোদের কোলেতে আমি কেবা কহ শুনি ?
সখীগণ। একি বল তুমি মোদের রাধা বিনোদিনী।
রাই কি ভুলেছ ভুলেছ—আপনা চিনতে নার।
রাধিকা। কোন্ রাধা হই আমি বল সখীগণ।
সখীগণ। বৃষভানু-সুতা তুমি মোদের প্রধান।
তা কি জান না জান না।" ইত্যাদি।

এখানেও কিছু বক্তব্য আছে। আধুনিক অর্থে যাহাকে পয়ার বলে, অর্থাৎ চৌদ্দটি অক্ষর গুণিয়া আট-ছয় মাত্রায় যতি বসাইয়া যে পয়ার রচিত হয়, ইহা সে পয়ার নহে। কৃষ্ণকমলের পয়ারে সব সময় চৌদ্দটি করিয়া অক্ষর থাকে না। যথা,—

"কি ছিলেম, কি হলেম, আর কি বা হই,"—
(চৌদ্দ অক্ষর বা হরফ।) অথবা,—
"একি বল তুমি মোদের রাধা বিনোদিনী।"—
(পনের অক্ষর।)

এইরূপ হওয়ার কারণ কি ? কারণ এই যে, বর্তমান কালে পয়ারের মধ্যে বাংলা কথ্য ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ-পদ্ধতিকে যতখানি মানিয়া লওয়া হয়, মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে শব্দের সেই স্বাভাবিক উচ্চারণকে ততখানি মানিয়া লওয়া হইত না। ["মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ" প্রসঙ্গে এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিব।] তখন কাব্য-পাঠও ছিল সঙ্গীতাত্মক। প্রয়োজন বোধে দুই একটি মাত্রাকে টানিয়া দীর্ঘ করিয়া লওয়া হইত। উদ্ধৃত "কি ছিলেম, কি হলেম, আর কি বা হই", এই চরণের "কি" কে 'কিই' বা 'কী' করিয়া উচ্চারণ করা হইত। সাধারণ কথা হইতে সঙ্গীতের পার্থক্যও এইটুকু। সাধারণ কথায় আমরা বাংলা শব্দের লঘু-গুরু-মাত্রাত্মক উচ্চারণ করি না। কিন্তু গানে স্বর-সাম্যের জন্য তাহা করিতে হয়। আবার এই স্বর-সাম্যের জন্য অনেক সময় অতিরিক্ত মাত্রাকে কমাইয়া উচ্চারণ করিতেও হয়। উদ্ধৃত "একি বল তুমি মোদের রাধা বিনোদিনী", এই পংক্তির "মোদের"

শব্দটি মোঁদেঁর এইরূপ হ্রস্ব দ্বিমাত্রিক উচ্চারণ করিতে হইবে। সুতরাং কৃষ্ণকমলের পয়ারগুলিও সঙ্গীত। কৃষ্ণকীর্তনের পয়ার-ত্রিপদীর সবই সঙ্গীত। বিজয় গুপ্ত, নারায়ণদেব প্রভৃতির মঙ্গলকাব্যের পয়ারে রচিত লাচারি-অংশগুলি রাগ-রাগিণী-সমন্বিত গান। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের পয়ারের পদগুলিও বিশিষ্ট রাগ-রাগিণীতে গেয় গীতি। কৃষ্ণকমলের এই পয়ারগুলিতে রাগিণীর উল্লেখ না থাকিলেও এগুলিও ঠিক তেমনি গান। সুতরাং কৃষ্ণকমলের যাত্রা আদ্যন্ত সঙ্গীত ;—উহাই সত্য সত্য যাত্রাগান।

গোবিন্দ অধিকারীর মুক্তালতাবলী পালা কৃষ্ণকমলের দিব্যোন্মাদ যাত্রার মতো নয়। গোবিন্দ অধিকারীর রচনায় গদ্য-সংলাপ ও গান উভয়েই স্ব স্ব প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। মুক্তালতাবলীর শৈলী আলোচনার আগে পালাটির কাহিনী একটু বর্ণনা করা প্রয়োজন।

গল্পাংশ অতি সামান্য। গোষ্ঠে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের মনে এক নূতন বাসনা জাগিয়াছে। তিনি মুক্তাবন সৃষ্টি করিবেন। মুক্তা দিয়া নবলক্ষ গোধন এবং দ্বাদশ গোপালকে সাজাইবেন। বীজ হিসাবে একটি মুক্তা পাওয়া গেলে তাহা মাটিতে পুতিয়া দিবেন। তাহা হইতে মুক্তার লতা সৃষ্টি হইবে। কিন্তু বীজ-মুক্তাটি কোথায় পাওয়া যাইবে? শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে সুবল শ্রীরাধিকার নিকট মুক্তা আনিতে চলিল। রাধা তখন শ্রীকৃষ্ণের কুশল জানিবার জন্য ব্যাকুল। কেননা শ্রীকৃষ্ণ আজ গোষ্ঠে গিয়া একবারও বংশী-ধ্বনি করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের কোনো বিপদ হইল কিনা? এমন সময় সুবল আসিয়া পড়িল। কিন্তু রাধা ধনের অহঙ্কারে শ্রীকৃষ্ণকে মুক্তা দান করিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ তখন মা যশোদার নিকট হইতে মুক্তা চাহিয়া আনিয়া তাহা দ্বারা মুক্তালতাবলী সৃষ্টি করিলেন। মুক্তা দিয়া রাখালগণ সাজিল, গোধন সাজাইল। শ্রীমতী ওদিকে কৃষ্ণ-মিলনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহাকে আদৌ স্মরণ করিতেছেন না। সখী বৃন্দা আসিয়া রাধাকে মুক্তাবনের সংবাদ দিল। শ্রীকৃষ্ণ যে রাধার নিকট মুক্তা না পাওয়ায় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন তাহাও বলিল। রাধা নিজের অপরাধ বুঝিলেন। কি করিয়া এখন কৃষ্ণ-মিলন সম্ভব হয় বৃন্দাকে তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃন্দা বলিল, মুক্তাবনে মুক্তা চুরি করিতে গেলেই শ্রীকৃষ্ণের দর্শন মিলিতে পারে ; অন্য উপায় নাই। এই প্রস্তাবে সখীগণ সঙ্গে লইয়া রাধা মুক্তা চুরি করিতে আসিলেন। কিন্তু সুবল ও অন্যান্য রাখালগণের হাতে ধরা পড়িলেন। সুবল রাধাকে দুই চারিটি সুবোল বলিয়া বিদায় দিল। রাধা

অপমানিতা হইয়া ফিরিয়া গেলেন। ওদিকে পৌর্ণমাসী শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিল তিনি কি রাধাকে ত্যাগ করিয়াছেন? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, রাধাকে তিনি ত্যাগ করেন নাই, করিবেন না। তবে যতক্ষণ রাধার মনে অহঙ্কার আছে ততক্ষণ তিনি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারেন না। রাধা ভাবিয়াছেন, তাঁহার মতো প্রিয়া কৃষ্ণের আর কেহ নাই। সেই ধারণা চূর্ণ করিতে হইবে। তিনি মায়াবলে মুক্তাবনেই এক স্বর্ণপুরী নির্মাণ করিলেন। সখাগণ প্রত্যেকে কৃষ্ণ সাজিয়া বসিল; দ্বারে দ্বারে শত শত মায়া-রাধা দ্বারিণী সাজিয়া রহিল। রাধা সখীগণ-সঙ্গে মুক্তাবনে প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু কোন্ কৃষ্ণ যে সত্যকার কৃষ্ণ তাহা তিনি চিনিতে পারিতেছেন না। তরুলতার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াও কোনো সদুত্তর পাওয়া গেল না। শেষে দ্বারদেশে গিয়া রাধা আরো বিস্মিত হইলেন আর একটি রাধাকে দেখিয়া। রাধার অভিমান এবং অহঙ্কার চূর্ণ হইল। তিনি চোখের জলে দ্বারদেশে অবস্থিতা রাধার নিকট পুরীপ্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। প্রত্যেক দ্বারে এমনি অনুনয় করিয়া রাধিকাকে প্রবেশ করিতে হইল। শ্রীকৃষ্ণ মায়া সংবরণ করিলেন। মুক্তাবনে রাধাকৃষ্ণের মিলন হইল।

কৃষ্ণকমলের যাত্রার মতো গোবিন্দ অধিকারীর পালায়ও কাহিনীর নিজস্ব আকর্ষণ কিছুই নাই। কা৷৲নী জটিল বা অভিনবও নহে। গীতি-কবিতার হৃদয়-ঢালা উচ্ছ্বাস কৃষ্ণকমলের রচনার প্রধান আকর্ষণ। তাহার সঙ্গে সঙ্গে অতি অল্প মাত্রায় রহিয়াছে রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য-বিশ্লেষণ-রূপ দার্শনিকতা। গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রায় সঙ্গীতের প্রাচুর্য আছে। সেই সঙ্গীতকে অবলম্বন করিয়া তাহার আশেপাশে যে গদ্য সংলাপ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রয়োজন দ্বিবিধ। একদিকে এই গদ্যাংশ নাটকের গল্প সৃষ্টি করিতেছে, অন্যদিকে রাধা-কৃষ্ণ-তত্ত্ব-বিষয়ক বা রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম-বিষয়ক দার্শনিক ব্যাখ্যায় উহা পালাটিকে ভরিয়া তুলিতেছে। এই গদ্যের গল্পাংশ বরং নীরস। কিন্তু দার্শনিকতার অংশ সরস এবং উপভোগ্য। একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে নাট্যকার তত্ত্ব-ব্যাখ্যাকেই পালার মধ্যে প্রধান স্থান দিয়াছেন। তাহার জন্য গল্পের গতি মন্থর হইলেও তিনি ভ্রূক্ষেপ করিতেছেন না। যুক্তি-তর্কের অবতারণায়, শ্লেষালঙ্কারের অতি-প্রয়োগে বাচ্যার্থকে বক্রোক্তির দ্বারা ঘুরাইয়া লইয়া নাট্যকার যে-কোনো প্রকারে তত্ত্ব-ব্যাখ্যার সুযোগ সৃষ্টি করিতে পারিতেছেন কিনা তাহাই লক্ষ্য রাখিতেছেন। যখনি কাহিনী-বর্ণনার অংশ তিনি ত্যাগ করিলেন, তখনই

দেখা গেল যে নাট্যকারের পাত্র-পাত্রীর মুখের কথা যেন আর ফুরাইতেছে না। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক,—

স্থবল। ওগো কানাই, তুমি যে খেলতে জান, তা আমরা ভাল জানি গো, কিন্তু মুক্তা নিয়ে খেলা হয় এ বিশ্বাস করতে পারি না গো।

কৃষ্ণ। কেন গো স্থবল, বিশ্বাস করতে পার্‌বে না কেন গো?

স্থবল। ওগো কানাই, কেন বিশ্বাস হবে না বলি শোন গো।

গীত

শোন গো কানাই, তোমায় জানাই,
কেমনে করিব বিশ্বাস।
যা হয় নাই কোনো কালে, শুনি নাই কোনো কালে,
খেলা হবে সেই মুক্তা ফলে, এ যে ঘোর অবিশ্বাস॥
মুক্তা নয়ত গাছের ফল,
মুক্তা নয়ত নদীর জল,
শুক্তিতে স্বাতীর জল,
পড়লে ফলে মুক্তা ফল,
সে মুক্তা এত পাবে কোথা, তাই দেও বৃথা আশ্বাস॥
মুক্তা নিয়ে খেলিবে খেলা,
এত মুক্তা কোথা কালা
একটা মুক্তা যায় না মেলা,
মুক্তায় হবে মুক্তার মালা,
দাস গোবিন্দ গোবিন্দের লীলা দেখে ছাড়বে শেষ নিঃশ্বাস॥

কৃষ্ণ। ওগো স্থবল, আমি মুক্তা নিয়ে খেলতে জানি কিনা তোমাদের কিসে বিশ্বাস হবে গো?

স্থবল। ওগো, যদি বিশ্বাসী সাক্ষী দিতে পার, তবে বিশ্বাস হয় গো।

কৃষ্ণ। ওগো স্থবল কার সাক্ষীতে তোমার বিশ্বাস হবে বল গো। আমি তাকে এনেই সাক্ষী দেওয়াব গো।

স্থবল। ওগো কালশশী, যদি দেবী পৌর্ণমাসী এসে সাক্ষী দেন, তবে বিশ্বাস করি গো।

কৃষ্ণ। ওগো স্থবল আমি তবে তাকেই সাক্ষী করছি গো। কোথা গো মা পৌর্ণমাসী একবার এইদিকে এস গো মা।

বড়াই। ওগো কানাই আমাকে ডাকছ কেন গো? গোষ্ঠে এসে কোনো কষ্ট হয়েছে না কি গো?

কৃষ্ণ। না গো মা, তোমার দয়ায় গোষ্ঠে এসে কোনো কষ্ট পাইনি গো।

বড়াই। তবে বাছা, আমায় কি জন্য ডেকেছ গো?

কৃষ্ণ। ওগো মা, আমার আজ মুক্তার খেলা খেলতে সাধ হয়েছে গো।

বড়াই। ওগো কানাই, তোমার খেলার সাধ কি অপূর্ণ থাকে গো?

কৃষ্ণ। ওগো মা, আমি মুক্তার খেলা খেলতে জানি কি না বল গো।

বড়াই। বলি কানাই গো, জগতে এমন কোন্ খেলা আছে, যে খেলা তুমি জান না? জগতের যত খেলা সবই তো তোমার খেলা গো।

কৃষ্ণ। ওগো সুবল, বড়াই মার সাক্ষী শুনলে ত গো?

সুবল। ওগো বড়াই মা, আমার একটি কথা শোন গো।

বড়াই। কেন গো সুবল, কি বোল বলবে, বল গো?

সুবল। ওগো বড়াই মা, কানাই কি করে মুক্তার খেলা খেলবে বলত গো? যে মুক্ত একটা মেলে না, সে মুক্ত ও এত কোথা পাবে গো?

বড়াই। ওগো সুবল মুক্তর জন্য ভাবনা কিগো? কানাই যে মুক্ত নিয়ে চিরকালই খেলে গো। জগতের যত বদ্ধকে নিয়ে মুক্তার খেলা খেলতে কানাই বই কে আছে গো। সামান্য মুক্তাফল কি বল্‌ছ গো? কানাই যে মুক্তিফল মোক্ষফল নিয়ে খেলে গো।

গীত

ওহে সুবল কি দেখাও তুচ্ছ মুক্তাফল।
যার মুক্ত ফল, তারই মুক্ত ফল, কথা নয় বিফল॥

সুবল। ওগো বড়াই মা, মুক্ত ত আর গাছের ফল নয় গো বাছা, যে যার মুক্তফল তার মুক্তফল হবে? মুক্ত যে দুর্মূল্য গো।

বড়াই। ওগো সুবল বলি শোন,—

গীতাংশ

বৃক্ষে যেমন ফলে গো ফল,
তেমনি দেহ-বৃক্ষে কর্মফল,
বদ্ধ নরে পায় কি ফল,
কখন সেই মুক্ত ফল॥

সুবল। এ সব ফল কোথা ফলে গো?

গীতাংশ

বড়াই।

মুক্তিফল মোক্ষ ফল,
মুক্তফল মুক্ত ফল,
এ সকল ফল সুফল,
কল্পবৃক্ষে ফলে এ ফল ॥

সুবল। ওগো বড়াই মা, এসকল ফল কি যে সে পায় গো?

গীতাবশেষ

বড়াই।

যে যেমন দেয় গো ফল,
পায় গো সে তেমনি ফল,
বদ্ধফলে জীবন বিফল,
মুক্ত ফলে জন্ম সফল ঃ—
দাস গোবিন্দের কর্ম ফল,
প্রতিফল পাপের ফল,
নিষ্ফল করে দাও গো ফল ॥

সুবল। ও গো বড়াই মা!

বড়াই। কেন গো সুবল কি বলছ গো?

সুবল। বলি তা না হয় হল, কিন্তু এত মুক্ত কোথা পাওয়া যাবে গো?

বড়াই। ওগো সুবল! যে মুক্তিদাতা—মুক্তার জন্মদাতা—জীবকে মুক্ত করা যার কাজ, তার কি মুক্তর অভাব হয় গো? যে মনে করলে সাগরের জল শুকিয়ে নগর করতে পারে, নগরকে সাগর জলে ডুবিয়ে দিতে পারে, যে নাগরীগণের প্রেমের নাগর, তার ইচ্ছা হলে মুক্তার অভাব হবে না গো।"

এই একই ধরনের সংলাপ ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়া নাটকটি অগ্রসর হয়। কৃষ্ণকমলের প্রধান উদ্দেশ্য যে-কোনো প্রকারে উপযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া একটি ভাবঘন মুহূর্ত রচনা করা। সেই মুহূর্তে নায়ক-নায়িকার ভাবাবেগ সঙ্গীতের রস-প্লাবনের সৃষ্টি করে। ভাবের প্রবল স্রোতে ঘটনা একেবারে ভাসিয়া যায়। গোবিন্দ অধিকারীও তেমনি সব সময় সচেষ্ট থাকেন, কখন কোন্ মুহূর্তে কেমন করিয়া তিনি রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম-কাহিনী

বা রাধা-কৃষ্ণের দিব্য-চরিত্রের মনোরম ব্যাখ্যা করিবেন। ইহার জন্য শুধু তিনি সুপ্রচুর গদ্য সংলাপের আশ্রয় লইয়াই ক্ষান্ত হন নাই। সঙ্গীতও তাঁহার রচনায় সমান স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে। অবশ্য সঙ্গীতের প্রয়োগে বৈশিষ্ট্য আছে। কৃষ্ণকমলের রচনায়ও আমরা দেখিয়াছি, যখনই ভাবের গভীর অভিব্যক্তির প্রয়োজন, তখন শুধু ছড়ায় চলিতেছে না। ছড়ায় বা পয়ার-ত্রিপদীতে যাহার উল্লেখ-মাত্র করিলেন, তাহাকে বিশদ করিলেন গানে। গোবিন্দ অধিকারীও তাহাই করিতেছেন। উদ্ধৃত অংশের মধ্যেই আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি। মুক্তা কোন দিন গাছে ফলে না। শ্রীকৃষ্ণ সেই অসাধ্য সাধন করিতে যাইতেছেন। সুবল তাহা বিশ্বাস করিবে কিরূপে? আবার এমন গুরুতর অবিশ্বাস কি গদ্যে প্রকাশ করা যায়? তাই সেইখানে গানের আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণ যে শুধু গাছে মুক্তা ফলাইয়া থাকেন তাহা নহে, তিনি দেহ-বৃক্ষে মুক্তিরূপ ফল দান করেন। মানুষের কর্মফলই যে মুক্তিফলের জনক এই গুরুতর দার্শনিক তত্ত্ব শুধু গদ্য সংলাপে প্রকাশ করিলে কি যথেষ্ট হয়? সুতরাং তাহা আবার গানে বিস্তৃত করার প্রয়োজন।

আবার কৃষ্ণকমলের রচনায় যেমন পয়ার-ত্রিপদীর প্রয়োগ দেখা যায়, গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রায়ও তেমনটি আছে।

মুক্তালতাবলী, তৃতীয় অঙ্ক। যশোদার নিকট হইতে মুক্তা লইয়া শ্রীকৃষ্ণ বিদায় লইতেছেন,—

"যশোদা। ওরে গোপাল, শীঘ্র ঘরে ফিরে এস।

কৃষ্ণ। তা আসব গো। এখন তবে যাই মা?

যশোদা। (সুরে)

বলো না যাই যাই, যাই কথা বলিতে নাই,
আসি তবে বল গো কানাই।
আমার আর কেহ নাই তোমারে কাতরে জানাই
মনের কথা তোমারে শুনাই।
এসেছ একা ভবনে, একা পুনঃ যাবে বনে,
সাবধানে রবে জীবনে।
দৈত্যচর বৃন্দাবনে, আসে যায় ক্ষণে ক্ষণে,
গুপ্তভাবে ভ্রমে পবনে॥

তাদের আশঙ্কা বড়, তাই হই জড়সড়,
প্রাণধন গোবিন্দ-কারণে।
বলাইয়ের সঙ্গে রবে, রাখাল-সঙ্গে বেড়াইবে,
দাস গোবিন্দ রবে চরণে ॥

শ্রীকৃষ্ণ 'যাই' বলিয়াছেন। এত বড় অমঙ্গলের কথা যশোদা কি করিয়া সহ্য করিবেন? সুতরাং সন্তানের মঙ্গলামঙ্গলের আশা-আকাঙ্ক্ষা ত্রিপদীর ভাষায় প্রকাশ পায়। শুধু পূর্বগামী ও পরগামী কাহিনীর মধ্যবর্তী যোগসূত্র হিসাবে ত্রিপদীর ব্যবহার পাইতেছি মুক্তালতাবলীর চতুর্থ অঙ্কে।

"বড়াই। (সুরে)।
কর্দম করিয়া মাটী, রুইল বীজ-মুক্তাটি,
লতা গাছ হ'ল কত শত।
তুলি তাহা রাখালেরা, চৌদিকে চারায় চারা,
মুক্তালতা বাড়ে ক্রমাগত ॥...
গন্ধেতে ভরিল ব্রজ, ত্যজি ফুল্ল সরসিজ,
অলিকুল হইল আকুলিত।
ব্রজবাসী বাসিনীরা, মুক্তা গন্ধ পেয়ে তারা,
আনন্দেতে হইল বিমোহিত ॥"...

সুতরাং শৈলীর দিক দিয়া কৃষ্ণকমল ও গোবিন্দ অধিকারীর মধ্যে ঐক্য পাইতেছি এই কয়টি বিষয়ে :—

১। প্রস্তাবনা উভয়ের ভিতরই আছে। অবশ্য উহাদের প্রস্তাবনার মধ্যে পার্থক্যও আছে। পূর্বেই সে বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি।

২। উভয়েই অতি-প্রয়োজনীয়, গভীর বা ভাব-ঘন বিষয় হইলে সঙ্গীতের প্রয়োগ করেন।

৩। উভয়ের মধ্যেই পয়ার-ত্রিপদীর ব্যবহার আছে।

৪। উভয়েরই বিষয়-বস্তু কৃষ্ণজীবনী।

পার্থক্য প্রধানতঃ তিনটি :—

১। কৃষ্ণকমলের রচনায় গদ্যের স্থান অতি অল্প, গোবিন্দ অধিকারীর রচনায় গদ্যের বিশেষ স্থান আছে।

২। কৃষ্ণকমলের রচনায় তত্ত্ব-ব্যাখ্যা অতি সামান্য, গোবিন্দ অধিকারীর রচনায় তত্ত্ব-ব্যাখ্যারই প্রাধান্য।

৩। কৃষ্ণকমলের পালাগুলিতে রাধা, কৃষ্ণ, সখী প্রভৃতির উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়া যে গভীর ভাবাকুলতার অভিব্যক্তি হয়, তাহাকে অবশ্য আমরা চরিত্রের প্রকাশ বলিতে পারি না। কারণ রাধা-কৃষ্ণের প্রেম প্রভৃতি বাস্তব ঘটনার মধ্য দিয়া আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে না। পদাবলী গানের পূর্ব-সংস্কার-বশতঃ বা সঙ্গীতের সুরের প্লবমানতার জন্য উহা আমাদিগকে অত্যধিক আকৃষ্ট করে মাত্র। উহা ঘটনা ও চরিত্র-সম্ভূত নাট্যরস নহে। নাট্যে আরোপিত একটা কৃত্রিম ভাবাবেগ মাত্র। উহা আমাদিগকে অবশ্যই মুগ্ধ করে যদি আমরা নাট্য-পরিবেশ ভুলিয়া গিয়া কীর্তন বা পদাবলীর রস-মাধুর্য আস্বাদন করি। কিন্তু গোবিন্দ অধিকারীর পালাগুলিতে রাধা-কৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া সখী, পৌর্ণমাসী প্রভৃতির যে দার্শনিকতা তাহাও কিন্তু রাধা-কৃষ্ণ-চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশ নহে। তাঁহাদের কর্ম বা জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া স্বাভাবিক জীবন-দর্শন হিসাবে ঐ উক্তিগুলি বাহির হয় নাই। শাস্ত্র-পাঠাদির মধ্য দিয়া নাট্যকার বা দর্শক রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে দার্শনিক জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, পালার অন্তর্গত চরিত্রের মুখে তাহা আরোপ করা হইতেছে মাত্র। সুতরাং এই দার্শনিকতা খানিকটা বুদ্ধির খোরাক যোগায়, নাটকীয় চরিত্রের বিকাশে সাহায্য করে না।

এই দার্শনিকতার জন্য গোবিন্দ অধিকারীর গদ্য ভাষার সুরেরও উঠা-নামা হইয়াছে। গোবিন্দ অধিকারীর সংলাপের গদ্য সাধারণতঃ সরল। সাধারণ কথাবার্তায় যেমন আমরা তৎসম শব্দের প্রয়োগ কমাইয়া দিয়া তদ্ভব শব্দের প্রয়োগ বেশী করি, গোবিন্দ অধিকারীর সংলাপেও তাহাই করা হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে গণ্যমান্য ব্যক্তির মুখে দর্শনের উচ্চ ভাব দেওয়া হইয়াছে, সেখানে ভাষাও মাঝে মাঝে গম্ভীর, তৎসম-শব্দ-পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। আর তাহা হইয়াছে অতি-দীর্ঘ বক্তৃতা। উপরন্তু নাট্যকার এই সব ক্ষেত্রে শুধু দীর্ঘ একখানি বক্তৃতায়ই মনের ভাব প্রকাশ করিয়া শান্তি পান না। বক্তৃতা শেষ হইলেই তিনি তাঁহার পাত্র-পাত্রীর মুখে তখন তখন একখানা গান বসাইয়া দেন। গানটি পূর্ববর্তী বক্তৃতার বক্তব্যের পুনরুক্তি বা অনুস্মৃতি মাত্র। একটি উদাহরণ দিতেছি,—

"কণ্ব। কে এই বালক? সত্যই কি এই বালক ত্রিলোক-পালক—গোলোক-আলোক ব্রহ্মবালক? আচ্ছা তাই যদি হয় তবে এই বালককে ব্রহ্মবালক বেশে সাজিয়ে দেখিনা কেন গো? তা লোকে যে ঠাকুর সাজায়

কেউ সোনার সাজে সাজায়,—কেউ ডাকের সাজে সাজায়—কেউ বা মনের সাজে সাজায় গো। তা সোনার সাজে কে সাজায় গো! না, যে ধনী, যার সোনা আছে সেই সোনার সাজে সাজায় গো! তা আমার তো সোনা নাই গো, কানে শোনা আছে যে, সোনা আছে, কিন্তু তার রং যে কেমন, তা চোখেও দেখলেম্ না গো। তা হলে সোনার সাজে আমার ঠাকুর সাজানো হল না গো। তারপর ডাকের সাজ? তা ডাকের সাজে সাজাতে পারে কে? না, যে ডাকার মতো ডাক্‌তে জানে, সেই ডাকের সাজে ঠাকুর সাজাতে পারে গো। তা আমি তো তাঁকে ডাক্‌তে জানি না, কাজেই আমার ডাকের সাজে ঠাকুর সাজান হল না গো। তারপর মাটীর সাজে ঠাকুর সাজায় কে? না, যে মনকে মাটী করতে পেরেছে। তা আমার মন তো আমি মাটী করতে পারিনি, তা হলে মাটীর সাজেও আমার ঠাকুর সাজানো হল না গো। আমার মন কাঙ্গালকে তবে মনের সাজেই ঠাকুর সাজাতে হবে গো। আচ্ছা,—যদি এই বালকের মাথায় চূড়া বেঁধে দেওয়া যায়, তাহলে কেমন মানায় গো। (নয়ন মুদিয়া) হাঁ, সেজেছে তো বটে গো। শ্যামসুন্দরের মাথায় চূড়া দিলে যেমন শোভা হয়, এ বালকের মাথে যে চূড়া তেমনি শোভা ধরেছে গো! এ যেন বালক হস্তসঙ্কেতে আমায় বল্‌ছে,—আমার মাথায় চূড়া বেঁধে দিলি, তা রাধা-নাম লেখা ময়ুর-পুচ্ছ কৈ গো? তা চিন্তামণি গো! চিন্তা নাই, আমি যখন তোমাকে মনের সাজে সাজাচ্ছি, তখন সব সাজ দিব গো। আমার মন হবে ময়ুর, সে আশা-রূপ পুচ্ছ বিস্তার করবে, আর আমার অনুরাগ তাতে চন্দ্রচিহ্ন হবে গো। আমি গুণরূপ লেখনী দিয়ে তোমার চূড়ায় রাধা নাম লিখে দিব গো। তা, নাসা সাজাতে হলে তো নোলকের প্রয়োজন গো। তা, আমার কাছে মুক্তাও নাই, আর আমি মুক্তা প্রয়াসীও নই গো। তা, একটি মাত্র মতি আছে, তা ও নিতান্ত দুর্মতি গো। তবে সাধুর মুখে শুনেছি,—দুর্মতিকে যদি শ্রীমতীর পতির নাসায় নলক-মতি করে দিতে পারা যায়, সেও তখন সুমতি হয়ে যায় গো। তা, আমি আমার দুর্মতিকে এই শ্রীমতীর পতির নাসায় নলক-মতি করে দিলেম গো। এইবারে কণ্ঠ সাজাতে হবে, তা কণ্ঠ সাজাতে হলে ত হারের প্রয়োজন গো। তা, মুক্তাহার মতিহার সে সব ত আমার নাই গো, তবে আমাকে বনফুলের হারে ঠাকুর সাজাতে হবে গো। যদি বল, বনফুলহার

পাবে কোথায় গো ? তা আমার জীবন হবে বন, প্রেম হবে বৃক্ষ, ভক্তি তাতে হবে লতা, আর অষ্টাঙ্গ-যোগ পুষ্পযোগ হবে গো। আমি মনোযোগ দিয়ে সেই অষ্টাঙ্গযোগের পুষ্পহার গড়িয়ে ঠাকুর সাজাবো গো। সবই তো হল গো, কিন্তু এখন যে ঐ বালকের ষড়-অঙ্গ সাজাতে হবে গো, তা কি দিয়ে সাজাব গো ? (চিন্তা) হাঁ হয়েছে ; আমার রিপুর মধ্যে প্রধান রিপু হচ্ছে ক্রোধ, তা মানুষের যখন ক্রোধ হয়, তখন তার সীমা থাকে না গো, তা হলে তাকে অসীম বা অনন্ত ক্রোধ বলা যেতে পারে গো। তা আমার ক্রোধকে অনন্ত করে ঐ বালকের বাহুমূলে প্রদান করবো গো। তারপর লোভ—তা মানবের লোভ হয় কিসে গো ? মুক্তা অথবা মণিতে। তা, আমি আমার লোভকে বলয় করে ঐ বালকের মণিবন্ধেই প্রদান করবো গো। মদকে অঙ্গুরী ক'রে বালকের করে দিব গো। আর মোহহারীকে সাজাবার জন্য মোহকে কিঙ্কিণী করে দিব গো। ...শ্রীনাথের কোন্ অঙ্গ লোকে প্রার্থনা করে গো ? না—শ্রীপতির শ্রীচরণযুগলই লোকের বাঞ্ছনীয় গো। তা আমি আজ বিনা সাধনায় শ্রীপতির সেই শ্রীচরণ-যুগলে নূপুর হয়েছি, সুতরাং আমারই জিত হয়েছে গো। তাই বল্‌ছি মন, জগতে এসে যদি জয়লাভের বাসনা থাকে গো, তবে অসার বিষয়-নেশায় মেতে না থেকে ব্রহ্মচর্য পালন কর, প্রাণায়াম যোগ অভ্যাস কর গো ! নিরাকার ব্রহ্মকে সাকার দেখে মুক্তিপথ পরিষ্কার কর গো !

গীত

ওরে মন, চাহ যদি নিদান দিনে তরিতে।
তবে অহংজ্ঞান শূন্য কর ত্বরিতে ॥
প্রাণায়াম যোগের বলে,
ব্রহ্মচর্যের শরণ নিলে
গুরু বস্তু মাস্তলে নিলে, প্রেমের গুণ-দড়িতে—
হরি নামের বাদাম তুলে ওঠ পারের তরীতে ॥
আমার নাই প্রেম ভক্তি-ধন,
জানিনা শ্রীহরির সাধন,
নিকট হল নিধন-সময়
হবে শমন-ভয়ে তরিতে;—
এখন দাস গোবিন্দের প্রতি
হবে গোবিন্দের কৃপা বিতরিতে ॥"

—গোবিন্দ অধিকারীর 'চাঁদধরা' পালা।

উপরি-লিখিত অংশটুকুর দৈর্ঘ্য লক্ষণীয়। গোবিন্দ অধিকারীর রচনায় দার্শনিক বিবৃতি সুপ্রচুর হইলেও এমন দীর্ঘ বক্তৃতা সুলভ নহে,—সংখ্যায় নিতান্ত কম। এই যে ক্লান্তিকর দীর্ঘ বিবৃতি, যাহা গোবিন্দ অধিকারীর রচনায় কালে-ভদ্রে দেখা গেল, তাহাকেই সাধারণ মানদণ্ড ধরিয়া পরবর্তী কালের মতিলাল রায়, ব্রজমোহন রায় প্রভৃতি পালা রচনা করিলেন। প্রত্যেকের মুখে একখানা দীর্ঘ বক্তৃতা এবং প্রায় প্রত্যেক বক্তৃতার শেষে একখানা গান দেওয়া ব্রজমোহন রায়, মতিলাল রায় প্রভৃতির রীতি হইয়া দাঁড়াইল। ফলে যাত্রা শেষ পর্যন্ত সাঙ্গোপাঙ্গ কথকতায় পর্যবসিত হইল।* আর এই ধারা বিবর্তনের ফলে সামান্য মাত্র পরিবর্তিত হইয়া আধুনিক যাত্রাওয়ালা অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ, ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী, ফণিভূষণ, অহিভূষণ প্রভৃতি পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। ব্রজমোহনের 'অভিমন্যুবধ' পালা হইতে খানিকটা উদ্ধৃত করিয়া তাহার শৈলীর পরিচয় দিতেছি।

"রাজা। ভ্রাতঃ বৃকোদর।

ভীমসেন। আর্য, আজ্ঞা করুন।

রাজা। অমিতবলশালী মহাবীর ভীষ্ম শর-শয্যায় শয়ন করলে, দূতমুখে শুনলেম কুরুপতি দুর্যোধন, মহারথ গুরু দ্রোণাচার্যকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করেছেন। মধ্যাহ্ন-কালীন দিবাকরের ন্যায় তেজস্বী আচার্য দ্রোণ নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য এক চক্রব্যূহ রচনা করিয়াছেন। শুনেছি উহা দেবতাদিগেরও দুর্ভেদ্য। পাণ্ডবপক্ষের মধ্যে এমন কোনোও বীরকে লক্ষ্য হয় না, যে দ্রোণ-নির্মিত ব্যূহ ভেদ্ করে, কৌরব-সংগ্রামে জয়লাভ করে গৌরব লাভ করে। অদ্য বিপক্ষগণের সিংহনাদে শ্রবণ বধির হচ্ছে। এজন্য আমি দ্রোণ-রক্ষিত সেনাগণকে সমরে সংহার করে রাজ্যলাভ-বিষয়ে নিতান্ত হতাশ হচ্ছি। তোমরা যে আচার্য-নির্মিত ভয়ঙ্কর ব্যূহ ভেদ করে বীরগণকে বিনাশ করে নির্বিঘ্নে জয়লাভ করবে, আমি এমন প্রত্যাশা করিনে।

* যাত্রায় আবৃত্তি প্রবন্ধ—শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী, জাহ্নবী, চতুর্থ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, পৌষ, ১৩১৫

গীত

রাগিণী মুলতান—তাল একতালা।

পাব রাজ্য আর কেমনে।
সহোদর বৃকোদর,
আমার নিতান্ত ভয় হয় যে মনে॥
সিন্ধুসম শত্রুসেনা, পার হতে অপার ভাবনা,
পূর্ণ হয় বৈরী-কামনা
হলেম নষ্ট আমরা ধনে প্রাণে॥

রাজা। ভ্রাতঃ! আমি আর একটি কথা বলি, বীর-প্রধান ধনঞ্জয়; বিশ্ববিজয়ী বাসুদেব, বাসুদেব-তনয় প্রদ্যুম্ন, অর্জুন-তনয় অভিমন্যু, এই চারি ব্যক্তি চক্রব্যূহ ভেদ করতে সমর্থ, এ বিষয়ে পঞ্চম ব্যক্তি আর নয়ন-গোচর হয় না। অর্জুনও সংশপ্তক-গণ বধার্থ গমন করলেন। কৃষ্ণ তদীয় রথে সারথি, প্রদ্যুম্ন, অভিমন্যু বালকের মধ্যে গণ্য, সুতরাং কোন ব্যক্তি এই গুরুতর ভার গ্রহণ করে রণমুখে অগ্রসর হয়, এই চিন্তায় আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হচ্ছে। ভাই! প্রবল জল-প্রবাহ যেমন দুর্ভেদ্য পর্বতকে এবং সাগর-সকল যেমন বেলা-ভূমিকে অতিক্রম করতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ পাণ্ডব-পক্ষীয় বীরগণ বোধ হয় দ্রোণাচার্যকে উল্লঙ্ঘন করতে ক্ষমবান হবেন না।

ভীম। আর্য, আপনি চিন্তা পরিত্যাগ করুন। আপনার শ্রীচরণাশীর্বাদে দ্রোণ-রক্ষিত সেনা-সকল আমরা আজ সমরে অবশ্যই সংহার করব। যখন পুরুষ-সিংহ জাহ্নবী-তনয় সমর পরিহার করে শরশয্যা গ্রহণ করেছেন, তখন আর বিপক্ষগণের মধ্যে কাহাকেও সমকক্ষ ব'লে গণ্য করি না। কেশরী যেমন করিকুম্ভ বিদীর্ণ করতে কখনই পরাঙ্মুখ নহে, তদ্রূপ কৌরবগণকে আমরা আজ বিনাশ করতে নিতান্তই সাহসী হচ্ছি। আর একটি নিবেদন করি, জলদ্বারা অনল নির্বাণ হয় বটে, কিন্তু মহারাজ অনলের উত্তাপেও জল শোষণ হয়ে থাকে। আরো দেখুন, বৃহদাকার ভেক কি ক্ষুদ্র বিষধর দ্বারা বিনষ্ট হয় না? আপনি চিত্ত স্থির করুন। যাহারা সর্বদা সত্যপথে বিচরণ করে, তাহারা সেই সত্য-প্রসাদে অবশ্যই জয়লাভ করবে, আপনি এ বিষয়ে চিন্তা করবেন না।

গীত

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

ক্ষান্ত ভব হে মহারাজ, চিন্তা কি চরণে ধরি।
তব চরণতরী প্রসাদে রণ-সিন্ধু মাঝে তরি॥
থাকে যদি ধর্মে মতি, জয়ী হইব সম্প্রতি,
তার কি চিন্তে হে ভূপতি,
যে পক্ষে সারথি হরি॥

ভীম। মহারাজ দেবাদিদেব মহাদেব যাঁহাকে সর্বদা সাধনা করেন, যিনি স্বর্গ মর্ত্য পাতাল এই ত্রিলোকবাসী জীবগণের পূজনীয়, সেই পুরুষ-প্রধান পরমারাধ্য বসুদেব-নন্দন জনার্দন আপনার মঙ্গল কামনা করছেন। স্বয়ং অস্ত্র ধারণ না করে অর্জুন-রথে তিনি অশ্বরজ্জু ধারণ করেছেন, এস্থলে জয়-লাভ-বিষয়ে চিন্তার বিষয় কি? আপনি ধন্বন্তরির আশ্রয় লাভ করে, শিরঃ-পীড়ায় এত কাতর হচ্ছেন কেন? সুমেরুবাসীরা কি দরিদ্রতা দুঃখে কাতরতা প্রকাশ করে, তটিনী-তীরবাসীর কি পিপাসায় প্রাণ-বিয়োগ হয়? কামধেনুর সেবা করলে কি দুগ্ধের অভাব থাকে? কল্পতরু তলস্থ ব্যক্তিরা কি সামান্য ফলের চেষ্টা করে?"

—অভিমন্যুবধ, ১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক

ব্রজমোহন রায়ের শৈলীর নমুনা দেওয়া গেল। এই একই ভাবে আদ্যন্ত নাটকের কাহিনী, সংলাপ ও গান ছুটিয়া চলিয়াছে।

এইবার ব্রজমোহনের বৈশিষ্ট্যগুলির একটি সার-সংক্ষেপ রচনা করা যাক।

১। ব্রজমোহনের রচনায় সংলাপ অতি দীর্ঘ। তদ্ভব-শব্দ-বহুল। সংস্কৃতের মতো সন্ধি, সমাস, উপমা অলঙ্কার ইত্যাদিতে পূর্ণ। মাঝে মাঝে সময়ে-সুযোগে নীতির বাণী ও দার্শনিকতা আছে। ভাষা তাই বাংলার স্বতঃস্ফূর্ত কথ্যভাষা নয়,—লেখ্য ভাষা। অনেক সময় আড়ষ্ট। গোবিন্দ অধিকারীর মধ্যে দার্শনিকতা-পূর্ণ দীর্ঘ বিবৃতি থাকিলেও তাহাই তাঁহার নাট্য-সংলাপের সাধারণ মান নয়। সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে কথ্য-রীতির সংলাপ চলিতে থাকে, তাহার মধ্যে মধ্যে কখনও কখনও দুই একখানা দার্শনিকতা-পূর্ণ সংস্কৃত-শব্দ-বহুল দীর্ঘ বিবৃতি থাকে মাত্র।

২। ব্রজমোহনের রচনায় অন্যান্য যাত্রাওয়ালার রচিত পালা-গ্রন্থের মতো অনেক সময় আরম্ভে বন্দনা-গীতি থাকে। সাবিত্রী-সত্যবান পালায় তাহা আছে।

৩। অন্যান্য যাত্রাওয়ালার ন্যায় ব্রজমোহনের রচনায়ও পয়ার, ত্রিপদী ও ছড়ার প্রয়োগ রহিয়াছে। কাহিনীর সংযোজক পয়ারের উল্লেখ আগেই করিয়াছি। তাহার পুনরাবৃত্তি করিব না।

৪। ব্রজমোহনের ছড়া প্রয়োগের একটি বৈশিষ্ট্য দেখিতেছি এই যে, অপ্রধান চরিত্রের মুখে যেখানে গদ্য দেওয়া যাইত, সেইখানে তিনি ছড়া দিতেছেন। ছড়ার মধ্য দিয়া হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছেন। আর এই হাসাইবার চেষ্টা পরিস্থিতির গুরুত্বকে অনেক সময় অস্বীকার করে। অভিমন্যুর যুদ্ধে সমস্ত সেনাপতির পরাজয় হইতেছে। এখন কর্তব্য কি? এই গুরুতর সংবাদটি দূত একটি হাল্‌কা ছড়ায় ভাঁড়ামির ঢংএ নিবেদন করিতেছে,—

"মহারাজ, বল্‌বো কত, হয়েছি বুদ্ধিহত।
রণে এসে একলা ছেলে, সকল বীরের মাথা খেলে,
দিলে যেন আগুন জ্বেলে, ছেলে নয় সে যমের মত॥
* * *
বাপ্‌কা বেটা বুঝলাম দেখে, ইঁচড়ে গিয়েছে পেকে,
উন্দু ধুন্দু কাণ্ড দেখে, হোমরা চোমরা পালায় যত॥
ফুঁয়ে উড়বে শকুনি মামা, লেজ তুলেছেন অশ্বত্থামা,
এককালে হয়েছে মাটি, দ্রোণাচার্যের বিক্রম যত॥"

—অভিমন্যুবধ, ৩য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক

৫। কর্কশ ব্যঞ্জনের অসঙ্গত অনুপ্রাসে ব্রজমোহনের ভাষা অনেক সময় অকারণ কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে। নমুনা,—

"বাপু কিসের বিপদ? তুমি যেমন ভয়ে জড়সড় হচ্ছো, পতঙ্গের যুদ্ধে কি কখনো মাতঙ্গ আতঙ্ক-প্রাপ্ত হয়? ভুজঙ্গ-গর্জনে কি বিহঙ্গরাজের ত্রাস জন্মে থাকে?" —অভিমন্যুবধ, ৩য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক

যাত্রার যে রূপটি আধুনিক যুগ পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে উপরিউক্ত আলোচনায় তাহার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা গেল। মোটামুটি দেখা গেল যে,—

১। যাত্রার উদ্দেশ্য নাটকীয় রসের স্ফুরণ নহে; রাধাকৃষ্ণ প্রেম-লীলার ঘনীভূত আবেগকে সংলাপের জল মিশাইয়া তরল করিয়া পদাবলীর রস-প্রাচুর্য আস্বাদনে অনধিকারী পাঠকের মধ্যে পরিবেশন করা। ইহাতে নাটকের বাহ্যরূপ আছে, কিন্তু উহার প্রাণস্পন্দন নাই। যেমন সমুদ্রের মাঝে দ্বীপখণ্ড মাঝে মাঝে মাথা তুলিয়া ওঠে কিন্তু শস্য-শ্যামলা পৃথিবীর সমস্ত লক্ষণ তাহাতে প্রকটিত হয় না, সেইরূপ গীত-প্লাবনের মধ্যে ভাবরসসিক্ত, কর্দম-বালুকা-পূর্ণ দার্শনিক তত্ত্বের কঙ্করবন্ধুর সংলাপ-ভূখণ্ডও মাঝে মাঝে জাগিয়া উঠিয়া নিজ স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় ততটা বহন করে না যতটা স্রোতোধারার অগভীরতার ইঙ্গিত দেয়।

২। যেহেতু পূর্বনির্ধারিত ঘটনার সমগ্রতা নাটকের ছাঁচে ঢালার উপযুক্ত নহে, সেই জন্য বাড়তি ঘটনাংশগুলিকে পয়ারের মাধ্যমে বিবৃত করা হয়। যাহা দাঁড়ায়, তাহা বিবৃতি-সংলাপ-দার্শনিকতা-গীতের একটা পিণ্ডাকার সমষ্টি মাত্র। ইহাতে নাটকের ভ্রূণাবস্থা লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু সুস্থ সবল, সুগঠিত-অঙ্গ শিশু-নাটকেরও সাক্ষাৎ মেলে না।

৩। গীত-প্রাচুর্যও ইহার সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় নিদর্শন। যাহা গীত হইতে উদ্‌ভূত তাহাকে গীত মধ্যে মধ্যে গ্রাস করে। সমুদ্রোত্থিত দ্বীপ মাঝে-মধ্যে সবটা গীত-সমুদ্রের জোয়ারের জলে অদৃশ্য হইয়া যায়।

৪। গীতধারা শুকাইবার সঙ্গে সঙ্গে দার্শনিক তত্ত্ব ও কথকতা-ধর্মী-ব্যাখ্যা এই শুষ্ক খাতকে পূর্ণ করিবার কাজে লাগিয়াছে। ভক্তি-ভাবমিশ্র মাধুর্যের সহিত তত্ত্ব-ব্যাখ্যার লবণাক্ত-স্বাদ যুক্ত হইয়া গঙ্গাজলের অভাবে গঙ্গামৃত্তিকা-লেপনের প্রবণতাকে পরিতৃপ্তি দিয়াছে।

৫। রাধাকৃষ্ণ-প্রেম ছাড়া অন্য বিষয়ে রচিত নাটকের মধ্যে নাট্যকারের স্বাধীন চিন্তার কিছু স্ফুরণ দেখা যায়। এখানেও ভক্তি-রসের প্রাধান্য; তবে ইহার প্রবাহ বৃন্দাবন-মথুরার মধ্যবর্তিনী যমুনার ন্যায় বৈষ্ণবীয় ভাবমার্গের উচ্চতট-নিয়ন্ত্রিত না হইয়া লেখকের খনিত শাখাপথে কতকটা স্বচ্ছন্দ বিচরণ করিয়াছে। লেখকেরা এখানে মহাজন-পদের ধুয়াতেই ভাব-বিগলিত হইয়া "আহা" করিয়া কাঁদিয়া ভাসান নাই। বিষয়টির নিজস্ব সম্ভাবনাটি লালন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। হয়ত সার্থক হন নাই। কিন্তু শিশুর অঙ্গ-সঞ্চালন যেমন তাহার ভবিষ্যৎ পুষ্টির কারণ, সেইরূপ নাট্যকল্পনার দোল্‌না-আন্দোলনও উহার পূর্ণ পরিণতির সূচনা বহন করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যাত্রার উৎপত্তির ইতিহাস

[পাশ্চাত্য মত, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে অভিনেয় সাহিত্যের উল্লেখ, চৈতন্যদেবের অভিনয়, চৈতন্যদেবের অভিনয়ের শৈলী, সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী অভিনেয় সাহিত্যের সহিত চৈতন্যদেবের অভিনয়ের সম্পর্ক, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যাত্রার লক্ষণ, কৃষ্ণকমলের শৈলীর সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শৈলীর তুলনা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও যাত্রাশৈলীর পার্থক্য, গীতগোবিন্দ, জগন্নাথবল্লভ ও যাত্রার শৈলী, চৈতন্যোত্তর পদাবলী সাহিত্য হইতে যাত্রার দার্শনিকতার সৃষ্টি, বিদগ্ধমাধব ও যাত্রা, পদাবলী এবং যাত্রায় উজ্জ্বল-নীলমণি ও বিদগ্ধমাধবের প্রভাব, কীর্তনে আখর ও উপজের সৃষ্টির কারণ, কীর্তনে আখরের বিবর্তন—পদ্য হইতে গদ্যে, কীর্তন পালায় যাত্রা শৈলীর পূর্বাভাস, কীর্তন হইতে ঢপের বিবর্তন, পাঁচালী হইতে যাত্রার উৎপত্তি হয় নাই, পাঁচালীর ব্যাপক সংজ্ঞা, পাঁচালী সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা, সপ্তদশ শতক হইতে পাঁচালী শৈলীর অঙ্কুরোদ্গম, পয়ার ত্রিপদী ও সঙ্গীতের ব্যবহার-বৈশিষ্ট্য, পাঁচালীর ত্রিপদী ছন্দের উৎপত্তি নির্ণয়, ভাগবত হইতেই কথকতার সৃষ্টি, ভাগবত পাঠের ক্রমবিকাশের স্তর নির্ণয়, যাত্রা সম্বন্ধে শেষ কথা, পদাবলীর উন্নত ভাবধারা হইতে বিচ্যুতি ও পতনের কারণ।]

যাত্রার আদিরূপ কি ছিল ইহা যাত্রা-শৈলীর একটা প্রধান আলোচ্য বিষয়। সে আলোচনা শুরু করিতে হইলে যাত্রার উৎপত্তি কবে হইয়াছিল তাহাই প্রথম খুঁজিতে হয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই বৈদিক যুগে একপ্রকার গীতি-নাট্যের অস্তিত্ব কল্পনা করেন এবং বলিতে চাহেন, বর্তমান যাত্রা সেই বৈদিক নাট্যেরই ক্রমবিকশিত রূপ। জনগণের দ্বারা এই নাট্য-শৈলীর অনুসরণ হইতেছিল। শেষ পর্যন্ত জয়দেবের গীত-গোবিন্দের মধ্যে ঐ শৈলীর প্রকট হইয়াছে।* কিন্তু জয়দেবের কাব্য-শৈলীর বৈদিক বংশধরত্ব প্রমাণ করিবার মতো উপায়ও আমাদের নাই। † সুতরাং বাংলা যাত্রার

---

*A History of Sanskrit Literature—
A. A. McDonell, ch. XIII, P. 346-7

A History of Theatrical Art, Vol. I—
K. Mantzius, P, 63-64

† A History of Sanskrit Literature, Vol. I—
Dr. S. K. De & Dr. S. N. Das Gupta, P. 55

The Sanskrit Drama—Keith, P. 21

শৈলীও বৈদিক নয়। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে আমরা 'যাত্রা' নামটিও পাইতেছি না। অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন বইয়ে ভিন্ন ভিন্ন অভিনেয় সাহিত্যের উল্লেখ আছে।

১। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যা-পদগুলির মধ্যে "বুদ্ধ নাটক" শব্দটি পাওয়া যাইতেছে,—

"নাচন্তি শবর গায়ন্তি দেঈ।
বুদ্ধ-নাটক বিষমা হোঈ॥"

২। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে "নাট" শব্দটি আছে, যমুনার ঘাটে গোপীদের দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে নাট পাতিলেন, তাহার বর্ণনা এইরূপ,—

"ষোল শত গোপী গেলা যমুনার ঘাটে।
তা দেখিআঁ কাহ্নাঞিঁ পাতিল নাটে॥
খনে করতাল খনে বাজাএ মৃদঙ্গ।
তা দেখি রাধিকার সখিগণে রঙ্গ॥"

—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বংশী খণ্ড, ১ম পদ

বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থে—

৩। ডাকের গানের বর্ণনা পাইতেছি,—

"একদিন এক বড়লোকের মন্দিরে।
সর্পক্ষত ডঙ্ক নাচে বিবিধ প্রকারে॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা গীত—তার মন্ত্রঘোরে।
ডঙ্ক বেড়ি সভেই গায়েন উচ্চস্বরে॥
* * * *
কালিদহে করিলেন যে নৃত্য ঈশ্বরে।
সেইরূপ গায়েন কারুণ্য উচ্চস্বরে॥"

—চৈতন্য-ভাগবত, আদি, ১১শ অধ্যায়

৪। কৃষ্ণ-যাত্রা শব্দের উল্লেখ চৈতন্য-ভাগবতকার করিয়াছেন। কিন্তু একথাও বলিয়াছেন যে, এই কৃষ্ণ-যাত্রার উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ কেহ জানে না।—

"কৃষ্ণ-যাত্রা অহোরাত্র কৃষ্ণ-সংকীর্তন।
ইহার উদ্দেশো নাহি জানে কোনো জন॥"

—চৈতন্য-ভাগবত, অন্ত্য, ৪র্থ অধ্যায়

৫। দানখণ্ড গানের উল্লেখ পাইতেছি,—

"দানখণ্ড গাহেন মাধবানন্দ ঘোষ।
* * * *
সুকৃতি শ্রীগদাধর দাস করি সঙ্গে।
দানখণ্ড নৃত্য প্রভু করে নিজ রঙ্গে॥

—চৈতন্য-ভাগবত, অন্ত্য, ৫ম অধ্যায়

৬। চৈতন্যদেব নিজে অভিনয় করিয়াছিলেন,—

"আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের বন্ধানে।"

চৈতন্যদেবের এই অঙ্কবদ্ধ নৃত্য কি ছিল তাহা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন। চৈতন্যদেবের অভিনয়ের বর্ণনা নিম্নরূপ,—

১। প্রাচীন যাত্রার মতো ইহা প্রকাশ্য অভিনয় নহে। শ্রীচৈতন্যদেব প্রকৃতিবেশে নৃত্য করিলে যে যে ব্যক্তি সংযত হইয়া তাহা দর্শন করিতে পারিবেন, তাঁহারাই শুধু বাড়ির ভিতর অভিনয় দেখিতে অনুমতি পাইবেন।—

"প্রকৃতি স্বরূপে নৃত্য হইব আমার।
দেখিতে যে জিতেন্দ্রিয় তার অধিকার॥
সেই সে যাইব আজি বাড়ীর ভিতরে।
যেইজন ইন্দ্রিয় ধরিতে শক্তি ধরে॥"

২। নাট্যাভিনয়ের জন্য যে সাজ-পোশাক প্রয়োজন, তাহার যথাযোগ্য আয়োজন করিলেন সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খান। চৈতন্যদেব তাঁহাকে আদেশ করিয়াছিলেন,—

"শঙ্খ, কাঁচুলি, পাটশাড়ী, অলঙ্কার।
যোগ্য যোগ্য করি সজ্জা কর সভাকার॥"

সাজ-পোশাক তৈয়ারী হইলে অভিনয় আরম্ভ হইল।

৩। প্রথমে মুকুন্দ কীর্তনের শুভারম্ভ করিলেন। (৪) তারপর পালার মুখ বা স্থাপনা করেন প্রভু হরিদাস। তিনি দুই মহাগোপ শোভিত হইয়া দণ্ডহস্তে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। তিনি জানাইয়া গেলেন, জগৎ-প্রাণ চৈতন্যদেব লক্ষ্মীর বেশে নৃত্য করিবেন। তিনি বৈকুণ্ঠের কোটাল, সবাইকে সাবধান করিতে আসিয়াছেন। তারপর শ্রীবাস পণ্ডিত নারদের বেশে উপস্থিত হইলেন। অদ্বৈত তাঁহাকে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? এখানে কেমন করিয়া আসিলে?" নারদ আপন পরিচয় দিয়া

বলিলেন (৫) শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া নদীয়ায় প্রকট হইয়াছেন, আজ তিনি রুক্মিণীবেশে নাচিবেন। নারদ তাই নৃত্য দেখিবার জন্য সভায় প্রবেশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের নিকট রুক্মিণীর যে পত্র ভাগবতে সপ্ত শ্লোকে বর্ণিত আছে চৈতন্যদেব ওদিকে ভাবাবেশে (৬) গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া তাহা পাঠ করিতেছেন। এইভাবে প্রথম প্রহর অতীত হইল। দ্বিতীয় প্রহরে রুক্মিণীবেশে গদাধরের, সুপ্রভাত সখীর বেশে ব্রহ্মানন্দের ও বড়াই-বেশে নিত্যানন্দের প্রবেশ। "নগর-কোটাল জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কোথায় যাইবে? কি তোমাদের পরিচয়?" সে কথার উত্তর দিতে সখী সুপ্রভাত রাজী হইল না, শুধু জানা গেল তাহারা মথুরা যাইবে। এইভাবে একটু (৭) কথাবার্তার পর অদ্বৈতাচার্য বলিলেন,—

"নৃত্য-গীত-প্রিয় বড় আমার ঠাকুর।
এথায়ে নাচহ ধন পাইবে প্রচুর॥"

গদাধর রমাবেশে নাচিতে লাগিলেন, অনুচর (৮) সময়োচিত গীত গাহিতে লাগিল।

বোধ হয় অঙ্কবদ্ধ নৃত্যের একটি অঙ্কের শেষ হইল। তারপর লক্ষ্মীর বেশে চৈতন্যদেব এবং বড়াই-বেশে নিত্যানন্দ প্রবেশ করিলেন। তখন,—

"জগৎজননী ভাবে নাচে বিশ্বম্ভর।
সময়-উচিত গীত গায় অনুচর॥"

ইহার পর আর অভিনয় অগ্রসর হইল না। মহাপ্রভু মহাভাবের আবেশে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন।

উপরি-উদ্ধৃত বর্ণনা হইতে এইবার আমরা উক্ত অভিনয়ের শৈলী নির্ধারণের চেষ্টা করিব।

১। দশ রূপক-নির্দিষ্ট আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক, ও আহার্য এই চতুর্বিধ অভিনয় সপরিকর চৈতন্যদেব করিয়াছিলেন।

২। যাত্রার ন্যায় এই অভিনয়ে কীর্তন বা গৌরচন্দ্রিকার বর্ণনা আছে।*

৩। হরিদাস পালার স্থাপনা বা মুখবন্ধ করেন,—সুতরাং যাত্রার মতো ইহার মধ্যে প্রস্তাবনা আছে।

* সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনায় নাট্য-বস্তুর বা পাত্র-পাত্রীর উল্লেখ থাকে। কিন্তু কোন্ অভিনেতা অভিনয় করিবেন তাহা বলা থাকে না। মুকুন্দ যে কীর্তনের 'শুভারম্ভ' করিলেন

৪। শ্রীচৈতন্যের অবতারত্বের ব্যাখ্যা বা দার্শনিকতা পাওয়া যায় শ্রীনিবাস পণ্ডিতের নারদের ভূমিকায়। যাত্রার মহান্ত, দূতী, পৌর্ণমাসী বা আধুনিক যাত্রার উচিত, বিবেক কিংবা পাগল প্রভৃতির আদিপুরুষ হিসাবে আমরা শ্রীনিবাসের এই ভূমিকাটিকে গ্রহণ করিতে পারি। ইনিও সংসার-ত্যাগী ব্রহ্মচারী, মহাজ্ঞানী, সন্ন্যাসী নারদ।

৫। যাত্রায়ও সংস্কৃত নাটকের মতো একই অঙ্কে বহু সংযোগ-স্থল আছে। নগর-কোটাল, গোপী প্রভৃতিরা রাস্তায়, রুক্মিণী গৃহাভ্যন্তরে যুগপৎ অভিনয় করে।

৬। কিছু সংলাপ আছে। গদ্যে কি পদ্যে তাহার উল্লেখ নাই। সংলাপ যাত্রায়ও আছে।

৭। যাত্রার অধিকারীর বা পালার নিয়ামক-ভূমিকার কাজ করেন অদ্বৈতাচার্য। নারদকে দার্শনিকতার সুযোগ তিনি করিয়া দেন জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়া। রুক্মিণী এবং সুপ্রভাতকে নাচিতে আদেশ করেন তিনি।

কিন্তু উপরি-উক্ত সাদৃশ্যের জন্য চৈতন্যদেবের অভিনয়টি অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের যাত্রার পূর্ব-রূপ বলিয়া অনুমান করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করা প্রয়োজন। অভিনয়টি কোন্ ভাষায়, সংস্কৃতে কি বাংলায়, কোন্ পালা অবলম্বনে হইয়াছিল তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু সংস্কৃতে যে নয় তাহা অনুমান করিতে পারি। কেননা সংস্কৃত নাটকের কোথায়ও এমন নির্দেশ নাই যে রঙ্গমঞ্চে পাত্র পাত্রী নৃত্য করিবে এবং অনুচরগণ সময়োচিত গান করিবে। পক্ষান্তরে যে কয়টি অভিনেয় সাহিত্যের উল্লেখ আমরা বাংলা ভাষায় পাইয়াছি তাহার মধ্যে কিন্তু একজন প্রধান অভিনেতা নৃত্য করে এবং তাহাকে ঘিরিয়া অনুচরগণ সময়োচিত গান করে দেখিতেছি। পূর্বোদ্ধৃত বুদ্ধনাটক, ডাকের গান, কালীয়দমন গান, দানখণ্ড-নৃত্য প্রভৃতি তাহার উদাহরণ। এবং এগুলি সকলই অভিনেয় সাহিত্য। এক কথায়

তাহা নিশ্চয়ই পালা-কীর্তন নহে। কেননা, নিবন্ধ-কীর্তনের তখন সৃষ্টি হয় নাই, সুতরাং ঐ কীর্তনকে 'নান্দী' জাতীয় বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। এইবার পালার স্থাপনা করিতে আসিয়া প্রভু হরিদাস যে "শ্রীচৈতন্য অভিনয় করিবেন" বলিলেন, তাহার অর্থ এই যে, এই অভিনয় সামান্য নয়। চৈতন্যদেব অভিনয়ের দ্বারা আসর ও অভিনয় পবিত্র করিবেন। পরবর্তীকালে কীর্তনের পালায় গৌরচন্দ্রিকায় এই কথাই স্বীকার করা হইয়াছে,—"আসিলে পবিত্র হবে, এসো গৌরাঙ্গ এই আসরে!" তাই চৈতন্যদেবের এই নামোল্লেখকে আমি আদি গৌরচন্দ্রিকা হিসাবে উল্লেখ করিয়াছি।

প্রাচীন বাংলার সকল সাহিত্যই অভিনেয়। অর্থাৎ আমাদের দেশের প্রাচীন বাংলা মঙ্গলকাব্য বা অনুবাদ-গ্রন্থ যে শুধু ভক্তি-সুললিত-কণ্ঠে সুর-লয়-তানে পড়া হইত তাহা নহে,—চামর মন্দিরাদি সহযোগে বিশেষ সাজে সজ্জিত হইয়া গায়ক উহা গান করিতেন। পয়ার-অংশ সুরে আবৃত্তি করার ভার ছিল মূল গায়ক বা অধিকারীর। লাচারী-অংশ গান করিত অনেকে মিলিয়া। এখনও রামায়ণ গান, মনসার ভাসান গান প্রভৃতিতে ঐ একই রীতির অনুসরণ দেখিতে পাই। কিন্তু ব্যাপক অর্থে ইহাদিগকে অভিনেয় সাহিত্য বলিলেও সংকীর্ণ অর্থে যাহাকে নাটক বা যাত্রা বলি, ঐগুলি তাহা নহে। বহু পাত্র-পাত্রীর বিচিত্র ভূমিকায়, চরিত্র-বিকাশী সংলাপের মধ্য দিয়া যাহার কাহিনী-ভাগের রূপায়ণ হয়, তাহাই নাটক। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে, ঐগুলি হইতে চৈতন্যদেব তাঁহার অভিনয়ের শৈলী আবিষ্কার করিয়াছিলেন কি না। বুদ্ধনাটক, ডাকের গান প্রভৃতির উল্লেখই পাইতেছি, নিদর্শন কিছু মিলিতেছে না। সুতরাং চৈতন্যদেবের অভিনয়ের উহাই আদর্শ কিনা ইহা জোর করিয়া বলার উপায় নাই। তেমনি একথাও স্বীকার করিতে হয় যে, চৈতন্যদেবের অভিনয়ে যেমন একজন নৃত্য করিতেছে আর অনুচরেরা সময়োচিত গান করিতেছে, ঠিক তেমন তেমন নৃত্য-গীতের বর্ণনা রহিয়াছে ঐ ডাকের গান প্রভৃতিতে। অতএব চৈতন্যদেবের অভিনয়ে উহাদের প্রভাব পড়িয়াছে ইহা মানিতেই হয়। বিশেষ করিয়া কালীদহের কৃষ্ণলীলাকে নাচিয়া গাহিয়া পালার আকারে রূপ দেওয়ার উল্লেখ ডাকের গানে পাইতেছি।

এই প্রসঙ্গে আর এক খানা কাব্যের আলোচনা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। উহা বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। ইহা যে চৈতন্য-পূর্ব যুগের নাট্য-সাহিত্যের উদাহরণ তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কাব্যটি একটি পালা নয়, কতকগুলি পালার সমষ্টি। কিন্তু সব কয়টি পালা মিলিয়া একটি অখণ্ড পালার সৃষ্টি করিয়াছে। সমগ্র কাব্য খানিকে একখানি সম্পূর্ণাঙ্গ নাটক ধরিলে তাম্বুলখণ্ড হইতে বংশীখণ্ড পর্যন্ত পালাগুলিকে এক একটি অঙ্ক ধরিতে পারি। জন্মখণ্ড নাটক খানির প্রস্তাবনা। যাত্রার পালার আরম্ভে একখানি বন্দনার পদ থাকে। কৃষ্ণকীর্তনের এই খণ্ডিত পালাটির আরম্ভেও আমরা তাহার নিদর্শন পাইতেছি—

"সভাপতি আর সব সভাসদ্ জন
আলপমতীঞঁ তোহ্মাতে শরণ ॥"

তারপর কংসের অত্যাচারে উৎপীড়িতা বসুমতী দেবগণের নিকট প্রতিকারার্থ গমন করিলেন। দেবগণ ক্ষীরোদসাগর-তীরে গিয়া বিষ্ণুর স্তব করিলেন। স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু নিজের মস্তক হইতে শ্বেত ও কৃষ্ণ দুইটি কেশ তুলিয়া দিয়া বলিলেন, এই দুই কেশ বলরাম ও কৃষ্ণরূপে দেবকীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবে। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইল। তাঁহার সম্ভোগের জন্য দেবতাদের অনুরোধে লক্ষ্মী আসিয়া রাধা রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। আইহন বা অভিমন্যুর সহিত রাধার বিবাহ হইল।

হাটে বাটে রাধাকে রক্ষা করিবার জন্য রাধার মাতামহী বড়াই নিযুক্ত হইল। ওদিকে নারদ আসিয়া কংসকে শাসাইয়া গেলেন,—দৈবকীর অষ্টম-গর্ভজ সন্তান কংসকে হত্যা করিবে। কংসও এই সন্তানকে বিনাশ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। এইরূপ বর্ণনার মধ্য দিয়া জন্মখণ্ড শেষ হয়। জন্মখণ্ড নাট্য নয়। কেননা ইহা পাত্র-পাত্রীর উক্তি-প্রত্যুক্তি-মূলক নয়। গোবিন্দ অধিকারী বা কৃষ্ণকমল গোস্বামীর যাত্রায় যে প্রস্তাবনা-অংশ দেখিয়াছি, জন্মখণ্ডের গানগুলিকে তাহারই একটা বিস্তৃততর পূর্বরূপ মনে করিতে বাধা নাই।

তারপর তাম্বূলখণ্ড হইতে পালাটির সত্যকার নাট্যরূপের সূচনা। কৃষ্ণ-কমলের পালায় আমরা দেখিয়াছি কোনো একটা ঘটনার খানিকটা অংশ ঘটিয়া গিয়াছে। কয়েকজন নরনারীর অন্তরে সুখ-দুঃখের অনুভূতির একটা তীব্র আন্দোলন শুরু হইয়াছে ঐ ঘটনাটুকুকে কেন্দ্র করিয়া। তাই তাহারা ভবিষ্যতে আরো কিছু বলিতে যাইতেছে, বা করিতেছে, বা করিতে যাইতেছে। ঠিক এই পর্যন্ত বর্ণনা করিয়া নাট্যকার পাত্র-পাত্রীর উক্তি-প্রত্যুক্তি দিয়া পালা আরম্ভ করেন। কৃষ্ণ-কীর্তনের প্রায় সব কয়টি খণ্ডের আরম্ভ হয় ঐ একই ভাবে। তাম্বূলখণ্ডের প্রথম দুইটি গানে এবং তৃতীয় গানের প্রথম দুই ছত্রে কৃষ্ণকমলের প্রস্তাবনার পূর্বরূপটি ফুটিয়া ওঠে।—

"দধি দুধেঁ পসার সাজাআঁ।
নেত বাস ওহাড়ন দিআঁ॥ ল রাধা॥
সব সখীজন মেলি রঙ্গে।
একচিত্তে বড়ায়ির সঙ্গে॥ ল রাধা॥
নিতি জাএ সর্বাঙ্গসুন্দরী।
বুনপথে মথুরা নগরী॥ ল রাধা। ধ্রু॥

*　　　*　　　*

রাধিকা হারাঁআ বড়ায়ি বুলে থানে থানে।
ভালমনে পথক না দেখে নয়নে॥

*　　　*　　　*

কথোদূর পথ গিআঁ দেখিল বডায়ি।
বৃন্দাবন মাঝে চরে শতসংখ্য গাই॥
তাক দেখি বড়ায়ির মনেত হরিষে।
এহা রাখোআল পুছোঁ রাধার উদ্দেশে॥

*　　　*　　　*

আচম্বিতে বুঢ়ী দেখি বৃন্দাবন মাঝে।
বিনয় করিআঁ পুছন্তি দেবরাজে॥"

অর্থাৎ ব্যাপারটি এই,—রাধা একদিন দধি দুগ্ধে পসরা সাজাইয়া মথুরার হাটে সখীদের সঙ্গে বিক্রয় করিতে চলিয়াছে। মনের আনন্দে বান্ধবীদের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে রাধা অনেক দূরে অগ্রসর হইয়া গেল। শেষে বকুলতলায় বড়াইয়ের আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। কিন্তু বৃদ্ধা বড়াই অন্যপথে চলিয়া গিয়াছে। ওদিকে বড়াই বৃন্দাবনে রাধিকাকে হারাইয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। খানিক দূরে দেখিল কৃষ্ণ গরু চরাইতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া বড়াই নাতিনীর সন্ধান করিতে সেখানে গমন করিল। শ্রীকৃষ্ণকে বড়াই বিনয় করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—এই পর্যন্ত একটানা বর্ণনা। তারপর তৃতীয় সঙ্গীতখানি শ্রীকৃষ্ণ ও বড়াইয়ের উত্তর-প্রত্যুত্তর,—

"কৃষ্ণ। কথাঁ হৈতে আইলা তোহ্মে কিবা তোর কাজে।
একলী বুলসি কেহ্নে বৃন্দাবন মাঝে॥
বড়াই। গোঠে হৈতে আসি আহ্মি বুঢ়ী গোয়ালিনী।
আগুত চলিলী মোর সুন্দরী নাতিনী॥
পাছে পাছে জাইতে পথ হারাইল আহ্মি।
মথুরার পথ পুতা কহিআঁ দেহ তুহ্মি॥
কৃষ্ণ। সঙ্গে কেন লআ বুল নাতিনী খানি।
কথা তাঁক হারাইলেঁ কহ তত্ত্ববাণী॥
কি নাম তাহার কেহ্নে তার রূপ।
আহ্মার থানত বুঢ়ী কহি আর স্বরূপ॥…"

তখন বড়াই সম্পূর্ণ একখানা গানে রাধিকার রূপ বর্ণনা করিতেছে,—

"কেশ পাশেঁ শোভে তার সুন্দর সিন্দূর।
সজল জলদে যেহ্ন উইল নব সূর॥
কনক কমল রুচি বিমল বদনে।
দেখি লাজে গেলা চান্দ দুই লাখ যোজনে॥
*   *   *
মাঝা খিনী গুরুতর বিপুল নিতম্বে।
মত্ত রাজহংস জিনি চলএ বিলম্বে॥
দিনে দিনে বাড়ে তার নহুলি যৌবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ॥"

বড়াইয়ের মুখে রাধার রূপের বর্ণনা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ ধৈর্যহারা হইয়া পড়িলেন। তিনি বড়াইকে অনুনয় করিতে লাগিলেন যাহাতে বড়াই রাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলাইয়া দেয়। শ্রীকৃষ্ণ ও বড়াইয়ের এখানকার উক্তি-প্রত্যুক্তিগুলি কয়েকখানা সম্পূর্ণ গান।

যাত্রার পালায় আমরা যেমন পূর্বগামী ও পরগামী কাহিনীর সংযোজক পয়ার বা ছড়া পাইয়া থাকি, কৃষ্ণকীর্তনের পালায় তাহাও রহিয়াছে,—

"শুভ তিথি বার শুভক্ষণে। আল।
আতিশয় উল্লসিত মনে॥ ল বড়ায়ি॥
বন্দিআঁ সব দেবগণে। আল।
বড়াই শ্রীরাম চরণে॥১
মনে ধরি কাহ্নাঞির বচনে। আল।
চলি ভৈল রাধিকার থানে॥ ল, ধ্রু॥
*   *   *
আতি নেহেঁ করিআঁ চুম্বনে।
ঘন ঘন কৈল আলিঙ্গনে॥
*   *   *
বসিলান্ত রাধার পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥"

সুতরাং দেখা যাইতেছে কৃষ্ণকমলের যাত্রার শৈলীর সঙ্গে কৃষ্ণকীর্তনের শৈলীর মিল অনেক।

১। কৃষ্ণকমলের যাত্রা মুখ্যতঃ আদ্যন্ত সঙ্গীত। কৃষ্ণকীর্তনেও পুরাপুরি গান।

২। কৃষ্ণকমলের পালার আরম্ভ বা প্রস্তাবনা ও কৃষ্ণকীর্তনের অনেকগুলি পালার আরম্ভ একরূপ।

৩। কৃষ্ণকমলের যাত্রার কাহিনী ও পাত্র-পাত্রীর মনোভাবের প্রকাশ ও বিকাশ প্রধানতঃ এক একখানি গোটা সঙ্গীতের উক্তি-প্রত্যুক্তিতে; কৃষ্ণ-কীর্তনেও প্রধানতঃ তাই।

৪। কৃষ্ণকমল মাঝে মাঝে পয়ার, ত্রিপদী ও শ্লোকের দ্বারা সংলাপ সৃষ্টি করিয়াছেন। কৃষ্ণকীর্তনেও একই গানের পদগুলিকে দুইজনের উক্তি-প্রত্যুক্তি হিসাবে সাজানো হইয়াছে।

৫। শুধু ইহাই নহে, কৃষ্ণকমলের রাধার বাক্য ও কার্য প্রভৃতির সহিত কৃষ্ণকীর্তনের রাধার বাক্য ও কার্যের মিল অনেক। দিব্যোন্মাদ যাত্রায় রাধার বিরহ-বেদনা করুণ গীতিকবিতার সৃষ্টি করিয়াছে; কৃষ্ণকীর্তনের বিরহ-খণ্ডও তাহাই করিয়াছে। কৃষ্ণকমলের রাধা শ্রীকৃষ্ণের বিরহে যোগিনী হইয়া বাহির হইতে চায়, কৃষ্ণকীর্তনেও রাধা বলিতেছে,—

> "মুণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর।
> যোগিনী রূপ ধরি লইবোঁ দেশান্তর॥"
>
> বিরহ খণ্ড, ৫ম পদ

অতএব আমরা যদি অনুমান করি যে কৃষ্ণকীর্তনের শৈলীর সহিত গৌরচন্দ্রিকা, চৈতন্যাবতারের ব্যাখ্যা বা দার্শনিকতা প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র আঙ্গিকের সংযোজন করিয়া আধুনিক যাত্রার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইলে অসুবিধা হয় কোথায়? অসুবিধা হয় এই যে, আমাদের তাহা হইলে দেখাইতে হয় যে পরবর্তী যুগের গদ্য-সংলাপ কৃষ্ণকীর্তনের শৈলীরই স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ। আরও একটি প্রশ্নের উত্তর করিতে হয়। যাত্রার মধ্যে আমরা দেখিতেছি কোনো চরিত্র হয়ত কয়েক পংক্তি পয়ারে বা গদ্য সংলাপে কিছু বলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে একখানা গান ধরিল। কৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে এই শৈলী তো কোথাও দেখি না।

চৈতন্য-আস্বাদিত রায় রামানন্দের জগন্নাথ-বল্লভ নাটকের মধ্যে এই শৈলীর পরিচয় পাইতেছি। সুতরাং বাংলা যাত্রার উৎপত্তি-প্রসঙ্গে জগন্নাথ-বল্লভের আলোচনা অপরিহার্য। জগন্নাথ-বল্লভের আলোচনা করিতে গেলে আবার

গীত-গোবিন্দের প্রসঙ্গ আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। গীত-গোবিন্দ নাটক নয়। কেননা, উহার এক একটি সর্গই এক একজনের উক্তি ; পরস্পরের উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়া কোনো সর্গই রূপায়িত হয় না। তবুও রামানন্দ নাটক রচনায় গীত-গোবিন্দের প্রভাব স্বীকার করিয়া লইলেন। গীত-গোবিন্দের প্রধান আকর্ষণ উহার শ্লোকগুলি নহে,—গান। জয়দেবের অনুপ্রাস-মধুর গানগুলি বৈষ্ণব সাহিত্যে নব প্রেরণা যোগাইল। সংস্কৃতে উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিবার জন্য রামানন্দ জগন্নাথবল্লভ সৃষ্টি করেন নাই। কৃষ্ণের মধুর লীলা শুনাইবার জন্যই তাঁহার চেষ্টা। নাটকের প্রস্তাবনায় তিনি সে কথা শুনাইয়া দিয়াছেন,—

> "ন ভবতু গুণ-গন্ধোহত্র নাম প্রবন্ধে,
> মধুরিপু-পদ-পদ্মোৎকীর্তনং ন স্তথাপি।
> সহৃদয়-হৃদয়স্যানন্দ-সন্দোহ-হেতু
> র্নিয়তমিদমতোঽয়ং নিষ্ফলো ন প্রয়াসঃ ॥"

আর এই কৃষ্ণ-কথা শুনাইতে গিয়াই তিনি গীত-গোবিন্দের প্রভাবে পড়িয়াছেন।

জগন্নাথবল্লভের শৈলীর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করিবার মতো—

১। নান্দীর পর অতি দীর্ঘ একখানা প্রস্তাবনা। প্রস্তাবনার একেবারে শেষের দিকে নেপথ্যে একটি শ্লোকের আবৃত্তি,—

> "দ্বাত্রিংশল্লক্ষণৈর্যুক্তঃ দেবঃ দেবশ্বরো হরিঃ।
> গোপাল-বালকৈঃ সার্দ্ধং জগাম যমুনাবনম্ ॥"

ইহার পরই জয়দেবীয় ভাষায় কৃষ্ণরূপ-বর্ণনাত্মক একখানা গীতি,—

> "মৃদুতর-মারুত-বেল্লিত-বল্লব-পল্লী-বলিত-শিখণ্ডম্।
> তিলক-বিড়ম্বিত-মকরত-মণিতল-বিম্বিত-শশধর-খণ্ডম্।"
> ইত্যাদি।

ইহা কাহার ভূমিকা তাহার উল্লেখ নাই। সূত্রধার এবং সূত্রধার-পত্নী আসরে থাকিতেই নেপথ্যে এই শ্লোকের আবৃত্তি এবং সঙ্গীত হইতেছে। সুতরাং ইহা তাহাদের ভূমিকা নয়। আবার এইখানেই এই ধরনের ভূমিকার শেষ হয় নাই। গোষ্ঠে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করিতেছেন। তাহা শুনিয়া রাধা গোষ্ঠে প্রবেশ করিতেছেন। নেপথ্য হইতে তাহা বলিয়া দেওয়া হইল।—

> "বৃন্দাবনে বিহরতো মধুসূদনস্য
> বেণুস্বনং শ্রুতিপুটেন নিপীয় কামম্।

উদ্যন্মনোজ-শিথিলীকৃত-গাঢ়লজ্জা
রাধা বিবেশ কুতুকেন সখি কদম্বম্ ॥” —১ম অঙ্ক।

ইহাও কাহার উক্তি নাটকে তাহার উল্লেখ নাই। যাত্রার নাটকের বেলায়ও আমরা এই ধরনের গান ও শ্লোক পাইয়াছি।

২। অঙ্কগুলি বিভক্ত হইয়াছে রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমের পর্যায় অনুসারে,—পূর্বরাগো নাম প্রথমোঽঙ্কঃ, ভাব-পরীক্ষা নাম দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ, ভাব-প্রকাশো নাম তৃতীয়োঽঙ্কঃ ইত্যাদি। নিবদ্ধ পদাবলীর পালাও ঠিক এমনি রস-পর্যায় অনুসারে সাজানো। আবার কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক যাত্রার কাহিনী-বিন্যাসের মূল লক্ষ্য থাকে ঐ রস-পর্যায়।

৩। যাত্রার কাহিনীর মধ্যে জটিলতা নাই। আদিযুগের যাত্রার গদ্য সংলাপ সঙ্গীতের সূত্র রচনার প্রয়োজনে মাত্র সৃষ্টি হইয়াছিল। রামানন্দের নাটকেও জয়দেবীয় ভঙ্গীতে সঙ্গীত-যোজনার দিকে সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে। গল্পাংশ অতি নগণ্য। গদ্য সংলাপ কোনোমতে ঐ সঙ্গীত এবং শ্লোকের আগমন-পথ পরিষ্কার করার জন্য।

৪। যাত্রায় যেমন আমরা দেখিয়াছি গদ্য সংলাপে বক্তব্য শেষ না করিয়া গদ্যের পরেই একখানা সঙ্গীতের যোজনা হয়, রামানন্দের নাটকেও তেমনি ধরনের প্রয়োগ আছে। কৃষ্ণকীর্তন হইতে এইখানে জগন্নাথবল্লভের পার্থক্য। উদাহরণ দিতেছি,—

“শ্রীকৃষ্ণঃ (পুনরপি পত্রিকাং বাচয়িত্বা)। সখি সম্যগ্ ইদং নাবকলিতম্ গোপাল-বালক-বৃতো যমুনা-তটান্তে বৃন্দাবনে কিমপি কেলিকলাং ভজামি। কস্মাদিয়ং দিশি দিশি স্ফুট-রূপ-ভাজং মামেব পশ্যতিকুরঙ্গ-কিশোর-নেত্রা।

সামগুর্জ্জরী রাগেণ।

গোপ কুমার-সমাজমিমং সখি পৃচ্ছ কদানুগতোঽহম্।
কথমিব মামনুপশ্যতি দিশি দিশি কথমিব কলয়তি মোহম্ ॥
সখি পরিহর বচন-বিলাসম্।
গোপ-শিশূনাং বিদিতমিদং মম জনয়তি গুরু-পরিহাসম্ ॥
যদিচ কুলাচলয়াপি কুলস্থিতিরনয়া পরিহরণীয়া।
কিমিতি তদা ময়ি রতিরতিবিকলা বালে কিল করণীয়া ॥

গজপতি রুদ্রমুদে মধুসূদন-বচনমিদং রসিকেষু।
রামানন্দ-রায়-কবি ভনিতং জনয়তু মুদমখিলেষু॥"—২য় অঙ্ক

অতএব এখন আমরা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারি কিনা ?—

প্রাক্-চৈতন্য যুগে যাত্রার কোনো নিদর্শন পাইতেছি না; পাইতেছি কৃষ্ণ-কীর্তনের ন্যায় নাট-গীতি। চৈতন্যদেবের অভিনয়ে গৌরচন্দ্রিকা, চৈতন্য অবতারের ব্যাখ্যা, প্রস্তাবনা, সংলাপ এবং নৃত্য পাইতেছি। যাত্রার অন্যান্য লক্ষণগুলি চৈতন্য-আস্বাদিত 'জগন্নাথবল্লভ' নাটকে পাইতেছি। জগন্নাথ বল্লভে গদ্য সংলাপ আছে। সুতরাং বাংলা কৃষ্ণকীর্তন এবং সংস্কৃত জগন্নাথবল্লভ নাটকের মিশ্র-শৈলী হইতে বাংলা যাত্রা-শৈলীর উদ্ভব। কৃষ্ণকমলের যাত্রা ঐ আদিযুগের শৈলীর অনুসরণ করিয়াছে।

তখন আমাদের আরো দুটি প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে। প্রথম প্রশ্ন যাত্রার দার্শনিকতা। এ প্রশ্নের উত্তর সহজ হইয়া পড়িবে। কৃষ্ণলীলার সঙ্গে দার্শনিকতা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং যেখানেই কৃষ্ণকাহিনী সেখানেই কিছু না কিছু দার্শনিকতা আছে। কৃষ্ণকীর্তন এবং জগন্নাথবল্লভ নাটকে যে দার্শনিকতা নাই তাহার অর্থ কৃষ্ণচরিত্রের ঐ দার্শনিক ব্যাখ্যার দিক ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়োজন নাই। নাটকের মধ্যে কৃষ্ণচরিত্রের একটা ব্যাখ্যা-মূলকতা যখনই আসিল. তখনই অন্তর্নিহিত দার্শনিকতা ফুটিয়া উঠিল।

এখন কথা হইল এই যে, ঐ প্রয়োজন-বোধ কখন হইল ? আমাদের শ্রীমদ্ভাগবত শুধু কৃষ্ণায়ণ কাব্যই নয়,—উহা কৃষ্ণ-দর্শন। ভাগবতের কৃষ্ণ-কথা কৃষ্ণ-নামধেয় একটি মানুষের জীবনীই নহে ; নরদেহধারী নারায়ণের অপূর্ব লীলা। ভক্তির, সাধনার, ধর্মের, গূঢ় তত্ত্ব এই লীলা বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে নিহিত রহিয়াছে। তাই ভাগবত শুধু পড়িয়া গেলেই হইত না, উহার অন্তর্নিহিত গূঢ় অর্থও পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝাইয়া দিতে হইত। তাহা হইতেই কথকতার সূচনা হয়। শ্রীচৈতন্যের পূর্ববর্তী মালাধর বসু পণ্ডিতের মুখে ভাগবত পাঠ শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনা করেন। শ্রীচৈতন্যের আমলেও ভাগবত পাঠ হইত। খেতরী উৎসবে ব্যাখ্যা সহ ভাগবত পাঠ হইয়াছিল—

"রামচন্দ্র কণ্ঠধ্বনি অমৃতের ধার।
ভাগবত-পদ্য-অর্থ কৈলা চমৎকার॥"

কিন্তু ভাগবতের বাহিরে যেখানেই কৃষ্ণ আছেন সেখানেই দার্শনিকতার প্রয়োজন চৈতন্যাবতারের আগে অনুভূত হয় নাই। তাই কৃষ্ণকীর্তনের মতো

কৃষ্ণায়ণ কাব্যেও দার্শনিকতা নাই। তারপর শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর তাঁহাকে রাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণ-স্বরূপরূপে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হইল। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য-লীলা গৌণ বা অনুসঙ্গ কর্ম হইয়া দাঁড়াইল। প্রেম বিদগ্ধ-মাধবেরই তখন একমাত্র প্রতিষ্ঠা হইল। এই বিশেষ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে পদাবলী সাহিত্য, চৈতন্য-চরিতামৃত-রূপ জীবনী গ্রন্থ ও অন্যান্য কৃষ্ণায়ণ কাব্যের মধ্য দিয়া প্রচার করা শুরু হইল। নিবদ্ধ পদাবলী বা পালাকীর্তনে এই দার্শনিক ব্যাখ্যা অবশ্য করণীয় রূপে গৃহীত হয়। তাহা হইতে যাত্রায় উহা আসিয়া যায়। পদাবলী সাহিত্য উহা পাইয়াছিল বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নাটক হইতে।

বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নাটক শৈলীর দিক দিয়া সংস্কৃত নাট্য শৈলীকেই অনুসরণ করিয়াছে। সেদিক দিয়া কিছুই নূতনত্ব নাই। নূতনত্ব উহার দার্শনিকতায়, রাধা-কৃষ্ণপ্রেম-কাহিনী সৃষ্টিতে, চৈতন্যদেবের কৃষ্ণমুখী ব্যাখ্যায়, যাত্রা-সুলভ কতিপয় চরিত্রের অবতারণায় ও অতিপল্লবিত রস-বিস্তার-প্রবণতায়।

নাটকে সর্বপ্রথম গৌরচন্দ্রিকার প্রয়োগ করেন রূপগোস্বামী তাঁহার বিদগ্ধমাধব নাটকে,—

> "অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
> সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
> হরিঃ পুরটসুন্দর-দ্যুতিকদম্ব-সন্দীপিতঃ
> সদা হৃদয়-কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥
>
> —বিদগ্ধমাধব, ১ম অঙ্ক, ২য় শ্লোক

গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রায় ললিতা, পৌর্ণমাসী, বৃন্দা প্রভৃতির মুখে রাধা-কৃষ্ণের অতিলৌকিক চরিত্রের দার্শনিক ব্যাখ্যা আমরা সুপ্রচুর পরিমাণে শুনিতে পাই। ইহা বিদগ্ধমাধবের হুবহু অনুসরণ। যথা—

> "পৌর্ণমাসী। প্রত্যাহৃত্য মুনিঃ ক্ষণং বিষয়তো যস্মিন্ মনো বিৎসতে
> বালাসৌ বিষয়েষু ধিৎসতি ততঃ প্রত্যাহরন্তী মনঃ।
> যস্য স্ফূর্তি-লবায় হন্ত হৃদয়ে যোগী সমুৎকণ্ঠতে
> মুগ্ধেয়ং কিল পশ্য তস্য হৃদয়ান্নিষ্ক্রান্তিমাকাঙ্ক্ষতি॥"
>
> —বিদগ্ধমাধব, ২ অঙ্ক, ২৯ শ্লোক

অথবা,—

"পৌর্ণমাসী। স্তোত্রং তত্র তটস্থাং প্রকটয়চ্চিত্তস্য ধত্তে ব্যথাং
নিন্দাপি প্রমদং প্রযচ্ছতি পরিহাসাশ্রয়ং বিভ্রতী।
দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন গুরুতাং কেনাপ্যনাতন্বতী
প্রেম্ন স্বারসিকস্য কস্যচিদিয়ং বিক্রীড়তি প্রক্রিয়া॥

মধুমঙ্গল। এব্বং রূপং ক্খু দোণ্ণং রাহামাহবাণং পেম্ম।

পৌর্ণমাসী। বৎস কিমুচ্যতে ? মাধুর্য-সংসর্গিনো
নৈসর্গিকস্য পরস্পর-বল্লভানাং বিদগ্ধমিথুনানাং
প্রেম-শৃঙ্খলা-বন্ধনস্য পরোমৎকর্ষ-রেখায়াং
দৃষ্টান্তঃ কিল রাধামাধবয়োর্ভাবামৃত-ভূমা॥"

—বিদগ্ধমাধব, ৫ম অঙ্ক

অথবা,—

"বিশাখা। বিধত্তে কংসারিঃ সখি পরমহংসালিষু রতিং
মনোহংসেন্দ্রং তে কথমপি ন নির্মোক্ষ্যতি ততঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণ-মিলনের ব্যাকুলতায় তাড়াতাড়ি অলঙ্কার পরিতে গিয়া রাধিকাকে বেশ-বিপর্যয় করিতে বৈষ্ণব পদাবলী ও যাত্রায় অনেকবার দেখা গিয়াছে। বিদগ্ধমাধবে ললিতা বলিতেছে,-

"ধম্মিল্লোপরি নীলরত্ন-রচিতো হারস্তয়ারোপিতো
বিন্যস্তঃ কুচকুম্ভয়োঃ কুবলয়-শ্রেণীকৃতো গর্ভকঃ।
অঙ্গে কল্পিতমঞ্জনং বিনিহিতা কস্তুরিকা নেত্রয়োঃ
কংসারেরভিসার-সংভ্রমভরান্ মন্যে জগদ্বিস্মৃতম্॥"

—বিদগ্ধমাধব, ৪র্থ অঙ্ক, ৩০ শ্লোক

চৈতন্যোত্তর পদাবলী সাহিত্যে এবং যাত্রায় রাধার কৃষ্ণ-প্রেমকে এক দুশ্চর সাধনা হিসাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। গোবিন্দদাসের অভিসারের পদ "কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল" প্রভৃতি তাহার উদাহরণ। বিদগ্ধমাধবের রাধিকাও এই সাধনা করেন,—

"রাধিকা। (সব্যথং) তদো পণিহাণেণ ণং
পচ্চক্খীকরিসসং। (ইতি ধ্যানং নাটয়তি।)"

—বিদগ্ধমাধব, ২য় অঙ্ক

গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতি যাত্রাওয়ালার রচনায় অনেক সময় অর্থ-সংশ্লেষের দ্বারা দার্শনিকতা করা হয়। গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রার উদ্ধৃত অংশে "মুক্ত" অর্থে সুবল বুঝিতেছে "মুক্তা" নামধেয় রত্ন। আর বড়াই শ্লেষের দ্বারা অর্থান্তর গ্রহণ করিয়া "মুক্ত" অর্থে "বন্ধন-হীন" বুঝাইতেছে। তাহা হইতে আরম্ভ হইল দার্শনিকতা,—শ্রীকৃষ্ণ সকলকে মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত করেন। সুতরাং তিনি এই সামান্য মুক্তার খেলা খেলিতে পারিবেন না কেন? প্রকাশের এই পদ্ধতি বিদগ্ধমাধব হইতে লওয়া,—

"বিশাখা। * * উদগীর্ণরাগেন করম্বিতান্তরা
পরিস্ফুরৎ কৃষ্ণমুখী গুণাঙ্কিতা।
গুঞ্জাবলী মঞ্জুতরাবলম্বতাং
সা রাধিকেয়ং তব কণ্ঠ-সঙ্গমম্॥"

—বিদগ্ধমাধব, ২য় অঙ্ক, ৫৪ শ্লোক

এই শ্লোকের দ্বারা গুঞ্জামালা এবং রাধা উভয়কেই বুঝাইতেছে। গুঞ্জাপক্ষে ব্যাখ্যা এরূপ,—

"রক্তবর্ণে এবং যাহা সর্বতোভাবে অনুরঞ্জিত হইলেও যাহার মুখভাগ কৃষ্ণবর্ণ এবং যাহা সূত্রে গ্রথিত হইয়া অধিক সার-বিশিষ্ট ও মনোহর হইয়াছে, সেই গুঞ্জামালা তোমার কণ্ঠদেশ অবলম্বন করুক।"

—বিদগ্ধমাধব, বসুমতী সং, ৯৮ পৃষ্ঠা

রাধা পক্ষে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী যে টীকা করিয়াছেন, তাহার সারানুবাদ এইরূপ,—"যাঁহার অন্তর অনুরাগে পূর্ণ, যাঁহার মুখে কৃষ্ণ-নাম উচ্চারিত হইতেছে, যিনি গুণশালিনী ও মনোজ্ঞা সেই শ্রীরাধিকারূপা গুঞ্জাবলী তোমার কণ্ঠদেশে সংলগ্না হউন।"

—বিদগ্ধমাধব, বসুমতী সং, ৯৮ পৃষ্ঠা

রূপ গোস্বামী শুধু নাটক রচনা করেন নাই। তাঁহার রচিত উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থ বৈষ্ণব রস-শাস্ত্রের সাহিত্য-দর্পণ। পারমার্থিক ভক্তিভাবের সহিত অলঙ্কার-শাস্ত্রের সঙ্গতি রাখিয়া তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। পরবর্তী কালে বৈষ্ণব পদসঙ্কলন-কর্তৃগণ রূপ গোস্বামীর নির্দিষ্ট পথেই রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমের পর্যায়-ভেদে নিজেদের সঙ্কলন গ্রন্থে পদাবলী সংযোজন করেন। রূপ গোস্বামী নিজের রচিত নাটকেও উজ্জ্বল নীলমণির রীতি মানিয়া চলিয়াছেন; বাসক-সজ্জিতা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা প্রভৃতি পর্যায়-ভেদে রাধা-

প্রেমের বিকাশ তিনিই তাঁহার বিদগ্ধমাধব নাটকে দেখাইয়াছেন। পরবর্তী বৈষ্ণব পদকর্তৃগণের সকলেই বিদগ্ধমাধবের কাহিনী, প্রেম পর্যায়, ভাব ও ভাষা অবলম্বনে পদ রচনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের সখা মধুমঙ্গল, রাধিকার সখী ললিতা, বিশাখা, বৃন্দা প্রভৃতি, প্রতিনায়িকা চন্দ্রাবলী, এ সমস্তই রূপ গোস্বামীর সৃষ্টি। যাত্রাওয়ালারা বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যের মধ্য দিয়া এই সমস্তই গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং রূপ গোস্বামীর রচনা বাদ দিয়া যাত্রা সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই চলিতে পারে না।

তাহা হইলে যাত্রার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা শেষ পর্যন্ত এই কথাগুলি বলিতে পারি কি না ?—

যাত্রার গৌরচন্দ্রিকার আদর্শ লওয়া হইয়াছিল রূপ গোস্বামীর বিদগ্ধ-মাধব হইতে।* যাত্রাপালার কাহিনী, ভাব, চরিত্রের নাম এবং রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের পর্যায়-ভেদ প্রভৃতি রূপ গোস্বামীর নাটক ও অলঙ্কারগ্রন্থ হইতে গৃহীত। রায় রামানন্দের নিকট হইতে লওয়া হইল যাত্রার গদ্য সংলাপ ও সঙ্গীতের যুগপৎ সংযোজনের রীতি। কৃষ্ণকীর্তন হইতে লওয়া হইয়াছিল যাত্রার সঙ্গীতের উক্তি-প্রত্যুক্তির পদ্ধতি। যাত্রার দার্শনিকতায় রূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধবের অনুসরণ।

উপরি-উক্ত মন্তব্যকে স্বীকার করিবার পূর্বে কয়েকটি বিশেষ প্রশ্নের উত্তর আমাদিগকে করিতে হয়।

প্রথম কথা, চৈতন্যদেবের পূর্বে যাত্রার কোনো উল্লেখ পাই না। চৈতন্য-দেব নিজে যে অভিনয় করিলেন, তাহার বর্ণনায় যাত্রার লক্ষণ পাই, আগেই সে কথা বলিয়াছি। তারপর বিদগ্ধমাধব, জগন্নাথবল্লভ নাটক প্রভৃতির মধ্যে

---

* রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর লিখিতেছেন,—"আমার বোধ হয় গৌরচন্দ্রিকার সূত্রপাত নরোত্তম ঠাকুর হইতে।" [বৈষ্ণব রস-সাহিত্য, ৮৯ পৃষ্ঠা] তিনিই আবার অন্যত্র লিখিতেছেন,—"ঠিক কোন্ সময়ে গৌরচন্দ্রিকার প্রবর্তন হয় তাহা বলা কঠিন। তবে চৈতন্য-ভাগবত, শ্রীরূপ-গোস্বামীর নাটক, রামানন্দ রায়ের নাটক, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ আরম্ভ করিবার পূর্বেই চৈতন্যচন্দ্রকে প্রণাম করিতে হয়। চরিতামৃতের প্রায় প্রত্যেক অধ্যায়ের অবতরণিকা রূপে এক একটি গৌরগুণাত্মক শ্লোক প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাই গৌরচন্দ্রিকার সূত্রপাত বলিয়া মনে হয়।" [পদামৃত-মাধুরী, ১ম খণ্ড, ভূমিকা ২।৶-পৃষ্ঠা] অতএব বিদগ্ধমাধব নাটক হইতেই যাত্রার গৌরচন্দ্রিকার আদর্শ লওয়া হইয়াছিল বলিলে ভুল হইবে না মনে করি।

নূতন নাট্যশৈলী, অভিনব ভাবপ্রেরণা প্রভৃতি লক্ষ্য করি বটে, কিন্তু ঐ নাটকগুলির অনুবাদ অবলম্বনে বা উহাদের আদর্শে রচিত কোনো বাংলা নাটকের সাহায্যে অভিনয় বঙ্গদেশে হইয়াছিল কিনা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে কোথাও তাহার এতটুকু উল্লেখ নাই। খেতরীর মতো উৎসবে নিবদ্ধ কীর্তনের সৃষ্টি হইল। কিন্তু চৈতন্যদেব যে ধরনের অভিনয় নিজে করিয়াছিলেন, খেতরীর সপ্তাহব্যাপী দীর্ঘ কর্মসূচীর মধ্যে কোথায়ও সেই ধরনের অভিনয়ের স্থান হইল না কেন? দ্বিতীয়তঃ যদি বাংলার নিজস্ব কোনো নাট্য-শৈলী চৈতন্যদেবের অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গেই গড়িয়া উঠিবে, তাহা হইলে সপ্তদশ শতক হইতে বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, গীতগোবিন্দ প্রভৃতির যে অনুবাদ হইতে আরম্ভ করিল, তাহা ঐ নাট্য-শৈলীর অনুসরণ না করিয়া নেহাৎ কাব্যগ্রন্থ হইয়া উঠিল কেন? এই দুইটি কারণই কি আমাদিগকে স্পষ্টভাবে বলিয়া দেয় না যে সপ্তদশ শতক যাবৎ যাত্রাশৈলীর উদ্ভব হয় নাই? চৈতন্যদেবের অভিনয়টিও কিন্তু প্রকাশ্যে হয় নাই,—বাড়ির ভিতরে।

তবে কি উপরি-লিখিত গ্রন্থগুলির ভাব, ভাষা ও আঙ্গিকের প্রভাব বাংলা যাত্রায় পড়ে নাই? পড়িয়াছে। কিন্তু তাহা ঠিক সোজাসুজি নহে। সপ্তদশ শতকে যাত্রার উৎপত্তি না হইলেও নিবদ্ধ-কীর্তনের সূচনা হইয়াছে। এই পালা-কীর্তনগুলিতে জয়দেবের গীতগোবিন্দ, রূপ গোস্বামীর নাটক ও অলঙ্কার-গ্রন্থ প্রভৃতির প্রভাব অঙ্গে অঙ্গে পরিদৃশ্যমান। পরবর্তী কালে কীর্তন হইতে যখন যাত্রার উৎপত্তি হইল* তখন রিক্‌থ-সূত্রে যাত্রা পূর্ববর্তী বৈষ্ণব কবিদের সকলের সম্পদে অধিকার লাভ করিল।

কীর্তন-পালার বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাইব ধীরে ধীরে কেমন করিয়া কীর্তন ভাঙিয়া যাত্রা সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে।

খেতরীর উৎসবে ব্যাখ্যা করিয়া ভাগবত পাঠের উল্লেখ পাইয়াছি। কিন্তু ব্যাখ্যা করিয়া কীর্তন করার উল্লেখ পাই নাই। তবে হস্তাদি ভঙ্গীর মধ্য দিয়া কবিতার অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশ করিবার বর্ণনা পাইতেছি।—

"শ্রীগোকুল গায় বর্ণ-বিন্যাস মধুর।
হস্তাদি ভঙ্গীতে ভাব প্রকাশে প্রচুর॥"

---

* কীর্তন হইতে যাত্রার উৎপত্তির কথা ডাঃ সুকুমার সেন উল্লেখ করিলেও বিস্তৃত কোনো আলোচনা করেন নাই।

সুতরাং অনুমান করা যায় প্রথমে নিবদ্ধ-কীর্তনের মধ্যে ব্যাখ্যামূলক আখর বা উপজ অংশ ছিল না। শুধু কাহিনীর ক্রমবিকাশ ও ভাবের পারম্পর্য রক্ষা করিয়া পদের পর পদ সাজাইয়া এই নিবদ্ধ-কীর্তনের পালা রচিত হইত। বৈষ্ণব-পদ-সংগ্রহগুলি এই অনুমানের সাক্ষ্য দিবে। সংগ্রহ ব্যাপারে এই সঙ্কলয়িতাদের একটা সুনির্দিষ্ট রীতি ছিল। প্রথমতঃ পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন, মান প্রভৃতি যে-যে ঘটনা পূর্বে ও পরে ঘটিতে পারে, তাহার পৌর্বাপর্য রক্ষা করা হইত। দ্বিতীয়তঃ মান, মাথুর প্রভৃতি পালায় পদগুলিকে ভাগ করিবার সময় ঐ বিষয়ের চৈতন্য-চরিতাত্মক পদ প্রথমেই সংযোজন করা হইত। ইহাই গৌরচন্দ্রিকা। কীর্তনীয়া আসরে নামিয়া যদি চৈতন্য-বিষয়ক মানের পদ গান করিতেন,—"মানভাব গোরাচাঁদের বাসুঘোষ গায়,"—তাহা হইলে শ্রোতাদের বুঝিতে হইত, এবার রাধা-কৃষ্ণের মানের পালা শুরু হইবে। বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে দুই ধরনের পদ আছে। কতকগুলি পদে রাধাকৃষ্ণপ্রেম-বিষয়ক কাহিনীর বর্ণনা থাকে, আবার কতকগুলি পদে থাকে ঐ কাহিনীর বা পরিস্থিতির অবলম্বনে নায়ক-নায়িকার আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস বা উক্তি-প্রত্যুক্তি। ভিন্ন ভিন্ন বৈষ্ণব কবি এই উভয় বিষয়েই ভিন্ন ভিন্ন পদ রচনা করিয়াছেন। ঐ গুলির মধ্যে যেটা যেখানকার উপযোগী সেইটিকে সেখানে বসানো হয়। একটি প্রসঙ্গ হয়ত এইরূপ,—রাধিকা যমুনার ঘাটে জল আনিতে গিয়াছে। সেখানে গিয়া কৃষ্ণের দেখা পাইল। কৃষ্ণকে দেখিয়া রাধিকার মনে প্রেম জাগিল। রাধাকে দেখিয়াও কৃষ্ণের তদ্রূপ অবস্থা হইল। কোনো কবির পদে রাধার জল আনিতে যাওয়া-টুকুর বর্ণনাই আছে। প্রথমে সেই পদখানি বসানো হইল। ঘাটে গিয়া কৃষ্ণকে দেখিয়া রাধার যে অবস্থা হইল তাহার বর্ণনা হয়ত রহিয়াছে আর এক কবির রচনায়। প্রথম গানখানির পরে অন্য কবির রচনা হইলেও প্রসঙ্গ রক্ষার জন্য এই গানখানি বসানো হইল। তারপর রাধার প্রেমোক্তি হয়ত তৃতীয় কবির রচনা। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন কবির রচিত পদ বিশেষ সূত্রে গ্রথিত হইয়া একখানা পূর্ণাঙ্গ কীর্তন-পালার সৃষ্টি করিল। অনুমান হয় ইহাই কীর্তন-পালার আদিরূপ। তারপর অচিরেই কবিগণ এই সংগ্রহ-গ্রন্থের আদর্শে নিজেরা স্বতন্ত্র পালা সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এই ধরনের পালার অনেকখানি পূর্বরূপ। দীন চণ্ডীদাসের যে পালাগ্রন্থ অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাও এই ধরনের। তারপর এমন সময় আসিল যখন এই আদর্শে বৈষ্ণব-

সাহিত্য-বহির্ভূত পালাও রচিত হইতে লাগিল। ফকিররাম দাসের সখিসেনা কাব্যটি তাহার উদাহরণ।*

যাহা হউক এই শৈলীতে রচিত কয়েকটি নিমাইসন্ন্যাসের পালাও পাইতেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩৮৭ সংখ্যক পুঁথি রূপচরণের নিমাইসন্ন্যাস এই ধরনের একটি পালা। পালাটি খণ্ডিত। সুতরাং কবির পরিচয় বা রচনাকাল জানিবার উপায় নাই। কতকগুলি পদ পর পর উক্তি-প্রত্যুক্তি হিসাবে সাজাইয়া পালাটি রচিত হইয়াছে। যথা,—

"কান্দিতে কান্দিতে বলে সচিদেবি আই।
হেদেরে নিষ্ঠুর নিমাই দয়া তোর নাই॥
আমি বির্দ্ধ মাতা তোর মোরে ফেলাইয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধু আইলে ফালিয়া॥
তব লাগি কান্দে সব নদিয়ার লোক।
ঘরেতে চলহ বাছা দূরে যাউক শোক॥

* * *

এ রূপচরণ কহে তেন দিন হব।
শ্রীনিবাস মন্দিরে গিয়া কির্তনে নাচিব॥"

ইহা শুনিয়া চৈতন্যদেব উত্তর করিতেছেন,—

"শুনিয়া সচির বাণী কহে গোরা গুণমণি
শুন বাছা আমার বচন।
তুমি জন্মে জন্মে মাতা আমি পুত্র হব তোথা
এই সব বিধির লিখন॥
বিধির লিখন যেবা তাহা না খণ্ডিবে কেবা
মিছা দুস্ক কর অকারণ।
ভজগে কৃষ্ণের পদ দূরে যাবে সব দুস্ক
পাইবে পরম পদ ধন॥
প্রভু নিরসনে রহে সচি অনুরাগে কহে
পড়ে জল দু আখি ভরিয়া।
এ রূপচরণে কহে আর কি এমন হবে
পুন গোরা জাইব নদিয়া॥"

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুঁথিশালার ১৮৭৬ সংখ্যক পুঁথি

ইহার পর চৈতন্যদেব ফিরিয়া যাইতে অসম্মত হইলে নদীয়াবাসীর যে শোকাচ্ছন্ন অবস্থা হইল, একটি পদে তাহার বর্ণনা চলিতেছে,—

"সকল ভকতগণ করে হায় হায়।
সচির দুলাল গোরা কোথাকারে যায়॥
কাঁদে যে অদৈত রায় ধরণী লোটাএ।
করাঘাত হানি শিরে গৌরাঙ্গ বলিয়ে॥

* * *

মুরারী কান্দএ বসুদেব দত্ত আর।
গৌরাঙ্গ বলিয়ে ডাকে ফির একবার॥
এ রূপচরণে কহে বিরহ-সায়রে।
ডুবিয়া রহিল সব ভকত মণ্ডলে॥"

উহার পর শচীর উক্তি হিসাবে একখানা সঙ্গীত দেওয়া হইয়াছে। এইরূপে পদের পর পদ সাজাইয়া পালাটি রচিত।

রূপচরণের রচনা যখনকার হউক না কেন, এই শৈলী সপ্তদশ শতকের পরের নয়। চৈতন্য-আত্মীয় মাধবাচার্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের ভিতর এই শৈলীর উদাহরণ মিলিতেছে। ঐ পুস্তকের রাস-লীলা অধ্যায় হইতে খানিকটা উদ্ধৃত করিতেছি,—

"শ্রীরাগ

নিকুঞ্জ গুঞ্জই মত্ত মধুকর।
বিকশিত কুসুম সৌরভ মনোহর॥
ভেল মনোরথ সিদ্ধি শুভগ নয়ানে।
পেখ অপরূপ সব বিহি নিরমানে॥
পবনে চলিত সব নব নব দল।
পরিসর শীতল বিমল তরুতল॥
সুচারু অঙ্কুর তৃণ ললিত লতিকা।
বিকচ কলিকা জাতি মালতি যূথিকা॥
সরসি প্রফুল্ল বারি কুমুদ প্রকাশে।
কহত মাধব বিধুবন্ধু দেখি হাসে॥

পয়ার

এই সব রূপে হরি লৈয়া গোপীগণ।
দেখাই দেখাই সব বুলে বৃন্দাবন ॥
তবে ত নাগরগুরু সানন্দিত মনে।
আইলা মনের রঙ্গে যমুনা পুলিনে ॥
হাস্য কটাক্ষ দৃঢ় মধুর বচনে।
বিবিধ বিহার কৈল না যায় লিখনে ॥
প্রকার বিশেষ তাহার রচিব এখানে।
শুনরে ভকতলোক হয়ে একমনে ॥
শুন শুন ওরে ভাই হয়ে একচিত্ত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত ॥

মালব রাগ

ও চাঁদবয়ানে ও চাঁদবয়নী।
ও পদ্মনয়নে ও পদ্মনয়নী ॥

রময়ই মাধাই গোপরমণী।
নিকুঞ্জ-শয়নে এ সুখ-শয়নী ॥ ধুআ ॥

অধরে অধরে সঘন চুম্বন।
কুচে নখাঘাত কর পীড়ন ॥

জঘনে জঘনে সঘনে মেলি।
রাধা মাধব অপার কেলি ॥"

এইভাবে গানের পর গান চলিয়াছে।

সপ্তদশ শতকে রচিত ভবানন্দের হরিবংশ হইতে রাধার বিলাপের খানিকটা অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দিতেছি, নিবদ্ধ-কীর্তন কৃষ্ণায়ণ-কাব্যগুলিকেও কতখানি প্রভাবান্বিত করিতেছে।—

"শ্রীকৃষ্ণ বিরহে শ্রীরাধার বিলাপ।

রাগ সিন্ধুরা

সইগ পরাণ বিদরে। ৭৩৬১ পঙ্‌ক্তি।
আমা ছাড়ি কালাচাঁদ গেলা মধুপুরে ॥

কাহাতে কহিমু দুঃখ কেবা মরম জানে।
না দেখিয়া কালাচাঁদ কি করে পরাণে ॥

কি করিলে কি হইব একই না বুঝি।
কাহ্নু দরশন হো'ক এই বর খুঁজি ॥

কতবা ঝুরিনু আমি হইয়া কুলবধু।
গরল থুইয়া কাহ্নু লইয়া গেল মধু ॥

কতেক ভরসার বন্ধু সেহি বাসে ভীন।
রাধার করুণা কহে ভবানন্দ দীন।

রাগ মোহন

সজনি সই,—

আপনা খোয়াইতে কেনে পীরিতি বাঢ়াইলুঁ।
যতেক মাধুরী ছিল অখনে গরল হৈল
আপনারে আপনি খাইলুঁ ॥
বন্ধু গেলা মধুপুরে কি মোর পরাণ ঝুরে
কেমনে রহিমু একাকিনী।
জাতিকুল যৌবন দিয়া তে কেনে বাঢ়াইলুঁ নেহা
তখনে এমত যদি জানি ॥
চিত্ত নিবারিতে নারোঁ আকুল হৈয়া মরোঁ
প্রেম আগুনি কত সইমু।
তেজি কুল ভয় লাজ কি মুই করিনু কাজ
এহি দুঃখে যোগিনী হইমু ॥
কি মোর করম ফলে বিরহ আনল জ্বলে
ছাড়ি গেল কাহ্নু প্রাণপতি।
জীবন যৌবন দিয়া তখনে বাঢ়াইলুঁ নেহা
অখনে হইব কোন গতি ॥

মুই যদি এমত জানু   নিদয়া হইবা কানু,
তে কেন বাজিতু প্রেম ফান্দে।
ভকতি স্মৃকৃতি হীন   কহে ভবানন্দ দীন
বিরহে মজিয়া রাধা কাঁদে।" ১৩৯০ পঙ্ক্তি

ইহার পর আরও দুইখানি গান। তাহার পর খানিকটা পয়ার। পরে আবার গান। এই ভাবে কাব্যখানি অগ্রসর হয়। সুতরাং পদের পর পদ সাজাইয়া নিবদ্ধ-কীর্তন রচনা শ্রীচৈতন্যের অব্যবহিত পরেই শুরু হইয়াছিল অনুমান করিতে পারি। নহিলে সপ্তদশ শতকের কাব্যগ্রন্থগুলি সেই শৈলীর দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবে কিরূপে?

কিন্তু পালা-কীর্তন শুধু গাহিয়া গেলেই চলিবে না। ইহার ভিতর চৈতন্যের অবতার-তত্ত্ব, রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমতত্ত্ব প্রভৃতি দার্শনিকতা রহিয়াছে। জনসাধারণের নিকট তাহা সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া দিবার প্রয়োজন। আবার ব্রজবুলি পদ নিশ্চয়ই কোনো যুগের কথ্য বাংলা নহে। সুতরাং বঙ্গবুলিতে তাহারও ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইয়া পড়িল। যতক্ষণ পর্যন্ত কীর্তন গান শিক্ষিত মুষ্টিমেয় ভক্ত-বৈষ্ণবের রুদ্ধদ্বার-কক্ষে আস্বাদনের বস্তু ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু মুষ্টিমেয় মহাজনের দ্বার অতিক্রম করিয়া কীর্তন একটা সার্বজনীন সাহিত্য হিসাবে বাহিরে আসিল। তখন বহিরঙ্গ-সঙ্গে শুধু নাম সঙ্কীর্তন করিলে চলিল না, রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের যে তত্ত্ব শ্রীচৈতন্য অন্তরঙ্গ-সঙ্গে আস্বাদন করিতেন, তাহাই যথাযোগ্য ব্যাখ্যার মধ্য দিয়া সাধারণকে পরিবেশন করিতে হইল। তখন হইতেই কীর্তন গানে আখর ও উপজের আমদানি হইল।

স্বর্গত হরিদাস পালিত মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত ভূপতিনাথের দুর্জয়-মান পালার একখানি সংখ্যা-হীন পুঁথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁলিশালায় রক্ষিত আছে। কীর্তন গানের পদ ভাঙিয়া ভাঙিয়া ব্যাখ্যা করিবার প্রথম প্রচেষ্টার রূপটি এই পালায় দৃষ্ট হয়। খানিকটা উদ্ধার করা যাউক,—

"পদ

তুমি যদি লম্পট কপট লোক সম
পিরিতি করিতে নাহি জান

হাত কোন চুমি আপন কৈছে
বিলায়ব আন ॥

তান

তুমি লম্পট লোঅ সম।
তুমি না জান পীরিতের মর্ম।"

৯। ১ পৃষ্ঠা

তানটি পদটির প্রথম পঙ্‌ক্তিটির ব্যাখ্যা। অবশ্য যদি ইহাকে ব্যাখ্যা না বলিয়া ধুয়া বলি এবং মনে করি যে এই ধুয়া ভাবকে ঘনীভূত করিবার জন্য, তাহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু মাঝে মাঝে তানের মধ্যে এত বেশী কথা পাইতেছি, যাহাতে উহাকে আর ধুয়া বলিতে পারি না। তখন পরিষ্কার বুঝা যায় ইহা ব্যাখ্যার পদ। বহুস্ত্রী-গমনের কৈফিয়ৎ দিয়া কৃষ্ণ একস্থানে বলিতেছেন,—

"স্থাবর জঙ্গম কিট পতঙ্গম আদি
স্থক দেয় সকল সরিরে।
কাগজ-পত্র পরশে যদি নাসই
তায় লাগী নিন্দসি নিরে ॥"

তানের মারফৎ পদটির ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া হইতেছে,—

"নিরে যদি পত্র নাসে।
ওগো রাধে নিন্দিত হয় কি এক দোসে।
সকল জিবের জিবন নিরে।
ওগো রাধে নিন্দা কর কেমনে কর্‌য়্যে ॥"

আর এক রকম ব্যাখ্যার নিদর্শন পাইতেছি শ্রীযুত দুর্গাদাস বিশ্বাস সঙ্কলিত সঙ্কীর্তন ১ম খণ্ডে।

শ্রীরাধিকা বলিতেছেন,—

"এই না কাছে আছে বঁধু ঘুমে অচেতন,
দরশনে বড় শুভ যোগ এখন।
মনের মতন আজ ও-বিধু-বদন
নিরখি জুড়াব জীবন নয়ন।"······ইত্যাদি।

বলিতে বলিতে রাধা ভাবের আবেশে মূর্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। এইখানে গায়ক উপজ সৃষ্টি করিয়া পরিস্থিতিকে বুঝাইয়া দিতেছেন,—

"উপজ

কথা কহিতে কহিতে রাই, আঁখিতে পলক নাই,
পুলকে ঢলিয়া পড়ে গায়।
তাহে ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর দেখিয়ে যামিনী ভোর
মনোচোর মাগিল বিদায়॥
রাধে তোমার আছে গুরুজন আমার আছে গোচারণ,
প্রয়োজন দুদিকে সমান।
প্রাণে না যাইতে চায় যেতে হল ঠেকে দায়,
রাখিতে তোমার কুলমান॥"···ইত্যাদি। ১৯৬ পৃষ্ঠা।

নিবন্ধ কীর্তনে প্রথম প্রথম এইরূপ পদ্যের ব্যাখ্যা পদ্যেই চলিত। তারপর ধীরে ধীরে দুইজনের উক্তি-প্রত্যুক্তি-মূলক পদ বা পদাংশের সংযোগ-স্থাপনের জন্য গায়ক কিছু কিছু গদ্য ব্যবহার করিতে লাগিলেন। প্রয়োজন-স্থলে খানিকটা গল্পও সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। পদসংগ্রহের মধ্যে বা কবির স্বরচিত নিবন্ধ-কীর্তনের পালায় আগে হইতেই ব্যাখ্যামূলক কবিতার পংক্তি কিছু কিছু ঢুকিতেছিল। এবার তাহার সঙ্গে গদ্যও প্রবেশ করিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২১০ সংখ্যক পুঁথির নিমাইসন্ন্যাস পালা হইতে ইহা আলোচনা করিয়া দেখাইতেছি।—

"অথ নিমাইসন্ন্যাষ।
যেজন ভকত হও সোন দিয়া মোন।
যে রূপে করিলা প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ॥
*　　*　　*　　*
আর দিন গঙ্গা শ্নানে গেলা গঙ্গা টটে।
ভারতির সঙ্গে দেখা হইল সেই ঘাটে॥
*　　*　　*　　*
ভারতির সঙ্গে প্রভু কহিলা তত্ত্ব বাণী।
নিকটে থাকিয়া তাহা শুনিল মালিয়ানী
*　　*　　*　　*

একদিন সচিমাতা গ্রিহকর্ম্ম করেন।
হেনকালে মালিয়ানি আসিলা সত্তরে ॥

কথা

তখনে মালিয়ানী কহিতেছেন ও সচিমাতা আমি গঙ্গাতটে শুনিয়াছি গো ঃ তোমার গৌর তোকে কাঙাল করিয়া নিশাভাগে ছাড়িয়া যাবেগ।

ধূ্য়া

তোমারে অনাথ করি ঃ
ছাড়িয়া জাবে গৌরহরী।

কথা

তখন সচি বলে্ আমার গৌরাঙ্গ অনাথ করিয়া ছাড়িয়া জাবে বজ্রতে গো ঃ

ধূ্য়া

গৌর যদি ছাড়ে মোরে ঃ
কিরূপে রহিব ঘরে ॥ ঃ

গৌর মোরে ছাড়িয়া গেলে ঃ একে কালে কাঙ্গালিনী করে জাবে ঃ

কথা ঃ

তখন সচিমাতা রোদন করিতেছেন ঃ আমারে অনাত করিয়া সন্যাসেতে জাবে গো ঃ ওরে নদিয়াবাসি গো ঃ

ধূয়া

নদিয়া ছাড়িয়া নিমাই জাবে ঃ
দিবসে আন্ধার হবে ॥ ঃ
শুনিলাম গৌর ছারিয়া জাবে ঃ
গেলে প্রাণ বাঁচিবে নারে ॥ ঃ
ব্রহ্মসাপ হইয়াছে।
আমি সন্যাসেতে জাব গো। ঃ

কথা ঃ

কান্দিয়া সচিমাতা কহিতেছে। ঃ

তোমার জেষ্ট ভাই ছিল ভিশ্বরূপ নাম।

সেই মরে ছাড়িয়া গেল বিধি হইল বাম ॥ঃ"

এইভাবে পালাটি অগ্রসর হইয়াছে। পালাটির শৈলীর তিনটি বিভাগ,—পদ, কথা ও ধুয়া।

পদ অর্থে মূল সঙ্গীত। পালার ভিতরে পর-পর সঙ্গীতগুলি সাজানো থাকে। কিন্তু কোন্ পদে গল্প বা পরিস্থিতির বর্ণনা রহিয়াছে, কোন্ পদে কাহার উক্তি-প্রত্যুক্তি আসিতেছে তাহা শ্রোতাকে বুঝাইয়া দিবার জন্য সূত্র-হিসাবে যে গদ্য বাক্যের প্রয়োগ কীর্তনীয়া করিতেছেন, তাহা হইল কথা।

ধুয়ার সংযোজন ও ব্যাখ্যার জন্য কথার প্রয়োগও হইতেছে। কথাটুকু বাদ দিয়া শুধু ধুয়ার অংশটুকু পর পর সাজাইলে কি দাঁড়ায় একবার দেখা যাক্।—

প্রসঙ্গ।— একদিন সচিমাতা গ্রিহকর্ম করেন।

হেনকালে মালিয়ানি আসিল সত্তরে ॥

মালিনী।— তোমারে অনাথ করি ঃ

ছাড়িয়া জাবে গৌরহরী ॥

শচী।— গৌর যদি ছাড়ে মোরে ঃ

কিরূপে রহিব ঘরে ॥ ঃ

নদিয়া ছাড়িয়া নিমাই জাবে ঃ

দিবসে আন্ধার হবে ॥ ঃ

(গৌরাঙ্গের প্রতি)—শুনিলাম গৌর ছারিয়া জাবে ঃ

গেলে প্রাণ বাঁচিবে নারে ॥ ঃ

নিমাই।— ব্রহ্মসাপ হইয়াছে

আমি সন্যাসেতে জাব গো ঃ

শচী।— তোমার জেষ্ট ভাই ছিল ভিশ্বরূপ নাম।

সেই মরে ছাড়িয়া গেল বিধি হইল বাম ॥

উপরি-উদ্ধৃত ধুয়াগুলিকে আমি যে ভাবে সাজাইয়াছি তাহাতে দেখা গেল ঃ—একটি ধুয়ায় পরিস্থিতি-বর্ণনা। মালিনী শচীমাতাকে সংবাদ দিলেন, নিমাই সন্ন্যাসে যাইবার মনস্থ করিয়াছেন। তাহার পরের ধুয়া কয়টি শচীদেবী,

মালিনী ও নিমাইয়ের উক্তি-প্রত্যুক্তি। প্রতি ধুয়ার পূর্বে গদ্যাংশ না থাকিলে কি হয়? মনে রাখিতে হইবে কীর্তন-গান প্রধানতঃ মূল গায়েন বা কীর্তনীয়া সম্পাদন করেন। দোহারগণ শুধু ধুয়া টানিয়া যায়। এই ধুয়াগুলি একবার কীর্তনীয়া দিলে তবে দোহারগণ উহার পুনরাবৃত্তি করিবে। কিন্তু একই ব্যক্তি তিনচার জনের উক্তি পর পর গান করিয়া যাইতেছে। তাহাতে কোন্‌টি যে কাহার উক্তি ইহা ধরিতে শ্রোতাদের অসুবিধা হয়। তাই কীর্তনীয়া প্রতিটি ধুয়া গাহিবার পূর্বে উহা কাহার উক্তি বা কোন্ পরিস্থিতির বর্ণনা, গদ্যে তাহা বুঝাইয়া দিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ার বক্তব্যের আভাসটুকুও গদ্যে খানিকটা প্রকাশ করিয়া যাইতেছেন।

তাহা হইলে কীর্তনীয়ার কাজ দাঁড়াইল এইরূপ :—

১. গদ্যে ও পদ্যে পরিবেশ বর্ণনা বা গল্পাংশ সৃষ্টি করা। ২. পদ্যে বা বা গানে যাহা বলিবেন গদ্যে তাহার আভাস দেওয়া। ৩. গদ্যে যাহার আভাস দেওয়া হইল গানে তাহার বিস্তৃতি।

যাত্রায় আমরা এই তিনটি শৈলীও দেখিতেছি। বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, গদ্যে যাহার আভাস দেওয়া হয় তাহাকেই গানে বিস্তৃত করিয়া প্রকাশের যে রীতি যাত্রায় সর্বত্রই দেখিতেছি, কীর্তন ভিন্ন আর কোথাও তাহার উৎপত্তির সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

পরিণত স্তরের কীর্তন-পালায় দেখা গেল, কথার অংশ বাড়িয়া চলিয়াছে। আদিতে যে পদাবলী-গান কীর্তনে প্রধান স্থান অধিকার করিত, তাহা এখন ধীরে ধীরে গৌণ স্থান পাইতে লাগিল। সেই পদাবলীর জন্য ক্ষেত্র-প্রস্তুত করিতে গায়ককে অনেকখানি কথা ও কাহিনীর অবতারণা করিতে হইল। নীরস বর্ণনা এবং নিছক কাহিনী যেখানে, কীর্তনীয়া সেখানে কথা ও কাহিনী দিয়া সারিয়া দিতে লাগিলেন। ভাবের অবতারণা যেখানে করিতে হইবে, রসের উদ্বোধন যেখানে প্রয়োজন, সেইখানে শুধু পদাবলী গীত হইতে লাগিল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একটি নিমাই-সন্ন্যাসের পালা মুদ্রিত করিয়াছেন। এই পালাটির আলোচনা করিলে আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার হইবে। পালাটিতে শ্রীচৈতন্যের গৃহত্যাগ পর্যন্ত কথা ও সংলাপে কাহিনীটি সরল ও মনোজ্ঞ ভাবে চলিয়াছে। রচয়িতা যেন আমাদিগকে গল্প শুনাইতেছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের গৃহত্যাগের পর যে

পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য তিনি পদাবলী গাহিয়া যাইতেছেন। কেননা করুণ রসের উদ্বোধনে এখানে সঙ্গীত ভিন্ন অন্য কিছুর স্থান নাই। পালাটির খানিকটা উদ্ধৃত করা যাউক।

"কথা ঃ—মধ্যাহ্নকালে শচীর দ্বারে ভারতী এসে উপস্থিত হয়ে বল্‌তিছেন,—শচী মা ভিক্ষাং দেহি। শচীমা কেশব ভারতীর গলা শুনে বল্‌তিছেন কি সর্বনাশ, হারে নিমাই অতিথিকে বলগে যা, ঠাকুর আপনি অন্যত্র গমন করুন।

তা শুনে নিমাই কি বল্‌তিছেন? নিমাই বল্‌তিছেন,—একি বল্‌লে মা, গিরস্থর ধর্মই অতিথ সৎকাজ করা। যদি ঘরে কিছু নাও থাকে ভিক্ষে করে এনেও অতিথ সেবা করতি হয়। এসময় কি অতিথ বিমুখ হয়ে ফিরে যাবে?

তখন শচীমাতা বল্‌তিছেন ঃ—হাঁরে নিমাই, গিরস্থর কাজ অতিথ সেবা করা তা আমি জানি। কিন্তু বাপ, বহুদিন হয় এমন সময় একজন অতিথ উপস্থিত হলো, আমি যত্ন করে সেবা করলাম আর সেই দিনই আমার প্রাণাধিক পুত্র বিশ্বরূপকে হারালাম। তাইতি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, আর কোনো দিন অতিথ সেবা করব না।

নিমাই বল্‌তিছেন,—এমন সময় যদি অতিথ ফিরে যায় তাহলি আমার অমঙ্গল হবে।

শচী মা বল্‌লেন—বাবা যদি তোর অমঙ্গলই হয় তবে অতিথকে পাদ্য অর্ঘ্য দে। আর ঠাকুরকে বল তিনি গঙ্গাছ্যান করে আসুন। বাপ্‌, কিন্তু একটা কথা।

নিমাই বল্‌তিছেন, কি কথা মা?

শচী—তুই অতিথির সঙ্গে কোনো কথা কতি পার্‌বিনে।

তা শুনে নিমাই বল্‌তিছেন,—মা আমি সত্য বল্‌ছি, অতিথির সঙ্গে কোনো কথা কব না। এই বলে বলছেন, ঠাকুর আপনি গঙ্গাছ্যান করে আসুন। ভারতী গঙ্গাছ্যানে গেলেন। ভারতী গঙ্গাছ্যান করতিছেন, নিমাই পশ্চাতে দাঁড়ায়ে যোড় হাতে বল্‌তিছেন, গুরুদেব প্রণমামি। তখন ভারতী চক্ষু খুলে দেখ্‌তি পেয়েছেন ঃ—

পদ। অমনি ঢেলে দিল,
কর্ণমূলে ঢেলে দিল,
নিমাই কাঁদিতে লাগিল,

কৃষ্ণ কোথা আছ বলে কাঁদিতে লাগিল।
কোথা প্রাণসখা বলে কাঁদিতে লাগিল।
আজ ভেসে যায়,
নিমার সোনার অঙ্গ ভেসে যায়,
নদের ধূলা ভিজিয়ে আজি প্রেমের বন্যা বয়ে যায়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে সোনার অঙ্গ ভেসে যায়॥

কথা—কেশব ভারতী শচীর ঘরে ভোজন করে নিজগ্রামে গমন কর্‌লেন। পরদিন প্রাতে নদেবাসী ব্রাহ্মণগণ নদীর ঘাটে সন্ধ্যে আহ্নিক করতিছেন, তখন প্রভু আমার প্রেমে উন্মাদ হ'য়ে কি করতি লাগলেন।

পদ ভাবাবেশে গৌরহরি লম্ফ দিয়ে পড়ে।
পদোত্থিত জলে গিয়ে ব্রাহ্মণ অঙ্গে পড়ে॥

কথা—তাঁরা তখন বলাবলি করতি লাগ্‌লেন, হ্যাদে ছোড়াডা কিডা? ওর কি হিতাহিত জ্ঞান নেই? আর একজন বল্‌তিছেন, ও না জগন্নাথ মিশ্রর ছাওয়াল? এ লক্ষ্মীছাড়া নদে ছাড়া না হলে নিস্তার নেই।

পদ আমার কোনোও দোষ নাই,
ব্রাহ্মণী বলে লক্ষ্মীছাড়া আমার কোনোও দোষ নাই,
আজ ত ছাড়তে হবে
আজ ত লক্ষ্মী ছাড়তে হবে,
নৈলে ব্রাহ্মণ-বাক্য লঙ্ঘন হবে,
আজ ত লক্ষ্মী ছাড়তে হবে।

কথা—এদিকে বিষ্ণুপ্রিয়া সখীদের সঙ্গে খেলা কর্‌তিছিলেন, যখন ব্রাহ্মণদের অভিসম্পাত হয়েছে, তখন সহচরীদের ধরে কেঁদে কেঁদে বল্‌তিছেন,—

পদ সখি কেন প্রাণ কেঁদে ওঠে গো,
প্রাণ-কান্তের লাগি প্রাণ কেঁদে ওঠে গো,
দক্ষিণে যেন ভুজঙ্গে দেখি গো,
ভুজঙ্গে (ভুজ অঙ্গ ?) নাচিছে,
কি জানি কি হবে আমার ভুজঙ্গে নাচিছে।
সখি তাতে ভয় করি না,
এসব অমঙ্গলের ভয় করি না,
পতি যদি নিকটে থাকে অমঙ্গলের ভয় করি না।

কথা—পতিপ্রাণা নারীর যদি মহাবিপদ হয়, বহুপ্রকার অমঙ্গল দর্শন করে, এক প্রিয়তম পতি যদি নিকটে থাকে কোনো প্রকার অমঙ্গল কিছু ক্ষতি করতে পারে না।

এদিকে প্রভু আমার গঙ্গাছ্যান করে গ্রেহে গমন করতিছেন, কিন্তু প্রভুর মলিন বদন আর দুনয়নে প্রেমধারা বইতেছে।

পদ আজ প্রভু কাঁদিতেছে,—কাঁদিতেছে,
এই জগৎবাসীকে কাঁদাবে বলে কাঁদিতেছে,
ধারার বিরাম নাই,
ধারায় ধারা ভেসে যায়রে
ধারার ত আর বিরাম নাই।

ওদিকে বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর মলিন বদন দেখে—প্রভুর কান্না দেখে বল্‌তিছেন. —প্রভুর মলিন বদন কেন? প্রভু উত্তর দিলেন—বিষ্ণুপ্রিয়া আমার ভবরোগের বিকারে মাথা ধরেছে।

তখন বিষ্ণুপ্রিয়া বল্‌তিছেন, মাথা ধরেছে সেইজন্য তুমি কাঁদছ? ওষুধ দিলিই ত সেরে যাবে। বদ্য এনে দেখাব কি? প্রভু বল্‌ছেন,—আমার এই মাথাধরা সামান্য বদ্যর কাজ নয়। যেমন রোগ তেমন বদ্য চাই।

পদ শ্রীরূপনগরে পাকা বৈদ্য আছে
যদি আনিতে পার গো,
তবে এ পাকা ব্যাধি সেরে যাবে
পাকা বৈদ্য পেলে পাকা ব্যাধি সেরে যাবে।
যেও ভক্তিপথে শ্রীরূপনগরে, ভক্তিপথে যেও গো,
ধর অনুরাগ-ছুরি
ভক্তিপথের কাঁটা কাটতে, অনুরাগ-ছুরি ধর গো।
সেথা মায়া-নাগিনী বিষম সাপিনী,
ভীষণ মূরতি ধরে গো।
ভক্তি-পথের পথিক পেলে দংশন করে।

বিষ্ণুপ্রিয়া জিজ্ঞাসা করতিছেন,—দংশন করলি কি তার ওষুধ নেই?

পদ আছে গো আছে গো,
বিষহরি কবচ আছে অনাসক্তির শিকড়।
সাপের শক্তি বিনাশ করে অনাসক্তির শিকড়॥

কথা—বিষ্ণুপ্রিয়া বল্‌ছেন তবে আমি কি করে যাব, তুমি যে সব ভয়ের কথা বল্‌ছ, বড়ই সঙ্কট।

* * * *

প্রভু আমার এইরূপ অনেক কৌশলে বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে বিদায় নেলেন। …প্রভু মাতৃ-আজ্ঞা পেয়ে সপ্তবার শচীমার মন্দির প্রদক্ষিণ করে কি করেছেন?

পদ ঐ চলে যায়, ঐ চলে যায়,
অস্তাচলে চলে যায়,
আর ত উদয় হবে না রে,
অস্তাচলে চলে যায়।

২

পদ ঐছন ভাবিয়া মন্দির ত্যাজিয়া
আইলা সুরধুনী তীরে।
দুই কর যুড়ি নমস্কার করি
পরশ করিলা নীরে॥
গঙ্গা পরিহরি নবদ্বীপ ছাড়ি
চলে কাঞ্চননগর পথে।
[লোচন দাস,—শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, ৩য় খণ্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠা]

উপজ ঐ চলে যায়, ঐ চলে যায়,
আমার সোনার গৌর চলে যায়।
কেউ ত দেখতে পেল নারে
সোনার গৌর চলে যায়।

এদিকে শচী মা বিষ্ণুপ্রিয়ার কি দশা হয়েছে।

এথা বিষ্ণুপ্রিয়া চমকি উঠিয়া
পালঙ্কে বুলায় হাত।
প্রভু না দেখিয়ে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে
শিরে হানে করাঘাত॥
[লোচন দাস,—শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, ৩য় খণ্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা]

উপজ ওগো কি হল,
হায় গো আমার কি হল,

আমার প্রাণকান্ত কোথায় গেল
হায় গো আমার কি হল।

পদ এ মোর প্রভুর সোনার নূপুর
গলার সোনার হার।
এসব দেখিয়া মরিব পুড়িয়া
জীতে না পারিব আর॥
[লোচন দাস,—শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, ৩য় খণ্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা]

তখন বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর শ্রীপাদপদ্মের নূপুর দুখানি ধারণ করে বল্‌ছেন,—

পদ কেন বাজিল না,
ওগো নূপুর কেন বাজিল না,
বিষ্ণুপ্রিয়া জাগো বলে নূপুর কেন বাজিল না।

কথা—মনে মনে চিন্তা করিতেছেন যাই দেখিগে প্রভু আমার মার মন্দিরে আছেন। এই বলে শচীমাতার মন্দিরের সন্‌মুখে এসে কেন্দে কেন্দে বল্‌ছেন,—

পদ শচীর মন্দিরে আসি দুয়ারের কাছে বসি
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
[বাসুদেব ঘোষ,—শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, ৩য় খণ্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা]

উপজ। কাঁদিতেছে—
প্রভু কোথা গেল বলে কাঁদিতেছে।

কথা—শচীমা বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা শুনে বলতিছেন, বিষ্ণুপ্রিয়া কি হয়েছে বল মা?

পদ শয়নমন্দিরে ছিল, নিশাভাগে কোথা গেল,
মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া।" ইত্যাদি।
[বাসুদেব ঘোষ,—শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, ৩য় খণ্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা]

শেষের উদ্ধৃত এই কীর্তন পালাটির শৈলী বিশ্লেষণে এই কয়টি বিষয় পাইতেছি :—

১. গদ্য গল্পসৃষ্টি।

২. যাত্রার উক্তি-প্রত্যুক্তি-মূলক সংলাপের পূর্ব-রূপ পাত্র-পাত্রীর গদ্য কথাবার্তায়।

৩. ভব-রোগের ভব-ব্যাধি দূর করার জন্য শ্রীরূপনগরের পাকা-বৈদ্য আনিতে যাওয়া এবং মায়ামোহ ত্যাগ করিয়া ভক্তিপথে গমন করা প্রভৃতি দার্শনিক আলোচনা।

৪. আগে যেখানে গোটা পদ গাহিতে গিয়া পদমধ্যস্থ ভিন্ন ভিন্ন শ্লোককে পদ্য-উপজের দ্বারা বিচ্ছিন্ন করা হইত সেখানে উপজের অতিরিক্ত গদ্য কথাও প্রবেশ করিল। আবার হয়ত এমন হইত যে পদে একই শ্লোকের প্রথম চরণে বর্ণনা এবং দ্বিতীয় চরণে উক্তি থাকিত। গদ্য কথা এবং উপজ দিয়া শ্লোকের ঐ বর্ণনা-অংশ এবং উক্তি-অংশ পৃথক করা হইল। তাহার ফলে পরিণামে উক্তি-অংশকে বর্ণনা অংশ নিরপেক্ষভাবে শুধু সংলাপ হিসাবে ব্যবহার করিবার স্থবিধা হইল। স্থতরাং কীর্তন ভাঙিয়া যাত্রা রচনার পথ ধীরে ধীরে স্থগম হইতে লাগিল।

কীর্তন ও যাত্রার মধ্যবর্তী স্তর হইল ঢপকীর্তন। ঢপের মধ্যে আমরা দেখিব, যাত্রার সমস্ত লক্ষণই ফুটিয়া উঠিয়াছে। উহাকে একক অভিনয় না রাখিয়া ভাঙিয়া বহু পাত্র-পাত্রীর দ্বারা অভিনয় করাইলেই যাত্রা হয়। মধু কানের ঢপকীর্তন হইতে খানিকটা উদ্ধার করিয়া আলোচনা করিতেছি।—

"কলঙ্ক ভঞ্জন

পালা আরম্ভ।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রেমে গৌরবিণী। তাঁহাকে গুরুজনগণ শ্যাম-কলঙ্কিনী বলে গঞ্জনা দেয়, তাইতে একদা তিনি অভিসারে গমন না করে অভিমান-বশতঃ মনে মনে বলিতেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ যতক্ষণ আমার এ কলঙ্ক না ঘুচাবেন, ততক্ষণ আমি শ্যাম-দরশনে যাব না। তুমি,—

ধুয়া

বাঞ্ছাকল্পতরু নাম ধর।
মনের সাধ পুরাতে পার॥

কথা—তখন শ্রীরাধিকা এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া নির্জন কক্ষে বস্‌লেন।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ স্থবলকে সঙ্গে লয়ে রাধাকুণ্ডের তীরে গিয়া দেখেন, তখনও শ্রীরাধিকার আগমন হয় নাই, অভিসারের সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে।

তখন সুবলকে সখেদে শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন, সুবল, রাধা বিনা আমার প্রাণ বাঁচে না। এই বলে শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বললেন,—

ধূয়া

এইস্থানে বস তুমি।
বৃন্দার কুঞ্জে যাই আমি॥

কথা—তখন কাঙ্গালের ন্যায় বৃন্দের মদনকুঞ্জে উপস্থিত হয়ে—

শ্রীকৃষ্ণ। বৃন্দে অদ্য অভিসারের সময় বয়ে গেছে। আমার প্রাণ-বল্লভা রাধিকা এখনও এলেন না কেন?

নয়নের তারা আমার রাধিকা সুন্দরী
একতিল না হেরিলে রহিতে না পারি॥

অতএব তুমি একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি কি উত্তর দেন।

বৃন্দা। যাও যাও আমি নিত্য-নিত্য গিয়ে ওসব কথার জন্য সাধ্য-সাধনা করতে পারব না।

ধূয়া— তোমরা মান করবে ছলনায়।
আমার সাধিতে প্রাণ যে যায়॥

শ্রীকৃষ্ণ। বৃন্দে তুমি আমার এই দুঃখের সময় এমন কথা বললে? অতএব তুমি এরূপ বলো না।

সুর। তুমি বিনা কে মোর আছে।
বল তোমা বই যাব কার কাছে॥

বৃন্দা। রাধাকে আনতে গেলে আমাকে কি দিবেন?

শ্রীকৃষ্ণ। আমার প্রাণ ভিন্ন আর কিছুই নাই, অতএব তোমাকে সেই প্রাণ দিলাম।

বৃন্দা। ঠাকুর আপনার একটি বই ত প্রাণ নাই, ঐ প্রাণটি আপনি কাকে দিবেন? যখন ক্ষীর সর নবনীত খাও, তখন ঐ প্রাণ যশোদাকে দেও, শ্রীদাম-সুবল দাদাকে লয়ে যখন গোচারণে যাও তখন তাদিকে দেও। যেদিন চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গমন কর সেদিন চন্দ্রাবলীকে দেও। যে দিন শ্রীরাধার কুঞ্জে থাক সেদিন ত আর কারওই নয়। আজ তুমি বড় দায় ঠেকে প্রাণটা আমাকে দিতেছ।

সুর— তুমি একটি প্রাণ দাও যারে তারে।
সেই লাগি রাই মান যে করে॥
অতএব ঠাকুর আমি তোমার ও-প্রাণ চাই না।

গীত

রাগিণী—পরজ। তাল ঢিমা—কাওয়ালী।

প্রাণ দিতে চাও আমায় (প্যারীত বেঁধেছে হৃদয়)
তবে যে দাও যারে তারে কথায় আর কথায়॥
প্রাণদান গ্রহণ করি পতিত হয়েছেন প্যারী,
সে কেন আজ দিবে ফিরি হরি হে তোমায়॥
প্রাণ হতে চরণ গুণকারী,
প্রাণ দিয়ে প্রাণে মার শুনেছি হরি,
পায়ে পাষাণ মানব হল,
প্রায় নিয়ে পিতার প্রাণ গেল,
সীতা বনবাসী হল কাষ্ঠের তরী স্বর্ণ পায়।
এদানি রাই বিনোদিনী রাজনন্দিনী,
প্রাণদান গ্রহণ করে হয় কাঙালিনী,
চরণ দেও—চরণে ধরি,
অন্তে মম প্রাণ হরি রেখ রাঙ্গা পায়।

কথা—

বৃন্দা। আমি আপনার প্রাণ চাইনে, যদি দেন, তবে আমাকে ঐ মোহন বংশীটি দিন।

শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, বংশী না দিলে যাইবে না, প্রকাশ্যে বলিলেন, বৃন্দে, এই বংশী লও।

বৃন্দা। (অঞ্চল পাতিয়া) দেন।

শ্রীকৃষ্ণ। না—দেওয়া হ'ল না।

বৃন্দা। দিতে চেয়ে আবার দিচ্ছেন না কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। বাঁশী যদি তোমায় দিব
রাধা নামটি কিসে লব॥
আর এই বাঁশীর—

ধুয়া— নাম রেখেছি কেলে সোনা।
বাঁশী রাধা-মন্ত্রে উপাসনা॥

বৃন্দা। ঠাকুর তোমার প্রাণও চাই না, ও বাঁশীও চাই না।

সুর— আমি আর কিছু নাহি চাই।
যেন শ্রীচরণে স্থান পাই॥

ঠাকুর, আপনি এইস্থানে থাকুন, আমি রাধিকার স্থানে গমন করিলাম। এই বলে বৃন্দা রাধিকার স্থানে উপস্থিত হইলেন।

হেথা মানভরে বসে আছেন প্রেমময়ী রাই।
অন্তরে অন্তরে রূপ সতত ধেয়াই॥

সে কেমন রূপ। নীলকমল, নবকিশোর, নটবর বেণুকর ইত্যাদি।

এমন সময় বৃন্দা উপস্থিত হলেন, বৃন্দাকে অবলোকন করে,—

শ্রীমতী। কস্মাৎ বৃন্দে প্রিয় সখি—কোথা হতে এলে?

বৃন্দা। হরেঃ পাদপদ্মাৎ—হরির পাদপদ্মের নিকট হইতে।

শ্রীমতী। কুত্র সঃ—কোথায় তিনি?

বৃন্দা। কুণ্ডারণ্যে—রাধাকুঞ্জের তীরে।

শ্রীমতী। কিমসৌ কুরুতে—কি করছেন তিনি?

বৃন্দা। নৃত্য-শিক্ষাং—নৃত্য শিক্ষা করছেন।

শ্রীমতী। গুরুঃ কঃ—তাঁহার গুরু কে?

বৃন্দা। ত্বং ত্বং মূর্তি প্রতিতরুং লতাং দিগ্বিদিক্ষু প্রস্ফুরন্তীম্। কুণ্ডপ্রান্তে বিলুণ্ঠতি বিহ্বলঃসন্ তবার্থে॥—তোমার রূপের একটি দিগ্বিদিক প্রসারিত লতাকে দর্শন করে শ্যাম তোমার জন্য বিহ্বল হয়ে রাধাকুঞ্জের তীরে বিলুণ্ঠিত হইতেছেন।

সুর— তোমার লাগি তোমার হরি।
ধুলায় যাচ্ছেন গড়াগড়ি॥

ধুয়া— আর সদা রা—রা—রা—রা বলে॥
ধা বলতে ভাসে নয়ন জলে॥

শ্রীমতী। বৃন্দে তুমি বড় কঠিন।

বৃন্দা। আমি কঠিন কিসে?

তখন শ্রীরাধিকা বলছেন, তোমায় কঠিন বলি কেন?

তান— ও তার এমন দশা দেখেছিলে।
তবে কার কাছে তায় রেখে এলে ॥

পরে রাধিকা চিন্তা করিয়া দেখেন, বৃন্দা যা বলছে, সে সর্ব্বৈব মিথ্যা। জেনে,—

শ্রীমতী। বৃন্দে, মিথ্যা বললে কেনে?

বৃন্দা। আমি মিথ্যা বলেছি তা কি আপনি জেনেছেন? তবে শুনুন ;—

পয়ার— শুন শুন ঠাকুরাণী, নিবেদন করি।
তোমায় না দেখে আকুল হয়েছেন শ্রীহরি ॥
বেঁধেছ তাঁহার প্রাণ প্রেমডুরি দিয়া।
সে বন্ধন কি-লাগিয়া ফেলহ ছিঁড়িয়া ॥
কি লাগিয়া কৃষ্ণের নিকটে নাহি যাও।
সত্য-নাহি কহ যদি মোর মাথা খাও ॥

শ্রীমতী— শুন বৃন্দে কই তবে ইহার কারণ।
যে কারণে নাহি যাই কৃষ্ণ-দরশন ॥
ঘাটে বাটে তুচ্ছ লোকে তুচ্ছ কথা কয়।
রাজার নন্দিনী তাই সদাই করি ভয় ॥
করিলাম প্রেম তারে রসিক দেখিয়া।
হইল কলঙ্ক মোর জগৎ ভরিয়া ॥
অতএব না যাব আর কৃষ্ণের নিকটে।
কুলের কলঙ্ক কথা নাহি যেন রটে ॥

বৃন্দে, আমি আর লোকের গঞ্জনা সইতে পারিনে। এই ব্রজমণ্ডলে কৃষ্ণ-প্রেমের প্রেমী নয় কে?

গীত

রাগিণী—সুর মল্লার। তাল,—তেতালা।

দেখ শ্যামের প্রেমে
কেবা না মজেছে সখি, এই গোকুলে।
সবার হয় আনন্দ হেরি ঐ গোবিন্দ
কলঙ্ক হয় কেবল আমার কপালে ॥
দেখ এই বিশ্বমণ্ডলে যে না হরি বলে,
যে না বলে সে-জন বিহ্বল।

নারদ আদি ঋষি যে পদ আশ্বাসী,
দিবা নিশি তারা বলে হরিবোল।
আমি যদি বলি হরি, ননদী কয় কিশোরী,
অমনি সরি কি না সরি
ভয়ে মরি আজ না জানি কি বলে॥
দেখ গয়াসুর শিরে যে চরণ ধরে,
বিশেষ পিণ্ড দানে ভবের তরণী,
যে পাদপদ্ম হতে গঙ্গা অবতীর্ণ,
অবনীতে যিনি ত্রিলোক-তারিণী,—
আমার ভাগ্যে এই হল,
কুল বাড়াতে দুকুল গেল,
সূদন বলে আর কি বল
কপালের কপালে এমনি ফলে॥”······ইত্যাদি।

উদ্ধৃতি অবলম্বনে পালাটির শৈলী বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাইব,—

১. কীর্তনের মতো ঢপকীর্তনে কথা, ধুয়া, তান বা সুর ও পদ সবই রহিয়াছে। শুধু প্রয়োগে কিছু কিছু ইতর-বিশেষ হইতেছে।

২. কথার ব্যবহার মুখ্যতঃ গল্প রচনার জন্য। পাত্র-পাত্রীকে উপস্থাপিত করিবার ভূমিকা প্রস্তুত হইলে কথার কাজ ফুরাইয়া গেল। যাত্রা-পালায়ও আমরা দেখিয়াছি পাত্র-পাত্রীকে উপস্থাপিত করিবার বা গল্পাংশের সূত্র ধরাইবার জন্য কয়েক পংক্তি পয়ার বা ত্রিপদীর ব্যবহার নাট্যকার করিতেছেন। উহা অবশ্যই কীর্তনের এই কথাংশেরই বিবর্তিত রূপ।

৩. আগে কীর্তনে পাত্র-পাত্রীর সংলাপ খুব অল্প এবং সংক্ষিপ্ত ছিল। উহা গানের সূত্র ধরাইবার জন্য মাত্র প্রযুক্ত হইত। কিন্তু ঢপে সংলাপের আধিক্য হইল। সংলাপের তুলনায় গান অনেক কমিয়া গেল। ফলে ঢপে আসিয়া কীর্তন নাটক হইয়া উঠিল। সুতরাং সংলাপ ও সঙ্গীতের সমবায়ে যে যাত্রার উৎপত্তি হইল ঢপ-কীর্তন তাহার পূর্বরূপ। ঢপের প্রধান রূপদাতা হইলেন একজন,—কীর্তনীয়া। বহুজনের অভিনয় তিনি একা করিতেছেন। ঢপে উল্লিখিত পাত্র-পাত্রীর উক্তি-প্রত্যুক্তি ও সঙ্গীতাদি উহাদের নিজেদের মুখে তুলিয়া দিয়া অভিনয় করাইলে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা হইয়া দাঁড়ায়।

৪. ঢপে দেখিতেছি সংলাপ যেখানে খুব ছোট, সেখানে তাহার সঙ্গে দুই ছত্রের একখানা ধুয়া যোগ করা হইতেছে। হয় সংলাপ ও ধুয়ার বক্তব্য এক, না-হয় ধুয়াটি সংলাপের বিস্তৃতি। আবার যেখানে গভীর বা গম্ভীর কিছু বলিতে হইতেছে, সেখানে সংলাপের পর শুধু ধুয়া দিলে চলিতেছে না, সঙ্গে সঙ্গে তদ্‌ভাব-বোধক বা পূর্ব-প্রসঙ্গের বিস্তারক সঙ্গীতও সংযোজিত হইতেছে। যাত্রারও ইহাই বৈশিষ্ট্য। সুতরাং এই বৈশিষ্ট্যও যাত্রা ঢপ হইতে গ্রহণ করিয়াছে।

৫. কীর্তনগানে দার্শনিক-প্রসঙ্গের অবতারণা ও সঙ্গীত এবং সংলাপে তাহার ব্যাখা করিবার রীতি আমরা দেখিয়াছি। ঢপ তাহা গ্রহণ করিয়া আরো বিস্তৃত করিয়াছে। ঢপ হইতে যাত্রা তাহা লইয়াছে। সুতরাং ঢপেরই বিকশিত রূপ যে যাত্রা সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না।

৬. পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণির নায়িকা-ভেদ বা প্রেম-পর্যায়-ভেদ স্বীকার করিয়া পদ-সংগ্রহ হইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে বিদগ্ধ-মাধব, ললিতমাধব, জগন্নাথবল্লভ নাটক, গীতগোবিন্দ প্রভৃতির অনুবাদও শুরু হইয়াছিল। ঐ অনুবাদের বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, দার্শনিকতাপূর্ণ শ্লোক বা ভাব-বিধুর উক্তি-প্রত্যুক্তির অনুবাদ বৈষ্ণব কবিগণ করিতেছিলেন পদাবলীর ভাষায়। সেগুলি আবার যথাভাব-প্রসঙ্গপর্যায়ে পদসংগ্রহ গ্রন্থে সঙ্কলিত হইতেছিল। কীর্তনগানেও সেগুলি আসিয়া গিয়াছিল। সুতরাং কীর্তন ও ঢপকীর্তন অনুবাদ সাহিত্যের মধ্য দিয়া বিদগ্ধমাধবাদির ভাব, দার্শনিকতা, বিষয়বস্তু সকলই গ্রহণ করিয়াছিল, শুধু নাটকের আকৃতি-ধর্মটি গ্রহণ করে নাই। ঢপের মধ্যে দেখিলাম, উক্ত নাটকাদির অংশ উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করা হইতেছে। অতএব কীর্তনের দার্শনিকতা-ব্যাখ্যা-প্রবণতা ক্রমে কথকতার পর্যায়ে আসিয়া গেল। এই কথকতার ভঙ্গী স্বাভাবিকভাবে যাত্রা ঢপ-কীর্তন হইতে গ্রহণ করিল।

৭. আদিযুগের কীর্তনে পরস্পরের উক্তি-প্রত্যুক্তি হিসাবে আমরা শুধু গান পাইয়াছি। সেই গানের আদি বা অন্তে কোনো কথার ভূমিকা ছিল না। ঢপকীর্তনে সেই প্রাচীন রীতিও রক্ষিত হইতেছিল। তাহাই আবার যাত্রায় গৃহীত হইল। সুতরাং যাত্রা ঢপেরই ক্রমবিকশিত রূপ।

৮. কীর্তন হইতে ঢপের প্রধান পার্থক্য এই যে, কীর্তনে মহাজন-পদ গাহিবার সঙ্গে সঙ্গে কীর্তনীয়াগণ স্বরচিত পদে উপজ সৃষ্টি করিতেন।

ঢপ-কীর্তনে গায়ক মহাজনপদের স্থানে স্বরচিত পদ সংযোজন করিতে লাগিলেন। যাত্রাওয়ালাও ঠিক তেমনি স্বাধীনভাবে পদ রচনা করেন।

সুতরাং উপসংহারে আমরা বলিতে পারি, কীর্তন ভাঙ্গিয়া ঢপকীর্তন ও ঢপকীর্তন ভাঙ্গিয়া যাত্রার উৎপত্তি হইয়াছিল। এই ক্রমবিকশিত রূপের উদাহরণ গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা। গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রারই ক্রমবিকশিত রূপ ব্রজমোহনের যাত্রা। কীর্তনের অব্যবহিত বিবর্তিত রূপটিই আমরা কৃষ্ণকমলের রচনায় দেখিতে পাই।

এই প্রসঙ্গে আর দুইটি অতি প্রচলিত মতের আলোচনা না করিলে যাত্রার উৎপত্তি-বিষয়ক গবেষণা অপূর্ণ থাকিবে। অনেকে মনে করেন পাঁচালী হইতে যাত্রার উৎপত্তি হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে সাঙ্গোপাঙ্গ কথকতাই যাত্রা। এই দুইটি মতের আলোচনা প্রয়োজন।

যে পাঁচালী হইতে যাত্রার উৎপত্তি সাধারণতঃ কল্পনা করা হয়, তাহার সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক কাঠামো গঠিত হয় যাত্রার উৎপত্তির অনেক পরে। পাঁচালী বলিতে আমরা সাধারণতঃ দাশরথি রায়, মনোমোহন বসু, ঠাকুরদাস প্রভৃতির রচনা বুঝি। যাত্রা-সাহিত্যের যখন পতন হইয়াছে তখন পাঁচালী-সাহিত্যের এই শৈলীর বিশেষ অনুসরণ চলিতেছিল। সুতরাং ইতিহাসের দিক দিয়া বিচার করিলে পাঁচালী হইতে যাত্রার উৎপত্তি হইতে পারে না।

তারপর পাঁচালীর রূপতত্ত্ব আলোচনা করিলেও দেখা যাইবে পাঁচালী হইতে যাত্রার উৎপত্তি হওয়া সম্ভব নহে। প্রসিদ্ধ পাঁচালীকার দাশরথি রায়ের রচনা হইতে খানিকটা অংশ উদ্ধৃত করিয়া এ-বিষয়ে আলোচনা করিতেছি।—

সত্যভামা ব্রতপালা ঃ

দর্প ঘটে যার রাজা কি প্রজার,
নর কিংবা সুরাসুর।
গোলোক-বিহারী, হরি দর্পহারী,
সে দর্প করেন চূর॥
করেন নারীগণ সহ দ্বারকাতে উৎসাহ
যদুবংশ-চূড়ামণি।
ভাবে সত্যভামা, কে আমার সমা,
শ্যামাঙ্গের সোহাগিনী॥

অন্যান্য নারীগণে, গোবিন্দ কি মান্য গণে,
  আমার বাঞ্ছা মাধবে।
অমনি যায় চলি আমি যদি বলি,
  জলধর জলে ডোবে॥
কৃষ্ণ মোর ঋণী, এমন আদরিণী,
  তারিণী করেছেন কারে।
অন্য নারীর প্রতি, নাই কৃষ্ণের প্রীতি,
  যান ধর্ম-রক্ষার তরে॥
বাঞ্ছা মোর প্রাণে, সদা মোর পানে
  বাঁকা নয়নের তারা।
আমি করিলে মান কেঁদে ম্রিয়মাণ,
  ভয়ে ভগবান সারা॥

*   *   *

এ তিন জনের গরব মনের,
  হরিতে হরি হরষে।
গরুড়ে কহেন, আরে তোমা হেন,
  কেবা আছে মম পাশে॥
কর আয়োজন মম প্রয়োজন,
  নীলপদ্ম দেহ আনি।
প্রভু যজ্ঞেশ্বর আজ্ঞা খগেশ্বর,
  পেয়ে কহে ভাগ্য মানি॥
এ কোন জঘন্য তুমি জগন্মান্য,
  দাসানুদাসে স্মরণ।
এ দাসের প্রতি, দেহ অনুমতি,
  এক্ষণে করি সাধন॥
করে বিনতা-নন্দন, বিনয়ে যাজন,
  বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত পদে।
প্রেম পূর্ণ কায়, কৃষ্ণ-গুণ গায়
  গমন করে আমোদে॥

গান

রাগিণী—টোরী : তাল—কাওয়ালী

ভাব শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে,
নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবে ভবে।
ভাবিলে ভাবনা যত ভ্রূভঙ্গে হরেরে,
তরল তরঙ্গে ভ্রূ-ভঙ্গে যেবা ভাবে॥
মন কিমর্থে এমর্ত্যে কি তত্ত্বে এলি,
সদা কুকীর্তি দুর্বৃত্তি করিলি,
কি হবে রে উচিত, এ নহে দাশরথিরে ডুবাবে,
কর প্রায়শ্চিত্ত, রে চিত্ত সে নিত্যপদ ভেবে॥

ছড়া

পেয়ে কৃষ্ণের অনুমতি, কৃষ্ণ-পদে রেখে মতি,
চলে পক্ষী নীলপদ্মারণ্য।
কি ছার পবন-গতি যায় হেন দ্রুতগতি,
অগতির গতি-আজ্ঞা জন্য॥
ঘন ঘন শব্দ ডাকে দিবাকর কর ঢাকে,
দুই পাখা ঘেরিল গগনে
দম্ভে ধরা কম্পে ঘন, বাসুকির অসুখী মন,
অনন্তের অনন্ত ভয় মনে॥
নানা বন তেয়াগিয়ে, খগেন্দ্র উদয় গিয়ে,
কদলী-কানন-মধ্য-ভাগে।
যথা বীর হনূমন্ত, পরম জ্ঞানে জ্ঞানবন্ত,
রাম-মন্ত্র জপিছেন যোগে॥
জিনিয়া রাবণ রাজ্য উদ্ধারিয়া রাম-কার্য,
স্ব-কার্য সাধেন বসি বনে।
হৃদে চিন্তে নারায়ণ, পরম বস্তু নারায়ণ,
বাহ্য-জ্ঞান-বর্জিত সাধনে॥

পথমধ্যে আছে বসি, গরুড় নিকটে আসি,
পথ না পেয়ে রাগেতে জল্‌ছে।
কোন্ বস্ত হনুমান, না পেয়ে তার অনুমান,
অপমান-বাক্য গুলো বল্‌ছে॥
হেদেরে বনের পশু ছাড়বি রাস্তা কি কাল কি পরশু,
দণ্ড তুই ডাক্‌ছি তোর নিকটে।
জগতে দেখিনে এমন কার এযে বুদ্ধি চমৎকার,
প্রতিকার করিতে হইল বটে॥
কোন্ বানরে দিলে তাড়া, হয়েছিস রে পাল-ছাড়া,
হতবুদ্ধি হয়েছিস রে হনূ।
পথ জুড়েছিস লেঙ্গুর পেতে আ মলো কি উৎপেতে,
পাইনে যেতে মাথায় উঠল ভানু॥

* * *

গান

পদ্ম-আঁখি আজ্ঞা দিন পদ্ম বনে আমি যাব।
আনিয়ে নীলপদ্ম সে নীল-পদ্মের চরণে দিব॥
হয় না হরির কার্য সিদ্ধি, কিসে তোর এত বুদ্ধি,
মলোরে বানরে বুঝি, হরির দোহাই তুচ্ছ তব॥

ছড়া

পবন-পুত্র যোগাসনে পক্ষী-বাক্য নাহি শুনে,
পক্ষী ক্রোধ-হুতাশনে কহে রুক্ষ ভাষে।
আরে খেলে কচুপোড়া ভাল সময় ভাল পোড়া,
মনোদুঃখে মুখপোড়া কি আনন্দে ভাসে॥
আমি কৃষ্ণের অনুচর যারে চিন্তে চরাচর,
গণ্ডমূর্খ বনচর বল্‌লে তা বুঝবে না।
ডালে বসি কাল কাটে, মুক্তা দিলে দাঁতে কাটে,
জল দিলে পর শুষ্ক কাঠে ফল কভু ফলে না॥

উপরি-উদ্ধৃত অংশে দেখা গেল একান্তভাবে পর-পর ছড়া ও গান সাজাইয়া পালাটি রচিত হইতেছে। ছড়াগুলি সাধারণতঃ ত্রিপদী। কখনো চৌপদী, অর্থাৎ দীর্ঘত্রিপদীরই প্রকার-বিশেষ। ইহাই সাধারণ শৈলী। তবে মাঝে-মাঝে অতি অল্পস্থলে পয়ারের ব্যবহারও আছে। ছড়ার পর একটি গান এবং তাহার পর ছড়া ইহাই পাঁচালীর সাধারণ নিয়ম বটে ; তবে কখনো কখনো ছড়ার পর একাধিক গানও দেখা যায়। কখন কি করিয়া এই শৈলীর উদ্ভব হইল ইহাই বর্তমানে আলোচ্য।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে পাঁচালী শব্দটি অতি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতিকবিতাগুলি বাদ দিলে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের যে বাকী অংশটুকু থাকে তাহার সাধারণ নাম পাঁচালী। মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ-সাহিত্য প্রভৃতি নাম বিষয়-বস্তু অনুসারে দেওয়া। প্রাক্-চৈতন্য যুগের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন কাব্যখানিকে এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না। কেননা কাব্যখানি আদ্যন্ত সঙ্গীত। ঐ যুগের মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধি-যুগের কবি ভারতচন্দ্রের কাব্য পর্যন্ত ঐ একই শৈলীর অনুবর্তন চলিয়াছে।

সংস্কৃতে পুরাণ সৃষ্টির যে প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল, তাহারই সমান্তরাল প্রয়োজনে রচিত হইয়াছিল বাংলা পাঁচালী সাহিত্য। সংস্কৃতে একদিকে দেবতা ও মানবকে অবলম্বন করিয়া মনোরম কাহিনী রচনা করিতে হইবে, অন্যদিকে সেই কাহিনীর মধ্য দিয়া করিতে হইবে মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখের হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা। দিতে হইবে মানুষকে নীতির বাণী ও চিন্তার খোরাক। সর্বোপরি গল্পটিকে মুখ্য রাখার জন্য তাহার উপযোগী ছন্দ কাব্যের মধ্যে প্রয়োগ করিতে হইবে। সমস্ত কাব্যে সেই ছন্দটি হইবে প্রধান। সংস্কৃত পুরাণ ও মহাকাব্যে এই উদ্দেশ্যে একটা আটপৌরে ছন্দকে সদা প্রবহমান দেখিতে পাই। ইহার নাম অনুষ্টুপ্! আবার যেখানে গুরুগম্ভীর ভাব বা পরিস্থিতির বর্ণনা, বিশেষ করিয়া শোকাদির, সেখানে ত্রিষ্টুভাদির আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। সুপ্রাচীন মহাকাব্য বাল্মীকির রামায়ণেই ইহার রাশি রাশি উদাহরণ আছে। সংস্কৃত মহাকাব্য-শৈলীর এই আদর্শ বাংলা পাঁচালী-কাব্যে গ্রহণ করা হইয়াছিল। বাংলা পাঁচালীর প্রধান বাহন পয়ার। কেবল মাত্র যেখানে গুরুগম্ভীর পরিস্থিতির বর্ণনা ও ভাবের উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তি রহিয়াছে, সেইখানেই আগমন হইতেছে ত্রিপদীর। কিন্তু পরিমাণে সে ত্রিপদী খুব কম। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল হইতে কিছু কিছু উদাহরণ দিতেছি।—

সমুদ্র মন্থনে যে বিষ উঠিয়াছিল, তাহা পান করিয়া মহাদেব অচেতন হইয়া পড়িতেছেন। সেই কাহিনীর বর্ণনা হইতেছে পয়ারে,—

"কাজলের বর্ণ হইল দারুণ গরল।
তেজ সহিতে নারে দেবতা সকল॥
তুমি দেবের দেব কি বলিব আর।
সৃষ্টি রক্ষা করিতে আজি তোমার অধিকার॥
অমৃত মথিতে গোঁসাই তুমি কর মন।
গরলের জ্বালায় পোড়ে সমস্ত ভুবন॥
প্রসন্ন পুরসর যতেক বলিল পুরন্দর।
প্রণাম করিয়া বলে শিবের গোচর॥
সহজে দয়াল শিব না করিল আন।
গণ্ডূষ করিয়া কালকূট বিষ করে পান॥
গণ্ডূষ করিয়া বিষ খাইল যোগবলে।
উর্ধ্বগত হইল বিষ জ্বলে জঠরে॥
বিষপানে মহেশ্বর হইল অচেতন।
দেখিয়া দেবতাগণের স্থির নহে মন॥······

বিষ-পানে মহাদেব অচেতন হইয়া পড়িলে পার্বতী ক্রন্দন করিতেছেন। এখানে আর পয়ারে চলিল না। এইরূপ সুখ-দুঃখ হর্ষ-বিষাদের বর্ণনার বেলায় ত্রিপদী বা লাচাড়ীর প্রয়োজন হইয়া পড়িত।—

"কান্দে গৌরী শিব মুখ চাহিয়া। (ধুয়া)
তুমি প্রভু অচেতন, অনাথ হইল দেবগণ,
কি করিলা কাল বিষ খাইয়া।
কেন আনিলা বিপদ, কেনবা মথিলা নদ,
ঘরে যাব কাহারে লইয়া॥
তুমি প্রভু মৃত্যুঞ্জয় তোমার হইল ক্ষয়
এই দুঃখ সহিব কেমনে।
হেন সাধ্য রাখে কে তোমারে লঙ্ঘিবে যে
আমা ছাড়ি গেলা কোন্ স্থানে॥
এই কি বিধির গতি ইন্দ্র আদি প্রজাপতি,
যক্ষ রক্ষ যাহার সৃজন।

সেই প্রভু গরলেতে প্রাণ দিলা আচম্বিতে,
কেন আর রাখিব জীবন ॥" …ইত্যাদি।

এই চিরাচরিত পাঁচালী রীতি তো ভারতচন্দ্র পর্যন্ত একভাবেই চলিয়া আসিয়াছে। ইহার মধ্য হইতে কোন্ বিশেষ শ্রেণীর কাব্য অবলম্বনে নূতন পাঁচালীর শৈলী গড়িয়া উঠিল? পয়ারের বর্ণনার স্থান ত্রিপদী কখন অধিকার করিল? ত্রিপদীর স্থানে সঙ্গীতের সংযোজনাই বা কবে কিভাবে হইল?

সপ্তদশ শতক হইতে কৃষ্ণায়ণ কাব্যগুলির শৈলীর মধ্যে এক বিশেষ ধরনের পরিবর্তন আসিতেছিল, তাহার উল্লেখ করিয়াছি। উহারই বিস্তারিত আলোচনা করিলে আধুনিক পাঁচালীর নষ্ট কোষ্ঠীর উদ্ধার করা যাইবে।

সপ্তদশ শতকে রচিত ভবানন্দের হরিবংশ এবং মাধবাচার্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল হইতে পয়ার ও সঙ্গীতের মিশ্রণে কাব্য-সৃষ্টির উদাহরণ দিয়াছি। অবশ্য এ কথা সত্য যে, আধুনিক পাঁচালীতে যেমন সাধারণতঃ খানিকটা অংশ ছড়ার পর একখানা গান এবং গানের পর একখানা ছড়ার পারম্পরিক বিন্যাসে কাব্য রূপায়িত হয়, পাচালীর এই সুশৃঙ্খল রীতির সন্ধান এই কাব্যগুলির মধ্যে মিলিবে না। তবুও ইহা হইতেই যে পরবর্তী কালে পাচালীর শৈলী গড়িয়া উঠিল তাহা অনুমান করিতে অসুবিধা হয় না। কারণ এই কাব্যগুলির মধ্যেও দেখা যাইবে পয়ার ও গানের বিশৃঙ্খল বিন্যাসের মধ্যেও পয়ার অংশের পর একখানা গান এবং তাহার পর আবার পয়ার ও গান সাজাইবার চেষ্টা বিশেষ-ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধরিয়া লওয়া ভাল যে, পয়ার ও গানের পারম্পরিক বা পর্যায়ক্রমিক বিন্যাসের দিকেই এই শৈলী অগ্রসর হইতেছিল। ভবানন্দের হরিবংশ হইতে আরো খানিকটা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।—

রাগ—নট্ট

সজনী সই
কাহ্নুরে জানিলু মুই ভালে।
সহজে শরৎ শেষ হেমন্ত পরিবেশ
মোরে ছাড়ি গেলা হেন কালে ॥
শুনহে পরাণ-সই তোমারে মরম কই
মোর চিত্ত দহে অনুক্ষণ।

দিন যেন অর্কহীনে নিশি যেন চন্দ্র বিনে
তেন হইল রাধার জীবন ॥
মধুপুরে গেল বন্ধু ভাসাইয়া বিবেক সিন্ধু
না জানি আইসে কতদিনে।
ভরিয়া যুগল আঁখি নিরবধি চাহিয়া থাকি
শুনো সখি তোর পায়ে ধরোঁ।
দীন ভবানন্দ কহে বন্ধুবিনে প্রাণ দহে
গরল ভক্ষিয়া মুই মরোঁ। (৭৪১৬)

পদবন্ধ— এহি মতে কাঁদে রাধা লোটায়ে ধরণী।
নয়নের জল বহে মুকুতা-গাঁথুনি ॥
ক্ষেণে ওঠে ক্ষেণে পড়ে গড়াগড়ি যায়।
ভাবিয়া বিষাদ রাধা কাঁদে উভরায় ॥
সকরুণ ভাবে কাঁদে বিলাপ করিয়া।
ত্রিভুবন আকুলিত বিলাপ শুনিয়া ॥

* * *

বয়োধিকা নববয়া বণিতা সকল।
রাধার মন্দিরে আসি কাঁদিয়া বিকল ॥
সকল বিষাদ ভাবি করয়ে ক্রন্দন।
শান্ত করিতে রাধাকে নাহি কোনজন ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে সব হৈল আকুলিত।
নিশি অবসান হইল রাধার পুরীত ॥
কাঁদিতে পোহাইল নিশি শোকে আকুলাইতে।
বিষাদ ভাবিয়া ঘরে গেলেন প্রভাতে ॥
একাকী রহিলা রাধা হৈয়া বিরহিত।
ঝুরিতে দারুণ শোকে হইলা মূর্ছিত ॥

* * *

চৈতন্য পাইয়া চক্ষু মেলে সুবদনী।
কোথা রইল প্রাণনাথ কহ কহ শুনি ॥

রাগ :—করুণা ভাটিয়ালী

কান্দে বিরহিণী রাধা করিয়া করুণ।
জীতে কত বিসরিমু শ্যাম বন্ধুর গুণ॥
কি মুই শুনিলু কথা হৈল বজ্রাঘাত।
এখনে জানিলু দঢ় রৈল প্রাণনাথ॥
আমি হনে ভাল নারী মথুরাতে পাইব।
বাপ মাও ছাড়ি কেনে গোকুলে আসিব॥
অখনে সে সবিশেষ জানিলু সকল।
পরাণ তেজিমু আমি ভক্ষিয়া গরল॥
কত বা ঝুরিমু আমি তনু হৈল ক্ষীণ।
হরি পরশনে কহে ভবানন্দ দীন॥

পদবন্ধ— এহি মতে বিলাপ করয়ে সুবদনী।
তখনে হইল রাজা প্রবীণ রজনী॥
কান্দিয়া গোঙাইল নিশি এ চারি প্রহর।
বিরহ-অনলে তনু দহে নিরন্তর॥
শোকে আকুলিত রাধা কাঁদে নিরবধি।
দুইটি আঁখির জলে বয়ে যায় নদী॥

* * *

এহি মতে বিলাপ করয়ে সুবদনী।
ধারা শ্রাবণে চক্ষুর পড়ে পানী॥
শয়ন ভোজন নাহি নাহি গৃহ-কাম।
আকুলিত হইয়া রাধা কাঁদে অবিরাম॥
এই মতে সপ্তাধিক শতদিন গেল।
ঘোর নিশিযোগে রাধা স্বপন দেখিল॥
পরিধান করিয়াছে পীত বসন।
নব জলধর অঙ্গ কৌস্তভ ভূষণ॥
কদম্ব বকুল-মালা মালতী দোসর।
কস্তুরী চন্দন বিরাজিত কলেবর॥

ললাটে চন্দন তাহে আবিরের বিন্দু।
রাহুর গ্রাসেতে যেন দিনমণি ইন্দু ॥
চূড়ায়ে কুসুম-কুল অলি লাখে লাখে।
সমীরে গমন করে ক্রৌঞ্চ রথ পাখে ॥
সর্বাঙ্গে ফুলের রেণু কটিতে কিঙ্কিণী।
রাঙ্গা পদে সুললিত বঙ্করাজ ধ্বনি ॥
ইন্দ্রধনু জিনি ভুরু কামের কামান।
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে যেন বরিষে চোখা বাণ ॥
সুরঙ্গ অধর-ওষ্ঠ হস্তেত মুরলি।
রাধার বিছানে আসি বসিলেন হরি ॥
কামকলা রসে মজি করিয়া রমণ।
যমুনার ঘাটে হরি করিলা গমন ॥
স্বপনে গেলেন রাধা জল আনিবার।
তরুমূলে পাইয়া কানু ভুঞ্জিলা শৃঙ্গার ॥
মেলিল নয়ন রাধা নিশি অবসানে।
বিষাদ ভাবিয়া কাঁদে না দেখিয়া তানে. ॥
করুণা করিয়া কাঁদে রাধা রসবতী।
দেখিতে আইলা তথা সুন্দরী শ্রীমতী ॥
দুই সই গলাগলি কাঁদিয়া বিস্তর।
রজনীর দুঃখ কহে সখীর গোচর ॥
শুন মোর প্রাণ-সই কহ (কহোঁ) বিবরণ
আজি নিশাকালে মুই দেখিলু স্বপন ॥

রাগ—শ্যাম পড়া

হেরল সজনী সই—

স্বপনে কানুর সনে হৈল দরশন।
হারাইল অভাগিনী মেলিয়া নয়ন ॥
রসে মজাইল মোরে অধর-সুধা পানে।
পাশ দিয়া রইলু মুই মনের গুমনে ॥

মিনতি করিয়া বন্ধু ধরে মোর করে।
কামকলা রসে বন্ধু বশ কৈল মোরে ॥
নয়ন মেলিয়া না দেখিয়া প্রাণ ফাটে।
স্বপনে পাইলু গিয়া যমুনার ঘাটে ॥
দীনহীন ভবানন্দে স্নুন্দরীকে বোলে।
কহ কি বেহার কৈলা গোবিন্দের ওলে (কোলে ?) ॥
ইত্যাদি।

ক্রমে এই শৈলীতে কৃষ্ণায়ণ কাব্য ভিন্ন রামায়ণ-মহাভারত-বিষয়ক কাব্য বা লৌকিক উপাখ্যানও রচিত হইতে লাগিল। অপৌরাণিক সখিসেনা কাহিনীর উল্লেখ আগেই করিয়াছি। এইবার রামায়ণ-কথা অবলম্বনে রচিত একখানি কাব্য হইতে খানিকটা অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। শ্রীআশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের সংগৃহীত একখানা নম্বর-হীন পুঁথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় আছে। তাহার ভিতর শক্তিশেল কাহিনীর একখানির খণ্ডিত পালা পাইতেছি। অংশটি এইরূপ :—

পয়ার

রাজ-আজ্ঞা লইয়া সেনা চলিল তরিত।
জথাএ আছে ছেলপাট গেল আচম্বিত ॥
পঞ্চাশ হাজার বীরে টানি ছেল ধইরে।
কার শক্তি না হইল ছেল আনিবারে ॥
রাবণ নিকটে কহে জোর করি হাত।
আনিতে না পারি ছেল শুন রাক্ষসের নাথ ॥
ক্রোধ হইয়া দশানন গেল সেল পাট ঘরে।
রামের উপরে তোলে ধরি বাম করে ॥

অথ শক্তিছেল গাঅন পটী

শুন শুন সভাজন হইয়া আনন্দিত মন
সক্তিছেল অপূর্ব কথন।
ক্রোধ হইয়া দশানন জেন কাল হুতাসন
যে রূপেতে মারিল লক্ষ্মণ ॥

ত্রিজটার মুখে স্থনি কান্দে রাজা নৃপমণি
পুত্র স্থকে না রহে জিবন।
দারুণ পুত্রের সোক বিদরে আমার বুক
কেমনে বাঁচিব লঙ্কা ভুবন॥
দুরাচার বিভিসান কৈল এত বিরম্বন
এখনে যে কি উপায় করি (ব)।
রাজারাণী মন্দাদরি কান্দিবে পুত্র ২ করি
পুত্র বধুর কি উপায় হইবো॥
এসব চিন্তিত দেখী পাত্র মিত্র হইল দুক্ষি
বহুমতে সান্তাএ রাজন।
তুমি রাজচক্রবর্তি কেন কান্দ নরপতি
উপাত্র জে চিন্তিএ এখন॥
স্থনি পাত্রের বচন কান্দে রাজা দসানন
পুত্র সোকে হইয়া অস্থির।
বসি রাজসিংহাসনে ধারা বহে দো নয়নে
শোকে দহে সকল সরির॥

গীত

পদ—ধুয়া

আমি কি লইএ লঙ্কাপুরে রব।
পুত্র সোকানলে প্রাণ তেজিব॥
হাএ হইএ হতমন কান্দে রাজা দসানন
জলধারা বহে দুই নআনে।
মূর্ছাগত প্রাণ নাহি কোনো জ্ঞান
পুত্র বৈলে আমি কারে স্থধাব॥
পুত্র তোমার বিহনে বাচি না জিবনে
তব সোকেতে প্রাণ দএ।
তুমি রণে মৈলে ক্ষ্যাতি রৈল দলে
তুমি বিনে প্রাণি আমার তেজিব॥

গান—পটী

পয়ার— পুত্র সোকে কান্দে রাজা হইয়া অচেতন।
ইন্দ্রজিত মৈলে রাণী স্থনিল তখন॥
পুত্র পুত্র বোলি রাণি কান্দে উর্ধ্ব সিরে।
পুনরপি আসি পুত্র মা না ডাকিল মোরে॥
এসব বলিআ রাণি বিকল হইল।
কান্দিয়াত রাজরাণি ধরনি লোটাইল॥"

—উল্লিখিত নম্বরহীন পুঁথির ২-৩ পৃষ্ঠা।

* * *

এখন একটা প্রশ্ন দাঁড়াইবে এই যে, পয়ার ও সঙ্গীতের মিশ্রণে যে শৈলীর উৎপত্তি হইল, তাহার মধ্যে ত্রিপদী আসিয়া পয়ারের স্থান অধিকার করিল কি রূপে? এবং যে ত্রিপদী আসিল তাহার ছন্দ ছড়ার স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দ ইহাই বা কি করিয়া হইল?

মনে রাখিতে হইবে পয়ার ব্যবহৃত হইত প্রধানতঃ বিবৃতি বা বর্ণনার ক্ষেত্রে। তাহা হইলে খুঁজিতে হয়, বর্ণনার ক্ষেত্রে ত্রিপদীর ব্যবহার কখন হইতে হইল। চৈতন্য-পূর্ব যুগের পাচালী শ্রীকৃষ্ণবিজয় প্রায় আদ্যন্ত পয়ার। ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধের কবি বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলেও দেখিতেছি, ত্রিপদী প্রধানতঃ গানের ভাষা; বর্ণনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু এই ষোড়শ শতকের শেষের দিকের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর এবং সপ্তদশ শতকের কাশীরামদাসের রচনায় ত্রিপদী বর্ণনার ক্ষেত্রে ঘন ঘন ব্যবহৃত হইতেছে। বর্ণনাটি যেখানে গুরুগম্ভীর, পরিস্থিতি যেখানে বিষাদ-ঘন বা চমকপ্রদ, সেখানে স্বাভাবিকভাবে ভাষা হইতেছে ত্রিপদী। কাশীরামদাস কর্ণবধের বর্ণনা পয়ারে করেন নাই। কবিকঙ্কণ গুজরাটে বিভিন্ন জাতির আগমন এবং ভূতগণ-কর্তৃক দক্ষযজ্ঞ-নাশের বর্ণনা করিয়াছেন ত্রিপদীতে। সুতরাং পাঁচালী-সাহিত্যে বর্ণনার ক্ষেত্রে ত্রিপদীর আগমন আকস্মিক নহে। ব্যাপারটা দাঁড়াইল এই, যেমন যেমন ভাবোচ্ছ্বাস সঙ্গীতধর্মী হইয়া উঠিল তেমনি ত্রিপদী ও ঘটনা-বিবৃতির প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। পয়ার মামুলি তথ্য-বিবৃতির, ত্রিপদী ঈষৎ-ভাব-স্পৃষ্ট ঘটনা বর্ণনার, ও গান ভাববিহ্বলতার উচ্চতম মান নির্দেশের বাহনরূপে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি,—

"ব্রজমোহন রায়ের আগমনী পালা

গান

রাগিণী—আলিয়া একতালা

আর কেঁদ না মা ধর ধৈর্য ধর রাণী
তোমার কন্যে এল।
গা তোলো গো গিরিভার্যে, কেন ধরাশয্যে
গেল গেল মনের বেদনা গেল ॥
একবার হের গো নয়নে প্রাণাধিক ধনে,
কেন দুঃখানল আর প্রবল।
তাপিত প্রাণ জুড়াইতে উমা-চাঁদে কোলে কর গো রাণী,
হর-অঙ্গনা যে এসে অঙ্গনে দাঁড়াল ॥
আমরা দেখে এলেম রূপ নাহি তার স্বরূপ
হেরে মনের অহঙ্কার হরিল।
তোমার উমা চাঁদে কি ছার পূর্ণ চাঁদে
লোকে দেয় তুলনা,
পদ নখরেতে কত চাঁদের তুলনা আছে লো ॥

পয়ার

উমার শোকে মহিষী অধৈর্য ধরাতলে।
হেনকালে এক নারী এই কথা বলে ॥
অমনি রাণী পায় যেন মৃত্যুদেহে প্রাণ।
কৈ উমা কৈ উমা বলে সন্নিধান ধান ॥
যাইতে সম্মুখে দেখে মহিষমর্দিনী।
চঞ্চল হইয়ে বলে অচলে তখনি ॥
কৈ হে ভূধর আমার প্রাণের নন্দিনী।
উমা না দেখিলে পরে মরিব এখনি ॥
উমার মূর্তি শান্ত অতি সুধীর সুধীরা।
অঙ্গনে অঙ্গনা কার এল ভয়ঙ্করা ॥
যার কন্যে অতি দৈন্যে সেই কন্যে কই।
ঘোর রাঙ্গী ভীমাঙ্গিনী রণরঙ্গী ওই ॥

করি-অরি জিনি হয় অসুর আসন।
দশভুজা এ দুর্জয় দশন দর্শন ॥
দক্ষে দৈত্য নাশে এ কম্পে এ জীবন।
এ নয় ত্রিনয়নী দেখি অসি যে ধারণ ॥
এ নয় আমার কন্যে শোন হেমগিরি।
প্রাণ যায় প্রাণ রাখ দেখাও প্রাণের কুমারী ॥

গান

রাগিণী—সুরাট-কাওয়ালী

কে নারী অঙ্গনে এল রণরঙ্গিণী।
অসুর-নাশিনী অসি-আশুগ-ধারিণী,
অতি ভয়ঙ্করী দেখি কার রমণী ॥
ত্রিদশের দর্পহরা দশদিক দীপ্তকরা
দশকরা কাঞ্চন-বরণী,
হেরি দুরাত্মা-দুর্জনজন-দনুজদল-নাশিনী।
গিরি নহে মম কন্যে এ যে এ সমর সাজে,
মানসে অমর পূজে চরণ দুখানি ॥
কি সুরী অসুরী হবে দানবী মানবী কিবে,
হবে কি কিন্নরী অনুমানি,
নহে সামান্যে কভু এযে ধরণীধন্যা ধনী ॥
ত্রিপদী—মগ্ন মন ভক্তি-নীরে পাষাণ কন পাষাণীরে,
তুমি কি চিনিবে উমা-কন্যে।
চিন্তে পারেন না ভব ভেবে চিন্তে পরাভব,
হেরে কাল হরেন ঐ জন্যে ॥
কখন বা দশভুজা ত্রিদেশের মন বোঝা,
দ্বিভুজা দিগম্বরা কভু।
কভু চারি কভু অষ্ট ষষ্ঠ কখন বা ভুজ অষ্ট,
স্বরূপাক্ষে বিশ্বমূলাধার কভু ॥
ঐ কন্যা আদ্যাশক্তি ভবে জীবে দেন মুক্তি
কভু নর কখন বা নারী।

করি মঙ্গলাচরণ, মঙ্গলায় করেন বরণ,
বলে আমার প্রাণের কুমারী ॥
শুনি রাণীর ঘুচিল ভ্রম করিয়া অতি সম্ভ্রম,
উমা শশী করেন কোলে।
হেরে তনয়ার বদন, নিবারিল রাণীর রোদন,
মুখ-চুম্বন করেন শ্রীমুখ-মণ্ডলে ॥…”

—ব্রজরায়ের পাঁচালী, বঙ্গবাসী সং, পৃষ্ঠা ২৬-২৭

উদ্ধৃত অংশের পয়ার ও ত্রিপদীর ব্যবহার আমাদের মন্তব্যের সমর্থন করিবে। পার্বতী আসিয়াছেন। তাঁহাকে মেনকা নিজের কন্যা বলিয়া চিনিতে পারিতেছেন না, এই সাধারণ কথাটি পয়ারে বর্ণনা করিয়া কবি ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু উমা যে সামান্যা মেয়ে নয়, আদ্যাশক্তি বিশ্বমাতা এই দার্শনিকতার কথা ত আর পয়ারে প্রকাশ করা যায় না। তাই ত্রিপদীর আশ্রয়।

দাশরথি রায়ও আগমনী-গানে ঐ একই শৈলীর অবতারণা করিয়াছেন। রাত্রিকালে গিরিরাণী উমাকে স্বপ্নে দেখিয়াছেন। তিনি হিমালয়কে কন্যা আনিতে অনুরোধ করিতেছেন। গিরিরাজ মেনকাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন। মেনকা বুঝিতেছেন না। ইহার বর্ণনা পয়ারে চলিতে পারে। কিন্তু যখন কৈলাস-ভবনে পিতাপুত্রীতে সাক্ষাৎ হইলে উভয়ে উভয়কে দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন, তখনকার বর্ণনা তো আর পয়ারে চলিতে পারে না। সেখানে আসিতেছে ত্রিপদী। যথা—

“মানসেতে গৌরী-রূপ ভাবিতে ভাবিতে।
গিরিরাণী নিদ্রাগত শেষ যামিনীতে ॥
স্বপ্নে আসি পূর্ণশশীমুখী হরপ্রিয়ে।
স্বীয় জননীর শিয়রেতে বসি মা বলিয়ে ॥
জগৎ-জননী অতি যত্নে জননীরে।
কৈলাস-কুশল-বার্তা কন ধীরে ধীরে ॥
স্বপ্নে হেরি গিরিরাণী দুঃখহরা মেয়ে।
চক্ষে ধারা তারাকারা তারা পানে চেয়ে ॥
ত্রিনয়নের নয়ন-তারা তাঁরা পেয়ে ঘরে।
যেন অন্ধ পেয়ে নয়ন-তারা অন্ধকার হবে ॥

তারায় ত্বরায় কোলে লয়ে শৈলরাণী
এড়ায় বিচ্ছেদ-জ্বালা জুড়ায় পরাণী ॥
বলে উমা মা বলে মা ছিল তোর মনে।
ঘনঘন ঘনঘন ধারা দুনয়নে ॥
ক্ষীর সর মিষ্টান্ন স্বর্ণ থালে।
কোলে করে দেয় উমার শ্রীমুখ-মণ্ডলে ॥
পরে স্বপ্ন ভঙ্গ হয় অদর্শন উমে।
আকাশ হইতে রাণী পড়িল অমনি ভূমে ॥
এলো থেলো পাগলিনী প্রায় হয়ে শিখরী।
সকাতরা হয়ে ত্বরা কন যথা গিরি ॥

গান

রাগিণী—ভৈরবী, তাল—একতালা

গিরি গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য করিয়ে
চৈতন্য-রূপিণী কোথা লুকালো ॥
কহিছে শিখরী কি করি অচল,
নাহি চলাচল হ'লাম হে অচল,
চঞ্চলার মতো জীবন চঞ্চল,
অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারাল।
দেখা দিয়ে কেন এত মায়া তার,
মায়ের প্রতি মায়া কেন নাই মহামায়ার,
আবার ভাবি গিরি কি দোষ অভয়ার,
পিতৃদোষে মেয়ে পাষাণী হলো ॥

* * *

পিতার আগমন পুরে, অন্তরে জানি ত্রিপুরে,
জয়ারে কহেন ইশারায়।
জয়া জানায় সম্বাদ, না করি বাদানুবাদ,
নন্দী দ্বার ছাড়িল ত্বরায় ॥

পুরে প্রবেশিয়া ত্বরা দেখি গিরি কন্যা তারা,
নয়ন-তারা ভাসে নয়ন-জলে।
দৃষ্টি করি পিতৃপক্ষে তারাকারা ধারা চক্ষে,
তারায় রহিল সেই কালে ॥
সংসার যাহার মায়া মোক্ষদাত্রী মহামায়া
মায়া জন্যে কাঁদেন সঘনে।
পিতা এসেছেন লতে আসি বলে কাশীনাথে
অনুমতি চান অন্যমনে ॥
যাইতে পিতার বাস শঙ্করী পরেন বাস,
কৃত্তিবাস না দেন অনুমতি।
দেখিয়া গমনোদ্যোগী, মহাদুঃখে মহাযোগী,
অনুযোগ করেন গৌরী প্রতি ॥
তুমি সদয়া অচলে আমার কিরূপে চলে,
চলাচল শক্তি নাই ইদানী।
বয়স হচ্ছে অশীতিপর, হ্রাস হচ্ছে পর পর,
এর পর কি হয় না জানি ॥
নাম ধরিয়াছি কাল দুঃখে গেল তিন কাল,
দিনে অন্ন পাইনে হেন কালে।
ভার্যা হইলে গুণবতী দুঃখে সুখ পায় পতি,
তা' হল না এ পোড়া কপালে ॥"··· ইত্যাদি।

দাশরথি রায়ের পাঁচালী, আগমনী-পালার আরম্ভ

এইবার দেখা যাক পাঁচালীর ছড়ার ত্রিপদী স্বরাঘাত-প্রধান হইয়া উঠিল কি করিয়া। বাংলা সাহিত্যে ত্রিপদী-ছন্দের বিবর্তনের ইতিহাস রচনা করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাইব,—

১। চর্যাপদের যুগে, অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের আদি-যুগে, বাংলা ভাষা হ্রস্ব-দীর্ঘ-মাত্রা-ভেদে উচ্চারিত হইত। সুতরাং তখনকার ত্রিপদীর মধ্যেও এই মাত্রাবৃত্ত উচ্চারণ বজায় ছিল।—

: : : : : oo : o oo : oo : : :
"উচা উচা | পাবত তহি | বসই শবরী | বালী।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আসিয়া দেখা গেল, ইহার পরিবর্তন হইতেছে। লঘু-গুরু-মাত্রা-ভেদ উচ্চারণে আর ততটা মানা হইতেছে না। ক্বচিৎ কোথাও ছন্দের অনুরোধে দীর্ঘ উচ্চারণ হইতেছে মাত্র। উদ্‌বৃত্ত স্বর-ধ্বনিগুলিকে অর্ধমাত্রার মতো উচ্চারণ করার প্রবণতা দেখা যাইতেছে। সুতরাং মাত্রা-বৃত্ত-উচ্চারণের ক্ষেত্রে প্রকৃত পক্ষে হরফ্‌ গণিয়া উচ্চারণের প্রবণতা দেখা দিতেছে। যথা—

০ ০ ০ ০ ‿০ | ঃ ০ ০ ০ ০ |
"কিবা চাহে কাহ্ন | বাটে রহা এ |
০ ০ ঃ ০ ০ ০ ০ | ০ ০
বুঝিতে নারোঁ তার | মনে।
০ ০ ‿০ ০ ০ | ০ ০ ০০ ০ ০ |
রাজা কংসাসুর | আতি দুরুবার |
০ ০ ০ ০০ ০ | ০ ০
সে জনি এহাক | শুনে ॥
০০ ০ ০ ০০ | ০ ০ ০ ০ ০০ |
এডু দামোদর | ঝাট যাও ঘর
০০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০
দিয়ারু মোকে মে | লানি।
০ ০ ‿০ ০ ০ | ০ ০ ঃ ০ ০ |
রাজা কংসাসুর | শুনিলে পাছে |
০০ ০ ০‿০ | ০০
ফল পাইবে চক্র | পাণী ॥"

—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, দানখণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেখা গেল পাশাপাশি অবস্থিত দুই উদ্‌বৃত্ত-স্বরধ্বনির যুক্তাক্ষরত্ব-প্রবণতা বাড়িয়া যাইতেছে; ফলে এ, ঐ, ও, ঔ প্রভৃতির মতো সন্ধ্যক্ষর সৃষ্টি হইতেছে। আর তাহাদের উচ্চারণও করা হইতেছে একটি লঘু ব্যঞ্জনের মত। "আই," "আউ" প্রভৃতির উচ্চারণে প্রায়ই শেষের স্বরটির একেবারে লোপ-প্রবণতা দেখা দিল। আউলাইল এই পাঁচ হরফের শব্দটিকে উচ্চারণ করিতে গিয়া আমরা তিন হরফের করিয়া উচ্চারণ করিতে

আরম্ভ করিলাম। তাহার ফল হইল এই যে, ইহার মধ্য দিয়া বাংলা ভাষায় ধীরে ধীরে অক্ষর-সংজ্ঞাত বা syllabic উচ্চারণ প্রবেশ করিতে লাগিল। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে বাংলা উচ্চারণে অন্ত্য-অকার লোপ হওয়ায় এই অক্ষর-সংজ্ঞাত উচ্চারণ আরও বাড়িয়া গেল। কিন্তু ব্যাপার হইল এই যে, বৈষ্ণব পদাবলী প্রভৃতির মধ্যে গানের অনুরোধে যেমন মাত্রানুগ উচ্চারণের যথাপ্রয়োজনীয় অনুশীলন হইতে থাকিল, তেমনি ত্রিপদীর ভিতর হরফ্ গণিয়া মাত্রা নির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে অক্ষর-সংজ্ঞাত উচ্চারণও পাশাপাশি চলিতে লাগিল। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল হইতে একই কবির রচিত দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া ইহার উদাহরণ দিতেছি।

১। হরফ্ গণিয়া ৮+৮+১০ মাত্রার ত্রিপদীর উদাহরণ—

"শুনিয়া অমৃত-খণ্ড, মন্দার মথন-দণ্ড,
নাগরাজে করিল ছান্দন।
মিলিয়া অসুর দলে, নামিয়া ক্ষীরোদ জলে,
করিবারে লাগিল মথন॥
প্রথমে আছিল নীর, মথিতে মথিতে ক্ষীর,
লবণ উঠিল ভাগ ভাগ।
সুরভি উঠিল যবে, আনন্দিত দেব সবে,
সবে যাহার করিবে যাগ॥

—বসন্তকুমার ভট্টাচার্য -সংকলিত, পৃষ্ঠা ৪১

২। মিশ্র উচ্চারণ পদ্ধতির উদাহরণ—

o ‿o o o‿oo | oo oo oo oo
আশীর্বাদে পুরন্দরে | মালা দিলাম্ তাহার্ তরে

‿o o o o o o o | oo
ভক্তি করি লইল অতি | শয়।

o o o o o o o o o | o oo o o o o o
হেন মালা ভূমে লোটে দেখিয়াত প্রাণ ফাটে

o ‿ oo o o o | oo
এ দুঃখ শরীরে মোর | সয়॥

o o o o o oo o o | o‿oo o o o o o |
মোর তরে দিয়া লাজ | সাধিল যে এই কাজ |

০০ ০০ ০ ০ ০ | ০ ০
শ্রীর এড়ুক গিয়ে | আশা !

০ ০ ০ ০০০০০ | ‿০ ০০০ ০০.০ |
না জানে আমার সার | অক্ষয় বচন যাহার |

০০ ০০ ০০ ০০ | ০ ০
সেই মুনি আমি দুর | বাসা ॥

এই শেষের পদ্ধতিই পাঁচালী-সাহিত্যে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার সুবিধা এই যে অক্ষর-সংজ্ঞাত উচ্চারণের ফলে অল্প সময়ে বহু কথা বলিয়া শেষ করা যায়। বাংলা গদ্যের স্বাভাবিক উচ্চারণ-পদ্ধতিও ইহার মধ্যে অনেকখানি বজায় থাকে। সুতরাং বর্ণনার ভাষার পক্ষে ইহা একান্ত উপযোগী।

উপরি-উক্ত আলোচনায় আমরা দেখিলাম, সপ্তদশ শতকে নিবদ্ধ-কীর্তনের প্রভাবে এক প্রকার পাঁচালী-সাহিত্যের যে সম্ভাবনা দেখা গেল, তাহার চরম পরিণতি হইল অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে। ইহার মধ্যে যাত্রার উৎপত্তি ও অবনতি পর্যন্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং পাঁচালীর প্রভাবে যাত্রার উৎপত্তি হইবে কি করিয়া ?

তাহাছাড়া পাঁচালীর মধ্যে কোথায়ও গদ্য সংলাপ দেখি না, এবং গদ্য সংলাপ সৃষ্টির সম্ভাবনাও কোথাও নাই। তাহা হইলে পাঁচালী হইতে যাত্রার কোন্ অংশের উৎপত্তি হইয়াছিল ? সঙ্গীতের ? যে নিবদ্ধ-পদ-কীর্তনের আদর্শে বা প্রভাবে পাঁচালীর উৎপত্তি তাহা হইতেই স্বতন্ত্রভাবে যাত্রার উৎপত্তি-নির্ধারণ কি অধিক যুক্তিযুক্ত নহে ? শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় পাঁচালীর ভাবকালি হইতে যাত্রার সংলাপ সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া অনুমান করেন।* কিন্তু কোনো প্রসিদ্ধ পাঁচালীকারের গ্রন্থেই ভাবকালি বলিয়া কোনো অংশ নাই। ডাঃ সুশীলকুমার দে পাঁচালীর অনুমেয় পাঁচটি অঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন। † তাহার মধ্যে ভাবকালি পাই না। তাহাছাড়া যে মনোমোহন বসু দাশরথি রায়ের পাঁচালী শুনিয়াছিলেন এবং নিজে পাঁচালী গান করিতেন, তিনিও পাঁচালীর ভাবকালি বা সংলাপাংশের উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং কি করিয়া অনুমান করিব যে পাঁচালী হইতে যাত্রার উৎপত্তি হইয়াছিল ?

* বাঙ্গালা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ—শ্রীমন্মথমোহন বসু, পৃষ্ঠা ৫৪-৫৫

† Bengali Literature in the 19th Century—Dr. S. K. De, Pp. 489.

এবার আমরা দেখিব কথকতা হইতে যাত্রার উৎপত্তি হইয়াছিল কিনা। যাত্রা-সাহিত্যের অনেক আগে কথকতার সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই কথকতার প্রকৃতি কি ছিল তাহা নির্ধারণ করার প্রয়োজন। কারণ উহার উপরই কথকতা হইতে যাত্রা-সাহিত্যের উৎপত্তি-বিষয়ক মতবাদ নির্ভর করিবে।

আধুনিক যুগের কথকতার সঙ্গে কীর্তন ও ঢপের পার্থক্য অতি নগণ্য। বর্তমান কালের কথকগণ ভাগবতাদি গ্রন্থের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থগুলি হইতে শ্লোক উৎকলন করেন বটে, কিন্তু সেইটিই মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। ভাগবতাদির কাহিনী অবলম্বনে মনোরম গল্প সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে বিভিন্ন কবির রচিত গান সংযোজন করিয়া কথকগণ গাহিয়া থাকেন। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি মহাজনদের গীতই শুধু গান করা হয় না; রবীন্দ্রনাথ এবং তাহার চেয়েও আধুনিক কবির সঙ্গীত পর্যন্ত গীত হইয়া থাকে। এই যে গল্প-বিবৃতির মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত-উৎকলন, ইহা তো কীর্তন বা ঢপ-কীর্তনের রীতিরই অনুসরণ। তাহা হইলে কথকতার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কি?

আমরা দেখাইয়াছি নিবদ্ধ-কীর্তন এবং কৃষ্ণায়ণ-কাব্যগুলির মধ্য দিয়া যাত্রা ও পাঁচালী-শৈলীর উদ্ভব হইয়াছে। তারপর বৈষ্ণবেতর সাহিত্যেও তাহা সংক্রামিত হইয়াছে। তেমনি দেখা যাইবে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইতেই কথকতার সৃষ্টি।

শ্রীমদ্ভাগবত শুধু গল্প নহে,—দর্শন ও কাব্য। সুতরাং উহার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে মনোরম গল্প সৃষ্টি, দার্শনিক-তত্ত্বের আলোচনা এবং উত্তম কবিত্ব-শক্তি-প্রকাশের অবকাশ ছিল। রামায়ণ-মহাভারতাদিতে গল্প এবং উত্তম কবিত্বের পরিচয় আছে। কিন্তু তাহার ভিতর পদে পদে দার্শনিকতা নাই। তাই ভাগবতকে অবলম্বন করিয়াই প্রথম কথকতার সৃষ্টি। চৈতন্য-আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই ভাগবতের কথকতার উল্লেখ আছে। ভাগবত অবলম্বনেই কথকতার সৃষ্টি; অন্যান্য মনীষিদের উক্তিও এই মত সমর্থন করে। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা" পুস্তিকায় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিতেছেন,—

"একদা বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত সোনামুখী নিবাসী গঙ্গাধর শিরোমণি মহাশয় এক স্থানে শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। প্রাতে যথারীতি পাঠ হইত। বৈকালে শিরোমণি মহাশয় বেদীতে বসিয়া ভাগবতের কোন কোন

অংশ ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি উত্তম ব্যাখ্যাতা ছিলেন। অন্য অন্য স্থানে ব্যাখ্যা শুনিতে বিস্তর লোক উপস্থিত হইত। কিন্তু ঐ স্থানে অধিক শ্রোতা আসিতেছে না দেখিয়া শিরোমণি মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শুনিলেন এক স্থানে রামায়ণ গান হইতেছে। শিরোমণি মহাশয় বলিলেন, আচ্ছা সকলকে বলিবে কল্য হইতে আমার নিকট ভাগবত গান শুনিতে পাইবে। তিনি যেমন সুপণ্ডিত তেমনি গায়ক ও কবি ছিলেন।...পরদিন বৈকালে নূতন রীতির কথকতা আরম্ভ করিলেন, চারিদিক হইতে লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার স্বরসংযোগ, বাক্য-বিন্যাস, ব্যাখ্যা ও সঙ্গীত পদাবলী শুনিয়া লোকে বিস্মিত ও মোহিত হইল।...ইহাই কথকতার প্রথম সৃষ্টি। ক্রমে রামায়ণ ও মহাভারতেরও কথা-গ্রন্থ বিরচিত হয়।"—পৃষ্ঠা ৬৩

উদ্ধৃত আলোচনায় আমাদের কয়েকটি বিষয় জ্ঞাতব্য রহিয়াছে। উহার মধ্যে ভাগবত-পাঠের ক্রমবিকাশের কয়েকটি স্তর আমরা লক্ষ্য করিতেছি।

১। ভাগবতের শুধু পাঠ।

২। পাঠ-সহ সুললিত ব্যাখ্যা।

৩। রামায়ণ-গানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভাগবত গান।

৪। ইহা হইতে আধুনিক কথকতার সৃষ্টি। ইহাই আধুনিক যুগের কথকতার ইতিহাস।

৫। এই আধুনিক ভাগবত-কথার আদর্শে রামায়ণ ও মহাভারত-কথা সৃষ্টি হইল।

নিবদ্ধ-পদাবলীর প্রভাব সাহিত্যে যখন পড়িতে আরম্ভ করিল, তখন পয়ার-ত্রিপদী-ছন্দে রচিত রামায়ণ-মহাভারত-কাব্যের পাশাপাশি পয়ার, ছড়া ও সঙ্গীতের সমন্বয়ে রচিত 'রামায়ণ-পাঁচালী', 'ভারত-পাঁচালী', প্রভৃতির উদ্ভব হইতে লাগিল। তখন শুধু শ্লোক তুলিয়া গদ্যে তাহার ব্যাখ্যা করিয়া ভাগবত 'পাঠের' দ্বারা শ্রোতৃগণকে আর আকর্ষণ করা গেল না। ভাগবত-পাঠকগণ তখন বাধ্য হইয়া কথকতার ভিতর সঙ্গীতের আমদানি করিলেন। তখন 'ভাগবত-কথা' 'ভাগবত-গান' হইয়া দাঁড়াইল। রামায়ণ-গানের প্রভাবে ভাগবত কথার পরিবর্তন হইল, অথচ ভাগবত-পাঠের স্বাভাবিক বিবর্তনে এমনটি হইল না কেন? এ-প্রশ্ন অনেকে করিতে পারেন। তাহার উত্তর এই যে, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতির ন্যায়

রামায়ণ-মহাভারতও আদি হইতেই চামর-মন্দিরা-যোগে এবং অঙ্গভঙ্গী-সহকারে গান করা হইত। অর্থাৎ উহাদের ছড়ার অংশ সুরে আবৃত্তি করা হইত এবং লাচারী বা ত্রিপদী অংশ গাওয়া হইত। এই সঙ্গীতাত্মক শৈলীর মধ্যে নিবন্ধ-পদাবলীর সঙ্গীতাত্মক শৈলীর প্রভাব সহজেই প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল। পক্ষান্তরে কথক-ঠাকুর গোড়াগুড়ি হইতে আসনে বসিয়া কবিত্বময় গদ্য-বাক্যে ভাগবতের ব্যাখ্যা করিতেন। তাহার ভিতর সঙ্গীতাত্মক ভিন্ন-জাতীয় পদ্ধতি সহজে প্রবেশ করিতে পারে নাই। জনগণের রুচিই শেষ পর্যন্ত ভাগবত-'পাঠের' মধ্যে 'গানের' আমদানি করিয়াছে।

রাজনারায়ণের উক্তি যে অলীক কল্পনা নয়, তাহার প্রমাণ মিলিতেছে কথকতার অনেক পুঁথিতে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইখানি কথকতার পুঁথি আছে। দক্ষযজ্ঞ (৫০০৭ নং) এবং ভাগবত (৫০০৮ নং)-এর পুঁথি। উহা আগাগোড়া গদ্য-রচনা। শ্রীযুত কৃষ্ণপদ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ভাগবত ও মহাভারতের কথকতার দুইখানি পুঁথি মুদ্রণ করাইয়াছিলেন। উহার মধ্যে সঙ্গীত যাহা একটা বা দুইটা আছে, তাহা অনেক কষ্ট করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। পক্ষান্তরে যাত্রায় গানেরই প্রাধান্য। কথকতার যে প্রয়োগ দেখা গেল, তাহা শেষ যুগের শখের যাত্রায়। তখন যে পদাবলী-সঞ্জাত যাত্রার মধ্যেই বিশেষ ভাবে কথকতার ন্যায় গদ্য ও দার্শনিকতা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা যথাস্থানে আলোচনা করিয়াছি।

সুতরাং উপসংহার এইভাবে করিতে পারি,—যে-কীর্তন হইতে যাত্রার উৎপত্তি হইয়াছিল, কথকতার ভাবুকতা ও সংলাপময়তা তাহার স্বতঃস্ফূর্ত হৃৎস্পন্দন-রূপে গোড়াগুড়ি হইতে অলক্ষিত ভাবে যাত্রায় আসিয়া যাইতেছিল। প্রথম প্রথম তাহা লক্ষ্য করা খুব বেশী সম্ভব হয় নাই। কিন্তু ক্রমে যাত্রার সংলাপ-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহা পল্লবিত হইয়া ফুটিয়া উঠিল। ইহা কথকতার প্রভাব নয়। কীর্তন গানের মূলীভূত বৈষ্ণব-পদাবলীরই উহা অন্তর্নিহিত প্রেরণা।

পদাবলীর যে উন্নত ভাব-প্রেরণা হইতে যাত্রার সৃষ্টি, পরবর্তী কালে তাহাতে যখন ভাঁটা লাগিল, তখন যাত্রা-সাহিত্যেরও পতন হইতে শুরু হইল। অন্যদিকে কৃষ্ণ-যাত্রা সাহিত্যের জনপ্রিয়তার সুযোগ লইয়া বৈষ্ণবেতর বিষয়ে অনেক যাত্রাওয়ালা পালা রচনা করিলেন। তাঁহাদের সাহিত্যের মধ্য দিয়া কুরুচি, ভাঁড়ামো, এবং অশ্লীলতা, যাত্রা-সাহিত্য ধীরে

ধীরে প্রবেশ করিতে লাগিল। ব্রজমোহন রায়ের রচনা হইতে তাহার উদাহরণ দিয়াছি। ইহার চরম অভিব্যক্তি হইল গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দরে। তখন হইতে যাত্রা শিক্ষিত সমাজের সমর্থন হারাইয়া ইতর জনগণের আস্বাদ্য হইয়া পড়িল। যাত্রায় যখন এই অবস্থা আসিয়া পড়িয়াছে তখন ইংরেজী রঙ্গমঞ্চ ও নাট্য-সাহিত্যের উন্নত আদর্শ বাঙ্গালীকে আকৃষ্ট করিল। যাত্রার মধ্যে কোনদিনই উৎকৃষ্ট গল্প রচনা, চরিত্রের জটিলতা সৃষ্টি বা মানবের রহস্যময় জীবনালেখ্য চিত্রণ দেখা যায় নাই। পাশ্চাত্ত্য-আদর্শ-পুষ্ট থিয়েটার তাই সহজেই বাঙালীর কৌতূহল জাগ্রত করিয়া তুলিল। থিয়েটার তাই যাত্রাকে সহজেই স্থানচ্যুত করিতে পারিল। কিন্তু যাত্রা মরিল না। থিয়েটারের প্রভাব যাত্রায় এবং যাত্রার প্রভাবও থিয়েটারে পড়িতে লাগিল। এইবার সেই আলোচনা করা যাইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

রামনারায়ণ তর্করত্ন

[রামনারায়ণকে দিয়া বাংলা নাটকের সত্যকার সূচনা; রামনারায়ণ সার্থক নাট্যকার নহেন; কুলীনকুলসর্বস্বে সংস্কৃত নাটকের এবং বাংলা যাত্রার প্রভাব; রামনারায়ণের বৈশিষ্ট্য; মধু-দীনবন্ধুর উপর রামনারায়ণের প্রভাব; উমেশচন্দ্রের বিধবা-বিবাহ নাটক বাংলা সাহিত্যের প্রথম সামাজিক নাটক।]

বাংলা নাট্য-সাহিত্যের সত্যকার সূচনা করেন পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন। তাঁহার পূর্বে যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, তারাচরণ শিকদার, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি যাঁহারাই নাটক রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহই তেমন মৌলিকত্ব দেখাইতে পারেন নাই। "কীর্তিবিলাসে"র কাহিনীর উপর বাংলা উপকথা বিজয়-বসন্তের প্রভাব অতি স্পষ্ট। উহাকে প্রথম বিয়োগান্ত নাটক বলিয়া অনুমান করিলে প্রধান ভুল হইবে এই যে, ট্রাজেডীর গাম্ভীর্য, বিয়োগান্ত নাটকের জটিলতা, নায়ক-চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ইত্যাদির অবকাশ ঐ নাটকে নাই। ঐ নাটকের মধ্যে না আছে দুর্দমনীয় দৈবের প্রভাব না আছে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে অতিমাত্র আত্মসচেতন ব্যক্তিত্বের অসমাহিত দ্বন্দ্বের ভয়াল করুণ পরিণতির ইতিহাস। শুধু বিয়োগে নাটকের উপসংহার হইয়াছে বলিয়া যদি উহাকে বিয়োগান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া লই, তবুও উহাকে ট্রাজেডী বলিব না। তারপর "ভদ্রার্জুন নাটক"। ইহার ভাষায় সংলাপের গুণ দেখা যায় না। প্রধানতঃ পয়ারের মধ্য দিয়া নির্জীব কাহিনীর বর্ণনা হয় মাত্র। আর এই পয়ার-ত্রিপদীর উক্তি-প্রত্যুক্তি, ইহাও যাত্রার প্রত্যক্ষ প্রভাব। নাটকের সংলাপ বলিতে এক বিশেষ ধরনের ভাষা বুঝি। নাটকের প্রত্যেকটি পাত্র-পাত্রীর নিজস্ব ধারণা-ভাবনা আছে। তাহা লইয়া সে অন্যের থেকে ভিন্ন। একের হৃদয়ের বদ্ধমূল সংস্কার অন্যের হৃদয়েও ঠিক সেই পরিমাণে না-ও থাকিতে পারে। বিশেষ-বিশেষ ব্যক্তির চরিত্রে, বিশেষ-বিশেষ প্রবণতা থাকে। তাহা লইয়া সে নিজের মধ্যে নিজে একটা জগৎ সৃষ্টি করিয়া রাখে। তাই ভিন্ন-ভিন্ন ব্যক্তি যখন কোনো বিশেষ মুহূর্তে, (যে কোনো একটা ঘটনাকে অবলম্বন করিয়াই হউক), একই পরিবেশে মিলিত হয়, তখন কতগুলি লোক হয়ত ঐ বিশেষ ঘটনাকে অনুকূল ভাবে গ্রহণ করে, কতক লোকে তাহা করে না। তাহাদের

পূর্বার্জিত সংস্কার, মনোভাব এবং জীবন-চলনাই এইরূপ পারা না-পারার কারণ। তখন ঐ বাহিরের ঘটনাকে অবলম্বন-মাত্র করিয়া কতকগুলি অন্তরের দ্বন্দ্ব-মিলনের বিচিত্র খেলা শুরু হইয়া যায়। পরস্পরের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাল-লাগা মন্দ-লাগার সঙ্ঘাতে নিত্য-নূতন ঘটনা সৃষ্টি হইতে থাকে। আর ঐ সৃজ্যমান ঘটনা-পুঞ্জের যাহারা কর্তা তাহাদের কর্মের মধ্য দিয়া প্রতি মুহূর্তে তাহাদের অন্তরের রেখাপাত হয়। এই যে অন্তরের প্রতিফলন রূপ বাহিরের কর্ম, ইহাকে রূপ দেয় যে ভাষা, তাহাই নাটকের সংলাপ। যোগেন্দ্রচন্দ্র, তারাচরণ, বা কৌরব-বিয়োগ-রচয়িতা হরচন্দ্র ঘোষ কেহই এই ভাষা সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের বিবৃতিমূলক ভাষার মধ্য দিয়া চরিত্রও সৃষ্ট হয় নাই। হরচন্দ্র ঘোষের "ভানুমতী-চিত্তবিলাস" ও "কৌরব-বিয়োগ", গদ্য ভাষায় রচিত হইলেও উহা আরও আড়ষ্ট। যাত্রা ও কথকতার বিবৃতির ভাষার অনুকরণে ঐ ভাষা সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যাত্রা ও কথকতার ভাষায় যে সাবলীলতা ও প্রসাদ-গুণ ছিল, হরচন্দ্রের রুক্ষ বাক্যাবলীতে তাহাও রহিল না।

তবে ইঁহারা যেটুকু করিলেন, তাহা হইল এই, কাহিনীটিকে স্থূল ভাবে অঙ্ক ও দৃশ্যে ইঁহারা ভাগ করিতে পারিলেন। কিন্তু ইংরেজী নাটকে যেমন দ্বন্দ্বময় কাহিনীর লক্ষণীয় উত্থান-পতনের গতি-লেখা অঙ্ক ও দৃশ্য-বিভাগের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, এই অঙ্ক-বিভাগাদির মধ্যে তাহা দেখা যাইবে না। সুতরাং এই দৃশ্যকাব্যগুলিকে উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে একপ্রকার কাহিনী-রচনার চেষ্টা বলিতে পারি। উহারা নাটক নহে।

রামনারায়ণের রচনাও ঠিক নাটক নহে। তবে উহাকে অবলম্বন করিয়া নাট্য রচনার সূত্রপাত হয়। বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাট্যকার মধুসূদন ও তাঁহার পরবর্তী দীনবন্ধুর রচনায় রামনারায়ণের প্রভাব অনেক। সুতরাং রামনারায়ণ বাংলা নাট্য-সাহিত্যের সূত্রধার।

তর্করত্ন মহাশয়ের প্রথম রচনা "কুলীনকুলসর্বস্ব" নাটক। সৃষ্টিকাল ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দ। রামনারায়ণ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। দেশী যাত্রা পদ্ধতির সহিতও তিনি পরিচিত। সুতরাং সংস্কৃত নাটক ও যাত্রার শৈলীর দ্বারা তিনি প্রভাবান্বিত হইবেন ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁহার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি অনুকারী নহেন। নাটকে তাঁহার মৌলিকতাও অনেক। আলোচনা করা যাক—

১। নাটকে সংস্কৃতের প্রভাব :—

কুলীন-কুলসর্বস্বের আরম্ভ অর্থাৎ নান্দী ও প্রস্তাবনা সংস্কৃতের সম্পূর্ণ অনুকরণ। নান্দীর "শিশু শশী শোভে ভালে" ইত্যাদি বাক্যের শিব-বন্দনা শকুন্তল-নাটকের "যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা" প্রভৃতি শিব-বন্দনাত্মক শ্লোক স্মরণ করাইয়া দেয়। সংস্কৃত নাটকের মতো "নান্দ্যন্তে সূত্রধার" রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে। সূত্রধারের উক্তিতেই নাটকের কথা-মুখের স্থাপনা হয়। "বিবাহ নির্বাহ বিধি বিধির ঘটনা।" এই কথারই সূত্র ধরিয়া কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন এবং ঠিক এখান হইতেই তিনি নিজের স্বগতোক্তি শুরু করেন,—"বিবাহ-নির্বাহ-বিধি বিধির ঘটনা। সত্যকথা যথার্থ, মিথ্যা নয়, সঙ্গত বটে। আমি বন্দ্যঘটীয় কেশব চক্রবর্তীর সন্তান, প্রধান কুলীন, আমার কন্যাদিগের বিবাহ হয় নাই, অদ্যাবধি তাহাদের প্রতি বিধি প্রতিকূল থাকায় সমযোগ্য পাত্র প্রাপ্ত হইতেছি না, তাহাতেই নিতান্ত চিন্তিত আছি।" ইত্যাদি। ইহা আমাদিগকে মুদ্রা-রাক্ষস নাটকের আরম্ভটি স্মরণ করাইয়া দেয়,—

সূত্র :— "ক্রূরগ্রহঃ স কেতু
শ্চন্দ্রসম্পূর্ণমণ্ডলমিদানীম্।
অভিভ[illegible]তুমিচ্ছতি বলাৎ······

ইত্যর্দ্ধোক্তে নেপথ্যে— আঃ ক এষ ময়ি স্থিতে······

(ততঃ প্রবিশতি মুক্তাং শিখাং পরামৃশন্ চাণক্যঃ)

চাণক্য :—কথয় ক এষ ময়ি স্থিতে চন্দ্রগুপ্তমভিভবিতুমিচ্ছতি :

আস্বাদিত-দ্বিরদ-শোণিত-শোণ-শোভাং
সন্ধ্যারুণামিব কলাং শশলাঞ্ছনস্য।
জৃম্ভা-বিদারিত-মুখস্য মুখাদ্ স্ফুরন্তীব
কো হর্তুমিচ্ছতি হরেঃ পরিভূয় দংষ্ট্রাম্॥"

২। সংস্কৃত নাটকে মাঝে মাঝে উৎকৃষ্ট কবিত্বপূর্ণ প্রকৃতি-বর্ণনা থাকে, কেননা সংস্কৃত নাটক দৃশ্য-কাব্য, যথা,—

"যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনা
মাবিষ্কৃতোঽরুণ-পুরঃসর একতোঽর্কঃ।
তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ্যাং
লোকে নিয়ম্যত ইবাত্মদশান্তরেষু॥

অপিচ,—

অন্তর্হিতে শশিনি সৈব কুমুদ্বতী মে
দৃষ্টিং ন নন্দয়তি সংসরণীয়শোভা।
ইষ্ট-প্রবাসজনিতান্যবলাজনস্য
দুঃখানি ন্যূনমতিমাত্র সুদুঃসহানি॥"

—অভিজ্ঞান-শাকুন্তলম্, ৪র্থ অঙ্ক

রামনারায়ণও সংস্কৃতের আদর্শে মাঝে মাঝে প্রকৃতিবর্ণনা করিয়াছেন, "একি মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত। সহস্র-কিরণ সূর্য প্রচুর কিরণ প্রদানে আপনার সহস্র-কিরণ নামই কি সার্থক করিতে উদ্যত হইয়াছেন? এক্ষণে অনবরত পথ-পরিশ্রান্ত ও দিনকর-কিরণে নিতান্ত ক্লান্ত পান্থ লোকেরা সন্তাপ-শান্তি-নিমিত্ত ছায়া-প্রধান পাদপ-তলে পল্লব-শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা ভজনা করিতেছে। মহীরূহচয় একান্ত পবন-পাত-বিরহে সজ্জন-মানসের ন্যায় চাপল্য পরিত্যাগ করিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছে। বরাহগণ পল্বল-পঙ্কে সর্বাঙ্গ নিলীন করিয়া রহিয়াছে…"

—কুলীনকুলসর্বস্ব, ১ম অঙ্ক

৩। হাস্যরস সৃষ্টি করিতে গিয়া রামনারায়ণ স্থল-বিশেষে মৃচ্ছকটিকের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন,—

"দ্রৌপদী কান্দিয়া কহে বাছা হনূমান।
কহ কহ কৃষ্ণ কথা অমৃত সমান॥
পরীক্ষিত কীচকের করিয়া সংহার।
সিংহাসন অধিকার করিল লঙ্কার॥
জানকীর কথা শুনে হাসে দুর্যোধন।
সপ্তাহ মধ্যেতে হবে তক্ষক-দংশন॥

—কুলীনকুলসর্বস্ব, ৬ষ্ঠ অঙ্ক

ইহার সহিত তুলনীয়,—

"শূলে বিক্কন্তে পাণ্ডবে? শেদকেত
পুত্তে লাধাএ? লাবণেইন্দপুত্তে?
আহো কুন্তীএ তেণ লামেণ জাদে
অশ্বখামে? ধম্মপুত্তে জড়াউ॥

—মৃচ্ছকটিকম্, ১ম অঙ্ক, ৪৭ শ্লোক

কিন্তু সংস্কৃতের এই প্রভাব বহিরঙ্গ মাত্র। কেননা নাটকের ঘটনা-সৃষ্টি ও চরিত্র-চিত্রণে সংস্কৃত শৈলীর প্রভাব আদৌ দৃষ্ট হয় না। সেদিক দিয়া রামনারায়ণ সমসাময়িক যাত্রার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন অনেকখানি।

১। কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকে পয়ার-ত্রিপদীর উক্তি-প্রত্যুক্তি পরিমাণে কম নহে, বরং অনেক বেশী। রামনারায়ণের উপর উহা সমসাময়িক যাত্রার প্রভাব।

২। যাত্রার মধ্যে যে অশ্লীলতা ও ভাঁড়ামি উহাকে বিকৃত করিয়া তুলিয়াছিল, রামনারায়ণ তাহার হাত হইতে অব্যাহতি পান নাই। আর এই অশ্লীলতা বা ভাঁড়ামি যাত্রার মধ্যে সময়ে অসময়ে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক ভাবে আমদানি করা হইত; (উদ্দেশ্য থাকিত ইতর জনগণের কদর্য রুচি চরিতার্থ করা।) কুলীনকুলসর্বস্বেও রামনারায়ণ তাহাই করিয়াছেন। কুল-পালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ের বিবাহ, নাপিতানীর প্রয়োজন। কিন্তু বিধবা নাপিতানীর লাম্পট্যের ইতিহাস সঙ্কলন মূল নাট্যকাহিনীর পক্ষে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় এবং অশোভন। রসিকা নাপিতানীর উক্তি,—

"ভালবাসে সবে অতি আমি শুদ্ধমতি সতী,
রজনীতে নাহিক কামাই॥
এ বয়সে পতি নাই, তাইত পাড়ায় যাই,
পোড়া পেট পুরাবার আশে।
বসিয়া না পাই খেতে, সেই হেতু হয় যেতে,
সে থাকিলে কেটা আর আসে॥"

—কুলীনকুলসর্বস্ব

ইহার সহিত তুলনা চলিতে পারে একমাত্র বিদ্যাসুন্দর-যাত্রার মালিনীর উক্তির,—

"পাড়ার যত পোড়ারমুখো, বাছেনা ফুটো অফুটো,
যা পায় গোটাক দুনো, আনা গোনা করে এসে॥
মালী বিনে বাগান গেল, পুনঃ জমি জমা হলো,
কে চাষ করে বল, মরি আপশোষে···

—ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-প্রকাশিত বিদ্যাসুন্দর, পৃষ্ঠা ১৩

৩। শোক দুঃখাদির প্রকাশের বেলা যাত্রায় অলঙ্কারপূর্ণ বাক্যে, উচ্ছ্বসিত দীর্ঘ উক্তি-প্রত্যুক্তি থাকে। কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকে প্রায়ই এই ধরনের দীর্ঘ খেদোক্তি আছে,—

"ব্রাহ্মণী। (অধোমুখে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) ওমা শাম্ভবি, তোর এ কথার কি উত্তর দিব? তার নিমিত্তে আমি বলেছিলাম গো, বলেছিলাম, সেই মিন্সেরে, বলি হেদে ভাল করে দেখে মেয়ে গুলোর বে দিস্, তা বাছা, আমি বল্যে কি হবে? সে কুল খোঁজে, বলে কুল থাকলেই সব থাকে। আরো দেখ, মেয়েদের জাত রক্ষা, প্রথমে মা বাপ করে, বাপ না করিলে রাজা, রাজাও যদি না করে, তবে বিধাতা আপনিই রক্ষা করেন। তা বাছা, তোদের তারা কুলের গন্ধে অন্ধ রহিয়াছে, এখনকার যে রাজা তিনি আবার প্রজার ধর্মে হাত দেন না, অভাগ্য আর কি! পূর্বে এক রাজা ছিল, তার নাম বল্লাল, সে মিন্‌সে সকলের জাত নষ্ট কত্যেই এই কাল কুলের সৃষ্টি করেছে। আর আমাদের জাত যায় বিধাতারও এই ইচ্ছে, সেইত ঐ জন্য বল্লাল মিন্‌সেকে রাজ্য দেয়। তবে মা-বাপ রাজা ও বিধাতা, এরা সকলে যখন জাত নষ্ট কত্যে বসেছে, তবে জাত-রক্ষা আর কে করবে মা?……"

৪। যাত্রার ন্যায় ইহার কাহিনীও সরল, সংক্ষিপ্ত। যাত্রার কাহিনী-বিন্যাসের সহিতই ইহার সামঞ্জস্য বেশী। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন। সুতরাং বৃন্দাবনে আজ বিরহ। অতএব যাহার বিরহ হইতে পারে সবাইকে একে একে টানিয়া আনিতে হইবে। একজনের বা একদলের কান্নার পালা শেষ হইলে আর একদল আসিবে। তাহারা কাঁদিয়া গেলে নূতন দলের কান্নার পালা। কৃষ্ণকমলের দিব্যোন্মাদ যাত্রা। যশোমতী ও সখীগণের কান্না শেষ হইলে রাখালগণ কাঁদিতে কাঁদিতে আসে। তাহারা চলিয়া গেলে বিশাখাদি সখীগণকে সঙ্গে লইয়া রাধা প্রবেশ করেন। বিষয় কিন্তু এক,—শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন। তেমনি কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকের বিষয় হইল কৌলীন্য প্রথার কু-ফল দেখান। সুতরাং বহু-বিবাহ-ব্যবসায়ী কুলীনগণের অনাচার-ব্যভিচারের বর্ণনা করিতে হইবে। বিলম্বিত-যৌবনা কুলীন-কুমারীগণের অনুতাপ শুনাইতে হইবে। বিবাহিতা কুলীনকন্যাদের পতি-নিন্দা এবং দুর্ভাগ্য-বর্ণনার হাট বসাইবার প্রয়োজনও আছে। যাহা লইয়া একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করা যাইত, রামনারায়ণ তাহা কথোপকথনের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। ইহাকে নাটক বলা যায় না, কেননা সুগঠিত

কোনো নাট্য-কাহিনী ইহার মধ্যে নাই। বিকশিত বা বিকশমান চরিত্রই এই নাটকে দেখা যায় না।

তাহা হইলে কি কুলীনকুলসর্বস্বে প্রশংসা করিবার কিছুই নাই? নাটকটি তবে অভিনয়-সাফল্য এবং জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল কেন?

উনবিংশ শতকের নব্য বাংলায় সমাজ-সংস্কারের প্রবল সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। রামনারায়ণই প্রথম নাট্যকার যিনি বর্তমান সমাজের বাস্তব-সমস্যাপূর্ণ প্রখর কদর্যতা উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। কুলীনকুলসর্বস্বের জনপ্রিয়তা উৎকৃষ্ট নাটক বলিয়া নহে। উহা সমাজের অনাচারের রূঢ় সমালোচনা। সুতরাং এই কারণেই জাগ্রত জনমন উহাকে অত ভালবাসিয়াছিল। কুলীনকুলসর্বস্বের মধ্য দিয়া সাহিত্যে যে সমাজ-সংস্কার আন্দোলন শুরু হইল, পরবর্তী কালে তাহাই মাইকেল-দীনবন্ধুর প্রতিভার স্পর্শে উৎকৃষ্ট নাট্য ও প্রহসন সৃষ্টি করিল।

যাত্রার অপ্রয়োজনীয় সঙ্গীত-বাহুল্য, অকারণ উচ্ছ্বাস-প্রবণতা প্রভৃতি রামনারায়ণ ত্যাগ করিলেন। স্বীকার করি যে রামনারায়ণের রচনার মধ্যে প্রচার অতি-প্রচারে পর্যবসতি হইয়াছে, কিন্তু রামনারায়ণের অভিনবত্ব এইখানে যে তিনিই সর্বপ্রথম নাটকে রক্তমাংসের মানুষ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। বাস্তবতা-গুণ রামানারায়ণের নাটকেই সর্বপ্রথম দেখা গেল। পরবর্তী কালে দীনবন্ধুর নাট্য-প্রহসনে ইহা সংক্রামিত ও পূর্ণ-বিকশিত হইয়াছে।

রামনারায়ণের নাটকে সমাজের উচ্চস্তরের লোকের ভাষায় স্বাভাবিকত্ব নাই। সংস্কৃত যাত্রা ও কথকতার আলঙ্কারিক বর্ণনা-রীতি সেখানে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু যেখানে নিম্নস্তরের লোক লইয়া রামনারায়ন হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন, সেখানে ভাষা স্বাভাবিক ও চরিত্র অনেকখানি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। আবার চাকর-বাকরাদির মুখে নিম্নস্তরের জনগণের কথ্য ভাষার প্রয়োগ তিনি করিয়াছেন। এই দিক দিয়া তিনি মধুসূদন ও দীনবন্ধু মিত্রের ("একেই কি বলে সভ্যতা?" পুঁটি-হানিফ্ প্রভৃতির) ভাষার পথপ্রদর্শক। খানিকটা উদাহরণ দিতেছি,—

"সুমতি। (শিশুর প্রতি) বাছা একবার ডাক্‌না, মত্যে গেল কোথা? ফলারের নেমন্তন্ন হয়েছে, বেলাবেলি ছেলেটা নে যাক্‌না কেন?

শিশু। ও মা কাকে ডাক্‌ব? কে নে যাবে মা!

সুমতি। সেই মিন্সেকে ডাক্, থাকে থাকে নিউদ্দেশ হয়।

শিশু। কোন্ মিন্সেকে মা ? যে আমাদের ঘর ছেয়েছিল ?

সুমতি। না, না, তাকে কেন ?

শিশু। তবে আবার কোন্ মিন্সেকে ডাক্‌ব ?

সুমতি। সেই কত্তাকে রে, কত্তাকে, ছেলেটাও তেম্নি।

শিশু। কোত্তাকে, তাই বলনা কেন। আয় তু তু তু।

সুমতি। (সক্রোধে) নারে, পোড়াকপালে ছেলে, কুকুরকে কেন ?

শিশু। (সরোদনে) আঁ আঁ তুই যে বল্যি কোত্তাকে, তবে আবার কোত্তা কে ?

সুমতি। সেই তোদের তাকে।

শিশু। (সাভিলাষে) ওমা, আমাদের তাকে কি আছে মা ? বল্‌না মা বল।

সুমতি। কি দায় হোলো, এখানেও কেউ নেই যে বলে দেয়।"

—কুলীনকুলসর্বস্ব, ৫ম অঙ্ক

উপরি-উদ্ধৃত অংশে দেখা যাইতেছে গ্রাম্য হিন্দু-কুলবধূ যে ভাষায় কথা বলে ঠিক সেই ভাষাই তাহার মুখে দেওয়া হইয়াছে। স্বামীর নাম বলিতে নাই। "তোর বাবাকে ডাক," একথাও ছেলেকে বলা যাইবে না। ছেলেও ঠিক বুঝিতেছে না। স্বামীকে যে মিন্সে বলে তাহা শিশু জানে না। সে 'মিন্সে' অর্থে বুঝিয়াছে 'দিনমজুর'। 'কর্তা' স্থলে সে ধ্বনি-সাদৃশ্যে বুঝিল 'কুত্তা'। 'তাকে' মানে 'তাহাকে'। ইহাও যে স্বামীর নাম না ধরিয়া তাহাকে বুঝাইবার একটি উপায় মাত্র, শিশু তাহা বুঝিবে কি করিয়া ? সুতরাং 'তাকে' অর্থে তাহার মনে আসিল 'আলমারী বা ঘরের তাক্।' তাহাই স্বাভাবিক। তাকের সঙ্গে শিশুর পরিচয় ঘনিষ্ট। মায়ের স্বামীর নাম উচ্চারণে বাধা এবং শিশুর অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া নাট্যকার এই কৌতুকাবহ দৃশ্যটির কল্পনা করিয়াছেন। ইতরতা বা অশ্লীলতা ইহার ভিতরে নাই। সুতরাং রামনারায়ণের নাটকেই আমরা ভাঁড়ামি-মুক্ত বিশুদ্ধ হাস্যরসেরও উদাহরণ প্রথম পাইতেছি।

এই অঙ্কেই দুষ্ট-চরিত্র-সৃষ্টির নিপুণতা তিনি দেখাইয়াছেন। নাট্যকার যেন চরিত্রগুলি দেখিয়া দেখিয়া ফটো তুলিয়াছেন। উদরপরায়ণ এবং তাহার স্ত্রী সুমতির আলাপের খানিকটা অংশ তুলিতেছি,—

"উদর। (সুমতির প্রতি সক্রোধে) কি এমন যোগ্যতা! একেবারে রাস্তার উপর! লজ্জা নাই? ভাদ্রমাসের তালের মত কীল না পেলে বুঝি হবে না? এই চারিদিকে পুরুষ, এখানে আসা, দেখ্‌বি একবার?

শিশু। বাবা, মা তোকে ডাকৃতে এয়েচে।

উদর। আমাকে ডাকৃতে এসেছে কি আর কাকে ডাকৃতে এসেছে তার নিশ্চয় কি?

সুমতি। (সভয়ে) ফলারের কথা বল্‌তে এসেছি।

উদর। (সানন্দে) আঁা, কি বলি্য? নিকটে আয়, নিকটে আয়, এখানে কেহই নাই। এত লজ্জা কি? ভাল তুই ত আর নব-বধ্বাগমের বৌ নোস্‌। (সুমতিকে নিকটে আনিয়া) কি বল্‌ দেখি, ফলার জুটেছে, বলিস্‌ কি? নিমন্ত্রণ না অনিমন্ত্রণ?"

উদ্ধৃত অংশে নাট্যকারের মনস্তত্ত্ব-জ্ঞানের পরিচয় রহিয়াছে অনেকখানি। প্রথম উদ্ধৃতির ভিতর সুমতির উক্তি,—"সেই মিন্সেকে ডাক, থাকে থাকে নিউদ্দেশ হয়।" এই "থাকে থাকে নিউদ্দেশ হয়" বাক্যটির ভিতর দিয়া দুশ্চরিত্র স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অশ্রদ্ধা এবং অন্য নারী তাহার স্বামীকে ছিনাইয়া লওয়ার জন্য সেই অজানিতার প্রতি আক্রোশ, দুইটারই ব্যঞ্জনা হয়। ওদিকে স্বামীর মনোভাবও একই প্রকার। স্ত্রী সচ্চরিতা হইলেও লম্পট পুরুষ তাহাকে অন্যাসক্তা বলিয়া সন্দেহ করে। তাই মার-পিট করিয়া তাহাকে সংযত শাসনে রাখিতে চাহে। নিত্য-কলহের মধ্য দিয়া যে এই দম্পতীর জীবন অতিবাহিত হয়, এক বাক্যেই তাহা সুন্দর ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে,—"কি এমন যোগ্যতা! একেবারে রাস্তার উপর! লজ্জা নাই? ভাদ্রমাসের তালের মত কীল না পেলে বুঝি হবে না।" স্ত্রীও জানে যে ঠিক এই সময়ে কোন্‌ কথা বলিতে হইবে। উদরপরায়ণ দরিদ্রের ভোজন-লোলুপতা তাহার চরিত্রের প্রধান দুর্বলতা। এইটি দুশ্চরিত্রতারও উপরে। তাই পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করিবার জন্য স্বামীর চরিত্রজ্ঞা স্ত্রী ঠিক উপযুক্ত কথাটিই পাড়িল। ফলারের লোভে আত্মহারা স্বামী এবার স্ত্রীকে অধিকতর আদর করিয়া ফলারের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। যেখানে ছোট ছোট কথার মধ্য দিয়াও চরিত্রের মর্ম-রহস্যটি প্রকাশ করা হয়, সেখানেই সংলাপ-সৃষ্টি সার্থক হইয়াছে বলিতে হইবে।

এই অর্থে রামনারায়ণ নাটকের প্রথম সার্থক সংলাপ-স্রষ্টা। অবশ্য সংলাপ তাঁহার নাটকের সর্বত্র নাই।

এবার চাকরের মুখের ভাষার নমুনা দিতেছি,—"ঐ উত্তরের বাড়ির মুই খ্যানাকাট্টী গেহালাম, এস্‌তেই এস্‌তে বড় মোশাই বল্যে ওরে ভোলা তুই যা., পুরুত ঠাকুরের ডাকি আন, তা এই মুই অদ্দূরে থাকি আলাম, তামাক খাতিও পালাম না, এট্টু জিরুতিও পালাম না, তাইতে মোদের বউ বলে, হালো, বলে চাকুরি না ককুরি, তা খাতি পত্তি পাইনে, না করে কি কব্বো? মুনিব ঝা বলে, তা না কল্যে মাইনে দেবে কেন?"

ইহাই আধুনিক বাংলার প্রাকৃত ভাষা, অর্থাৎ কোনো কোনো অঞ্চলের নিরক্ষর জনগণের মুখের ভাষা। এখানে শুধু ভাষার অনুকরণই করা হয় নাই, চরিত্রও ফুটিয়া উঠিয়াছে সুন্দর ভাবে। দিন-মজুর জীবনের দায় ঠেকিয়া প্রভুভক্তি ও নিরন্তর অবসরহীন খাটুনির সঙ্গে দাম্পত্য-জীবনের সমবেদনাপূর্ণ ভালবাসার ইঙ্গিতও এই কয়টি বাক্যে ফুটিয়া ওঠে।

এইবার রামনারায়ণের অর্ধ-সার্থক চরিত্রগুলির দুই একটির সমালোচনা করিব। এই চরিত্রগুলিকে অর্ধ-সার্থক বলিতেছি এইজন্য যে অতি-প্রচারবাদের ফলে এই চরিত্রগুলি অনেক সময়ে অসার্থক হইয়া উঠিয়াছে। নাট্যকারের মুখের কথা ইহাদের মুখে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। চরিত্রের সঙ্গে সমালোচনামূলক সেই উক্তিগুলির সামঞ্জস্য নাই। তবুও মাঝে মাঝে ইহাদের চরিত্রের স্বাভাবিকতা ভালই ফুটিয়াছে। ঘটক অনৃতাচার্য এই ধরনের চরিত্রের একটি দৃষ্টান্ত।

শুভাচার্য, সুধীর, ও অনৃতাচার্য তিনটি ঘটকের সম্মিলন। ইহার মধ্যে শুভাচার্য সত্যকার ঘটক। অনৃতাচার্য স্বার্থপর, মূর্খ, হীন প্রতারক। উভয়ের এই চরিত্র যদি তাহাদের আচরণ ও বাক্যে প্রকাশ পাইত তাহা হইলে সার্থক চরিত্র সৃষ্টি হইত। কিন্তু তাহা ঠিক হয় নাই। অনৃতাচার্য প্রবেশ করিতেছে। এখনও সে কোনো কথা বলে নাই। তাহাকে দেখিয়াই সুধীর বলিতেছে,...

"আয়াতি জাতিকুলবিপ্লব-ধূমকেতুঃ
সেতুর্বিবাহ-ঘটনাম্বুধি-পারহেতুঃ।
অর্থামিষার্থমনপেক্ষিত-ধর্মকর্মা
চূড়ামণি র্বিতথবাগনৃতার্য শর্মা॥"

—কুলীনকুলসর্বস্ব, ২য় অঙ্ক

অনৃতাচার্যের চরিত্র সম্বন্ধে অন্যের এই উক্তিটি আমাদের মনে পূর্ব হইতে একটি বিশেষ সংস্কার জন্মাইয়া দেয়। সুতরাং আমরা আর মুক্ত দৃষ্টিতে তাহার বিচার করিতে পারি না। এই চরিত্রটি যে বিশেষ কোনো সম্প্রদায়কে নিন্দা করিবার জন্যই নাট্যকার পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহাই তখন প্রকট হইয়া ওঠে। আবার অনৃতাচার্য যেখানে নিজের বিদ্যার পরিচয় দিয়া শুভাচার্যের কুল পরিক্রমা করিতেছে,—

> "সেই কিম্নুরায়ের পুত্র হরিনাথ, হরির পুত্র মহেশচন্দ্র, মহেশের পুত্র নিমাইচরণ, নিমাইয়ের পুত্র বলরাম ও রামরাম, বলরাম নিঃসন্তান, রামরামের পুত্র গোকুলচন্দ্র, তাহার পুত্র কেশব, শংকর ও গংগাধর তন্মধ্যে গংগাধর নিঃসন্তান, শংকরের পুত্র শ্যামসুন্দর, তাহার পুত্র বৈদ্যনাথ, তিনিও নিঃসন্তান, অতএব গংগাধর ও শংকরের বংশ নাই। কেশবের পুত্র হরিহর ও কবিবর মাতামহ সম্পর্কে গৌহাটীতে বাটী করিয়াছিলেন, হরিহরের পুত্র মাধবচন্দ্র, তিনি ত্রিপুরায় উঠিয়া যান, সেই মাধবের পাঁচ পুত্র—শঙ্করাচার্য, ব্যাসাচার্য, জ্ঞানাচার্য, ধর্মাচার্য ও কুশলাচার্য। সেই কুশলাচার্যই তোমার পিতামহ, কেমন হইয়াছে কি না? আমি কি জানিনা, পঞ্চগোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই, ইহা ছাড়া বামন নাই, আমার অবিদিত কোন ঘর আছে?—"

তখন তাহার প্রতারক ঘটক-মূর্তি ভালভাবেই ফুটিয়া ওঠে। সাধারণতঃ বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি কুলকর্মে সাত পুরুষের নাম এবং প্রবরাদি জানার প্রয়োজন হয়। আদি বীজী পুরুষ হইতে বংশের কোনো শাখা কখন বিচ্ছিন্ন হইল, তাহা খুঁটিনাটি ভাবে মনে রাখা সম্ভব নহে। ঐ তালিকা ঘটকের কণ্ঠস্থ থাকে। স্বার্থপর প্রতারক যে ঘটক, সে বড় জোর যতদূর পর্যন্ত পিতৃপুরুষের পরিচয় যজমানের জানা থাকে ততদূর পর্যন্ত ঠিক ঠিক মুখস্থ রাখে; তারপরের উর্ধ্বতন পুরুষদের কথা নিজের কল্পনার দ্বারা পূর্ণ করে; অনেক কুলীনকে অকুলীন এবং অনেক অকুলীনকে অর্থাদিলোভে কুলীন করিয়া দেয়। যেমন অনৃতাচার্য বলিতেছে,—

> "আমি এসকল শিখিয়া ও এসকল গুণে ভূষিত হইয়াই ঘটক চূড়ামণি নামে খ্যাত আছি। আমার গুণের কথা কত কহিব—আমি সাবর্ণ-গৃহে কত শত কৈবর্ত-কন্যা চালায়েছি, শুদ্ধশ্রোত্রিয় বরে ক্ষত্রিয়কন্যা, বিষ্ণু-ঠাকুরের বংশে বৈষ্ণব-কন্যা, শিব চক্রবর্তীর সন্তানে

পদ্মরাজদুহিতা ঘটায়েছি, আর কানা, খোঁড়া, অন্ধ, আতুর এ সমস্ত তো আমার শরীরের আভরণ।"

কিন্তু চরিত্রটির অসঙ্গতি কোথায় ?

যে ব্যক্তি অন্যের আদি-পুরুষের নাম পর্যন্ত মুখস্থ রাখিয়াছে, সে নিজের বাবার নাম বলিতে পারে না। অবশ্য যদি ধরিয়াও লই যে অনেক কুলীনেরই (রামনারায়ণের মতে ও শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে' অনুসারে) জন্মদাতা পিতার খোঁজ ছিল না, তবুও যে ভদ্রলোক ঐ সন্তানের জননীকে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার নামে সন্তানটি অবশ্যই পরিচিত হইত। অনৃতাচার্য কি করিয়া সেই পিতার নাম ভুলিয়া গেল ? তবে এমনও হইতে পারে যে অনৃতাচার্যের কুল খুব উন্নত ছিল না। কিন্তু যে ব্যক্তি সাবর্ণ-গৃহে কৈবর্ত-কন্যা চালাইতে পারে সে কি নিজের একটি বিরাট কুলপরিচয় সৃষ্টি করিতে পারে না ? দ্বিতীয় কথা হইতেছে এই যে, যে-ঘটক সত্যই এই সকল অন্যায় কর্ম করে, সে কি তাহা গোপন করিতে চেষ্টা করিবে না, নিজেই ভদ্রলোকের নিকট সেইগুলি প্রকাশ করিবে ? আবার অনৃতাচার্য ঘটকের যে বর্ণনা দিতেছে,—

"প্রবঞ্চনা-পরায়ণ মুখে প্রিয় আলাপন,
ধর্মাধর্মে নাই বিচারণ।
না পাইলে বলে কটু, স্বোদর পূরণে পটু,
দৃষ্টি মাত্র করে সম্ভাষণ॥
বাচাল আচার ভ্রষ্ট, জাতি কুল করে নষ্ট,
দুষ্টমতি মূর্খের প্রবর।
বিবাদে নারদ সম, মূর্তিমান যেন তম,
হয় নয় বল সুধীবর॥"

তাহা বেল্লিক পুরাণে মাৎলামিখণ্ডে লিখিত থাকিলেও কেবল অনৃতাচার্যের মতো ঘটকের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। ইহাকে অনৃতাচার্যের উক্তি হিসাবে নাটকে ব্যবহার করিলে তাহা বে-মানান হইয়া পড়ে। ইহা ছাড়া আরো বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে। বর্তমান প্রবন্ধে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব নহে।

শেষ পর্যন্ত আমরা এইটুকু বলিতে পারি, কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকের দ্বারা সামাজিক সমস্যা-মূলক নাট্য রচনার সূত্রপাত হইল বটে, কিন্তু নিজে উহা

সার্থক নাটক নহে। উহাকে উৎকৃষ্ট প্রহসনও বলিতে পারি না। কারণ প্রহসনের চরিত্রগুলির আভ্যন্তরীণ সঙ্গতি কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকে পাওয়া যায় না। তবে রামনারায়ণের এই নাটকখানিই যে দীনবন্ধু মিত্র ও মধুসূদনের প্রহসনগুলির পূর্বপুরুষ তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই দিক দিয়া নাটকখানির মূল্য অনেক।

কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক রচনার দুই বৎসর পরে উমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে বিধবাবিবাহ নাটক রচনা করেন। উভয় নাটকই সামাজিক হইলেও উহাদের প্রয়োজন এক নহে। কুলীনকুলসর্বস্ব সমাজের একটি অনাচার বলিয়া বিবেচিত প্রথাকে ভাঙ্গিবার জন্য রচনা, বিধবাবিবাহ একটি প্রয়োজনীয় প্রথাকে প্রবর্তন করিবার জন্য সৃষ্টি। উভয়ই প্রচারমূলক সাহিত্য। উভয়ের সমস্যাই বাস্তব। কিন্তু রামনারায়ণ সমস্যাকে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের দ্বারা উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাই তাঁহার রচনায় হাস্যরস প্রধান। উমেশচন্দ্র বিধবাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া তাহাদের দুঃখের করুণ চিত্র রচনা করিয়াছেন। উমেশচন্দ্রের রচনা তাই প্রহসন নয়,—নাটক। উহাই বাংলা সাহিত্যে প্রথম সামাজিক নাটক।

চতুর্থ অধ্যায়

মধুসূদন—দীনবন্ধু

[শর্মিষ্ঠা নাটকে যাত্রা ও সংস্কৃতের প্রভাব বিষয়ে আলোচনা; স্বগতোক্তির স্বরূপ; সংস্কৃত নাটকে ও শেক্স্‌পীয়রীয় ট্রাজেডীতে স্বগতোক্তির প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য; শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী ও কৃষ্ণকুমারী মধুসূদনের নাট্য-প্রতিভা বিকাশের তিনটি স্তর; কৃষ্ণকুমারী মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ নাটক। কৃষ্ণকুমারী সার্থক ঐতিহাসিক নাটক বা সার্থক ট্রাজেডী নহে; কমেডীর শৈলী ট্রাজেডীর সম্ভাবনা নষ্ট করিয়াছে।

দীনবন্ধুর নাটকে উনবিংশ শতকের বাঙালীর জীবনালেখ্য অঙ্কিত হইয়াছে; সমসাময়িক সমাজ-চিত্র অবলম্বনে সার্থক প্রহসন রচনা করেন মাইকেল মধুসূদন; দীনবন্ধু মধুসূদনকে অনুসরণ করেন; নীলদর্পণ বাংলা সাহিত্যে প্রথম নাটক যাহাতে প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজের অত্যাচারের আলোচনা করা হইয়াছে; নীলদর্পণ নাটক হিসাবে সার্থক নহে; দীনবন্ধুর প্রতিভা-সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তির আলোচনা।]

কিন্তু রামনারায়ণের শৈলীকে অবলম্বন করিয়া বাংলা নাট্য-সাহিত্য গড়িয়া উঠিবার অবসর পাইল না। রত্নাবলীর অভিনয় দেখিতে দেখিতে এক দুঃসাহসী যুবক বাংলা নাটকের নবযুগ প্রবর্তনের প্রতিজ্ঞা করিয়া লেখনী ধারণ করিলেন। ইনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁহার প্রণীত শর্মিষ্ঠা নাটক বাংলা নাট্য-জগতে এক বৈপ্লবিক অবদান। অবশ্য শর্মিষ্ঠা নাটকের নাট্যগুণ কতটুকু আছে এবং উহা সংস্কৃত নাট্য-শৈলীকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে কি না, সে বিষয়ে আমরা নিশ্চয়ই আলোচনা করিব। কিন্তু সমস্ত আলোচনার পূর্বেই এই কথা বলা যায় যে, শর্মিষ্ঠা নাটক বাংলা নাটকের গতানুগতিকতা ভঙ্গ করিল; উহা প্রাচীন নাট্য-শৈলীর বিরুদ্ধে সজ্ঞান বিদ্রোহ। পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের নিরুৎসাহ-ব্যঞ্জক নিন্দা* মাইকেলকে সংকল্পচ্যুত করিতে পারে নাই। বিশ্বনাথের সাহিত্য-দর্পণের

---

* মধুসূদন রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে 'শর্মিষ্ঠা'র পাণ্ডুলিপি প্রদান করিলে, তিনি তাঁহার পরিচিত কোন শিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা উহা তাঁহাদের সভাপণ্ডিত বিখ্যাত আলঙ্কারিক প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের নিকট প্রেরণ করিয়া বলেন যে, "যে-যে স্থলে নাটকখানির দোষ আছে, সেই-সেই স্থলে তিনি যেন দাগ দিয়া দেন"·········তর্কবাগীশ হাসিয়া বলিলেন, "দাগ দিতে দেখছি···সে রকম চোখ আর গোটা দুই লোকের আছে, আমরা ফতে হ'য়ে গেলে তোমার বই খুব চলে যাবে, বাহবা বাহবা পড়বে।"—"মধু-স্মৃতি", ২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৯৩

নির্দেশ তিনি মানিবেন না। যদি আদর্শের অনুসরণ করিতেই হয়, তাহা হইলে তিনি ইউরোপীয় নাট্যকারদের আদর্শই গ্রহণ করিবেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, মধুসূদন শর্মিষ্ঠা নাটকে সত্য-সত্যই সংস্কৃত নাট্য-শাস্ত্রের প্রভাব অস্বীকার করিতে পারিয়াছিলেন কি না। অবশ্য মধুসূদনের শর্মিষ্ঠায় কালিদাসের অভিজ্ঞান-শাকুন্তলের প্রভাব অনেকেই অনেকভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ প্রভাব শুধু তাঁহার শর্মিষ্ঠা নাটকেই নহে, সমগ্র নাট্য ও কাব্য-সৃষ্টির মধ্যেই দেখা যাইবে। আমরা দেখিব, সংস্কৃত নাট্য-নীতিকে তিনি কতখানি অস্বীকার করিয়াছেন।

শর্মিষ্ঠা নাটকের বহিরঙ্গের আলোচনা করিলে প্রথমতঃ মনে হইবে ইহাতে সংস্কৃত প্রভাব একেবারেই বর্জিত হইয়াছে। সংস্কৃত নাটকের নান্দী, প্রস্তাবনা, বিষ্কম্ভক প্রভৃতি মধুসূদন নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় মনে করিয়া বাদ দিয়াছেন। এ কাজ অবশ্য সর্বপ্রথম করেন ভদ্রার্জুনের রচনাকার তারাচরণ শীকদার। শর্মিষ্ঠা নাটকের কাহিনীকে অঙ্ক ও গর্ভাঙ্কে মধুসূদন ভাগ করিলেন। ইহাও তাঁহার পূর্ববর্তী তারাচরণ, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি করিয়াছিলেন। তবে কিসের জন্য মধুসূদনের অভিনবত্ব? শর্মিষ্ঠা নাটক প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন বঙ্গ-সাহিত্যে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব ও অভিনবত্ব সোল্লাসে স্বীকৃত হইয়াছিল। বিবিধার্থ সংগ্রহে (১৭৮০ শকাব্দা, মাঘ, পৃষ্ঠা ২৪০) রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিতেছেন—

> …"নাটকরচনার এক প্রধান নিয়ম এই যে তাহাতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হয় তৎসমুদায়কে এক উদ্দেশ্যের অনুকূল হওয়া কর্তব্য, এবং সেই উদ্দেশ্য বর্ণনীয় বিষয়ের মুখ্য ঘটনা। প্রত্যেক গর্ভাঙ্কে সেই মুখ্য ঘটনার উপায় ক্রমশঃ প্রস্তুত হইতে থাকে; তাহা হইলেই অসংলগ্নত্ব দোষের সম্ভাবনা হয় না। উক্ত নাটকে ভয়ানক বর্ণিতব্য হইলেও মধ্যে মধ্যে রহস্যজনক ব্যাপারেরও বর্ণন থাকে, কিন্তু সদ্‌গ্রন্থকারেরা এতাদৃশ কৌশলে তাহার বিনিয়োগ করেন যে তাহাতে রসের অপলাপ হয় না। দত্তজ এবিষয়ে পরমপণ্ডিত। তিনি অনেকগুলি অনাবশ্যক কৌতুক-বাক্য এমন চতুরতার সহিত প্রস্তাবিত নাটকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন যে তাহা কোনো মতে অসংলগ্ন বোধ হয় না।"

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উপরি-উদ্ধৃত মন্তব্য হইতে বেশ বুঝা যায় যে তিনি শর্মিষ্ঠা নাটকের কাহিনী-গত ঐক্য বা সংহতি লক্ষ্য করিয়াছেন। নাটকে কাহিনীর সংহতি অতিবাঞ্ছিত, এবং সেই সংহত কাহিনী সমৃদ্ধ হয় প্রধান চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া। কিন্তু এই কাহিনীর সংহতিটুকু সংস্কৃত নাটকেও সুসম্পূর্ণ ভাবে দেখা যাইবে। সুতরাং শুধু নান্দী-প্রস্তাবনা বাদ দিয়া সুসম্বদ্ধ কাহিনী রচনা ও মনোহারী চরিত্র সৃষ্টি করাই সংস্কৃত নাট্য-শৈলীকে অস্বীকাব করা নহে। নান্দী-প্রস্তাবনা সংস্কৃত নাটকের মূল কাহিনীর অতি অপরিহার্য অংশ নয়। উহার প্রধান সম্পর্ক যে রঙ্গালয়ের সহিত, নাট্যের মূল বিসয়-বস্তুর সঙ্গে নহে, তাহা বুঝিতে বিশেষ কোনো অসুবিধা হয় না। আজ মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্রের দৌলতে নাট্যকারের নাম, অভিনয় আরম্ভের পূর্বে রঙ্গাধিকারীর শুভেচ্ছা, এবং নাট্য-বস্তুর সারাংশ আমরা মুদ্রিত করিয়া বিতরণও করিতে পারিতেছি। এই বিজ্ঞপ্তির অবকাশটুকু সেকালের নাট্যকার যদি নান্দী-প্রস্তাবনার মধ্য দিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে তাহা নাট্যবস্তুর বা অভিনয়ের অবিচ্ছেদ্য বা অপরিহার্য অঙ্গ নহে। সুতরাং বাংলা নাটক হইতে শুধুমাত্র নান্দী-প্রস্তাবনাদি বাদ দিয়াই আমরা সংস্কৃত নাটকের ঋণ অস্বীকার করিয়াছি বলিতে পারি না।

এখন বিপরীতক্রমে দেখা যাউক, সংস্কৃত নাট্য-শৈলীর নিকট মাইকেলের ঋণ কতটুকু। শর্মিষ্ঠা নাটকে সংস্কৃতের প্রভাব স্বগতোক্তির বাহুল্য। সংস্কৃত নাটকে স্বগতোক্তি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার কবে। শুধু সংস্কৃতে নয়, ইংরেজী, নাটকেও স্বগতোক্তির বহুল ব্যবহার আছে। সুতরাং শর্মিষ্ঠা নাটকের স্বগতোক্তি যে সংস্কৃত নাটকের প্রভাবজাত, ইহা প্রমাণ করিতে হইলে ইংরেজী ও সংস্কৃত নাটকে স্বগতোক্তির ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় পূর্বেই করিতে হইবে।

যে কথাগুলি অন্যকে শুনাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই, শুধু নিজের মনে মনে যেগুলির আলোচনা করিতে হইবে, তাহারই প্রকাশের উপায় হইতেছে স্বগতোক্তি। ইংরেজী ও সংস্কৃত উভয় প্রকার নাট্য-শৈলীতে স্বগতোক্তির এই প্রয়োজনকে স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু পার্থক্য শুধু এই প্রয়োজনের মাত্রাবোধে। শেক্‌স্‌পীয়রীয় নাটকে দেখা যায় tragedy-গুলির মধ্যে তিনি যে স্বগতোক্তির ব্যবহার করিয়াছেন তাহা ব্যক্তির সমগ্র অন্তর-সত্তাকে আলোড়িত, বিমথিত করিয়া জীবনের অতি তীব্র, তিক্ত

অভিজ্ঞতা-প্রসূত সত্যরূপে আবির্ভূত হইতেছে। সে সত্য হয়ত বৃহৎ বিশ্বের সার্বজনীন সত্যের সঙ্গে সব সময়ে সামঞ্জস্য রক্ষা নাও করিতে পারে। কিন্তু নিজের চরিত্রও পারিপার্শ্বিকের সাড়া-সঙ্ঘাতে ঐ ব্যক্তির জীবনে ঐ সত্য চরম অভিজ্ঞতা-প্রসূত উপলব্ধিরূপে প্রতিভাত হইয়াছে যাহা তাহার জীবনে অন্ততঃ অস্বীকার করা যায় না। মানুষের জীবনের রঙ্গমঞ্চ হয় তো অসার কথার এবং নিষ্ফল কার্যের বৃথা সমন্বয় না-ও হইতে পারে, অথবা মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি দিন হয় তো নিয়তি-তাড়িত অন্ধ মানবের মনে কর্মের উত্তেজনা সৃষ্টি করাইয়া শেষ পর্যন্ত তাহাকে ধূসর মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া লইয়া না-ও যাইতে পারে, কিন্তু ম্যাক্‌বেথের জীবন দিয়া অনুভূত উহাই চরম সত্য যাহা জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঙ্ঘাতে একদিন ভাষা হইয়া তাহার মুখ দিয়া ফুটিয়া উঠিল। দুই বিরুদ্ধ আদর্শ বা ভাবধারার মধ্যে উভয়েই যখন গ্রহণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তখন কোন্‌টি গ্রহণ করিতে হইবে বা বর্জন করিতে হইবে তাহা লইয়া ব্রুটাসের তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব স্বগতোক্তির ভাষায় ফুটিয়া ওঠে। অথবা বৃহত্তর জগৎ ও জীবনের সঙ্গে নিজের বিশিষ্ট চিন্তা, ব্যক্তিত্ব ও কর্মের সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া মনে যে সন্দেহ-সঞ্জাত জিজ্ঞাসা জাগিয়া ওঠে, হ্যাম্‌লেটের মনে হওয়া-না হওয়া, করা-না করার যে দ্বন্দ্ব নিরন্তর চলিতে থাকে, তাহার প্রকাশ হয় স্বগতোক্তির মাধ্যমে। বস্তুতঃ এই চরিত্রগুলিকে অন্যের সংস্পর্শে আমরা যেটুকু পাই বা বুঝি, তাহা হইতে বেশী বুঝি, যখন তাহাদিগকে নিজেদের অন্তরের মধ্যে নিমগ্ন অবস্থায় পাই। আর তাহাদের এই অবস্থার প্রকাশ স্বগতোক্তিতে। এই চরিত্রগুলি হইতে স্বগতোক্তি বাদ দিলে তাহাদের চরিত্র আমাদের নিকট নিতান্ত দুর্বোধ্য ও অপ্রকাশিত হইয়া পড়ে।

কিন্তু সংস্কৃতে এইরূপ অতি উচ্চ-গ্রামের স্বগতোক্তি দেখি না। কেন? আমার মনে হয়, সংস্কৃত নাট্যকার রসৈকসর্বস্ব নাটক হইতে চারিত্রিক অন্তর্দ্বন্দ্বের অবকাশটুকুই বাদ দিয়াছেন। Tragedy-র নায়কের ব্যক্তিত্ব অতিমাত্র আত্ম-সচেতন। নিজের ধারণা-ভাবনার মধ্য দিয়া যতক্ষণ সে জগৎ ও জীবনকে না পাইতেছে ততক্ষণ কিছুতেই সে তাহাকে স্বীকার করিতেছে না। নিজের বিশিষ্ট আত্ম-সচেতনতার ভারে সে ভাঙ্গিয়া পড়িতেও রাজি। এই অতিমাত্রব্যক্তিত্ববোধ বা আত্ম-কেন্দ্রিকতা অন্তরকে সঙ্কীর্ণ করিয়া তোলে। পারিপার্শ্বিক বৃহত্তর জগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও

নিজের ধারণা-ভাবনা, চলনার মধ্যে সে সামঞ্জস্য খুঁজিয়াই পায় না। তাহার ফলে সে বিশ্বের বৈধানিক ভারসাম্যকে নিজের অজ্ঞাতসারেই লঙ্ঘন করে। সেই লঙ্ঘিত বিশ্ববিধি যে কখন সংক্ষুব্ধ হইয়া তাহার উপর প্রতিশোধ লইয়া যায়, তাহা সে নিজের সমূহ পতনের দিনও বুঝিতে পারে না। অন্যে বুঝাইয়া দিলেও উপেক্ষা করে। অথচ নিজের অমীমাংসিত রহস্য লইয়া সে নিজেরই ব্যথিত অন্তরকে বার বার প্রশ্ন করিতে করিতে স্বগতোক্তির পীড়নে অস্থির করিয়া তোলে। সংস্কৃত নাট্যকারের কিন্তু প্রচলিত সমাজবিধির বিরুদ্ধে অর্থাৎ শ্রুতি-স্মৃতির অনুশাসনের বিরুদ্ধে অস্বীকৃতি-জনিত বিদ্রোহ নাই। দুই বিবদমান আদর্শের সঙ্ঘাত আসিলে তাহার মধ্যে কোন্‌টিকে গ্রহণ করিতে হইবে বা না-হইবে সংস্কৃত নাটকের নায়ক বা পাত্র-পাত্রীর জন্য তাহা নির্ধারিত আছে। সুতরাং তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং তজ্জনিত স্বগতোক্তি সংস্কৃত নাটকে আসিতে পারে না। সংস্কৃত নাটকে উচ্চতর দার্শনিকতা, উন্নত সত্যানুভূতি ও নীতি-গর্ভ উপদেশের অভাব নাই। কিন্তু তাহা যে কোনো ব্যক্তির নিজের চিন্তা ও কর্ম নিংড়াইয়া চারিত্রিক নির্যাস হিসাবে বাহির হইতেছে তাহা বলিতে পারি না। ব্যক্তি সেখানে সার্বজনীন আকাঙ্ক্ষিত আদর্শের মহত্তম প্রতিনিধি। সুতরাং তাহার মুখ দিয়া ব্যক্তিগত অনুভূতি ও চিন্তার কথা না ফুটিয়া ব্যক্তির নৈর্ব্যক্তিকীকৃত সুখ-দুঃখের ভাষাই ফুটিয়া ওঠে।

তবে সংস্কৃত নাটকে স্বগতোক্তির বাহুল্য কোন্ দিক দিয়া? পাত্র-পাত্রী মনে মনে কোনো একটা অভিসন্ধি পোষণ করিতেছে যাহা অন্যের নিকট প্রকাশ করা যায় না অথচ তাহা আত্মজিজ্ঞাসাও নহে, সেই ক্ষেত্রে সংস্কৃতে স্বগতোক্তি আছে। আর আছে বিশেষ ভাবে দৃশ্যাদির কবিত্বপূর্ণ বর্ণনায়। উহা মানুষের চরিত্রের অংশীভূত নহে, কিন্তু উদ্দীপন-বিভাব হিসাবে কাজ করে। সংস্কৃত নাটকে কর্ম-সঙ্ঘাতকে গৌণ করিয়া দেওয়ার জন্য অনেক ক্ষেত্রে ঘটনাগুলিকে মাত্র বর্ণনার বা উল্লেখের দ্বারা সারিয়া লইতে হয়। সেইখানে অনেক সময় পাত্র-পাত্রীর মুখে স্বগতোক্তির প্রয়োজন সংস্কৃত নাটকে হইয়াছে। কিন্তু এইক্ষেত্রে ইংরেজী নাট্য নীরব। যে স্বগতোক্তিতে চরিত্রের বিকাশ এবং তাহার সঙ্ঘাতে ঘটনার অগ্রগতি নাই, ইংরেজী নাটকে তাহা প্রয়োজনীয় নহে। ইংরেজী নাটকে অনেক সময়ে মূক অভিনয়ের দ্বারা যাহা দেখানো যাইতে পারে, সংস্কৃতে, হয় তো দৃশ্যপটের

পটের অভাবের জন্যই, তাহার প্রকাশে স্বগতোক্তির আশ্রয় লওয়া হয়। মৃচ্ছকটিকের শর্বিলক শেক্‌স্‌পীয়ারের হাতে পড়িলে নিশ্চয়ই সিঁদ কাটিয়া চুরি করিবার সময় অতগুলি স্বগতোক্তি করিত না।

উপরে শেক্‌স্‌পীয়রীয় বিষাদান্ত নাটকে যে উৎকৃষ্ট ধরনের স্বগতোক্তির ব্যবহারের কথা বলিলাম, মাইকেলের পরবর্তী অনেক নাট্যকার বাংলা নাটকে তাহা অতি নিপুণভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের চাণক্য-চরিত্র হইতে স্বগতোক্তি বিচ্ছিন্ন করা যায় না। চাণক্য-চরিত্রের একক বৈশিষ্ট্যটুকু তাহার স্বগতোক্তির মধ্য দিয়া যতখানি প্রকাশিত হয়, এমন আর কিছুতেই নহে। বিধাতা ও মানুষ -কর্তৃক নির্যাতিত শক্তিমান মানবাত্মার রোষ ও অভিমানদীপ্ত বেদনা বিচ্ছুরিত হয় তাহার বিজনে উচ্চারিত স্বগতোক্তিতে। পরিত্যক্ত শ্মশানে আসিয়া তাই চাণক্য নিজের সঙ্গে নিজে আলাপ করিয়া মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে। আবার গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'-এ কৌরব-কর্তৃক নির্যাতিত কীচকের দ্বারা দ্রৌপদীর অপমানে ব্যথিত, অবমানিত ভীমসেনের অন্তরের অগ্নিজ্বালা উদ্‌গীরিত হয় স্বগতোক্তির ধূমোচ্ছ্বাসে। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নর-নারায়ণ' ও রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকে কর্ণ ও জয়সিংহ চরিত্রে এই ধরনের স্বগতোক্তির সুসঙ্গত প্রয়োগ অনেক দেখা যায়।

কিন্তু মাইকেল মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের স্বগতোক্তি এই ধরনের নহে। যে সংস্কৃত আদর্শকে তিনি গ্রহণ করিতে চাহেন নাই, তাহারই প্রভাবে পরিবেশ সৃষ্টির জন্য, কোনো আঙ্গিক অভিনয়ের বাচনিক ব্যাখ্যার জন্য বা কাহিনীর কর্মহীন বর্ণনার জন্যই তাঁহার নাটকে প্রায় সবগুলি স্বগতোক্তির প্রয়োগ হইয়াছে। অবশ্য ইহার পরবর্তী 'পদ্মাবতী' নাটকে কলির স্বগতোক্তির মধ্যে অতি সামান্যভাবে শেক্‌স্‌পীয়রীয় স্বগতোক্তির ব্যবহার দেখা যায়।

শর্মিষ্ঠায় সংস্কৃতের আর একটি, এবং বোধ হয় বিশেষ প্রভাব হইতেছে তাহার কাহিনী-বিন্যাস রীতিতে। যেখানে যেখানে ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশে এতটুকু দ্বন্দ্ব জমিয়া উঠিতে পারিত, মধুসূদন তাহা একেবারে এড়াইয়া গিয়াছেন। প্রমাণ স্বরূপ কতকগুলি স্থলের উল্লেখ করা যাইতে পারে। নাটকের আরম্ভটাই ধরা যাক। এই আরম্ভই বলিয়া দেয়, মাইকেল সংস্কৃত নাট্যাদর্শের দ্বারা কতখানি অভিভূত। যে-ঘটনা চরিত্রের সজ্ঘাতে

সৃষ্ট হয় না বা যাহা পরিস্থিতির উপর প্রতিক্রিয়া করিয়া চরিত্র-বিকাশে সাহায্য করে না, তাহা নাটকীয় নহে। শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীর বিবাদ, শুক্রাচার্যের ক্রোধ ও শর্মিষ্ঠার দাসীত্ব প্রভৃতি ঘটনা বিবদমান বিপরীত চরিত্রের সঙ্ঘাতে দ্বন্দ্বীভূত ও উদ্বেল হইয়া উঠিতে পারিত, মধুসূদন তাহা একটা নিছক বর্ণনা দিয়া একেবারে নীরস করিয়া দিয়াছেন। এই বর্ণনা সংস্কৃত নাটকের বিষ্কম্ভক ও প্রবেশকেরই অনুকরণ মাত্র। নাটকটি তাই আরম্ভেই নির্দ্বন্দ্ব। আবার সংস্কৃত নাটকের ভাবসর্বস্ব নায়কের ন্যায় রাজা যযাতি বিদূষক-সহায় হইয়া কাব্যিক ভাষায় নিজের আন্তর-বিলাস লইয়াই ব্যস্ত। কর্মহীন ভাবেরই সেখানে অভিব্যক্তি মাত্র। তারপর দেবযানী-কর্তৃক শর্মিষ্ঠার প্রেম-প্রসঙ্গ আবিষ্কারে যে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারিত, সংস্কৃত নাট্যরীতির অনুসরণের ফলে তাহা নিতান্ত সরল এবং নীরস হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং শর্মিষ্ঠা নাটকে মধুসূদন সংস্কৃতের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

মাইকেলের নাটকের ভাষা বিচার করিলেও সংস্কৃতের প্রভাব ধরা পড়ে। শর্মিষ্ঠার ভাষা সংস্কৃত আলঙ্কারিকতার অনুসরণে নিতান্ত আড়ষ্ট ও প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। উহাতে বাংলা ভাষার স্বাভাবিকতা নাই। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে ভাববহুল, উচ্ছ্বাস-প্রবণ সংস্কৃত ভাষায় আলঙ্কারিকতা যতখানি শোভন, বাংলার সহজ, সরল রীতির ক্ষেত্রে উহা ততই অশোভন। অবশ্য মাইকেল নিজেও যে তাহার ভাষার দৈন্য বুঝেন নাই এমন নহে। কিন্তু তিনি আশা করিতেন, অদূর ভবিষ্যতে তাঁহার ব্যবহৃত ভাষা বাংলায় স্বাভাবিক হইয়া যাইবে।* কিন্তু তাহা হইল না, যেহেতু উহা হইবার নহে। মাইকেলের নাটক-চতুষ্টয়ের ভাষায় সংস্কৃতের এই প্রভাব সমানে চলিয়াছিল। তবে ইহা

---

* "Everyone says it is superior to that book ; as for the Bengali original, the only fault found with it, is that the language is a little too high for such audiences as all may expect now to patronize it. This, I need scarcely tell you, is nothing. If the book is destined to occupy a permanent place in the literature of the country, it will not be condemned on this head, twenty years hence, for every one is learning Bengali."

যোগীন্দ্রনাথ বসু-রচিত 'মাইকেল মধুসূদনের জীবন-চরিত' গ্রন্থের ২৪৭ পৃষ্ঠার উদ্ধৃত মধুসূদনের লিখিত পত্রের অংশ।

সংস্কৃতের প্রত্যক্ষ প্রভাব নহে। সংস্কৃত নাট্য, কাব্য প্রভৃতির কাহিনী, ভাব ও ভাষার প্রভাব বাংলা যাত্রা-সাহিত্যে পড়িয়াছিল, তাহার উল্লেখ পূর্বেই করিয়াছি। মাইকেলের নাটকের ভাষায়ও সংস্কৃতের এই প্রভাব যাত্রা হইতেই আসিতেছিল। অবশ্য নাট্যকার তাহা সচেতন ভাবে গ্রহণ করেন নাই।

শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী ও কৃষ্ণকুমারী মধুসূদনের নাট্য-প্রতিভা বিকাশের তিনটি স্তর। কৃষ্ণকুমারী মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ নাটক। অবশ্য শেক্‌স্‌পীয়ারের বিষাদান্ত নাটকের গাম্ভীর্য দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাত, বলিষ্ঠ চরিত্রাবলীর দৃঢ় প্রকাশ এবং অবশ্যম্ভাবী পরিণতির বেদনানন্দ-বিধুর, মহত্ত্ব ব্যঞ্জক শোচনীয় পরিণাম কৃষ্ণকুমারী নাটকে নাই। তবুও কৃষ্ণকুমারী চরিত্র-চিত্রণ ও কাহিনী-বিন্যাসের দিক দিয়া অনেকখানি ইংরেজী আদর্শকে রূপায়িত করিয়াছিল। শর্মিষ্ঠা রচনায় যাত্রা-সংস্কৃতের নাট্য-রীতির যে আনুগত্য আমরা লক্ষ্য করিলাম, তাহা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকুমারীর ইংরেজী নাট্যাদর্শে উপনীত হইবার সময়ে মধুসূদনকে একবার মধ্য-পথে ইতস্ততঃ করিতে হইয়াছিল। সে তাঁহার পদ্মাবতী নাটকে। শর্মিষ্ঠা হইতে পদ্মাবতীর নাট্য-শৈলীর একটু রূপান্তর হইল। শর্মিষ্ঠা নাটকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে যেমন ঘটনাকে যবনিকার অন্তরালে রাখিয়া নির্দ্বন্দ্ব বর্ণনার দ্বারা কাহিনীকে বিবৃত করা হইয়াছে, পদ্মাবতীতে তাহা হয় নাই। পদ্মাবতী নাটকে চরিত্রের সঙ্ঘাতে ঘটনা-সৃষ্টির একটা নাটকীয় প্রয়াস কোনো কোনো স্থানে দেখা যায়। সেই জন্য এই নাটকে স্বগতোক্তি শর্মিষ্ঠা হইতে অনেক কম। বিষ্কম্ভক-প্রবেশকের সংখ্যাও অল্প। কিন্তু তাই বলিয়া শেক্‌স্‌পীয়রীয় নাট্যরীতির সম্যক পরিচিতির প্রকাশ পদ্মাবতীতে নাই। শেক্‌স্‌পীয়রীয় রীতির কাহিনী-বিন্যাসের একটা বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, ঘটনাটি চরিত্রের বিকাশ হিসাবে ঘটিয়া যায়। নায়ক-নায়িকার অন্তরের মধ্যে বীজাকারে যে বাসনা বা সংস্কার সুপ্ত থাকে, বহির্বিশ্বের সঙ্ঘাতে তাহাই বাহিরে কর্মের আকারে বিকশিত হয়, এবং সেই বীজের উৎপত্তি হইতে উপসংহৃতি পর্যন্ত কাহিনী চলে একটা অচ্ছেদ্য ক্রমবিকাশের ধারায়। পূর্ববর্তী কাহিনী পরবর্তীকে প্রসব করে। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত দৃশ্য হইতে দৃশ্যান্তর বা অঙ্ক হইতে অঙ্কান্তরে যে ঘটনা চলিয়াছে, তাহার প্রত্যেক পরবর্তী ঘটনার আভাস সূত্র-হিসাবেও অন্ততঃ প্রত্যেক পূর্ববর্তী ঘটনায় থাকিবে। পদ্মাবতী

নাটকের আরম্ভের দৃশ্যটির প্রথমাংশ সুন্দর ভাবে নাটকীয়। ঘটনার কাহিনী-আকারে কোনো পূর্ব-বিবৃতি নাই। যে পাত্র-পাত্রী কয়জন উপস্থিত হইল, তাহাদের চরিত্রের সঙ্ঘাতে একটা কিছু ভাবী ঘটনার বীজ উৎপন্ন হইল। শচী, রতি ও মুরজার মধ্যে নারীজনোচিত যে স্বাভাবিক রূপ-গর্ব ছিল, তাহাই নারদের মানস-সরোবর হইতে অবচিত পদ্মের অবলম্বনে পরবর্তী নাটকীয় ঘটনাকে সৃষ্টির পথ করিয়া দিল। বুঝিতে পারিতেছি, রাজা ইন্দ্রনীলের ভাগ্যচক্র এই তিন প্রতিদ্বন্দ্বিনী দেবী দুই বিপরীত দিকে ঘুরাইতে চেষ্টা করিবে। ইহা তাহার সূচনা মাত্র। কিন্তু এই সূচনাকে পরিণতির দিকে লইয়া যাইবার জন্য ঘটনাগুলির যেমন গ্রন্থন প্রয়োজন ছিল, পরে তাহা আর দেখা গেল না। প্রথম দৃশ্য হইতে দ্বিতীয় দৃশ্যের ঘটনায় আসিবার জন্য আমাদের কোনো স্বাভাবিক সূত্র নাই। প্রথমতঃ প্রথম দৃশ্যে শচী, রতি ও মুরজার বিচার যেখানে থামিল, সেখানে রাজা ইন্দ্রনীলকে অত্যন্ত চিন্তিত হওয়া উচিত ছিল। একটা জটিল পরিস্থিতির ভাবী সম্ভাবনা তিনি মনে মনে কল্পনা করিয়া ভীত হইতে পারিতেন। তাহা না করিয়া তিনি বিদূষকের সহিত যে তরল হাস্যরস জমাইয়া তুলিলেন তাহা পূর্ব-পরিস্থিতির গাম্ভীর্যকে অতি লঘু করিয়া দিয়াছে। তারপর দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথম দৃশ্যে হঠাৎ সখীজন-সমভিব্যাহারে পদ্মাবতীর আবির্ভাবের কোনো ইঙ্গিত পূর্বে দেওয়া হয় নাই। ঘটনার ক্রমাগতি এখানে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় নাট্যরস জমিয়া ওঠে নাই। শচী ও মুরজা এই দৃশ্যের মধ্যভাগে পদ্মাবতী-সম্পর্কিত যে ঘটনা বিবৃত করিল, তাহা এই দৃশ্যের আরম্ভে পরিবেশন করিলে ঘটনার পূর্বানুস্মৃতি অচ্ছিন্ন থাকিত। ইহার পর যদি পদ্মাবতীর সঙ্গে রতির সাক্ষাৎ হইত, তাহা হইলে ঘটনা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ক্রমবিকশিত হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই। পরন্তু ইহার পর হইতে একপ্রকার উপকথার আবেশের দ্বারা সমস্ত কাহিনী অভিভূত হইয়াছে। বাহিরের পরিস্থিতির ও অন্তর্দ্বন্দ্বের সঙ্ঘাতে চরিত্র-বিকাশের কোনো লক্ষণই আর দেখা যায় না। অনেক স্থলে কাহিনী পরিস্থিতি ও পাত্র-পাত্রীর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে না। কঞ্চুকী-কর্তৃক পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর-আয়োজনের বর্ণনা ও সখীদের খেদোক্তির মধ্যে গল্পের অতি ক্ষীণ সূত্র থাকিতে পারে, কিন্তু নাটকীয়তা নাই। তৃতীয়াঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে রাজা ইন্দ্রনীলের ছদ্মবেশে

আগমন (শকুন্তলা নাটকের রাজা দুষ্মন্তের আদর্শে কল্পিত) ও পদ্মাবতীর সহিত দর্শন যেমন আকস্মিক, অসম্ভাব্য, তেমনি অতি নাটকীয়; কেন-না, আমরা ইহার কোনো কার্যকারণ-সূত্র নির্ধারণ করিতে পারি না। স্বয়ম্বরে আগত রাজার পূর্ববর্তী ঘটনার সজ্ঘাতে এমন কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই, যাহাতে তিনি ছদ্মবেশ-ধারণের একান্ত প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন। তারপর বণিকবেশ-ধারী রাজা ও সখীরূপে পরিচিতা পদ্মাবতীর মনে পরস্পরের বিষয়ে একটা তীব্র আন্দোলন দেখা দিতে পারিত। শেষে উভয়ের সত্যকার পরিচয়ে বিস্ময়ে উভয়ে অভিভূত হইয়া অবশ্যই যাইতেন। কিন্তু তাহার কোনোও অবকাশ নাই। যেভাবে রাজার আত্ম-প্রকাশ হইল তাহাও অদ্ভুত। একটি পথিককে প্রাণের ভয়ে আর একজন অপরিচিত লোক রাজা ইন্দ্রনীল রায় বলিয়া পরিচয় করাইয়া দিল আর পদ্মাবতীর পিতা তাহার সত্যাসত্য বিন্দুমাত্র অনুসন্ধান না করিয়া তাহাকে পরম আদরে কন্যা সমর্পণ করিলেন! এ সম্বন্ধে কোনো বিতর্কই তাঁহার মনে আসিল না! রাজবুদ্ধিকে ধন্যবাদ! এই গ্রহণের অযোগ্য আকস্মিকতাকে মাইকেল নাটকের অন্যত্র অনেক স্থানে গ্রহণ করিয়াছেন। কলির প্রচেষ্টায় রাজন্যবর্গ ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে মিলিত হইল। বিরাট যুদ্ধ। কিন্তু সমস্ত ঘটনার বর্ণনা কলি একখানি স্বগতোক্তিতে সারিয়া দিলেন। তারপর মহারাণী একটি সারথির কথায় রাজান্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার মনে কোনো দ্বিধা বা সঙ্কোচ আসিল না। সারথি কি তাহা হইলে একজন অতি-বিশ্বাসী পরিজন? অবশেষে, নাটকের পরিণতি। মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রমে পদ্মাবতীর সঙ্গে ইন্দ্রনীলের মিলন। কেন? যেহেতু ভগবতী দেবী শচীকে আদেশ করিয়াছেন। মহাদেবীর এক আদেশেই যদি সমস্ত ঘটনার সমাধান হইয়া যাইবে, তাহা হইলে আরম্ভে আমরা যে চারিত্রিক দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা আশা করিয়াছিলাম, তাহার নাটকীয় বিকাশ কি করিয়া হইবে? আসল কথা, যে নাটকীয় কাহিনী নায়ক-নায়িকার ও তাহাদের পারিপার্শ্বিকের প্রত্যক্ষ চরিত্রের সজ্ঘাত-বিকাশে পরিস্ফুট হয়, মাইকেল তাহা পদ্মাবতী নাটকে দেখাইতে পারেন নাই। এখানে তিনি গ্রীকট্রাজেডীর Deus ex machina-র আশ্রয় লইয়াছেন। পদ্মাবতী নাটকে তাই না-আছে নায়ক, না-আছে নায়িকা। তাই মানব-চরিত্রের কেন; দেব-চরিত্রেরও কোনো বিকাশ নাই। অবশ্য একজন

সমালোচক শচী-চরিত্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন, "শেক্‌স্‌পীয়ারের গনেরিল ও লেডী ম্যাক্‌বেথের ন্যায় শচীর দৃঢ় সঙ্কল্প প্রখর বুদ্ধি, সুচতুর উপায়-উদ্ভাবনী শক্তি, নিষ্করুণ কাঠিন্য, লক্ষ্য করিবার বিষয়।...এবং সকলের আনন্দ-পূর্ণ মিলনের মধ্যে ঈর্ষ্যাদগ্ধ প্রতিশোধ-পরায়ণা অথচ পার্বতী-আদেশে নিরুপায় শচীর ট্রাজেডীর দুঃখপূর্ণ সুর ধ্বনিত হয়।"* আমি আমার পূর্বসূরীর এই অভিমত সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। লেডী ম্যাক্‌বেথের যে সক্রিয় প্রচেষ্টা ম্যাক্‌বেথকে উত্তেজিত ও কর্মপ্রণোদিত করাইয়া নাটকের পরিণতি ঘটাইয়াছিল শচীর মধ্যে সেই সক্রিয়তার প্রতিজ্ঞা মাত্র আছে, তদনুগ কর্ম নাই। শচীর কর্মের ও চরিত্রের অনিবার্য সঙ্ঘাতে সমগ্র নাট্য-কাহিনী সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া ইন্দ্রনীলের ভাগ্য রূপায়িত করিতেছে কি? সত্য বটে, নাটকের মধ্যে উল্লিখিত আছে, কলির সাহায্যে ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে শচী রাজগণকে উত্তেজিত করিয়াছিল এবং পদ্মাবতীকে হরণ করাইয়া নাটকের ঘটনাবলীর এক বিষাদময়ী পরিণতির সূচনা করিয়াছিল। কিন্তু তাহা শুধু বাক্যে,—বর্ণনায়। চরিত্রকে নাটকীয় হইতে হইলে তাহাকে দিয়া শুধু বলাইলে চলিবে না, করাইতেও হইবে। সেই করার প্রকাশরূপেই আসিবে বাক্য। শচীর সমস্ত কর্মকে যবনিকার অন্তরালে রাখিয়া নাট্যকার চরিত্রটিকে অসার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। এবং এই নিষ্ক্রিয়তার জন্যই চরিত্রটি শেক্‌স্‌পীয়রীয় নাটকের নায়িকার মর্যাদা দাবী করিতে পারে না। তাই এই চরিত্রের মধ্যে কোনো ট্রাজেডীর সুরও আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। ট্রাজিক চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। পূর্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। তবুও এখানে প্রসঙ্গতঃ আর একবার বলিতেছি। ট্রাজেডীর নায়কের প্রধান দুর্বলতা হইল তাহার অসঙ্গত, অতিশয় আত্ম-সচেতনতা বা সঙ্কীর্ণতা। তাহার জন্য সে পারিপার্শ্বিক জগৎ ও জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে না। এমন কি তাহার নিজের অন্তরের বিবদমান প্রবৃত্তিগুলির সমাধানও সে খুঁজিয়া পায় না। তাই নিজের অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিত্ব ও অ-সমাহিত চরিত্র লইয়াই সে পারিপার্শ্বিকের উপর প্রতিক্রিয়া শুরু করে। এই প্রতিক্রিয়া তাহাকে অতিরিক্ত কর্ম-প্রবণ করিয়া তোলে। কিন্তু তাহার সমস্ত চেষ্টা ও চরিত্র তাহাকে সমূহ পতনের দিকে

* বাংলা নাটকের ইতিহাস—শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ, পৃষ্ঠা ৩৭-৩৮

লইয়া যায় ; সে পতিত হয়। তবুও তাহার চরিত্রের মধ্যে এমন বিরাটত্ব থাকে, যাহার জন্য সে আমাদের সমবেদনা আকর্ষণ করে। তাহার ব্যক্তিত্বও আমাদিগকে বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় অভিভূত করে। কিন্তু তাহার চারিত্রিক অসঙ্গতি-জনিত পতন আমাদের মনকে মানব-জীবনের শোচনীয় পরাজয়ের আশঙ্কায় ব্যথিত ও ভীত করিয়া তোলে। পদ্মাবতীর শচীর চরিত্র এই ধরনের ট্রাজিক নিশ্চয়ই নহে।

আর একটি বিষয়ের আলোচনা করিয়া পদ্মাবতী-প্রসঙ্গ শেষ করিব। পদ্মাবতী নাটকের উপর সংস্কৃত-প্রভাব অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।* কিন্তু সে-প্রভাব হয় শুধু বিভিন্ন সংস্কৃত নাটক হইতে ইতস্ততঃ শ্লোকের অনুবাদ করায়, আর না হয় সংস্কৃত নাটকের কোনো ঘটনার সাদৃশ্যে স্বীয় নাটকের ঘটনা সৃষ্টি করায়। নহিলে সংস্কৃত নাটকের রসৈকসর্বস্বতা বা পঞ্চ-সন্ধির দৃঢ়-বদ্ধতা, কিছুই মধুসূদনের নাটকে অনুসৃত হয় নাই। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশের মধ্য দিয়া আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত নাট্য-কাহিনীর একটা স্বতঃস্ফূর্ত পরিণতির সূচনা হয়, মাইকেলের পদ্মাবতী নাটকে সেই ধরনের ঘটনা সৃষ্টির সন্ধান মিলিবে না। অবশ্য ইহার অনেকখানি আমরা পাইতেছি মধুসূদনের তৃতীয় নাটক কৃষ্ণকুমারীতে।

আমরা কৃষ্ণকুমারী নাটকের আলোচনা-প্রসঙ্গে আপাততঃ ভুলিয়া যাইব যে, টড্ সাহেবের রাজস্থানের কাহিনী অবলম্বনে একখানি বিয়োগান্ত ঐতিহাসিক নাটক মাইকেল মধুসূদন রচনা করিয়াছিলেন। মনে করা যাক, তিনি একটি মৌলিক কাহিনী রচনা করিয়া উহাতে রূপদান করিয়াছেন। তাহা হইলে দেখিতে পাইব ইংরেজী নাট্যাদর্শে এই নাটক কতটুকু সার্থক হইয়াছে।

আরম্ভটি চমৎকার। আরম্ভে কাহিনীর কোনো পূর্বপরিচিতি বা ভূমিকা নাই। জগৎ সিংহ নামক জনৈক বিলাসী রাজা রাজকার্য অবহেলা করিয়া নারী-ব্যসনে মত্ত। নারী-রূপ-লোলুপতায় সম্ভোগ তাঁহার নিত্য কার্য। এই লাম্পট্য-প্রসঙ্গে তাঁহারই জনৈক ধূর্ত পারিষদ ধনদাস কৌশলক্রমে মেবার-কুসুম রাজনন্দিনী কৃষ্ণার চিত্রপট তাঁহাকে দেখাইল। রাজার অন্তর-নিহিত রূপ-পিপাসা তাঁহাকে প্রণোদিত করিল মেবার-রাজ ভীম

* বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড—ডাঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ৮০

সিংহের নিকট রাজনন্দিনীর পাণি-প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করিতে। রাজ-চরিত্রের এই রূপ-পিপাসা নাটকের বীজ। কিন্তু রাজার রক্ষিতা বিলাসবতীর সখী মদনিকা সখীর মঙ্গলের জন্য, যাহাতে কৃষ্ণকুমারীর সঙ্গে জগৎ সিংহের বিবাহ না হয়, তাহার চেষ্টা করিল। পুরুষবেশে সে ধনদাসকে প্রতারণা করিতেছে। নারীবেশে মরুরাজের দূতী সাজিয়া সে কুমারী কৃষ্ণাকে একখানা ছবি দেখাইয়া বলিল, ইহা মরুরাজ মান সিংহের প্রতিমূর্তি। চিত্রদর্শনে কৃষ্ণার পূর্বরাগ জন্মিল। ওদিকে মদনিকা মরুদেশের রাজা মান সিংহের নিকট কৃষ্ণার পূর্বরাগ-জ্ঞাপক পত্র লিখিয়া মরুদেশের দূতকে কৃষ্ণার বিবাহের ঘটকালির জন্য মেবারে আনাইল। এদিকে কিন্তু রাজা জগৎ সিংহের লাম্পট্যের কাহিনী মেবারে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল; চিত্রদর্শনে রাজা মান সিংহের প্রতি কৃষ্ণার মনোভাবও তপস্বিনীর নিকট ব্যক্ত হইয়া গেল। ফলে তপস্বিনী ও রানী মান সিংহের সহিত কৃষ্ণার বিবাহ দিতে রাজা ভীম সিংহকে অনুরোধ করলেন। রাজা ভীম সিংহ অনেকখানি ইতঃস্তত করিয়া শেষপর্যন্ত জয়পুরের দূতকে বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু অবমানিত ও ক্রুদ্ধ জগৎ সিংহ মেবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ভীম সিংহ মহাবিপদে পড়িলেন। একদিকে সম্মান ও অন্যদিকে রাজ্য দুইটিই এককালে বিপন্ন। শেষপর্যন্ত কন্যার জীবনের মূল্যে তিনি উভয়ই রক্ষা করিলেন। কুমারী কৃষ্ণা নিজের শোণিতে এই রণ-বহ্নি নির্বাপিত করিল। রাজা জগৎ সিংহের রূপ-পিপাসা হইতে যে-কাহিনীর সূচনা, কৃষ্ণার প্রাণ-বিসর্জনে তাহার পরিসমাপ্তি।

কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে বিচার করিলে আমরা দেখিব মধুসূদন কৃষ্ণকুমারী নাটকে ট্রাজেডীর গাম্ভীর্য, ঘটনা-সঙ্ঘাতের তীব্রতা ও চরিত্রের গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। যদিও এই নাটকে চরিত্রের অভিব্যক্তি ও অভিঘাতের ফলেই ঘটনা-প্রবাহ বিচ্ছুরিত হইতেছে এবং সেই বিচ্ছুরিত ঘটনা চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত ও উদ্বুদ্ধ করিয়া নূতন ঘটনা সৃষ্টি করিতেছে, যদিও জানিতেছি যে কৃষ্ণার জীবনের বিষাদময়ী পরিণতির কোনো পূর্বাভাস না দিয়া নাট্যকার অতি সুকৌশলে জগৎ সিহের ও ধনদাস-মদনিকার আশা-আকাঙ্ক্ষা কর্ম-চিন্তার সঙ্ঘাতে এমন একটা ঘটনা সৃষ্টি করিয়া অপরাধহীনা কৃষ্ণার ভাগ্যকে সেই ঘটনার সঙ্গে জড়াইয়া দিলেন, ার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে ঘনাইয়া আসিল কৃষ্ণার মৃত্যু; বুঝিলাম

ঘটনা-প্রবাহের এই অখণ্ডত্ব ইংরেজী নাট্যাদর্শের সার্থক অনুসরণের ফল; তবুও কিন্তু আমাদের প্রশ্ন রহিয়া যায়, নাটকখানি সার্থকভাবে নাটকীয় এবং পরিপূর্ণভাবে ট্রাজেডী হইয়াছে কি না। একটু গভীরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে আমরা দেখিব, তাহা হয় নাই। হয় নাই, তাহার প্রধান কারণ, মাইকেল শেক্‌স্‌পীয়ারের কমেডীর শৈলীতে নাটকটির আরম্ভ করিয়া ট্রাজেডীতে সমাপ্ত করিয়াছেন। তাই এই দুই শৈলীর মধ্যে যে সূক্ষ্ম বিভেদ বা বিরোধ আছে, তাহাই রসাভাস ঘটাইয়া নাটকটির সৌন্দর্য নষ্ট করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ যেখানে যেখানে চরিত্র ও পরিস্থিতির সঙ্ঘাতে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইত, সেই সকল জায়গা তিনি একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। মন্তব্যটি একটু বিশদভাবে আলোচনা করা যাক।

কমেডী ও ট্রাজেডীর পার্থক্য শুধু উহাদের মিলনান্ত ও বিয়োগান্ত পরিণতিতেই নয়। পার্থক্য উহাদের মূল সুরের। জীবনের সহজ, সরল, আনন্দ-চঞ্চল, হাস্য-তরল যে দিক আছে, কমেডীর উপজীব্য তাহাই। সেখানে ঘটনার বৈচিত্র্য বা জটিলতা যতই তীব্র হউক না কেন, জীবন-সংগ্রামের নিদারুণ রূঢ় সঙ্ঘাতের রূপ তাহার মধ্যে নাই, বা জগৎ ও জীবনের বিচিত্র অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া জীবনের মূল্যে মানবাত্মার নৈরাশ্য-বাদাত্মক যে চরম শিক্ষা হয়, কমেডী তাহার রঙ্গশালা নয়। ট্রাজেডীর মধ্যে আমরা মূর্ত দেখি আত্ম-সচেতনতার অহঙ্কার-দীপ্ত অনমনীয় মানবাত্মার অসহায় আত্মবিসর্জনের দৃশ্য। তাই ভয় ও বিস্ময়ে আমরা শিহরিয়া উঠি। ট্রাজেডীর নায়কের মধ্য দিয়া আমরা মানবজীবনের ব্যর্থতা উপলব্ধি করি। তাই ট্রাজেডীর গাম্ভীর্যের মধ্যে তারল্যের অবকাশ নাই। সেই কঠোর নিষ্ঠুর সত্যের রাজ্যে হাল্‌কা হাসির প্রবেশ নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। সমগ্র ট্রাজেডী ব্যাপিয়া একটা কঠোর, সংযত গাম্ভীর্য বিরাজ করে। এই বিষাদঘন, নৈরাশ্যব্যঞ্জক গাম্ভীর্যই ট্রাজেডীর মূল রস। তাই কমেডীর সহিত ট্রাজেডীর মিশ্রণ চলে না। অবশ্য অনেক নাটক আছে যাহার মধ্যে হাসি ও বিষাদ, ট্রাজেডী ও কমেডীর সুর মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেখানেও লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিব, হাসি সেখানে আনন্দের উদ্রেক না করিয়া বেদনাকে আরো বিধুর করিয়া তুলিতেছে। অথবা বেদনা যতই তীব্র হউক না কেন জীবনের মর্মমূলে সে এমনভাবে শিকড় গাড়িয়া বসে নাই, যাহার জন্য

জীবনের অবাঞ্ছিত শোচনীয় পরিণতি ঘটিতে পারে। যেখানে গিয়া পরিণতির যবনিকা পাত হইল, সেখানে গিয়া দেখা গেল, সমস্যার উদ্ভবও যেমন অতি সামান্য কারণে, শুধুমাত্র মানুষের বুদ্ধির চমকপ্রদ কারুকার্যে, সমাধানও তেমনি বুদ্ধির একটি হাস্যোজ্জ্বল ঝলকে। কমেডীর মধ্যে তাই বুদ্ধির খেলা ও মননশীলতার স্থান বেশী ; ট্রাজেডীর মধ্যে চিন্তার চেয়ে হৃদয়াবেগের উদ্বেল সঙ্ঘাত বেশী। হৃদয় সেখানে ব্যক্তিত্ব ও পারিপার্শ্বিকের সঙ্ঘাতে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে। তাই ট্রাজেডীর নায়কের আত্ম-জিজ্ঞাসা, আত্ম-বিশ্লেষণ এবং আত্মসমর্থনের আকাঙ্ক্ষা তীব্র। এই তীব্রতাই নাটককে নায়ক-সর্বস্ব করিয়া তোলে। কিন্তু কমেডীর মধ্যে এমন কোনো সর্ব-নিয়ামক বা সর্বসংঘাতী ব্যক্তিত্ব নাই। সেখানে যাহা কিছু জটিলতা বা দ্বন্দ্ব তাহা সমস্ত চরিত্রের সমবায়ে গঠিত পরিস্থিতির।

এইবার কৃষ্ণকুমারীর বিচারে আমরা দেখিব এই নাটকের মধ্যে কমেডীর রস আদ্যন্ত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

কৃষ্ণকুমারী নাটকে মধুসূদন কাহিনীকে যে ভাবে বিন্যস্ত করিয়াছেন তাহাতে মুখ্য ঘটনা হইতেছে ধনদাস-বিলাসবতী-মদনিকা ও তৎপ্রসঙ্গে রাজা জগৎ সিংহের প্রণয়-কাহিনী। এই প্রণয়-কাহিনীর সঙ্গে একটি অনুগ কাহিনী হিসাবে আসিয়াছে কৃষ্ণা-প্রসঙ্গ। চতুর্থাঙ্ক পর্যন্ত কৃষ্ণা-প্রসঙ্গ পূর্ববর্তী কাহিনীর আওতায় পড়ায় স্ব-প্রধান হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাই পঞ্চমাঙ্কে কৃষ্ণা-প্রসঙ্গের প্রাধান্য এবং কৃষ্ণার আত্মবলির জন্য কোনো পূর্বপ্রস্তুতি নাই। সেইজন্যই সমগ্র নাটক উপচিয়া রসানুভূতির কোনো নিবিড়তা কৃষ্ণকুমারীতে ফুটিয়া ওঠে না। আর এই ধনদাস-বিলাসবতী-মদনিকা কাহিনীর মধ্যে প্রধান আকর্ষণ রাজা জগৎ সিংহের লাম্পট্য বা হৃদয়বতী বারাঙ্গনা বিলাসবতীর যথার্থ প্রেমের ততটা নহে যতটা ধনদাসের কপটতা ও সেই কপটতাকে মদনিকার 'শঠে শাঠ্যং' নীতির দ্বারা জয়ের। তাই ধনদাস ও মদনিকা যতদূর পর্যন্ত নাটকে অধিকার লাভ করিয়াছে, ততদূর পর্যন্ত নাট্যকাহিনীর অন্যান্য সব কিছু উপচিয়া প্রধান হইয়া ফুটিয়া ওঠে চোরের উপর বাটপাড়ী বুদ্ধির তাৎপর্য। রাজা জগৎ সিংহকে ফাঁকি দিয়া ধনদাসের অর্থ-সংগ্রহে এবং বিলাসবতীকে বৃথা প্রবোধ দেওয়ার মধ্য দিয়া তাহার কপটতা-ব্যঞ্জক স্বগতোক্তিতে, আর মদনিকার (শেক্‌স্‌পীয়ারের ভায়োলার মতো) পুরুষবেশ

ধারণ করায়, যে স্বতঃস্ফূর্ত হাস্যরস ফুটিয়া ওঠে, তাহাই নাটকের গাম্ভীর্য ও বিষণ্ণতাকে আচ্ছন্ন এবং পরাভূত করিয়া রাখে। অপরপক্ষে ট্রাজেডীর নায়ক-প্রাধান্য এই নাটকে নাই। রাজা জগৎ সিংহকে শেষপর্যন্ত নায়ক ধরিলে তিনি সার্থক নায়ক নহেন। দেখা যায়, তিনি নিতান্ত নিষ্ক্রিয় এবং ব্যক্তিত্বহীন। কিন্তু মেরুদণ্ডহীন পুরুষ কখনো ট্রাজেডীর নায়ক হইতে পারে না। কেন না তাহার চরিত্রের মধ্যে এমন কিছু মেলে না, যাহার জন্য চরিত্রের তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের সঙ্ঘাতে পারিপার্শ্বিকের প্রবল প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। এই নায়ক-হীনতা কৃষ্ণকুমারী নাটক ট্রাজেডী না হওয়ার আর এক কারণ।

মধুসূদন অবশ্য কৃষ্ণকুমারী নাটকে ধনদাস-বিলাসবতী কাহিনীর প্রাধান্যের জন্য কিছুটা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। কিন্তু তাহা যুক্তি-যুক্ত নহে। তিনি বলিয়াছেন, কৃষ্ণকুমারী কাহিনীতে নাটকীয় ঘটনার অভাব।* কিন্তু টড্ সাহেবের রাজস্থানে কৃষ্ণকুমারী কাহিনী ভালভাবে পড়িলে এই কৈফিয়ৎ শক্তিহীনের জবাবদিহি বলিয়াই মনে হইবে। টড্সাহেবের লিখিত কাহিনী অবলম্বনে ঐতিহাসিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নাটকখানি রচিত হইলে অতি উৎকৃষ্ট ট্রাজেডী রচিত হইতে পারিত।† প্রসঙ্গটি রাজস্থান কাহিনীতে এ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। "মারবারের প্রধান সামন্ত পোকর্ণের অধিপতি সবাই সিংহের সহিত মারবার-পতি মান সিংহের দারুণ মনোবিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। চতুর সবাই সিংহ পূর্বতন মারবার-পতি ভীম সিংহের পুত্র রাজকুমার ধনকুল সিংহকেই মারবারের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির পক্ষে সুবিধা না হওয়ায় যাহাতে জয়পুররাজের সহিত মান সিংহের বিবাদ বাধে তাহারই পথ পরিষ্কার করিলেন। এ সময়ে মেবারের রাজকন্যা কৃষ্ণকুমারীর রূপের কথা রাজপুতনায় প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। সবাই সিংহ বন্ধুভাবে জগৎ সিংহকে জানাইলেন, রাণা

---

* The story of Krishna, though tragic, is barren of incidents."—যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখিত জীবন-চরিত, ১৬০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত, মাইকেল-কর্তৃক কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র।

† Annals and Antiquities of Rajasthan, Vol. I, Coronation Edition,— J. Tod, Chap. XVII.

ভীম সিংহের কন্যা কৃষ্ণকুমারী পরমা সুন্দরী, আপনি তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য রাণার কাছে প্রস্তাব করুন।"* রাণা জগৎ সিংহ বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু মান সিংহও দাবী করিলেন যে, কৃষ্ণকুমারীর সঙ্গে মারবারের মৃত রাজকুমারের বিবাহ হইবার কথা ছিল। সুতরাং ন্যায়তঃ রাজা মান সিংহের সঙ্গেই কৃষ্ণকুমারীর বিবাহ হওয়া উচিত। রাজা জগৎ সিংহ মান সিংহের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া ধনকুল সিংহকে স্থান দিলেন, মারবারের প্রকৃত অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং মান সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। মারবার ও জয়পুর-সীমান্তে উভয়ের সৈন্য সমাবিষ্ট হইল। কিন্তু যুদ্ধের প্রাক্‌কালে অধিকাংশ সামন্ত মান সিংহকে ত্যাগ করিয়া ধনকুল সিংহের পক্ষে যোগদান করিলেন। মান সিংহ ক্ষোভে-দুঃখে আত্মহত্যা করিবার উপক্রম করিলে তাঁহার কয়েক জন বিশ্বাসী সামন্ত তাঁহাকে বাধা দেন। কিন্তু পরাজিত রাজা মান সিংহ রাজধানী পর্যন্ত বিতাড়িত হইলে মারবারের সামন্তগণ দেশের সম্মান রক্ষার জন্য কঠোর হস্তে অসি ধারণ করিলেন। ধনকুল সিংহের পক্ষীয় নবাব আমীর খান মান সিংহের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া ধনকুলকে হত্যা করিয়া মান সিংহের পক্ষে যোগ দিলেন। রাজা জগৎ সিংহ কোনো মতে প্রাণ লইয়া দেশে পলায়ন করিলেন। কিন্তু এখানেই কাহিনীর শেষ হইল না। রাজা মান সিংহ কৃষ্ণার দাবী ত্যাগ করিলেন না। কিন্তু রাণা ভীম সিংহ অসহায়, নিঃস্ব হইলেও বংশ-গৌরব ও মর্যাদাজ্ঞান হারান নাই। তিনি কিছুতেই মান সিংহকে কন্যাদান করিতে রাজি হইলেন না। মারাঠা সিন্ধিয়া রাজা জগৎ সিংহের উপর বিরূপ ছিলেন। তিনিও মান সিংহের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। মরু ও মহারাষ্ট্র দেশীয় সৈন্যেরা মেবার অবরোধ করিল। তখন মান সিংহের শিবির হইতে এক বিকল্প প্রস্তাব আসিল। আমীর খানের প্রস্তাব, হয় কৃষ্ণকুমারীকে মান সিংহকে বিবাহ করিতে হইবে, না-হয় প্রাণদান করিতে হইবে। রাণা ভীম সিংহের মধ্যে পিতৃত্ব ও বংশগরিমার দ্বন্দ্বে পিতৃত্ব পরাজিত হইল। কিন্তু কে রাজকুমারীকে হত্যা করিবে? পাত্র-মিত্র-সন্তানাদি সকলেই একে একে অস্বীকার করিল। রাণা-বংশীয় মহারাজ জৌন্দন সিংহ এই নির্মম কার্য সমাধা করিতে

* বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ ভাগ, পৃষ্ঠা ৫৫২—৫৩

রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু লেডী ম্যাক্‌বেথ যেমন নিদ্রিত ডান্‌ক্যানের মুখে নিজ পিতার মুখচ্ছবির প্রতিভাস দেখিয়া অবচেতন মনের পিতৃভক্তির জাগরণে আর নিজের অভীষ্ট পূর্ণ করিতে পারেন নাই, জৌন্দন সিংহও তেমনি কৃষ্ণার অপূর্ব যৌবন ও লাবণ্য দেখিয়া এতই স্নেহার্দ্র হইয়া পড়িলেন যে তিনি হত্যা করিতে তো পারিলেনই না, বরং নিজের হীন উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন। অসহায়া সন্তানবৎসলা মাতার ক্রন্দনে অন্তঃপুর ধ্বনিত হইয়া উঠিল। কুমারী কৃষ্ণা মাতাকে প্রবোধ দিয়া পিতৃবংশের মর্যাদা রক্ষার জন্য অম্লানবদনে বিষপান করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু দুইবার বিষপান করিয়া দুইবারই তিনি উদ্‌গীরণ করিয়া ফেলিলেন। শেষে অতীব তীব্র কুসুম্বাসব তাঁহাকে পান করানো হইল। অনিন্দ্য-সুন্দরী অনন্ত নিদ্রায় শায়িত হইলেন। শোকসন্তপ্তা মাতা আহার ত্যাগ করিলেন এবং অচিরেই কন্যার অনুগমন করিলেন। নিষ্ঠুর আমীরও এই আত্মহত্যার কাহিনী শুনিয়া বিস্মিত এবং সন্তপ্ত হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! মাইকেল ইহার ভিতরে উপযুক্ত নাট্যবস্তু পাইলেন না!

আমরা বলিব, ইতিহাস অক্ষুন্ন রাখিয়া কৃষ্ণকুমারী কাহিনী লইয়া উৎকৃষ্ট ট্রাজেডী রচনা করা যাইত। সেই ট্রাজেডীর নায়ক ভীম সিংহ। এক দিকে বিপুল বংশ-গরিমা · অন্য দিকে পিতৃস্নেহের দ্বন্দ্বে ভীম সিংহের যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের সূচনা হইত, তাহা শেক্‌স্‌পীয়রীয় ট্রাজেডীর পক্ষেও অগৌরবের হইত না। ইয়াগোর মতো একটি প্রতিহিংসা-পরায়ণ কপটাচারী, ধূর্ত চরিত্র সবাই সিংহের। নাটকীয় ঘটনাকে সবাই সিংহ আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত জটিল করিয়া তুলিতে পারিত। সবাই সিংহের সহিত রাজা মান সিংহের মনোমালিন্যের ফলে সবাই সিংহ রাজা জগৎ সিংহকে কৃষ্ণাকে বিবাহ করিবার জন্য উত্তেজিত করিত। রাজা জগৎ সিংহ ভীম সিংহের নিকট দূত প্রেরণ করিলে নাট্য-বস্তুর প্রকৃত আরম্ভ হইত। ওদিকে রাজা মান সিংহও কৃষ্ণাকে বিবাহের দাবী জানাইয়া বসিতেন। রাজা জগৎ সিংহের প্রতি অসন্তুষ্ট সিন্ধিয়া মান সিংহের পক্ষে যোগ দিত। শেষে সবাই সিংহের প্রচেষ্টায় ধনকুল সিংহকে মারবারের ন্যায্য অধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়া জগৎ সিংহ আসিতেন মান সিংহের রাজ্য আক্রমণ করিতে। কিন্তু মান সিংহের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া আমীর খান ধনকুলকে হত্যা করিলে ঘটনার গতি পরিবর্তিত হইত। বিজয়ী মান সিংহ তখন

কৃষ্ণার দাবী ত্যাগ না করায় ও আমীরের হীন প্রভাবে কৃষ্ণার জীবনে নামিয়া আসিত নিষ্ঠুর নিয়তির অভিশাপ। কৃষ্ণা গ্রীক ট্রাজেডীর* নায়িকা। রাণা ভীম সিংহের মর্যাদা-বোধ ও বংশগরিমার নিকট কন্যা-স্নেহ মাথা নত করিত। দুই ন্যায়-সত্যের দ্বন্দ্বে একতরের স্বীকারে দুইই তাঁহার উপর রুষ্ট হইয়া তাঁহার জীবনে যে অভিশাপ বর্ষণ করিত, হেগেলীয় ট্রাজেডীর তাহাই হইত অপূর্ব উপাদান।** অপূর্ব ট্রাজেডীর উপকরণ থাকিতেও মধুসূদন তাহাকে কাজে খাটাইতে পারেন নাই। রাজা জগৎ সিংহের জীবনে রসকর্পূর নাম্নী বেশ্যার কদর্য প্রভাব সত্য।*** কিন্তু সেই সুযোগ লইয়া বিলাসবতী-কাহিনী সৃষ্টি করিয়া মধুসূদন আর যাহাই করুন না কেন,

* "Greek subtlety has seized upon what is furthest removed from orderly habit and regularity of occurrence, and of this it looks token from the Supreme. For that portion of the universe which menifests itself in the form of law is limited by law ; if the higher will is even to indicate itself it must be by using some machinery that is outside the course of law. The philosophy of the omen is that accident is the only possible revelation of Destiny."—Shakespeare as a Dramatist Thinker, Moulton, pp. 318.

** "...For Hegel the world was of reason all compact a translucent globe of rationality ruled by immortal powers, the spiritual principles to which humanity owes and renders an unceasing allegiance. Among men they have many names—loyalty, duty, honour, obligation, affection, family ties, patriotism, justice, and to their beneficent guidance all ordered communities must commit themselves or fall into ruin. They are not to be questioned though, parcelled out among individual wills and purposes, the spiritual principle battles with itself ; though upon earth and among men a conflict or series of conflicts rages when one good, one right, one ideal, is set over and asserted against others in themselves equally justified ;...For the spiritual principle cannot deny itself or brook division, and if reconciliation fails, vindicates its unity by the destruction of the contending and partial claims."—Tragedy, Dixon, pp. 160-162.

*** "সেই সময়ে জগৎ সিংহের চরিত্র অত্যন্ত কলুষিত হইয়াছিল। রসকর্পূর নাম্নী এক বেশ্যাকে লইয়া তিনি উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।" —বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ ভাগ, পৃষ্ঠা ৫৫৩

কৃষ্ণাকাহিনীর ঐতিহাসিক গাম্ভীর্য ও মহিমা নষ্ট করিয়াছেন। তবে একথা বলিতে পারি, কৃষ্ণকুমারী নাটক নাট্যগুণে উহার পূর্ববর্তী সমস্ত নাটক হইতে শ্রেষ্ঠ।

দীনবন্ধু মিত্রঃ—মাইকেল মধুসূদনের নাট্য-প্রতিভা যেখানে আসিয়া থামিল, মধু-বঙ্কিম যুগে অন্ততঃ নাটকীয় ঘটনাসংস্থান-ব্যাপারে বাঙালীর প্রতিভা তাহা হইতে অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। তবুও এই যুগ-প্রসঙ্গে আর একটি প্রতিভাবান নাট্যকারের নামোল্লেখ আমরা না করিয়া পারি না। তিনি দীনবন্ধু মিত্র। মধুসূদনের ন্যায় উচ্চাঙ্গ কবি-প্রতিভা দীনবন্ধুর ছিল না বটে, কিন্তু প্রকৃত নাট্যকার হইতে হইলে যে গণ-চেতনা, আপামর জনসাধারণ সম্বন্ধে যে বাস্তব দৃষ্টি এবং বৃহত্তর মানবসমাজের সুখে সমানুভূতি ও দুঃখে সহানুভূতির প্রয়োজন, দীনবন্ধু মিত্র তাহার অধিকারী হইয়াই বাংলা নাটক রচনায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই সহানুভূতি ও দৃষ্টিশক্তির সঙ্গে সৃজনী প্রতিভাব যদি তুল্যরূপ মিশ্রণ ঘটিত তবে বাংলা সাহিত্যে সর্বাঙ্গসুন্দর নাট্য সৃষ্টি সম্ভব হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা হয় নাই।

তবুও দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে উনবিংশ শতকের বাঙালীর জীবন-পরিচিতি যে ভাবে রচিত হইয়াছে, তাহা সত্যই সুন্দর এবং বিস্ময়কর। খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতক এক দিক দিয়া বাঙালীর জাতীয়-জীবনের চরম বিপর্যয়ের যুগ। অন্যদিকে সেই বিপর্যয়ের মধ্য দিয়াও ইহা ভবিষ্যৎ বাঙালীর কল্যাণের যুগরূপে দেখা দিতেছিল। নবাগত ইংরেজী সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কারকে পরমতম কল্যাণপ্রদ প্রার্থনার বস্তু হিসাবে গ্রহণ করিয়া নব্য-শিক্ষিত বাঙালী যুবক যেমন স্বদেশীয় শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-আচরণ যাহা কিছুকে জীর্ণ এবং পরিহার্য আবর্জনা হিসাবে বর্জন করিতেছিল, নিজ অভিভাবক ও আচারবান স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের চক্ষের উপর দিয়া পানদোষ, অভক্ষ্য-ভক্ষণ এবং বেশ্যাসক্তিতে গা ঢালিয়া দিয়াছিল, তেমনি অন্যদিকে মনীষী, আচারবান, অথচ ইংরেজী-শিক্ষিত, বাঙালী ইউরোপীয় সমাজের কল্যাণকর নীতি আর জ্ঞানের অনুসরণে নিজেদের পুরাতন সমাজ ও জাতীয়-জীবনকে নূতন করিয়া গড়িতেছিলেন। একদিকে উচ্ছৃঙ্খল তরুণ বাঙালী যুবক নিজের চারিত্রিক অধঃপতনের নিম্নাভিমুখী আকর্ষণে নিজের ও পারিপার্শ্বিকের সমূহ সর্বনাশ ডাকিয়া আনিতেছিল, পারিবারিক শান্তি

ও দাম্পত্য-প্রেম নষ্ট করিয়া সোনার সংসারকে নরক-কুণ্ডে পর্যবসিত করিতেছিল, অন্য দিকে কল্যাণকামী জাতীয়-জীবনের ঋত্বিকগণ তাঁহাদের যাজ্ঞিক সঙ্গীতে তন্দ্রাহত জাতিকে নূতন প্রেরণায় জাগিয়া উঠিতে আহ্বান করিতেছিলেন। রাজা রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম-প্রবর্তন এবং নৈতিক-চরিত্রের বিশুদ্ধির ভিত্তিতে জাতীয়-জীবন-সংগঠনের প্রয়াস নবজাগ্রত বাঙালীর জাতীয়ত্বে নূতন জীবনের সঞ্চার করিল। স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের প্রচেষ্টার সঙ্গে মহামতি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের প্রবল আন্দোলন জাতিকে শিহরিয়া তুলিল। এই যুগে তাই ধ্বংস এবং সৃষ্টি পাশাপাশি চলিতেছিল। কিন্তু প্রকৃত সৃষ্টি শুরু হইবার পূর্বে ধ্বংসের যে প্রলয়ঙ্কর রূপ বিকটাকারে দেখা দেয়, সেই করাল কালীমূর্তি দেখিয়া তাহার চরণতলাশ্রিত শিবকে আমরা একেবারেই ভুলিয়া যাই। তরুণদের অত্যাচারে প্রবীণ বাঙালী সমাজ তাই ভীত ও বিস্মিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মহাঝড়ে একদা-সারবান অথচ অতি-প্রাচীন জীর্ণবৃক্ষকে ভাঙ্গিয়া তাহার সত্যকার শক্তিহীনতার পরিচয় করাইয়া দেয়। তেমনি জাতীয় জীবনের এই মহাসন্ধিক্ষণে প্রাচীনদের বহুকালাচরিত অথচ অন্যায়, অমানুষিক দুর্নীতির স্বরূপও ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। বাঙালীর এই যুগটাকে অনেকখানি পরিপূর্ণরূপে দেখি আমরা দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে। তাঁহার পূর্বে অনেক নাট্যকার সমাজ-সংস্কার লইয়া নাটক লিখিয়াছেন। কিন্তু এমন ব্যাপকভাবে নয়। পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকে যাহার সূচনা করিয়াছিলেন, উমেশচন্দ্রের বিধবা-বিবাহ নাটকে যে প্রচেষ্টা অনেকখানি সার্থক হইয়াছিল, তাহা প্রথমে একটা সঙ্গত ও সুন্দর রূপ পাইল মাইকেল মধুসূদনের প্রহসন দুইখানিতে। আর তাহারই ক্রমানুসৃত প্রস্ফুটতর রূপ আমরা দেখিতে পাই দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে।

ক্লাসিক-কাব্য-ভক্ত, মহাকাব্যের লেখক মাইকেল মধুসূদনের প্রতিভা নাটক লিখিতে গিয়া সমসাময়িক সামাজিক বা রাজনৈতিক কাহিনীর বাস্তবতায় নামিয়া আসে নাই। পৌরাণিক কাহিনী বা রোমান্টিক ঐতিহাসিক ঘটনা তাঁহার নাট্য-প্রতিভাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল। দীনবন্ধু মিত্রও দুইখানি রোমান্টিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিভার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ঐ 'কমলে-কামিনী' এবং 'নবীন তপস্বিনী'র মধ্যে

নাই। কৃষ্ণকুমারী বা পদ্মাবতী হইতে তাহা কোনো অংশেই উৎকৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু দীনবন্ধুর প্রতিভার যেখানে বিশেষ পরিচয়, সেই প্রহসনগুলির আলোচনা করিতে হইলে আমরা মধুসূদনের প্রহসন দুইখানি স্মরণ না করিয়া পারি না। এখানে দেখিতে পাই, নাটক-লেখক এবং প্রহসন-লেখক মধুসূদন যেন সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন ব্যক্তি। এই ভিন্নতার একটি প্রধান কারণ এই, নাট্যকার মধুসূদনের প্রচেষ্টা ছিল কি করিয়া নাটকের সাহিত্যিক আদর্শ বাংলা সাহিত্যে প্রচার করা যায়। সমাজ-সংস্কার বা জাতির যুগ-সমস্যার কোনো আলোচনাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। তিনি ভাল নাটক রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু প্রহসন লিখিতে গিয়া মধুসূদন বাঙালী-সমাজের বাস্তব চিত্র দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার নিজের ও বন্ধুবান্ধবদের পূর্বজীবনের চিত্র হইতেই তিনি হয়তো 'একেই কি বলে সভ্যতা'-র উপকরণ পাইয়াছিলেন।* আর তৎকালীন ধর্মধ্বজী, বিষয়ী, কপটাচারী জমিদারদের চিত্র তিনি নিখুঁতভাবে আঁকিয়াছিলেন 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে। উচ্চাঙ্গের প্রহসনের বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, তাহার মধ্যে মানব-জীবনের যত গভীর সত্যই রূপায়িত হউক না কেন, তাহা গম্ভীর হইবে না। সহজ-সরল হাস্যরসের অবতারণার মধ্য দিয়া সমাজ-জীবনের দুষ্টতা একটি সহনযোগ্য নগ্নরূপ ফুটাইয়া তুলিতে হইবে যাহার ফলে সমাজ সংশোধনের পথে অগ্রসর হয়। এই সংশোধন গুরু-মহাশয়ের বেত্রাঘাত নহে। মধুসূদন তাঁহার প্রহসন দুইখানিতে অম্লমধুরের মিশ্রণ ঘটাইতে পারিয়াছিলেন। রামনারায়ণের কুলীনকুলসর্বস্বেও সমাজ-সমালোচনা আছে। কিন্তু তাহা প্রায়ই হাস্যরসে সিক্ত নয়। দ্বিতীয়তঃ রামনারায়ণ কোনো অবজ্ঞেয় বা অসঙ্গত চরিত্রের কর্মের মধ্য দিয়া ঐ চরিত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ যতটা না করিয়াছেন, তাহা হইতে অন্যকে দিয়া তাহার সম্বন্ধে সমালোচনা

*'একেই কি বলে সভ্যতা'য় মধুসূদন প্রকারান্তরে নিজের দলকেই তিরস্কার করিয়াছেন। 'জ্ঞান-তরঙ্গিণী' সভার সভ্যদের আদর্শ, নিজ-বন্ধু সহপাঠীদের মধ্য হইতেই তিনি লইয়াছিলেন। 'জ্ঞান-তরঙ্গিণী' সভার কথায় স্বভাবতই কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী সভার নাম মনে আসে।—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ২য় সং,—ডাঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ৫২

করাইয়াছেন অনেক বেশী। ফলে নাট্যকারের প্রচারের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মধুসূদনের প্রহসনে চরিত্রগুলি তাহাদের নিজেদের অসঙ্গতির আভ্যন্তরীণ প্রেরণায়, তাহাদের চলা-বলা ও করার মধ্য দিয়া নিজেরাই স্বাভাবিকভাবে হাস্যাস্পদ এবং উপভোগ্য হইয়া ওঠে। অন্যের ভাষ্যের অবকাশ রাখে না। আর এই চরিত্রগুলিকে স্বাভাবিক করিতে গিয়া মধুসূদনকে রোমান্টিকতার বালাই একেবারেই ত্যাগ করিতে হইয়াছে। নির্মম, নগ্ন, নিষ্ঠুর একান্ত বাস্তবতাকে অবলম্বন করিতে হইয়াছে। প্রখর প্রত্যক্ষ বর্তমানের উপর কল্পনার তুলিকা বুলাইবার ইচ্ছা তাঁহার জাগে নাই। নাট্যকার মধুসূদন ও প্রহসনকার মধুসূদনে এইখানেই প্রধান পার্থক্য। আর এই বাস্তবতাপ্রীতির জন্য পাত্র-পাত্রীর ভাষাকেও নিতান্ত স্বাভাবিক, সহজ ও সঙ্গত করিতে হইয়াছে। তাই চরিত্রগুলি টাইপ্ না হইয়া হইয়াছে জীবন্ত। উচ্চস্তরের পাত্র-পাত্রীর মুখে অতি অল্প স্থানেই তিনি তাঁহার স্বভাবজাত বা অভ্যস্ত কাব্যের ভাষা দিয়াছেন। অন্যত্র সব জায়গায়ই যে যে-স্তরের মানুষ তাহার মুখে সেই স্তরের স্বাভাবিক ভাষা তিনি দিয়াছেন। লম্পট, বৃদ্ধ জমিদার ভক্তপ্রসাদের খাজনার কড়া-ক্রান্তি হিসাব ও লাম্পট্য-চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে কৃষ্ণ-বুলি আওড়ানো ও অন্যদিকে ভারতচন্দ্রের আবৃত্তি সমানে চলিতেছে। হানিফের ভাষা দীনবন্ধুর তোরাপের ভাষার আদর্শ। ইয়ং বেঙ্গলের ইঙ্গ-বঙ্গীয় ভাষাটি অবিকলভাবে রূপ পাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সর্বস্তরের লোকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অতি সামান্য কথায় এমন সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে যাহা অন্য কোনো নাট্যকারের রচনায় ইহার পূর্বে পাওয়া যায় নাই। প্রহসন দুইখানির আর এক বৈশিষ্ট্য, সংক্ষিপ্ত সংহতির মধ্যেও পর্যাপ্ত সঙ্গতি। ঘটনা, চরিত্র ও প্রতিপাদ্য বস্তুকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তাহা হইতে অবান্তর কি চরিত্র, কি ঘটনা, কিছুই বর্ণিত হয় নাই। তাই রসও অখণ্ডভাবে জমাট বাঁধিয়াছে। মাইকেলের রচনার পূর্বে এমন সুন্দর প্রহসন একখানিও সৃষ্ট হয় নাই। অবশ্য ইহার পর বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট প্রহসন অনেকই রচিত হইয়াছে। কিন্তু মধুসূদনের গৌরব কেহই খর্ব করিতে পারেন নাই।

মধুসূদনের প্রহসনে যে হাস্যরস, বাস্তব-দৃষ্টি ও সমাজ-চেতনা সার্থক সাহিত্যিক রূপ পাইল, তাহারই ক্রমবিকশিত সাধনা দেখিতে পাই

দীনবন্ধুর প্রহসনগুলিতে। কিন্তু তাহার আলোচনার পূর্বে দীনবন্ধুর প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ' সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব।

নীলদর্পণ বিপ্লবাত্মক নাটক। ইহার পূর্বে শ্বেতাঙ্গ শাসকগোষ্ঠী বা তাঁহাদের জ্ঞাতি-গোত্রের অত্যাচারজনিত কার্যকলাপের সমালোচনা করিয়া কোনো বাঙালী সাহিত্য রচনা করেন নাই। দীনবন্ধুর সহানুভূতি-প্রবণ হৃদয় দীন কৃষকের দুঃখে কাঁদিয়া উঠিল। তাই তিনি নিজের নাম গোপন করিয়া নীলদর্পণ নাটক রচনা করেন। ইহা বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদী গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রচারেই ইংরেজ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি নীলকরদিগের অত্যাচার দমনের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। নাটকটির রচনায় নাট্যকারের এই স্বদেশহিতৈষণা প্রথম এবং প্রধান লক্ষণীয় বিষয়। ইহার পূর্বে বাংলা সাহিত্যে সমাজ ও স্বধর্মের কল্যাণকামনার আকুতি দেখিয়াছি। কিন্তু শক্তিমান বিদেশী শ্বেতাঙ্গের এক শোষক শ্রেণীর এমন নির্মম সমালোচনার সৎ-সাহস সর্বপ্রথম এই দেখিলাম। তাই তিনি শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়।

নীলকরদের অত্যাচার এবং নীলবিদ্রোহ ঐতিহাসিক ঘটনা। ফরিদপুর, যশোহর, নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় নীলকরদের অত্যাচার নৃসংশতা ও বর্বরতার চরমরূপ পরিগ্রহ করে। নীলকরগণ জোর করিয়া কৃষকের ধানের জমিতে নীল চাষ করাইত। দাদনের টাকা পরিশোধ করিত না। চাষিগণ প্রতিবাদ করিলে তাহাদিগের উপর নির্মম অত্যাচার করা হইত। কৃষকগণকে কুঠির লাঠিয়ালের সাহায্যে ধরিয়া আনিয়া তাহাদিগের উপর মারধোর করা হইত। 'শ্যামচাঁদ' এবং 'রামকান্ত' নামক বিশেষ ধরনের চাবুকের প্রহারে তাহাদের দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেওয়া হইত। অসহায় কৃষকেরা রাজদরবারে বিচার প্রার্থনা করিয়া কোনোও ফল পাইত না। কৃষকগণকে কুঠিতে ধরিয়া লইয়া শুধু যে তাহাদিগকে নির্মমভাবে প্রহার করা হইত তাহাই নয়, তাহাদিগকে রাত্রির অন্ধকারে দূরদূরান্তের কুঠিতে চালান দিয়া অন্ধকার ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। নীল জাল দেওয়ার অগ্নিকুণ্ডে অনেক কৃষক জীবন্ত দগ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিত। কৃষকের সুন্দরী স্ত্রী ও কন্যাগণ এই বর্বর নীলকরদের লালসার আগুনে আত্মাহুতি দিতে বাধ্য হইত। ক্ষেত্রমণির প্রতি রোগ সাহেবের অত্যাচারের কাহিনী দীনবন্ধুর স্বকপোলকল্পিত নয়। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় হরমণির হরণের কাহিনী লিখিত হইয়াছিল। কৃষ্ণনগরের

জনৈক কৃষকের কন্যা, সেকালের নদীয়ার অন্যতমা সুন্দরী হরমণি কুঠির লাঠিয়ালদের দ্বারা 'কুল্‌চিকাটা ফ্যাক্‌টরী'তে নীত হয়। সেখানকার ছোট সাহেব আর্চিবল্ড্‌ হিল্‌স্‌-এর শয়নকক্ষে তাহাকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট্‌ ডব্লিউ, জে, হার্সেল-এর সহায়তায় তাহাকে কুঠি হইতে উদ্ধার করিয়া আনা হয়। এই হরমণিই যে নীলদর্পণ নাটকে ক্ষেত্রমণির ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নির্যাতিত, নিপীড়িত কৃষকগণ সব সময়ে এই অত্যাচার নির্বিবাদে সহ্য করে নাই। ফরিদপুর, যশোহর, নদীয়া প্রভৃতি জিলার বিভিন্ন স্থানে নীলবিদ্রোহ ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। নদীয়ার 'চৌগাছা' গ্রামের বিশ্বনাথ সর্দার, ওরফে 'বিশু ডাকাত' নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে বিব্রত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তোলেন। শেষপর্যন্ত তিনি ধৃত হইয়া ফাঁসিকাঠে প্রাণ বিসর্জন করেন। চৌগাছা-নিবাসী বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস এবং পোড়াগাছার দিগম্বর বিশ্বাস প্রথমে নীলকুঠির দেওয়ান ছিলেন। কিন্তু কৃষকদের প্রতি নির্মম অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহারা উক্ত পদ পরিত্যাগ করেন এবং নিজেদের বিষয়-আশয় সমস্তই নীলবিদ্রোহের কার্যে নিয়োজিত করেন। ইঁহারা নীলচাষের এলাকায় গিয়া কৃষকদিগকে বিদ্রোহে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তোলেন। নীলকরগণ এই বিদ্রোহ দমনের জন্য গ্রামের পর গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছে। নরহত্যা, নারীধর্ষণ ও লুণ্ঠনের দ্বারা নারকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু বিশ্বাস-দ্বয় তাহাতে দমেন নাই। তাঁহারা বিপুল অর্থব্যয়ে সুবিশাল লাঠিয়াল-বাহিনী গড়িয়া তুলিয়া নীলকরদিগের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। কিন্তু অনেকে আবার নীলকরদের বিরুদ্ধে অর্থবল, জনবল নিয়োগ করিয়া শেষপর্যন্ত চরম পরাজয় এবং শোচনীয় মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। চূর্ণীনদীর তীরস্থ শিবনিবাসের জমিদার বৃন্দাবন সরকার, হাঁসখালি-গোবিন্দপুরের জমিদার গোপাল তরফদার প্রভৃতি তাহার উদাহরণ।

বলা বাহুল্য, চৌগাছার বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস নীলদর্পণ নাটকের নবীনমাধব ও বিন্দুমাধব চরিত্রের উৎস হইতে পারেন না। কারণ, যাঁহারা নীলকরদের বিদ্রোহী হইয়া চরমে জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই নাটকের নায়ক হইতে পারেন না। যাঁহারা নীলকরদের নির্মম অত্যাচারে পরাজিত ও সর্বস্বান্ত হইয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছেন, নবীনমাধব তাঁহাদেরই প্রতিনিধি। গোপাল তরফদার কিংবা বৃন্দাবন চৌধুরীর চরিত্র নবীনমাধব-

চরিত্রের পরিকল্পনায় প্রেরণা যোগাইলেও যোগাইতে পারিত। মনে হয়, ইহাদের কেহই নবীনমাধব-চরিত্র পরিকল্পনার মূলীভূত নহেন, কারণ, ইহাদের সংগঠনী শক্তির ও বিদ্রোহ পরিচালনার ক্ষমতা কিংবা বিদ্রোহাত্মক ক্রিয়াকলাপ কিছুই নবীনমাধব বা বিন্দুমাধবের চরিত্রে নাই। এক অসহায়, নির্যাতিত কৃষকের করুণ চিত্রই দীনবন্ধু নবীনমাধবের চরিত্রের মাধ্যমে অঙ্কন করিয়াছেন। ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের ৭ই নভেম্বর 'ভারত সংস্কারক' পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছিল, "নদীয়ার অন্তর্গত গুয়াতোলির মিত্র-পরিবারের দুর্দশা নীলদর্পণের উপাখ্যানটির ভিত্তিভূমি।"

যাহাই হউক, নীলদর্পণের কাহিনী-পরিকল্পনার ভিত্তিভূমিতে যে বাস্তব ঘটনা বর্তমান ছিল, তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু বসুপরিবার ও ঘোষপরিবারের চরিত্রগুলি রূপায়ণে নীলবিদ্রোহের কোন্ কোন্ ব্যক্তির চরিত্র কতখানি প্রেরণা যোগাইয়াছে তাহা আজ গবেষণা করিয়া বাহির করিবার উপায় নাই। আমরা শুধু এইটুকু বলিয়া ক্ষান্ত হইব যে, বাংলার এক দুর্যোগপূর্ণ হতিহাসের নিষ্ঠুর, নির্মম ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নীলদর্পণ নাটকখানি রচিত হইয়াছিল। এই ঐতিহাসিক পটভূমিকাই নাটকখানিকে অমরতার গৌরব দান করিয়াছে। 'নীলদর্পণ' নাটকের যত দোষ-ত্রুটি থাকুক না কেন, এই ঐতিহাসিক তাৎপর্য ইহাকে মহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছে এবং রাখিবে।

এইবার আমরা নাটকখানির সাহিত্যিক মূল্য বিচার করিতে চেষ্টা করিব। প্রথমেই আমরা স্বীকার করিয়া লই, নীলদর্পণ সার্থক নাটক নহে। তাহার প্রথম কারণ, নাটকটির মধ্যে নাটকীয় ঘটনা-সংস্থিতি বলিয়া কিছুই নাই। কোনো বিশেষ নায়ক-চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া ঘটনা রূপায়িত হইতেছে না। সংঘাত যাহা কিছু সবই বাহ্য। নীলকরের অত্যাচারের তীব্রতা দেখানোর জন্যই যেন একটির পর একটি দৃশ্যকে সাক্ষ্য হিসাবে আনা হইয়াছে। কোনো এক আভ্যন্তরীণ নিয়তি-কৃত সৃজন-রহস্যের প্রেরণায় ঘটনা স্বতঃস্ফূর্ত ও অনিবার্যভাবে বিকশিত হইয়া আপনার গতিবেগ ও বিকাশ-ধারার দুর্নিবারতা এবং নিরবচ্ছিন্নতার প্রমাণ দিতেছে না। তাই আমাদের সহানুভূতি পাত্র-পাত্রীর চরিত্রের উপর পতিত হইয়া আমাদিগকেও তাহাদের সুখ-দুঃখে সমানুভূতিতে আত্মহারা করিয়া তোলে না। শুধুমাত্র একটা বহিরঙ্গ পরিস্থিতির রূঢ়তায় আমরা আহত হই। সে আঘাতে বেদনা জন্মে, কিন্তু করুণার উদ্রেক হয় না। নীলদর্পণের

বিষাদময়ী পরিণতিকে গোলোক বসুর পারিবারিক জীবন নিঙড়ানো নির্যাস হিসাবে নাট্যকার উপস্থাপিত করিতে পারেন নাই। তাই এখানে বিষাদান্ত নাটক সৃষ্টির প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে। নাটকের পরিণতিতে অতগুলি অবাঞ্ছিত মৃত্যুর আতিশয্য কোনো কার্যকারণসূত্রে আবদ্ধ নয় বলিয়া উহা অতি-নাটকীয় হইয়াছে। এই ব্যর্থতার প্রথম কারণ, নাট্যকার সমসাময়িক ঘটনাকে চিরন্তনতার বাঁধনে বাঁধিতে পারেন নাই। সমসাময়িক ঘটনাকে চিরন্তন বন্ধনে আবদ্ধ করিতে হইলে তাহাকে এমন একটি শাশ্বত জীবন-সমস্যা বা অন্তর্দ্বন্দ্বের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিতে হয়, যাহা সর্ব দেশে, সর্ব কালে এক এবং অপরিবর্তনীয়। সেই জীবন-রসের চিরন্তনত্বের অভাব নাটকখানিতে রহিয়াছে। আর এই প্রথম এবং প্রধান অভাব হইতে জাত হইয়াছে নাটকের আর একটি দোষ। নাট্যকাহিনীর কোনো প্রকার জটিলতা নাই। জৈবদেহের ক্রম-বিকাশের মধ্যে প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াও যে অখণ্ড বিকাশের ধারা অব্যাহত থাকে, তাহা একই অখণ্ড প্রাণরসের পোষকতার পরিচায়ক। নাটকের কাহিনীতে আমরা বিচিত্রতার মধ্যেও তেমনি যে অখণ্ডতার আশা করি, নীলদর্পণের নাট্যকার তাহা সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। এই প্রাণরসের অভাবে চরিত্রগুলি পরস্পরের সাপেক্ষত্ব হারাইয়াছে। পরস্পরের বিকাশে পারস্পরিক সংঘাত বা উদ্দীপনা নাই। ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন,—"নীলদর্পণ ঠিক নাটক নহে, নাট্য-চিত্র। ইহাতে কোনো চরিত্রের পরিণতি অথবা মানব-জীবনের কোনো মৌলিক সমস্যা কিংবা ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির চিত্ত-সংঘর্ষ আলিখিত হয় নাই। একটি বিশেষ সময়ে বিশেষ অবস্থায় পতিত কতকগুলি অসহায় মানুষের অত্যাচার-জীবনের বাস্তব চিত্র ছাড়া ইহাতে আর কিছুই নাই। গ্রাম্য-চরিত্রগুলির মধ্যে মানব-জীবনের যে অনাবৃত খণ্ডিত রূপটুকুর চকিত দর্শন পাই শুধু তাহাই নীলদর্পণকে সমসাময়িক নাট্য-রচনাগুলি হইতে স্বতন্ত্র করিয়া স্থায়ী মূল্য দান করিয়াছে।"

—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ২য় সং, পৃষ্ঠা ৫৮

'নীলদর্পণ' নাটকের চরিত্রগুলি সম্বন্ধে আরো দুই-চারিটি কথা বলার প্রয়োজন আছে। নবীনমাধব যে নাটকখানির সার্থক নায়ক হইয়া উঠিতে পারে নাই, ইহা আমরা আগেই কিছুটা আলোচনা করিয়াছি। নীলদর্পণ

সার্থক ট্রাজেডী হয় নাই তাহার কারণ, ইহার নায়ক-চরিত্রটি আদৌ সুবিকশিত নয়। ট্রাজেডীর নায়ক হইবে অত্যধিক আত্মসচেতন এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। কথায় বড় না হইয়া তাহাকে অবশ্যই কাজে বড় হইতে হইবে। প্রতিপক্ষের শক্তি ও ষড়যন্ত্র যতখানি প্রবল হইবে, ঠিক ততখানি বা ততোধিক কর্মতৎপরতা, বিচক্ষণতা ও ব্যক্তিত্ব লইয়া নায়ক ঐ শক্তি ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া করিবে। এই দুর্দমনীয় ব্যক্তিত্ব বা কর্মতৎপরতা নবীনমাধবের চরিত্রে নাই। প্রবল প্রতিপক্ষ নীলকরের অত্যাচার প্রতিরোধ করার জন্য নবীনমাধব জনশক্তিকে সংগঠিত করিয়া কোনো সজ্ঘাত তোলে নাই। সে শুধু সাহেবের সামনে কয়েকবার বক্তৃতা করিয়াছে মাত্র। কিন্তু বক্তৃতার দ্বারা তো নীলকরের অত্যাচার নিরোধ করা যায় না। স্বরপুর-বৃকোদরের বৃকোদরত্বের এতটুকু পরিচয় এই নাটকের মধ্যে নাই। সাহেব তাহার পুকুরপাড়ে নীল বুনিয়াছে, সে নীরবে সহ্য করিয়াছে। নীলকরদিগের লাঠিয়াল ও অর্থবলের কথা তাহার জানা ছিল। তাহাদের বিরুদ্ধে নালিশ করিয়াও সে ইংরেজ বিচারকদের নিকট হইতে কোনো সুবিচার পাইবে না, জানিত। তবে কী শক্তি সম্বল করিয়া, কোন্ কর্মপন্থায় সে অগ্রসর হইল? চরিত্রটির পরিকল্পনায়ই তাই চরম দুর্বলতা রহিয়া গিয়াছে। দুইটি জায়গায় মাত্র তাহাকে আমরা সক্রিয় দেখিতেছি। এক, রোগ সাহেবের শয়নকক্ষ হইতে ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধার করার সময়। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, এখানেও সে খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছে। একে তো সে কেমন করিয়া এই কক্ষে প্রবেশ করিল তাহা ভাবিবার বিষয়। যদিও তোরাপের কথায় ইহার কিছুটা কৈফিয়ৎ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই মুহূর্তে কি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কৈফিয়ৎ দেওয়া যায়, না, নেওয়া যায়? তারপর, যেমন দ্রুতবেগে তোরাপ এবং নবীনমাধব প্রবেশ করিয়াছিল, ঠিক তেমনি দ্রুতবেগে, বিনা বাক্যব্যয়ে ক্ষেত্রমণিকে লইয়া পলাইয়া যাওয়া উচিত ছিল। এখানে নাট্যকার পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুযায়ী চরিত্রের অভিব্যক্তি ঘটাইতে পারেন নাই। তারপর নবীনমাধবকে আর একবার এবং শেষ বারের মতো বীরত্ব প্রকাশ করিতে দেখি। তাহাও জানিতে পাই সাধুচরণের বর্ণনায়, পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে। নবীনমাধব উক্ত সাহেবের নিকট দীনভাবে আবেদন জানাইতে গিয়াছিল, যাহাতে সাহেব তাহার পিতৃশ্রাদ্ধের কয়েকটি দিন পুকুরপাড়ে নীলচাষ স্থগিত রাখে। সাহেবের চরিত্র তো তাহার অজ্ঞাত নয়।

এই আবেদন-নিবেদনের যে কোনো ফল হইবে না তাহাও সে নিশ্চয় জানিত। সাহেবের নিকট কটূক্তি শুনিয়া সে যে সাহেবের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিল, ইহা আকস্মিক উত্তেজনা এবং হঠকারিতার ফল; বীরত্বের পরিচয় মোটেই নয়। নাট্যকার আকস্মিকতার মধ্য দিয়া তাঁহার নায়কের জীবনের অবসান ঘটাইয়াছেন; চরিত্রটিতে নাট্যগুণ ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই।

বিন্দুমাধব চরিত্রটির কোনো প্রয়োজন এই নাটকে দেখানো হয় নাই। সে নবীনমাধবের ভাই। কিন্তু তাহার কর্মসঙ্গী নয়। কলেজে পড়াশুনা করার সঙ্গে নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কোনো কার্য-কারণ-সম্পর্কিত যোগাযোগ নাই। তাহাকে শুধু গোলোক বসুর পরিবারের মহা বিপর্যয়ের সাক্ষীরূপে দাঁড় করানো হইয়াছে মাত্র। কিন্তু এই সাক্ষীগোপাল চরিত্রটির থাকা-না-থাকায় নাটকীয় কাহিনীর কিছুই ইতর-বিশেষ হইত না। তাই চরিত্রটি নাটকে একেবারেই অবান্তর।

রাইচরণ ও সাধুচরণ দুই ভাই। রাইচরণ কৃষক। লাঙ্গল-গরু, জমি-জমা, চাষবাসের পরিবেশের সঙ্গে এই কৃষকটির ভাষা ও আচার-আচরণের একান্ত সঙ্গতি আছে। তাই চরিত্রটি অত্যধিক জীবন্ত হইয়া নাটকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সাধুচরণ তাহারই দাদা। তাহার ভাষা ও আচার-আচরণে কৃষক-জীবনের স্বাভাবিকত্ব নাই। নাট্যকার তাহাকে ঘষিয়া-মাজিয়া 'সাধু' করিয়া তুলিয়াছেন। দেওয়ান গোপীনাথ দাসও সাধুর এই 'সাধুভাষা' প্রয়োগ অসঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছে। সাধুচরণ কৃষিকর্ম করে না। ছোট ভাই রাইচরণের উপর চাষের ভার চাপাইয়া দিয়া সে নিশ্চিন্ত হইয়া ভদ্রলোকদের সঙ্গে মিশিয়া বেড়ায়। কারণ, সে লেখাপড়া শিখিয়াছে। কৃষকের ছেলে লেখাপড়া শিখিলে চাষবাস করিবে কেন? উনবিংশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া আজও পর্যন্ত এই ধারণা কৃষক-সমাজে কাজ করিয়া আসিতেছে। কৃষকের ছেলে ভদ্র সমাজে মিশিলে তাহার চেষ্টা থাকিবে, কি করিয়া লেখাপড়া জানা লোকের মতো চলা ও 'বলা' যায়। সেদিক দিয়া সাধুচরণের চরিত্রটি সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত হয় নাই। কিন্তু ব্যাপার হইয়াছে এই যে, দীনবন্ধু সাধুকে মাঝে মাঝে অত্যধিক 'সাধু' করিয়া ফেলিয়াছেন; তাল ঠিক রাখিতে পারেন নাই। সাধুর সংলাপের ক্রিয়াপদগুলিও 'সাধু' অর্থাৎ লেখ্য ভাষার হইয়াছে। উহার জন্য সংলাপের কৃত্রিমতা আরো বাড়িয়া গিয়াছে।

সমগ্র নীলদর্পণ নাটকের মধ্যে একটিমাত্র পুরুষ-চরিত্র স্বাভাবিক, সঙ্গত, সুন্দর এবং সুগঠিত দেখিতে পাই। উহা দেওয়ান গোপীনাথ দাসের চরিত্র। আমিন এবং দেওয়ান গোপীনাথ দাস, এই দুই জন বাঙালী নীলকরদের অত্যাচার ও দুষ্কর্মের সাকরেদ। ইহার মধ্যে আমিনের ভূমিকা অতি সামান্য। আমিন মনুষ্যত্বহীন, নরপশু। সে শুধু রায়তদের ভাল ভাল ধানের জমি নীলের জন্য দাগ দিয়া যায় না; রায়তদের সুন্দরী স্ত্রী এবং কন্যাদিগকে সাহেবদের উপভোগের জন্য লইয়া যাইবারও আয়োজন করে। সে যেমন নির্মম এবং অমানুষ, তেমনি তাহার ভাষাও অভব্য। সে রেবতীকে বলে, "আরে মাগী, তোর নাকিসুর এখন রাখ্, জল দিতে হয় তো দে, নয় ওমনি নিয়ে যাই।" এই ভাষা আমিনের মতো ছোট লোকের মুখেই মানায়। কিন্তু দেওয়ান গোপীনাথ দাসের চরিত্রটি অদ্ভুত। সে ভদ্র কায়স্থ ঘরের সন্তান। পেটের দায়ে, পরিবার-পরিজন পরিপোষণের জন্য সে নীলকর সাহেবের চাকরী করিতে আসিয়াছে। সাহেবদের মনস্তুষ্টির জন্য তাই তাহাকে অন্যায় ও নিষ্ঠুর কর্ম করিতে হইতেছে। কিন্তু ইহা যে অন্যায় কর্ম তাহা সে বোঝে। তাই মনে মনে সে অনুতপ্ত। সাহেবদের সে আদৌ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না। কিন্তু অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিলে যে চাকরী যাইবে; তাই সে প্রাণপণে নিজের মনোভাব গোপন রাখিয়া সাহেবদের চাটুকারিতা করিয়া চলে। রায়তদের নির্যাতনের ব্যবস্থা সে করিয়া দেয় বটে, কিন্তু উহাদের জন্য তাহার সমবেদনারও অন্ত নাই। গোপীনাথ দাস দেওয়ানের সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয় নাটকের প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্কে। বেগুনবেড়ের কুঠির বড় বাঙ্গলার বারান্দায় তাহাকে আই. আই. উডের সহিত আলাপ করিতে দেখি। নীলের দাদন বাড়াইবার জন্য সে দিনরাত খাটিয়া মরিতেছে, তবু সাহেব তাহার কাজে খুশি হইতে পারিতেছে না। অথচ সে এই সাহেবদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য কি না করিয়াছে? মোল্লাদের ধান ভাঙ্গিয়া সেখানে নীল করাইয়াছে; গোলোক বসুর বাগান ও গাঁতি বাহির করিয়া লইয়াছে। সে জানে, ইহা ভদ্র কায়স্থ সন্তানের কাজ নয়। ক্যাওটেও এই অন্যায় কাজগুলি করিতে পারে না। তবুও সে সাহেবদের মনোরঞ্জন করিতে পারিতেছে না। অন্নের জন্য গোলামী করিতে আসিয়া সে যে সমস্ত অন্যায় কাজ করিতেছে, সেজন্য তাহার অনুতাপের অন্ত নাই। বিবেকদংশনে সে প্রতি মুহূর্তেই জর্জরিত হইতেছে। চাকরীর চাপে পড়িয়া তাহার নীতিবোধ

এবং মনুষ্যত্ববোধ যে একেবারে অবলুপ্ত হয় নাই, তাহা বুঝা যায়। বুঝিতে পারা যায় বলিয়া তাহার প্রতি আমাদের সমবেদনা জাগিয়া ওঠে। অদৃষ্টের হাতে নিরুপায় এই মানুষটিকে তাই আমরা অশ্রদ্ধা করিতে পারি না। আমরা বুঝিতে পারি, অবস্থাই এই মানুষটিকে দিয়া হীন কাজ করাইয়া লইতেছে। কিন্তু আসলে সে অন্তরে অন্তরে মানুষই আছে; একেবারে সর্বতোভাবে অমানুষ হইয়া যায় নাই।

গোপীনাথ বুদ্ধিমান। সে জানে, কখন কোন্ কথা ব'লিলে সাহেব সন্তুষ্ট হইবে। উড যখন নবীনমাধবের নাম করিল, গোপীনাথ তখন বুঝিল যে, নবীনমাধব সম্বন্ধে দুই-চারিটা কঠোর মন্তব্য করিলে সাহেব তাহার উপর সন্তুষ্ট হইতে পারে। তাই সে বলে, "ঐ একজন কুটির প্রধান শত্রু। পলাশপুর জালানো কখনও প্রমাণ হইত না যদি নবীন বোস ওর ভিতরে না থাকিত।" ইত্যাদি। ইহাতে সাহেব সন্তুষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। তবে গোপীনাথ অভিজ্ঞ কর্মচারী। নবীনমাধবের মতো লোক নীলকর সাহেবদের কোনো ক্ষতি করিতে পারুক আর না পারুক, তাহার মতো সামান্য নায়েবের ধন-প্রাণ যে বিপন্ন করিতে পারে, তাহা সে জানে, সাহেবেরা যখন দেখে যে তাহারা বিপন্ন হইতেছে, তখন সমস্ত দোষ নায়েবের ঘাড়ে চাপাইয়া তাহারা নিজেরা অব্যাহতি পায়। পলাশপুর জ্বালানোর জন্য নীলকরদের কিছুই হয় নাই। কিন্তু সাবেক নায়েবের দুই বৎসর জেল হইয়াছে, সে তাহার বাকি বেতনও পায় নাই। তাহার স্ত্রী-পুত্র উপবাসে মরিতেছে। গোপীনাথেরও ভয় তাহার সেই অবস্থা না হয়। কিন্তু ভয় প্রকাশ করিলে চাকরী থাকিবে না, তাই সে মনের আশঙ্কা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। বরং সে নবীন বসুকে অনুরোধ করিয়া আসিয়াছে সাহেবের বিরুদ্ধাচরণ না করিতে। একদিকে চাকরীর মমতা, অন্যদিকে অর্থের জন্য সে যে অন্যায় করিয়া যাইতেছে, তাহার জন্য অনুতাপ, এই দুইটি মিলাইয়া চরিত্রটিকে এক অপূর্ব মাধুর্য দান করিয়াছে। তাহার মুখে যখন আমরা অনুশোচনার বাণী শুনি, "হুজুর, ভয় পাওয়ার মত কি দেখিলেন, যখন এ পদবীতে পদার্পণ করেছি, তখন ভয়, লজ্জা, শরম, মান, মর্যাদার মাথা খাইয়াছি, গো-হত্যা, ব্রহ্ম-হত্যা, স্ত্রী-হত্যা, ঘর জ্বালান অঙ্গের আভরণ হইয়াছে, আর জেলখানা শিওরে করে বসে আছি," তখন আমরা চরিত্রটির অসহায় অবস্থা, মনুষ্যত্ববোধ এবং ভীতির যুগপৎ চিত্র পরিষ্কার দেখিতে পাই। গোপীনাথ জাত-শয়তান নয়। পরিস্থিতি তাহাকে

অমানুষ হইতে বাধ্য করিয়াছে। কিন্তু অনুপায় মানুষের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় তো তাহার মনুষ্যত্বের পরিচয়।

গোপীনাথ দাস মানুষ,—দেবতা নয়, মানুষের স্বার্থ বুদ্ধি, ঈর্ষ্যা, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য চাতুরী, তোষামোদ, মিথ্যা কথা বলা, ইহার সব কিছুই গোপীনাথ দাসের আছে। সাধুচরণকে উক্ত সাহেবের কুটিতে ধরিয়া আনিলে গোপীনাথ দাস তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া বলে, "সাহেবের ভয়, পাছে তুমি সাহেবকে তোমাদের বড়বাবুর গুদামে কয়েদ কবে রাখ।" ...ইহা সাধুচরণকে ব্যঙ্গ করার জন্য নয়। গোপীনাথ জানে যে এই কথা বলিলে সাহেব সন্তুষ্ট হইবে। সাহেবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সে আগেই সাধুচরণকে অনেক রূঢ় কথা বলিয়াছে: "সাধু তোর সাধু ভাষা রাখ্, চাসার মুখে ভাল শুনায় না......বেটা রাইয়তদিগের আইন পরোয়ানা সব বুঝাইয়া দিয়া গোল করিতেছে, বেটার ভাই মরে লাঙ্গল ঠেলে, উনি বলেন 'প্রবল প্রতাপশালী'।" সাধুচরণের সাধুভাষাই যে গোপীনাথকে রাগাইয়া তুলিয়াছে, তাহাই নয়। সে যে কুঠির কতখানি বিশ্বস্ত এবং দরদী কর্মচারী, তাহা দেখাইবার জন্যই সাধুকে এইভাবে ভর্ৎসনা করিতেছে। শুধু তাহাই নয়, সাধুচরণ যে ইচ্ছা করিলে আরো বিশ বিঘা জমিতে নীল করিতে পারে, তাহাও বলিতেছে। ইহার সবটুকুই নিজের চাকরী বাঁচাইতে সাহেবকে খুশি করিবার জন্য। কিন্তু নবীনমাধবের সঙ্গে সে নিতান্ত ভদ্র ব্যবহার করিয়া বলে, "নবীনবাবু, বাড়াবাড়ি কাজ কি, আপনি বাড়ী যান।" এই উক্তির তাৎপর্য দুইটি। প্রথম কথা, এই অমানুষ উডকে অনুরোধ করিয়া লাভ নাই তাহা সে জানে। দ্বিতীয়তঃ সাহেব হয় তো নবীনমাধবকে অপমান করিতে পারে। তাহাতে শুধু একজন ভদ্রলোকের অপমান হইবে তাহাই নয়। হয় তো ইহা হইতে এমন কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি হইতে পারে, যাহা হইতে গোপীনাথেরই অমঙ্গল বেশী করিয়া ঘনাইয়া আসিতে পারে। উড চলিয়া গেলে যখন গোপীনাথ এবং সাধুচরণ এই দুইজন মাত্র পড়িয়া থাকে, তখন গোপীনাথের কথায় আর ব্যঙ্গের সুর নাই। সমবেদনার সুরেই সে বলে, "চল সাধু, দপ্তরখানায় চল, সাহেব কি কথায় ভোলে।" এই কৃষকদের দুঃখ সে সহ্য করিতেও পারে না, অথচ চাকরীর অনুরোধে নিত্য নিত্য তাহাকে এই নির্মম অত্যাচার সহ্য করিতে হইতেছে। তাহার কিছু বলিবারও উপায় নাই, অথচ সহ্য করিবার মতো অমানুষও সে নয়। তাই তাহার মর্মবেদনা ছড়ায় অভিব্যক্তি লাভ করে,—

"বাড়া ভাতে ছাই তব বাড়া ভাতে ছাই।
ধরেছে নীলের যমে আর রক্ষা নাই ॥"

বাঙালী কায়স্থ সন্তান গোপীনাথ দাসের অন্তর যে বাঙালী কৃষকের দুঃখে কতখানি ব্যথিত হইতেছে, এই ছড়াটিই তাহা অভিব্যক্ত করিয়া তোলে।

গোপীনাথ দাসের ঈর্ষ্যা, ধূর্ততা এবং তোষামোদের দ্বারা কাজ বাগাইবার বুদ্ধির পরিচয় পাইতেছি তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কে। আমিন নায়েবকে ভাগ না দিয়া ঘুষ খাইয়াছে। খালাসীদিগকেও ফাঁকি দিয়াছে, পরন্তু নায়েবকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করিয়াছে। ধূর্ত "কায়েতের বাচ্চা" গোপীনাথ ইহা সহ্য করিবে না। আমিনের বিরুদ্ধে সাহেবের মন বিষাইয়া তুলিতে হইবে। গোপীনাথের পরামর্শেই সাহেব গোলোক বসুকে আসামী করিয়া মামলা দায়ের করিয়াছে। পিতার হাজতবাসে পিতৃভক্ত পুত্র নবীনমাধব যে বিচলিত হইবে ইহা গোপীনাথের মাথায় আসিয়াছিল। সুতরাং উডকে এখন গোপীনাথ যাহা বলিবে, উড তাহাই শুনিবে। নবীন বসুর কথা বলিয়া তাই সে সাহেবের মন জয় করিয়া সত্য-মিথ্যা জড়াইয়া আমিনের নামে দু-কথা লাগাইতেছে। যখন সে উডকে বুঝাইয়া আমিনের সর্বনাশের রাস্তা পরিষ্কার করিতে পারিয়াছে ভাবিল, তখন আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া বলিয়া উঠিল,—

"ঠেকিয়াছে এইবার কায়েতের ঘায়।
বোনাই বাবার বাবা হার মেনে যায় ॥"

গোপীনাথ দাস দেবতাও নয়, শয়তানও নয়,—উভয়েরই সমন্বয়ে সৃষ্ট বিষয়ী মানুষ। নিজের স্বার্থটুকু সে ভালভাবেই বোঝে।

কিন্তু এহেন ধূর্ত, বিষয়ী স্বার্থপর গোপীনাথের অন্তরেও বিপন্নের প্রতি সমবেদনা আছে। সে বলে, "আমার মনেতে কিছু দুঃখ হ'য়েছে—মিথ্যা মোকদ্দমা করে মানী মানুষটারে নষ্ট করলাম।" কিন্তু এই সমবেদনার চেয়েও নিজের বিপদের আশঙ্কা গোপীনাথকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে বেশী। সে ভাবে, "আমাকে হয়তো সাবেক দেওয়ানের সঙ্গে কতকদিন থাকৃতে হয়।" তাই নবীন বসুর ব্যাপারে সাহেব যাহাতে আর বেশী কিছু না করে, সে-বিষয়ে সে সাহেবকে অনুরোধ করে। সাহেব যখন কিছুতেই গোপীর কথা শুনিল না, গোপী তখন বুঝিল, তাহার চাকরী এবং প্রাণ উভয়ই যাইতে পারে। তখন সে সাহেবকে দুই চারিটা উচিত কথা বলিতেও ভয় পাইল না।

গোপীর আর একটা বড় গুণ আছে। অপমান নির্যাতন সহ্য করিয়াও সে সমস্তই হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারে। সে নিজেকে লইয়াও তামাসা করিতে ছাড়ে না। উডের লাথি খাইয়া সে বলে, "শাতশত শকুনি মরিয়া একটি নীলকরের দেওয়ান হয়, নইলে অগণিত মোজা হজম হয় কেমন করে? কি পদাঘাতই করিতেছে, বাবা! বেটা যেন আমার কালেজ আউট্ বাবুদের গৌণপরা মাগ।"

পঞ্চমাঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে আমরা অল্পপরিসরে আর একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, সুচিত্রিত চরিত্র দেখিতে পাই। গোপীনাথ দাসের সঙ্গে একটি গোপের আলাপ হইতেছে। এই গোপের নিকট হইতে সে গোলোক বসুর খবরাখবর লইতেছে। গোপটি নীলকুঠির মধ্যে বসিয়া কথা বলিলেও গোলোক বসুর পরিবারের প্রতি সমবেদনায় এতই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে যে সে আর তাল সামলাইয়া কথা বলিতে পারিতেছে না। সে বলে, "গোড়ার লীলি বুড়রে, খেয়েচে, বুড়ীরিও খাব্যে কত্তি জোগবে।" গোপীনাথ নীলকরের নিন্দায় ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, "চুপ কর গুওড়া, সাহেব শুনলে এখনি অমাবস্যা বার করবে।" গোপ সতর্ক হইয়াও ঠিক সতর্ক হইতে পারিতেছে না। এই নিরক্ষর লোকটি যখন একবার উত্তেজিত হইয়াছে, তখন সহজে কি করিয়া আত্মসম্বরণ করিবে? কিন্তু সে তো ইচ্ছা করিয়া কুটিতে বসিয়া নীলকরের নিন্দা করে নাই। গোপীনাথই কথায় কথায় তাহার অন্তরের সঞ্চিত নীলকরের প্রতি বিদ্বেষের বিষ টানিয়া বাহির করিয়াছে। গোপীনাথ তখন আত্মদোষ ক্ষালনের জন্য বলিল যে গোলোক বসুর দুঃখে তাহার কিছু সমবেদনা জাগিয়াছে। গোপ এই কথা বিশ্বাস করিতে পারে নাই। সে যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই বলিয়া ফেলিয়াছে, "ব্যাঙের সর্দি।" ব্যাঙ্ চিরদিন জলে বাস করে; সুতরাং ঠাণ্ডা লাগিয়া তাহার সর্দি হইতে পারে না। ঠিক তেমনি, নিত্য নিত্য কৃষকের ঘরজ্বালানো, নারীহরণ, দাঙ্গা, মাম্‌লা-মোকদ্দমা করিয়া কৃষকের সর্বনাশ করা যাহার কর্ম, সেই নীলকরের নায়েবের তো এই সামান্য ব্যাপারে এতটুকু দুঃখ হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু গোপটি বোকা নয়। সে নিশ্চয়ই বোঝে যে নায়েবের নিকট নীলকর সাহেবের নিন্দা করিলে তবুও সামলানো যাইবে, কিন্তু একেবারে নায়েবের মুখের উপর তাহাকে নিন্দা করিলে ফল বিপরীত হইবার সম্ভাবনা। নায়েব রাগিয়া গিয়া তাহার ক্ষতি করিতে পারে। তাই সে মুহূর্তে সাবধান হইয়া বলে,

"দেওানজী মশাই, খাপা হবেন না, মুই পাগল-ছাগল আছি একটা, তামাক সাজে আন্‌বো ?" তামাক সাজিয়া আনিতে গেলে সে যেমন এই প্রসঙ্গ হইতে রক্ষা পাইবে, তেমনি নায়েবকে সেবা দিয়া খুশী করিয়া অপরাধ হইতেও অব্যাহতি পাইতে পারিবে। সুতরাং অতি সংক্ষেপে নাট্যকার সুন্দর করিয়া এই চরিত্রটি অঙ্কন করিয়াছেন। এই গোপের মধ্যে একটা জীবন্ত গ্রাম্য মানুষকেই আমরা দেখিতে পাই।

এইবার আমরা দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণের অন্তর্গত হাস্যরসের আলোচনা করিব। দীনবন্ধু মিত্রই বাংলা নাট্যসাহিত্যে প্রথম সার্থক হিউমার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার হাস্য চরিত্র এবং ঘটনার উপর বাহির হইতে চাপাইয়া দেওয়া হয় না। উহা চরিত্রেরই স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নীলদর্পণের হাস্যরসসৃষ্টির প্রচেষ্টা আমাদিগকে কুলীনকুলসর্বস্বের অংশবিশেষ মনে করাইয়া দেয়। শ্লেষের সাহায্যে শব্দার্থের ভিন্নতা সৃষ্টি করিয়া (ইংরেজী pun-অলঙ্কার অবলম্বনে) রামনারায়ণ সুমতি এবং তাহার শিশুকে দিয়া হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন। নীলদর্পণ নাটকে আদুরী ও সৈরিন্ধ্রীর কথোপকথনে সেই একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে। সৈরিন্ধ্রী আদুরীকে তামাক পোড়ার কৌটাটা আনিতে বলিল। কৌটাটা রান্নাঘরের রকে উঠিতে ডানদিকে চালের বাতায় গোঁজা আছে। আদুরী চাল পর্যন্ত বুঝিতে পারিয়াছে। বাক্যের আর কোনা শব্দই সে অনুধাবন করে নাই। চালে উঠিবার জন্য তাই সে মই আনিতে যাইতেছে। সৈরিন্ধ্রী বলিল, "তুই রক কারে বলে জানিস্‌নে, তুই ডান বুঝিস্‌নে ? "ডান" শব্দটি আদুরীর কানে গিয়াছে। কিন্তু কথাটি সে উলটা করিয়া বুঝিল। 'ডান' শব্দে দক্ষিণ না বুঝিয়া সে বুঝিল 'ডাইনী' ; ডাইনী হইতে আদুরী কিছুতেই রাজি নয়। ডাইনীর দোষ-গুণ কি আদুরী তাহা জানে না। তবে এইটুকু সে জানে যে ডাইনী 'বুড়ী' ; আদুরী অত বৃদ্ধা হইতে চায় না। বলে, "মুই কি ডান হবার মতো বুড়ো হইচি।" কিন্তু চায় না কেন ? আদুরী বৃদ্ধা হইলেও নারী-জনোচিত স্বাভাবিক দুর্বলতা তাহার আছে। বিগত দিনের দাম্পত্য জীবনের মধুময় স্মৃতি এখনও তাহাকে ব্যাকুল করে। স্বামীর আদরের কথা বলিতে গিয়া সে আনন্দে শতমুখ হয়। বৃদ্ধার এই তরুণীজনোচিত পুলকিত প্রেমস্মৃতি-আস্বাদন অসঙ্গতি-জনিত হাস্যরস সৃষ্টি করে। এই হাসি আরো প্রগাঢ় হয় এই জন্য যে সৈরিন্ধ্রী যে তাহাকে তামাসা করিতেছে আদুরী তাহা বুঝিতে পারে না।

জিজ্ঞাসাটিকে অকপট মনে করিয়া সেও অকপট উৎসাহে, নিবিড় সারল্যে, আপন দাম্পত্য প্রেমের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া যায়। কারণ, আদুরী স্বামী হারাইয়াছে এবং যৌবন হারাইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও যুবতী-জনোচিত মনোভাবটি হারায় নাই। তাই সে নিজেকে বৃদ্ধা মনে করিতে পারে না। সুযোগ পাইলে সে-ও এই তরুণী বধূদের মতো নায়িকা সাজিতে পারে। বৃদ্ধার এই তরুণায়ন-বাসনাই হিউমারের সৃষ্টি করিয়াছে। রেবতী যখন বলে "ক্ষেত্রকে রোগ সাহেব······তার সঙ্গে একবার কুটির বারান্দার ঘরে যাতি ব'লেছে", তখন আদুরীর মনে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হইল। সাহেবের কুটিতে যাইতে আদুরীর অন্য কোনোদিক দিয়া আপত্তি নাই। পেঁয়াজের গন্ধটুকু সে সহ্য করতে পারিবে না। বৃদ্ধার অন্তরস্থিত অভিসার বাসনার সঙ্গে চিরাচরিত আচরণ-জনিত সংস্কারের দ্বন্দ্ব বাধিয়াছে। পলাণ্ডুরস তখনও উচ্চ নীচ কোনো স্তরের হিন্দুগৃহে নিত্য আস্বাদ্য মহাবস্তু হইয়া ওঠে নাই; তাই এই হিন্দু বৃদ্ধাটির প্রথম আপত্তি হইল সাহেবের পেঁয়াজের গন্ধে। এখানে অবশ্য ভাবিতে পারি, নিম্নশ্রেণীর এই বিধবার ম্লেচ্ছপুরুষ সংসর্গে আপত্তি নাই। সতীত্বের মর্যাদা তাহার নিকট বড় নহে। ব্যাপারটি ঠিক তাই নয়। অন্তরের অতৃপ্ত আসঙ্গলিপ্সার সঙ্গে চিরাচরিত সংস্কারের দ্বন্দ্বও অতি অল্পকথায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। পরপুরুষের সংস্পর্শে এমন কি তাহার সঙ্গে বাক্যালাপও হিন্দুনারীর পক্ষে নিন্দনীয়, আদুরী তাহা জানে। "কুটির বিবির লজ্জা নাই", শরম নাই: ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়িয়া সে রাস্তায় বাহির হইয়াছিল। মেয়ে মানুষে ঘোড়ায় চাপে, পরপুরুষের সঙ্গে বেড়ায়, আদুরী ইহা কি করিয়া সহ্য করিবে? এদেশে ভাসুরের সঙ্গে ভ্রাতৃবধূ হাসিয়া কথা বলিলেও লোকে নিন্দা করে। অল্পকথায় দীনবন্ধু যেমন আদুরীর মনের কথা খুলিয়া বলিয়াছেন, তেমনি বৃদ্ধার যুবতীসুলভ প্রেমবাসনার ইঙ্গিত করিয়া অসঙ্গতিজনিত হাস্যরসও সৃষ্টি করিয়াছেন। তবে এই অসঙ্গতি বাহিরের নহে, অন্তরের সংস্কারের—চরিত্রের। দীনবন্ধুর আদুরীর প্রভাবে পরবর্তীকালে বাংলা নাট্যসাহিত্য কিছু কিছু চরিত্র সৃষ্টি হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণা প্রতাপ সিংহ' নাটকে রেবার ধাত্রীটি এই জাতীয় চরিত্র। রেবা শুনিতে না চাহিলেও সে তাহার দাম্পত্য প্রেমের ইতিহাস এই রাজকুমারীকে শুনাইবেই।

আদুরী বৃদ্ধা হইতে পারে, বোকা হইতে পারে; কিন্তু সে নারী। তাহারও একদিন দাম্পত্য জীবন ছিল। সুতরাং দম্পতীর অন্তরের কথা সে যে

বুঝিতে পারে, তাহার একটি মাত্র বাক্যে সে বিষয়টি চমৎকার প্রকাশ পাইয়াছে। নবীনমাধব নেপথ্য হইতে ডাকিল, 'আদুরী'। মাতা সাবিত্রী বুঝিলেন, পুত্র জল চাহিতেছে। তাই সে সৈরিন্ধ্রীকে যাইতে বলিল। সৈরিন্ধ্রী এই ডাকের অর্থ বুঝিয়াছে। তাই সে তামাসা করিয়া জনান্তিকে আদুরীকে বলিল, "আদুরী তোরে ডাকছে।" এই 'তোরে' ডাকাটির অর্থ, স্ত্রীর কর্তব্য বৃদ্ধা দাসী পালন করিয়া আসুক। আদুরী বুঝিয়াই সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত উত্তর দিল, "ডাকচেন মোরে কিন্তু চাচ্চেন তোমারে।" বাক্যটি উৎকৃষ্ট হিউমার। এখানে আর একটি কথা লক্ষ্য করিবার মতো। 'নীলদর্পণ' নাটকে নীলকরদের অত্যাচারের চিত্র অঙ্কন করাই নাট্যকারের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহার মধ্যে নায়ক নবীনমাধবের দাম্পত্য প্রেমের ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয়। নায়ক যে দাম্পত্য প্রেমেও কতখানি সুখী ছিল, একটি কথায়, সামান্য ইঙ্গিতে, নাট্যকার তাহার অনেকখানি বলিয়া গেলেন। এমন সুখী পরিবারের সুখী দম্পতীর জীবনের বিষাদময় পরিণাম দেখিয়া আমরা নিশ্চয়ই বেদনায় অভিভূত হইব। এই হাসি তাই নাট্য-পরিণতির বিষাদের অগ্রদূত। হাস্য ও কারুণ্যের সংমিশ্রণ দীনবন্ধুর নাটকে এমনি করিয়াই হইয়াছে।

হাসি ও অশ্রুর সংমিশ্রণ ঘটাইয়া দীনবন্ধু উৎকৃষ্ট হিউমার সৃষ্টি করিয়াছেন দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর ভাঁড়ুদত্ত যখন বন্যায় ডুবিয়া মরিতেছে, তখন 'চুলে ধরি মাগু' তাহাকে 'উদ্ধার' করিয়াছিল। যে অকাল-কুষ্মাণ্ড পুরুষ আত্মরক্ষা করিতে পারে না, স্ত্রী তাহাকে উদ্ধার করিয়াছে জানিয়া অসঙ্গতিবোধে আমরা হাসিয়া উঠি। কিন্তু নীলদর্পণ নাটকের তৃতীয় রায়তটি একেবারে স্ত্রীগতবুদ্ধি। মাম্‌দো ভূতে পাইলে ছাড়ে না, এ-কথা যখন স্ত্রী বলিয়াছে, তখন তাহা আর মিথ্যা হইতে পারে না। আমাদের দেশে স্বামীকেই স্ত্রীর থেকে বয়সে, বিদ্যা-বুদ্ধিতে বড় বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়। স্ত্রীগণ স্বামীকেই তাই প্রাজ্ঞ জানিয়া অনুসরণ করে। তাহার কথা, তাহার যুক্তিকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। এই রায়তটির বেলায় তাহার বিপরীতটি দেখিয়া আমাদের হাসি পায়। কিন্তু যখন রোগ সাহেবের 'পায়ের গুঁতা' খাইয়া এই রায়তটি "বউ তুই কনেরে, মোরে খুন করে ফেল্‌লো, মারে, বৌরে, মেলেরে," বলিয়া পড়িয়া যায়, তখন এই মাতা ও স্ত্রীর উপর একান্ত নির্ভরশীল সরল লোকটির প্রতি সমবেদনায় আমাদের অন্তর কাঁদিয়া ওঠে।

একটি উৎকৃষ্ট হিউমারের পরিচয় পাই চতুর্থ রায়তের উক্তিতে। রায়তটি একবার স্বরপুরে আসিয়া বসু মহাশয়কে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। "আহা কি দয়ার শোরীল, কি চেহারার চটক, কি অপরূপ রূপী দেখলাম, বসে আছে যেন গজেন্দ্রগামিনী।" অসঙ্গতিবোধে আমরা না হাসিয়া পারি না। কারণ, যিনি বসিয়া থাকেন, তিনি একেবারেই গমনশূন্য,—সুতরাং গজেন্দ্রগমনের কোনো কথাই তাঁহার পক্ষে উঠিতে পারে না। তারপর দ্বিতীয় অসঙ্গতি হইল এই যে, বসু মহাশয় পুরুষ; তাঁহাকে গজেন্দ্রগামিনী বলিয়া নারী করিয়া দিবার সঙ্গত কোনো কারণ নাই। কিন্তু হাসিটি এখানে নিছক বহিরঙ্গ অসঙ্গতির পরিচয়ই বহন করে না। ইহা বক্তার চরিত্রের একটি বিশেষ দিকের ইঙ্গিত করে। রায়তটি লেখাপড়া জানে না। যাত্রা, কথকতা, পাঁচালী ইত্যাদি সে শুনিয়াছে। নিশ্চয়ই শ্রীমতী রাধিকাকে 'গজেন্দ্রগামিনী' বলা হইয়াছে। রায়তটি শব্দটির অর্থ কিছুই বোঝে নাই। কিন্তু শব্দটি যে অতি পূজনীয় কোনো কোনো গুরুজন বা দেবজনকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে তাহা সে জানে। গুরুজনদের সম্মান দিতে হইলে যে সাধুজনের মুখ-নিঃসৃত সাধুভাষা ব্যবহার করিতে হইবে ইহাও সে জানে। সুতরাং বসু মহাশয়ের উদ্দেশে তাহার অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধা বিমথিত করিয়া এই 'গজেন্দ্রগামিনী' শব্দটি বাহির হইয়া আসিয়াছে। এই অসঙ্গতি চরিত্রেরই গভীর অভিব্যক্তি। তাই ইহা উৎকৃষ্ট হিউমারের উদাহরণ।

অবশ্য দীনবন্ধু-প্রতিভার যে গৌরবময় দিক তাঁহার নাটক-প্রহসনাদিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং যাহা তাঁহার প্রতিভার একমাত্র বৈশিষ্ট্য, সে সম্বন্ধে আমরা যেন আলোচনা করিতে ভুলিয়া না যাই।

নাটক ও প্রহসনগুলির আলোচনা করিয়া দেখা যায়, নিম্নস্তরের চরিত্রগুলি যত স্বাভাবিক ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে, উচ্চস্তরের চরিত্রগুলি তাহা হয় নাই। তাহাদের ভাষার জড়তা ও কর্মের বৈচিত্র্যহীনতা তাহাদিগকে নির্জীব এবং নিশ্চল করিয়া রাখিয়াছে। নীলদর্পণ নাটকে তোরাপ, আদুরী, রাইচরণ, গোপীনাথ প্রভৃতির নিকট নবীনমাধব, গোলোক বসু সাধুচরণ প্রভৃতি নিষ্প্রভ। অন্যান্য নাটকের বেলায়ও নিমেদত্ত, নদের চাঁদের দল যেমন জীবন্তভাবে চিত্রিত হইয়াছে, সচ্চরিত্র, প্রতিষ্ঠাবান্, উচ্চস্তরের লোকেরা তাহা হয় নাই। ইহার কারণ দেখাইতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, নিম্নস্তরের লোকগুলির প্রতি দীনবন্ধুর একদিকে

যেমন অসীম সমবেদনা ছিল, অন্যদিকে তাহাদের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও ছিল। তাই তিনি তাহাদিগকে যে অবস্থায় দেখিয়াছেন, ঠিক সেইভাবে তাহাদিগের সামগ্রিক আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়াছেন। নিজের কল্পনার রঙে কাহাকেও রঙীন করিতে হয় নাই। কিন্তু উচ্চস্তরের যে সমস্ত চরিত্র তিনি রচনা করিয়াছেন, তাহাদের কোনো জীবন্ত আদর্শ নাট্যকারের সম্মুখে ছিল না। এবং যে অলৌকিক কল্পনা-শক্তি থাকিলে বাস্তব অভিজ্ঞতার দৈন্য দূর করা যায়, সেই উচ্চাঙ্গের কল্পনা-শক্তি দীনবন্ধুর ছিল না। তাই উচ্চস্তরের চরিত্রগুলি অমন নির্জীব হইয়াছে।* বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তিকে আমরা অনেকখানি স্বীকার করিতে সম্মত আছি। দীনবন্ধুর বাস্তব-দৃষ্টি ছিল। কিন্তু যে সৃজনী-শক্তি থাকিলে দৃষ্ট জগৎ ও জীবনের উপকরণ লইয়া শিল্পিজনোচিত গ্রহণ-বর্জনের দ্বারা চিত্তাকর্ষক জীবনচিত্র আঁকিয়া তোলা যায়, দীনবন্ধু মিত্রের মধ্যে তাহার অভাব ছিল। তাই তিনি যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই প্রাকৃত স্বরূপে রূপ দিয়াছেন, পরিমার্জিত করেন নাই। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির এই অমার্জিত ভাব অনেক জায়গায় অতি-জীবন্ত এবং সেই জন্যই সুন্দর হইয়াছে। তোরাপের মধ্যে শারীরিক শক্তি, কৃতজ্ঞতা ও ধর্মাধর্মজ্ঞানের সমাবেশ আছে। কিন্তু তাহার মধ্যে যে একটা অসংস্কৃতবাক্, প্রকৃতিশিশুর আরণ্য বলিষ্ঠতা রহিয়াছে, যাহা রূঢ় হইলেও আপন স্বাভাবিকতায় আপনি সুন্দর, তাহা বুঝিতে পারি তাহার বাক্য ও কর্মের সুসঙ্গত সমন্বয়ে। রাগ হইলে সে শুধু সাহেবকে চিৎ করিয়া ফেলাইয়া পলায় না, দরকার হইলে তাহার নাক কামড়াইয়া দেয়। তাহার তীব্র অন্তর্দাহ বাক্যে যখন প্রকাশিত হয়, তখন শিক্ষিত ভদ্রলোকের রুচির অপেক্ষা রাখে না। সে ভাষা শিক্ষিত লোকের অমুচ্চার্য হইলেও তোরাপের পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক। গ্রাম্য গালাগালি বা গ্রাম্য তামাসার ভাষা দীনবন্ধু নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু উহা অশ্লীলতার পর্যায়ে পড়ে না; বরং তাহার জন্য ঐ চরিত্রগুলি অতিমাত্র জীবন্ত হইয়াছে। তাহাদের ঐ ধরনের আলাপ-ব্যবহারের সঙ্গে জনসাধারণও পরিচিত।

অবশ্য দীনবন্ধুর মধ্যে আপত্তিকর অশ্লীলতা যে নাই তাহা নহে। মাঝে মাঝে তিনি অসংযত ভাবে সমাজ বা সমাজের কোনো স্তরের লোককে

---

* দীনবন্ধু গ্রন্থাবলীর (বসুমতী সংস্করণ) ভূমিকা-ভাগে উদ্ধৃত বঙ্কিমচন্দ্রের দীনবন্ধু-বিষয়ক প্রবন্ধ।

আক্রমণ করিয়াছেন। সেই আক্রমণের অসঙ্গতি আমাদিগকে ব্যথা দেয়। হাস্যরসাত্মক বলিয়াও আমরা সেই অবাঞ্ছিত অসঙ্গতিকে গ্রহণ করিতে পারি না। নিমেদত্তের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাঁড়ামি চরিত্র ও পরিবেশের সঙ্গে বেশ সঙ্গতি রাখিয়া চলে। তাই নিমেদত্তের অমন পতিত মদ্যপ চরিত্রও জীবন্ত। কিন্তু নদেরচাঁদের চরিত্রে এই সঙ্গতির সমূহ অভাব দেখা যায়। মেয়ে দেখার সময়ে তাহার মূর্খজনোচিত সম্বোধন এবং নিতান্ত অশ্লীল প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা, নিতান্ত বাচালের ন্যায় বক্তৃতা এবং অশিষ্ট আচরণ ঠিক ঠিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রাখে নাই। বিচার-শক্তির অভাবে দীনবন্ধু কয়েকটি উচ্চস্তরের চরিত্রও অসঙ্গতি-দুষ্ট করিয়াছেন। তৎকালীন বয়স্কা বাঙালী মেয়ের courtship-এর চিত্রের কোনো বাস্তব সম্ভাবনা ছিল না বলিয়া তিনি না হয় সেই courtship-এর চিত্র আঁকিতে গিয়া চরিত্রগুলিকে মামুলি ধরনের করিয়াছেন মানিলাম; কিন্তু কামিনীর মাতা যখন জানিতেছে যে তাহার ভাবী জামাতা সন্ন্যাসী বিজয় কন্যার নিকট প্রেম নিবেদন করিতে আসে এবং তাহাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ হয়, এমন কি ফুল তুলিয়া দেওয়ার ব্যাপার বিজয় যখন অতি নিঃসঙ্কোচে কামিনীর মায়ের নিকট প্রকাশ করে, কামিনীর মা তাহাকে তখন পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া এই courtship-এর উৎসাহ দান করে কি করিয়া? বাঙালী মাতার পক্ষে ইহা কতখানি স্বাভাবিক এবং সঙ্গত তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। রোমান্টিক নাটকের মধ্যে কালানৌচিত্য দোষ বা anachronism ঘটাইয়া দীনবন্ধু কামিনীর দ্বারা স্কুল খোলাইয়াছেন। কিন্তু সেই স্কুলে যে অনঙ্গবন্দনা-রূপ পাঠ দেওয়া হয়, কচি খুকীদের পক্ষে তাহা অভ্যাস করা সঙ্গত কি? তারপর 'নবীন-তপস্বিনী'র কাহিনীর পটভূমিকা হইতেছে রাজা রমণীমোহনের দুই বিবাহ এবং ছোটরানী ও রাজমাতার পরামর্শে বড়রানীকে বিষ খাওয়ানোর প্রবাদ ইত্যাদি। তাহা হইতেই ধীরে ধীরে কাহিনী পল্লবিত হইয়া উঠিল। এখানে রাজার পারিবারিক ইতিহাস যাহা সঙ্কলিত হইয়াছে তাহার মধ্যে রাজ-পরিবারোচিত গাম্ভীর্যকে বিসর্জন দিয়া দীনবন্ধু একটি মধ্যবিত্ত কুলীন বাঙালী পরিবারের অন্তঃপুরের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। রাজার জন্য পাত্রী অনুসন্ধানে বাঙালী ঘটকের ঘটকালির বর্ণনাই ফুটিয়া ওঠে। ইহার মধ্যে উপকথার অলৌকিক বিস্ময়াশ্রিত আনন্দ বা ঐতিহাসিক রাজান্তঃপুরের

রহস্য অথবা পৌরাণিক চরিত্রের মহাকাব্যিক রূঢ়, স্থূল সবলতার কোনোও প্রকাশ নাই। সুতরাং দীনবন্ধুর প্রতিভা তাঁহার নবীন-তপস্বিনী নাটকের গল্প-রচনায় বা চরিত্র-চিত্রণে উপকথা, তৎকালীন বাঙালীর পারিবারিক ইতিহাস এবং প্রচারবাদের সমাবেশ করিলেও সুষ্ঠু সমন্বয় করিতে পারে নাই যাহার জন্য সাহিত্যিক সৃষ্টিটাই হইয়াছে অসার্থক। ওদিকে তাঁহার জলধর-জগদম্বার চরিত্র যতই হাস্যোদ্দীপক হউক না কেন, জলধরের রাজমন্ত্রী-পরিচয় ও ভাঁড়ামির মধ্যে যে অসঙ্গতি আছে, আমাদের মন তাহা কিছুতেই অতিক্রম করিয়া উঠিতে চাহে না। তারপর 'সধবার একাদশী'র কাহিনী-পরিবেশনে নাটকীয় কোনো সঙ্ঘাতের বালাই নাই, পতন-অভ্যুত্থানের প্রয়োজনবোধ নাই। চরিত্রগুলিকে যেমন ভাবে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি, সেইভাবেই বরাবর তাহাদিগকে দেখিতেছি। কোনো ক্রমবিকাশ বা পরিবর্তন নাই। তাই নিমেদত্তের মাত্‌লামী যতই মনোজ্ঞ হউক না কেন, এই নাটকে কোনো চরিত্র নাই। অটলের আকস্মিক ভাব-পরিবর্তনের মধ্যে কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক নাই। অর্থাৎ বাহ্য ও আভ্যন্তর কর্মের সঙ্ঘাতে ধীরে ধীরে চরিত্রটি গড়িয়া উঠিয়া ক্রমবিকাশের স্তর বাহিয়া সুষ্ঠু পরিণতি বা সমাপ্তির যবনিকাপাত করে না। মাইকেল মধুসূদনের নাটক ও প্রহসনগুলি কিন্তু এই দিক দিয়া দীনবন্ধুর নাট্য-প্রহসনগুলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মাইকেলের নাটকের কাহিনী-বিন্যাস-রীতি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার প্রহসনেও হাস্যরসাত্মক চরিত্রগুলি ভাষা ও কর্মের মধ্য দিয়া একদিকে যেমন বাস্তব ও জীবন্ত হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি আঁট-সাঁট-বাঁধা স্বাভাবিক এক একটি কাহিনী গ্রথিত হইয়া উঠিয়াছে। সে কাহিনীর আরম্ভও যেমন আছে, পরিণতিও আছে তেমনি।

দীনবন্ধুর নাটকাবলী পড়িতে গিয়া আর একটি প্রধান দোষ আমাদের দৃষ্টি কিছুতেই এড়াইতে পারে না। সেটি হইতেছে উচ্চস্তরের পাত্র-পাত্রীর মুখের ভাষার। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে কল্পনা ও অভিজ্ঞতার অভাব বলিয়াছেন। এখানে অন্ততঃ সাহিত্য-সম্রাটের এই যুক্তিকে সম্পূর্ণ মানিতে পারি না। হইতে পারে বাঙালী-কন্যার courtship অবাস্তব বলিয়া বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাবে লীলাবতী, কামিনী প্রভৃতি চরিত্র নির্জীব হইয়াছে। কিন্তু নীলকরের অত্যাচার যেখানে বাস্তব, নবীনমাধব, বিন্দুমাধব যেখানে জীবন্ত সত্য, সেখানে তাহারা নাটকে যে ধরনের কর্ম করিতেছে, যে ধরনের চিন্তা

করিতেছে বা যে ভাবে তাহাদের হৃদয় আন্দোলিত হইতেছে তাহার মধ্যে এমন কোনো অবাস্তবতা বা অলৌকিকত্ব নাই, যাহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবে চরিত্রগুলি অসার্থক হইতে পারে। নীলকরের অত্যাচারে একজন ভদ্র মধ্যবিত্ত-ঘরের লোক বিব্রত হইতে পারে, ইহা বাস্তব। নবীনমাধবের মতো পরোপকারী পিতৃভক্ত, সৎসাহসী যুবক থাকাও বাস্তব। বাপের মামলার তদ্‌বির করিতে স্ত্রীর গহনা লইয়া বন্ধক দিয়া বা বিক্রয় করিয়া মামলা চালানো প্রভৃতি কোনো ঘটনাই নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটে না তাহা নহে। এই স্বাভাবিক ঘটনা-পুঞ্জ গ্রন্থনে কল্পনার রঙ্গীন স্বপ্ন বয়ন করিতে অবশ্যই হয় নাই। আর নবীনমাধবের মতো লোক যখন ছিল, নবীনমাধবের সংসারের স্ত্রীলোকদের মতো স্ত্রীলোকও যখন সেই সংসারে ছিল, যে যে কর্ম-প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া তাহারা গিয়াছে, ঐ বাস্তব পরিবারও নিশ্চয়ই যখন সেই সেই কর্ম-প্রচেষ্টা করিয়াছে, তখন তাহাদের তৎকর্মানুযায়ী মুখের ভাষাও ছিল। আমরা কি এখানে বিশ্বাস করিব যে দীনবন্ধু নিজে ভদ্র মধ্যবিত্ত কায়স্থ-সন্তান হইয়াও সেই ভাষার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না? পরিচিত তিনি অবশ্যই ছিলেন। আমার মনে হয়, তিনি ইচ্ছা করিয়াই উচ্চস্তরের লোকের মুখের ভাষা ব্যবহার করেন নাই। সেখানে তিনি সাহিত্যিক এবং কাব্যিক ভাষা ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন গভীর এবং গম্ভীর ভাব বা বিষাদময়ী পরিস্থিতির প্রকাশে সংস্কৃতানুগ এই ভাষা বেশী কার্যক্ষম ও হৃদয়বেদ্য হইবে। তাই দেখা গিয়াছে, শোকের ভাষায়, প্রেমের ভাষায়, অর্থাৎ উচ্চ ও গভীর ভাবের ভাষায়, তিনি সংস্কৃতানুগ লেখ্য বাংলার শরণ লইয়াছেন। এই ভাষা শুধু নবীনমাধবের মুখে নয়; মদ্যপ, বাচাল নিমচাঁদের মুখেও নাট্যকার কী ভাষা দিয়াছেন!—"রে পাপাত্মা! রে দুরাশয়! রে ধর্ম-লজ্জা-মান-মর্যাদা-পরিপন্থী মদ্যপায়ী মাতাল! রে নিমচাঁদ! তুমি একবার নয়ন-নিমীলন করে ভাব দেখি তুমি কি ছিলে কি হয়েছ।"—[সধবার একাদশী, ৩য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক।] ললিত-লীলাবতীর প্রেম-প্রকাশের ভাষা, বিজয়-কামিনীর আত্মনিবেদনের ভাষা, সরলতার চিঠির ভাষা, ঐ একই পথ অনুসরণ করিয়াছে। দীনবন্ধু যদি বুঝিতেন যে যাহাদের হৃদয়ের গভীর ব্যাকুলতা তিনি ভাষায় প্রকাশ করিতেছেন, তাহাদের স্বাভাবিক ভাষায় প্রকাশ করিলে তাহা যতখানি হৃদয়গ্রাহী হইত, এই কৃত্রিম ভাষায় তাহা হয় নাই। কেন না আসলের চেয়ে

চাকচিক্যময় নকল কখনই সুন্দর হয় না। তাই আমার মনে হয়, উচ্চস্তরের চরিত্রগুলি ব্যর্থ হওয়ার কারণ দীনবন্ধুর অভিজ্ঞতা বা কল্পনা-শক্তির অভাব নয়; বিচার-শক্তির এবং স্বাভাবিকতাকে স্বীকারের অভাব। তিনি যে কেন বুঝিলেন না যে বাঙালী-কুলবধূ সৈরিন্ধ্রী টোলের ভট্টাচার্য নয়, তাই তাহার মুখে, —"জীবনকান্ত আমি যে কষ্টে ও নিদারুণ কথা বলিয়াছি তাহা আমিই জানি আর সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বরই জানেন, ও অগ্নিবাণ তার সন্দেহ কি—আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ করেছে, জিহ্বা দগ্ধ করেছে, পরে ওষ্ঠ ভেদ করে তোমার অন্তঃকরণে প্রবেশ করেছে," [নীলদর্পণ, তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক] প্রভৃতি ভাষা অসম্ভব, অসঙ্গত এবং অনুচ্চার্য, তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না। বলা বাহুল্য আমাদের বঙ্গীয় অন্তঃপুরিকাগণ এই কালিদাসীয় শ্লোকের অভঙ্গ অনুবাদের ভাষায় কোনোদিন কথা বলে নাই, বলিবে না। আবার বাক্যগুলি কোথাও কোথাও এত লম্বিত হইয়াছে যে তাহা শুধু ধৈর্যচ্যুতিই ঘটায় না, রসানুভূতিতেও ব্যাঘাত জন্মায়। ইহার পর মাইকেলের অন্ধ-অনুকরণ-জনিত অমিত্রাক্ষরের প্রাণহীন, স্পন্দনহীন, লালিত্য-বর্জিত দীর্ঘ উক্তি-প্রত্যুক্তি অনেক স্থলে, বিশেষ করিয়া প্রেম-নিবেদন, শোক-জ্ঞাপন প্রভৃতির ক্ষেত্রে, এই অসুন্দরত্বকে আরো বর্ধিত করিয়াছে। যাহা হউক, দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের দোষগুলির জন্য আমরা তাঁহার রচনার গুণগুলি অস্বীকার করিব না। হাস্য-রসাত্মক প্রহসন রচনার ক্ষেত্র তিনি অনেক প্রশস্ত করিয়া গিয়াছেন। তারপর সমাজের নিম্নস্তরের যে সকল নিকৃষ্ট বা দুষ্ট চরিত্র তিনি স্বাভাবিক বা বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে অঙ্কিত করিয়াছেন, নিজের ধারণা-ভাবনার রঙে রঞ্জিত করেন নাই বা অযথা প্রচারের মোহে বিকৃত করেন নাই, তাহারাই তাঁহার নাটকের প্রধান আকর্ষণ। বঙ্গ-সাহিত্যে তাহারা নিজেদের অমর আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সেখানে কেহই তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই।

পঞ্চম অধ্যায়

মনোমোহন বসু

গীতাভিনয় সৃষ্টি

[মধু-দীনবন্ধুর যুগ নাট্য-সম্ভাবনার যুগ; মনোমোহন বসু বাংলা নাট্য-সাহিত্যে মধ্য পন্থার প্রবর্তক; মনোমোহনের উপর মধু-দীনবন্ধুর প্রভাব; মনোমোহন যাত্রা-শৈলীকেই নাট্যীকৃত করিলেন, নাটকে সঙ্গীতের স্থান; সঙ্গীত-প্রয়োগে মনোমোহনের বৈশিষ্ট্য; গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি পরবর্তী নাট্যকারদের উপর মনোমোহনের প্রভাব; 'আনন্দময়' মনোমোহনের শ্রেষ্ঠ নাটক।]

মধুসূদন-দীনবন্ধুকে দিয়া বাংলা নাট্য-সাহিত্যের একটা যুগের শেষ হইল। এই যুগ বাংলা নাটকে ইংরেজী আদর্শকে ধরিবার যুগ। এই প্রচেষ্টা কতটুকু ফলবতী হইয়াছিল, পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তাহার আলোচনা করিয়াছি। তবে এই যুগের সম্বন্ধে আর একটি বিশেষ বক্তব্য এই যে, এই সময়ে বাংলা নাট্য-সাহিত্য যেটুকুই উন্নতিলাভ করুক না কেন, বঙ্গদেশে নাটক রচনার পক্ষে যুগটি অনেকখানি অনুকূল ছিল। পরে হয়ত বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট নাটক রচিত হইয়াছে, উন্নততর প্রতিভাশালী নাট্যকার আবির্ভূত হইয়াছেন। কিন্তু যুগ তাঁহাদের জন্য অতখানি প্রস্তুত ছিল কিনা তাহা বিবেচনার বিষয়। মধু-দীনবন্ধুর যুগ সামাজিক নাটকের পক্ষে নিতান্ত উপযোগী ছিল। উৎকৃষ্ট সামাজিক নাটক তখনই রচিত হইতে পারে যখন জাতীয়-জীবনে একটা নব-জাগরণের সাড়া জাগে। পূর্বেই বলিয়াছি ইংরেজী সাহিত্য ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া বাংলা বহুদিন পরে এই নব-জাগরণের স্পন্দন অনুভব করিল। কিন্তু এই যুগপ্রেরণাকে নাট্যরূপ দিবার মতো মহতী সৃজনী প্রতিভার আবির্ভাব তখনও হয় নাই। মধুসূদনের প্রতিভা রোমান্স্-প্রিয়তার উত্তুঙ্গ শিখর ত্যাগ করিয়া একবার মাত্র ধূলির ধরণীতে অবতরণ করিয়াছিল। তখন আমরা 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামক প্রহসন দুইখানি পাইয়াছিলাম। দীনবন্ধু মিত্রের মধ্যে এই যুগের স্পন্দন অপূর্বভাবে অনুভূত হইলেও তাঁহার বিচার-শক্তির অভাবই যে তাঁহার সামাজিক নাটকের অনেক মহত্তর সম্ভাবনাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে তাহা একান্ত সত্য। যাঁহারা সামাজিক প্রসঙ্গ লইয়া নাটক রচনা করিলেন তাঁহাদের অক্ষম হস্তের স্পর্শে বাংলা নাট্য-সরস্বতীর জাগরণ হইল না। সামাজিক যে প্রেরণা উপযুক্ত

ধৃতির মধ্য দিয়া সার্থক সৃষ্টির সম্ভাবনা আনিতে পারিত, তাহা ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হইতে চলিল। বাঙালীর জীবনে নাট্য-যুগ আসিয়া বিনা অভিনন্দনেই প্রস্থান করিল।

কিন্তু বাংলা নাট্য-সাহিত্যকে এই দুর্গতি হইতে অন্যভাবে রক্ষা করিলেন মনোমোহন বসু। মধু-দীনবন্ধুর যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি প্রতিভাবলে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের মোড় অন্য দিকে ফিরাইয়া দিলেন। বাংলা নাট্য-সাহিত্যের আসরে মনোমোহনের যখন প্রথম প্রবেশ, মধুসূদন তখন প্রকৃত প্রস্তাবে বিদায় লইয়াছেন। মধুসূদনের এক "মায়া-কানন" ভিন্ন সমস্ত নাটকই রচিত হইয়াছে। দীনবন্ধু তখন আপন প্রতিভার মধ্যাহ্নগগনে পূর্ণতেজে বিরাজমান। যে বৎসর মনোমোহনের প্রথম নাটক "রামাভিষেক" প্রকাশিত হয়, সেই বৎসরই প্রকাশিত হইয়াছিল দীনবন্ধুর পঞ্চম নাটক "লীলাবতী"। অতএব মনোমোহনের উপর দীনবন্ধুর প্রভাব অবশ্যই পড়িয়াছে। তবে মাইকেল মধুসূদনের মধ্যে ঘটনা-সংস্থানের যে অপূর্ব কৌশল 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে দেখা যায়, কিংবা দীনবন্ধুর নাটকে চরিত্রের যেটুকু সজীবতা লক্ষ্য করা যায়, মনোমোহনের নাটকে তাহা মেলে না। অন্তর্দ্বন্দ্বে ফেনায়িত চিন্তাধারার কার্যকারণ-সূত্রে কর্মে যে প্রকাশ নাটকীয় ঘটনা ও চরিত্র সৃষ্টি করিয়া তোলে, মনোমোহনের নাটকে তাহা পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে যাত্রার দীর্ঘ বিবৃতি ও কর্মহীন উচ্ছ্বাস মনোমোহনের নাটকে স্থান পাইয়াছে বেশী। তাঁহার শৈলী মুখ্যতঃ যাত্রার। মধু-দীনবন্ধুর প্রভাব উহাতে বহিরঙ্গ মাত্র। খানিকটা আলোচনা করিয়া দেখাইতেছি।

মনোমোহনের প্রায় প্রত্যেক নাটকের আরম্ভে মধুসূদনের প্রভাব আছে। মধুসূদনের পদ্মাবতী নাটকের আরম্ভটি এইরূপ,—

"(ধনুর্বাণ হস্তে রাজা ইন্দ্রনীলের প্রবেশ)

রাজা। (চতুর্দিকে অবলোকন করিয়া স্বগত) হরিণটা দেখতে দেখতে কোন্ দিকে গেল হে? কি আশ্চর্য! আমি কি নিদ্রায় আবৃত হয়ে স্বপ্ন দেখ্‌ছি? আর তাই বা কেমন করে বলি? এই ত ভগবান বিন্ধ্যাচল অচল হয়ে আমার সম্মুখে রয়েছেন। (চিন্তা করিয়া) এই পর্বতময় প্রদেশে রথের গতি রোধ হয় বলে আমি পদব্রজে হরিণটির অনুসরণ-ক্লেশ স্বীকার করে অবশেষে কি আমার এই ফললাভ হল যে, আমি একলা একটা নির্জন বনে এসে পড়লাম?……"

ইহার সহিত মনোমোহনের 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকের আরম্ভের তুলনা করা যাইতে পারে,—

"(মৃগয়াবেশী রাজা হরিশ্চন্দ্র ও নাগেশ্বরের প্রবেশ)

রাজা। একি ? বিঁধেও বিঁধলো না—এমন ত কখনও হয় না, আজ কি হস্ত তুমি এত দুর্বল হয়েছ ? না, জ্যা-রোপণের কোন ত্রুটি ছিল ? কার দোষ ?

নাগে। কারও দোষ নয় মহারাজ। বোধহয় মৃগের গায় ভালরূপে—লাগেনি—

রাজা। লাগেনি, তাও কি সম্ভব ? আমার লক্ষ্য ব্যর্থ ?······"

এই ধরনের নাট্যারম্ভের বৈশিষ্ট্য এই যে, কোন ঘটিয়া-যাওয়া ঘটনার সবটুকু বর্ণনা না দিয়া মাঝামাঝি হইতে প্রসঙ্গগুলি আরম্ভ হয়, বাকিটা অনুমানে বুঝিয়া লইতে হয়। মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' এবং 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের আরম্ভও এইরূপ।

মনোমোহনের প্রায় সবকয়খানি নাটকই এইভাবে আরম্ভ হইয়াছে। প্রণয়-পরীক্ষা নাটকের আরম্ভেও দেখি, মহামায়া স্বামীর প্রেম কাহার প্রতি বেশী তাহার পরীক্ষা করিবার জন্য কাজ্‌লার সঙ্গে যে পরামর্শ করিতেছে তাহার মাঝখান হইতে প্রথম বাক্যটি আরম্ভ হয়,—

"মহা। আর কি রকম জানে ?

কাজ্‌লা। আর একরকম বল্লে, ভেড়ার পিত্তি দে খাওয়াতে হয়, তাতে নাকি পুরুষ একেবারে ভেড়া হয়ে থাকে।

মহা। তার কাছে কি আর কোনো রকম নেই ?

কাজল। কেন এটা কি ভাল না ?······"

মধুসূদনের রচনায় মাঝে মাঝে অনেক নেপথ্য-গীতি থাকে যাহা কোনো পাত্র-পাত্রীরই অন্তরের কথা। কৃষ্ণকুমারী নাটকে নেপথ্যে কৃষ্ণা একটি গান করিতেছে,—"শুনিয়া মোহন মুরলী-গান"···ইত্যাদি।

—কৃষ্ণকুমারী, ২য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক

উহা কৃষ্ণারই পূর্বরাগের অভিব্যক্তি।

এইরূপ নেপথ্য-গীতি দ্বারা নিজের বা অন্যের অন্তরের ভাবকে ব্যক্ত করার চেষ্টা মনোমোহনের বহু নাটকে দেখা যায়। নেপথ্যে একখানা গান হইতেছে,—

"হায় কোথায় রহিলে প্রাণপ্রিয়ে ?

প্রাণ যায় রে—
তব বিচ্ছেদ-দহন সদা দহিছে জীবন
হৃদয়ে পশিয়ে।”……

—প্রণয়-পরীক্ষা নাটক, ৩য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক

ইহা পত্নীহারা রসিকবাবুরই অন্তরের কথা।

মনোমোহনের উপর দীনবন্ধুর প্রভাবও এইরূপ বহিরঙ্গ-মূলক এবং নগণ্য। 'প্রণয়-পরীক্ষা' নাটকের নটবর-চরিত্র আমাদিগকে দীনবন্ধুর নদেরচাঁদ প্রভৃতি উনপাঁজুরে চরিত্রগুলি মনে করাইয়া দেয়। দীনবন্ধুর আদর্শে মনোমোহনও প্রচলিত ছড়ার ব্যবহার করিয়াছেন, যথা—

“বৃন্দাবনে আছেন হরি!
ইচ্ছা হলে রইতে নারি॥”

—লীলদর্পণ, ১ম অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক

“ঢেঁকিরে বোঝাব কত নিত্যি ধান ভানে।
অবোধকে বোঝাব কত বোধ নাহি মানে॥”

—রামাভিষেক, ৩য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক

দীনবন্ধুর “নবীন-তপস্বিনী” নাটকের পলাতক অরবিন্দ এবং সন্ন্যাসিনী চাঁপার প্রভাব মনোমোহনের 'আনন্দময়' নাটকের ভূষণ ও ভৈরবী চরিত্রের উপর পড়িয়াছে।

মনোমোহনের উপর মধু-দীনবন্ধুর এই ছোটখাটো বহিরঙ্গ-মূলক প্রভাবের কথা ছাড়িয়া দিলে দেখা যাইবে মনোমোহনের মূল শৈলী যাত্রার। মনোমোহন চাহিয়াছিলেন যাত্রাকেই নাট্যীকৃত করিতে।* এবিষয়ে তাঁহার নিজের মত এই :—

“আমি এমন বলিতেছি না, যে, যাত্রাওয়ালা যেমন কথায় কথায় অর্থাৎ

* ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের অভিমত এইরূপ: “মনোমোহন যখন নাটক-রচনায় হাত দিলেন তখন স্বভাবতই পূর্বতন যাত্রাপাঁচালীর রীতি তাঁহার নাট্য-রচনাকে প্রভাবিত করিল। প্রকৃতপক্ষে মনোমোহনের নাটকগুলিই পূর্বেকার নাট-গীতির সঙ্গে অধুনাতন সংস্কৃত ইংরেজী পদ্ধতির নাটকের যোগসাধন করিয়া বাঙ্গালা নাটকের মোড় ফিরাইয়া দিল। মনোমোহনের পৌরাণিক নাটকে পুরাতন যাত্রা-পাঁচালীর কারুণ্য ও ভক্তিভাব নূতন করিয়া দেখা দিল। এই ভাব গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলিতে বিকশিত ও পরিণত রূপ পাইয়াছে।”

—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৭

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্তৃতার পর কেবলই গানের আধিক্য করিয়া থাকে, নাটকেও তদ্রূপ হউক। আমার অভিপ্রায় এই যে স্বভাবোক্তির পর যেখানে যেখানে গান খাটিতে পারে তাহা উক্ত স্বাভাবিক নিয়মে সংখ্যায় যতই কেন হউক না, ফলতঃ যে কয়টি গান হইবে সে কয়টি যেন উত্তমরূপে গাওয়া হয়। ফলকথা আমরা মধ্যস্থ মানুষ, আমরা চাই দেশে পূর্বে যাহা ছিল, তাহার ধ্বংস না করিয়া তাহাকে সংশোধিত করিয়া লও। আমরা চাই সেই যাত্রাগান সংখ্যায় কমাইয়া ও গাইবার প্রণালীকে শোধিত করিয়া নাটকের স্বভাবানুযায়ী কথোপকথন বিবৃত হউক।"

—মনোমোহন বসু, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৭-১৮

উপরি-উদ্ধৃত অংশে এই কয়টি লক্ষ্য করিবার বিষয়।—

(১) যাত্রাওয়ালাগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্তৃতার পর অধিক মাত্রায় গান প্রয়োগ করেন।

(২) মনোমোহনের মতে যাত্রার সকল গান নাটকে স্বাভাবিক বা সঙ্গত নয়।

(৩) মনোমোহন নাটকে স্বভাবানুযায়ী কথোপকথন বিবৃত করিবেন।

(৪) গানের সংখ্যা কমাইয়া স্বাভাবিক ক্ষেত্রে গানের প্রয়োগ করিবেন।

(৫) তিনি যাত্রাকে ধ্বংস করিতে চাহেন না, উহা সংশোধন করিয়া লইতে চাহেন।

তাহা হইলে এই বিষয়গুলির মোটামুটি আলোচনা করিলেই মনোমোহনের শৈলীর দিগ্‌দর্শন করা যাইবে।

যাত্রায় যেমন প্রতিটি কথার পর এক একখানা গান থাকে, মনোমোহনের রচনায় তাহা নাই। 'পার্থ-পরাজয়' ও 'রাসলীলা' নাটক দুইটি তিনি যাত্রা অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই রচনা করিয়াছিলেন। ঐ বই দুইটি এবং 'আনন্দময়' নাটকের স্থল-বিশেষে ভিন্ন, দৃশ্যের মধ্যভাগে উক্তি-প্রত্যুক্তির পর গানের সংযোগ সাধারণতঃ মনোমোহনের নাটকে দেখা যায় না। গানগুলি যেমন সংখ্যায় নিতান্ত কম থাকে, তেমনি থাকে প্রায়ই দৃশ্যের শেষে না হয় প্রথমে। আর প্রায় গানই গীত হয় নেপথ্যে। কিন্তু যেখানে কোনো গুরু-গম্ভীর কথা বলা হইতেছে বা কোনো পাত্র-পাত্রী শোক-দুঃখ, বেদনা বা আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, সেখানে এক একখানা

দীর্ঘ বক্তৃতা দেওয়া হইতেছে ; আর সেই বক্তৃতার সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইতেছে গান। সামাজিক নাটকেও ঐ একইভাব, উদাহরণ স্বরূপ,—

প্রণয়-পরীক্ষা নাটক, ৫ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক :

"রসিক। (স্বগত) সূর্যোদয় হলো, আর কেন ? যাওয়া যাক্। চিরদিন দৈবাধীন দুঃখ পেয়েছি, এখন আর ইচ্ছাধীন কেন ? গত তিন রাত যে দুঃখে কাটিয়েছি, তাতে সুখের দিন সম্মুখে পেয়েও কি আর হেলা করতে আছে ? কাল রাতে তত ঘোর দুর্যোগ না হলে পান্থশালায় চেটাইতে কি অমন করে শয্যা-কণ্টক সহ্য করি ? তা নইলে কি এই দুই ক্রোশের ব্যবধান আমায় আনন্দ-গিরির আনন্দ-শয্যায় বঞ্চিত রাখ্তে পারতো ? নইলে এতক্ষণ সেই সুখশয্যা থেকে উঠে কি সুখই ভোগ কর্তেম ?……আজ শান্তবাবুর জন্মোৎসব, সেজন্য মহামায়ার বিশেষ অনুরোধ। আজ তরলার চাতক-ব্রত উদ্‌যাপন, সেজন্য প্রেমের বিশেষ অনুরোধ। আজ সরলার পঞ্চামৃত সেজন্য তরলার বিশেষ অনুরোধ। এত অনুরোধেও মন তুমি আমার চরণকে তোমার বিশেষ গতি দান করছ না ?

গীত

দেখরে মনপথিক, বিভাবরী পোহাইল।
পরিয়ে অরুণ-ভূষা, রূপসী ঊষা আইল ॥
মধুকর মধু আশে, চলিল কমল-পাশে,
বিয়োগীরে উপহাসে গুঞ্জরব শুনাইল ॥"

বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে ইহা যাত্রার প্রভাব। মাইকেল মধুসূদন এবং দীনবন্ধু মিত্রও এই সব ক্ষেত্রে যাত্রার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' হইতে উদাহরণ দিতেছি,—

"শর্মিষ্ঠা। (স্বগত) হে প্রাণেশ্বর, তোমার বিরহে আমার দগ্ধ-হৃদয় যে কিরূপ চঞ্চল হয়েছে তা আর কাকে বলব ? (দীর্ঘ নিঃশ্বাস।) হে প্রাণনাথ, তুমি কি এ অনাথকে জন্মের মত পরিত্যাগ কর্‌লে ? জীবিতনাথ, তোমাকে সকলে দয়াসিন্ধু বলে, কিন্তু এ হতভাগিনীর কপালগুণে কি তোমার সে নামে কলঙ্ক হলো ? হে রাজন্, তুমি দরিদ্রকে অমূল্য রত্ন প্রদান করে আবার তা অপহরণ কল্লে ?……কি আশ্চর্য, গত সুখের কথা স্মরণ হলে দ্বিগুণ দুঃখ বৃদ্ধি হয় বৈ ত নয়।

গীত

ঝিঁঝিট—মধ্যমান

এই সে কুসুম-কানন গো,
পাইয়াছিলাম হেথা পুরুষ-রতন।
সেই মত পিকবরে স্বরে হরে মন।
সেই পূর্ণ শশধরে, সেইরূপ শোভা ধরে,
সেই এই ফুলবনে, মলয়ার সমীরণে,
সুখোদয় যার সনে, কোথা সেইজন।
প্রাণনাথে নাহি হেরি, নয়নে ঝরিছে বারি,
এ দুঃখে আর নারি ধরিতে জীবন॥

আমরা এই স্থানে গান বাদ্যে যে কত সুখলাভ করেছি তার আর পরিসীমা নাই। কিন্তু এক্ষণে সে সুখানুভব কোথায় গেল? আহা, কি চমৎকার ব্যাপার! সেই দেশ, সেই কাল, সেই আমি, কেবল প্রাণেশ্বর ব্যতিরেকে আমার সকলই অসুখ। বীণার তার ছিন্ন হলে তার যেমন দশা ঘটে, জীবিতেশ্বর বিহনে আমার অন্তঃকরণও অবিকল সেইরূপ হয়েছে।"···

'নীলদর্পণ' নাটকের তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে সৈরিন্ধ্রী ও নবীনমাধবের উক্তি-প্রত্যুক্তিতে যাত্রার প্রভাব অতি স্পষ্ট। শুধুমাত্র অলঙ্কার-বিক্রয়ের বিষয় লইয়া সুদীর্ঘ অতিকান্নার এই যে বহর চলিয়াছে ইহা যাত্রারই প্রত্যক্ষ প্রভাব। নীলদর্পণের শেষ দৃশ্যে দীর্ঘ বক্তৃতা ও মৃত্যুর পর মৃত্যু; ইহাও যাত্রারই প্রভাব ব্যতীত কিছুই নহে।

তবে রামনারায়ণ, মধুসূদন ও দীনবন্ধু হইতে মনোমোহনের পার্থক্য এইখানে যে নাট্যকার-ত্রয় নাটক রচনা করিতে করিতে যাত্রার দ্বারা স্থানে স্থানে প্রভাবান্বিত হইয়াছেন, আর মনোমোহন মুখ্যতঃ শৈলী গ্রহণ করিয়াছেন যাত্রার। তাহার মধ্যে এখানে-সেখানে নাটকীয় গুণ খানিকটা দেখা গিয়াছে মাত্র।

যাত্রার আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি, যাত্রায় প্রধান স্থান ছিল গানের। ধীরে ধীরে গানের পাশাপাশি কথার বিকাশ হইয়াছিল। শেষে গান ও কথা উভয়েই সমান মর্য্যাদা পাইয়াছিল। কিন্তু যাত্রার সংলাপ মুখ্যতঃ বিবৃতি-মূলক, যাত্রার কাহিনী প্রধানতঃ সরল। কাহিনীর মধ্যে

যেমন বহির্দ্বন্দ্ব নাই, চরিত্রের মধ্যেও তেমনি বিবদমান প্রবৃত্তিগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব নাই। ঘটনাগুলি যেমন একমুখী তেমনি যাত্রার নাটকে গৌণ কাহিনী বলিয়াও এমন কোনো কাহিনী থাকে না, যাহা আপন সত্ত্বাতে নায়ক-চরিত্রের বিকাশে বাধা দিয়া মূল কাহিনীর ভিতর জটিলতা সৃষ্টি করে। একটা সামান্য সূত্র অবলম্বন করিয়া ভাবের অতি-প্রকাশ করা যাত্রার বৈশিষ্ট্য। আর এই সব ভাবাবেগ যত প্রবল হয়, যাত্রায় ততই দীর্ঘ বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে গানের প্রয়োগ হইতে থাকে। তাই যাত্রায় চরিত্রের বিকাশ অপেক্ষা উচ্ছ্বাসের প্রকাশটাই বেশী হয়। মনোমোহনের নাটকে আমরা মুখ্যতঃ তাহাই দেখিতেছি। এক একখানি করিয়া মনোমোহনের নাটকগুলির আলোচনা আমরা করিব। তাহার আগে দেখা যাক, যাত্রার গানকে মনোমোহন কিরূপ ভাবে সংশোধিত করিয়া লইয়াছেন; 'স্বভাবোক্তির পর' কোথায় কোথায় তিনি কি ভাবে গান খাটাইয়াছেন।

গানে হৃদয়ের প্রসার হয়, রুদ্ধ ভাবের মুক্তি আনে। তাই অনেক সময় দেখা যায় অন্তরে আবদ্ধ ভাবের বেদনা মানবকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। ভাব-ভাষায় আপন প্রকাশ খুঁজিতে থাকে। কিন্তু নানা প্রকার সংস্কারাদির জন্য সময়ে সময়ে মানুষ ইচ্ছা থাকিলেও মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। আবার স্বগতোক্তির মাধ্যমে উহা প্রকাশ করিলেও যেন সবটুকু বলা হয় না। কথার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করিবার জন্য তখন গান অনিবার্য হইয়া ওঠে। নির্জনে, নেপথ্যে বা কোনো দৃশ্যের মধ্যে সঙ্গীতের মাধ্যমে তাহার প্রকাশ করা ভিন্ন আর কোনো উপায় থাকে না। বিশেষতঃ নারীর কোমল মনোবৃত্তি, প্রেমের সলজ্জ পূর্বরাগ বা গোপন অনুরাগ যখন কর্ম ও সংলাপে ফোটে না, তখন তাহা প্রকাশিত হয় গানে, —নিজের অন্তর ও বিজন একাকিত্বের মধ্যে আত্মভোলা সুরের খেলায়, —ঠিক যেমন পাই ইংরেজ কবি শেলীর Skylark কবিতার মধ্যে বিরহিণী অভিজাত-কুমারীর বর্ণনায়।

নারীর বেলায় যেমন প্রেমের গোপন ব্যাকুলতা ইঙ্গিতে প্রকাশের জন্য গানের প্রয়োজন হয়, তেমনি পুরুষের বেলায়ও সঙ্গীত ততোধিক মধুর হইয়া ওঠে উদাসীন সন্ন্যাসীর মুখে। জীবনের সুখ-দুঃখে যে মানুষ নির্লিপ্ত, সংসার তাহার কাছে সঙ্গীতময় হইয়া ওঠে। নিজের

সংহত, সমাহিত জীবনের আত্মতুষ্টি প্রকাশের জন্য তাহার আশ্রয় হয় গান। মানব-জগতের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার তুচ্ছ দ্বন্দ্বের তীব্রতা কমাইয়া শান্তিদান করিবার জন্যও প্রয়োজন হয় সন্ন্যাসীর মুখের গান। যাত্রার বিবেক, মহান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া নাটকের সন্ন্যাসী, পাগল প্রভৃতির চরিত্রে তাই সঙ্গীতের শান্তির স্পর্শ মেলে। আবার নারীর গভীর প্রেমানুরাগকে বিপরীত ভাবের সঙ্ঘাতে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য অনেক নাট্যকার সখীজনের মুখে শ্লেষাত্মক হাসির গান দিয়াছেন। আধুনিক গীতাভিনয়-লেখক পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় তাঁহার 'ধর্মপথ' নাটকে নবাব-নন্দিনী দোলেনার পূর্বরাগকে সুন্দর করিয়া ফুটাইবার জন্য সখী নুরনীহারের মুখে বাংলা গান দিয়াছেন,—"এখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু গল্পে শুনেছি। গল্প শুনে অল্পে অল্পে মজে গিয়েছি।"

কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন হয় যে পূর্বগামী বা পরবর্তী পরিস্থিতির গুরুত্ব আরো গম্ভীর বা মহনীয় করিবার জন্য একখানি গান বসানোর প্রয়োজন হইয়া পড়ে। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে বহুদিন পরে বিজয়ী গ্রীক সৈন্য দেশে ফিরিয়া যাইতেছে। তাহাদের মনের অসীম আনন্দ হৃদয়-রানী কুটীর-রানীর উদ্দেশে সঙ্গীতে ব্যক্ত হইতেছে। কিন্তু যে হতভাগ্য গৃহহীন, অজ্ঞাত-পিতৃ-পরিচয়, প্রেমের ক্ষেত্রে অপমানিত ও হতাশ, গৃহ-প্রত্যাবর্তনে তাহার আনন্দ কোথায়? তাই পূর্বগামী সমবেত সঙ্গীত অবলম্বন করিয়া এন্টিগোনাসের মর্মব্যথা স্বগতোক্তিতে ঝরিয়া পড়িল। মানুষ-ও-বিধাতা কর্তৃক নির্যাতিত চাণক্যের অন্তর-বেদনা যখন পৈশাচিক পৌরুষের বিজয়-পতাকা তুলিয়া নন্দকুলের রক্তে স্নান করিয়াও নিবৃত্ত হইতেছে না, অন্তরের অন্তর-বাসী সুপ্ত ব্রাহ্মণ যখন হৃদয়ের দ্বারে দ্বারে বারে বারে আঘাত করিয়াও তাঁহাকে শান্তির জগতে, ভূমার রাজ্যে, টানিয়া লইতে পারিতেছে না, তখন শ্রান্ত চাণক্যের মর্মবাণী হিসাবেই ছুটিয়া আসে ভিক্ষুকের ঐ গানটি, —"মহাসিন্ধুর ওপার হতে কি সঙ্গীত ভেসে আসে।" সঙ্গীত ছাড়া এখানে আর কোনো অবলম্বনই ছিল না।

এইবার দেখা যাক, মনোমোহন কিরূপ ক্ষেত্রে সঙ্গীতের ব্যবহার করিয়াছেন।

মনোমোহনের সঙ্গীত-প্রয়োগে এই কয়টি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়,—

১। নেপথ্যগীতির দ্বারা সুখ বা দুঃখের পরিস্থিতি জ্ঞাপন।

২। কোনো বিশেষ সুখ-দুঃখের, বিশেষ করিয়া দুঃখের অনুভূতি প্রকাশের বেলা যাত্রার পাত্র-পাত্রী প্রথমে একখানা দীর্ঘ উক্তি করে। পরে সঙ্গে সঙ্গেই ঐ একই ভাবের অভিব্যক্তি-ব্যঞ্জক একখানা গান করিয়া থাকে। সব কয়খানি নাটকেই মনোমোহন যাত্রার এই শৈলীর অনুকরণে কিছু না-কিছু গান রচনা করিয়াছেন। তবে যাত্রা হইতে মনোমোহনের নাটকে ইহার প্রয়োগ অনেক কম। কিন্তু শুধু পৌরাণিক নাটকে নয়, সামাজিক নাটকেও তিনি এই শৈলীর অনুসরণ করিয়াছেন।

৩। আবার ইহাকে তিনি একটু ঘুরাইয়াও প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ অমন পরিস্থিতিতে পাত্র-পাত্রী যেখানে একখানা উক্তির পর নিজেই একখানা গান করিত, সেখানে উক্তিটি নাট্যকার রঙ্গমঞ্চে পাত্র-পাত্রীর মুখে দিয়াছেন, গানখানি দিয়াছেন নেপথ্যে,—অন্যের মুখে।

৪। নাটক শেষ হইলে কোনো কোনো নাটকে এক একখানা সমাপনী গীতি থাকে।

৫। উদাসীন পাগলজাতীয় চরিত্রের মুখে দার্শনিকতা-পূর্ণ গান। কখনও কখনও এই পাগলেরা অন্যের মনের গোপন কথার কদর্যতা উদ্ঘাটন করিয়া দেয়, কখনও মানুষের শ্রান্ত, ক্লান্ত জীবনের উপর উপদেশের শান্তিবারি বর্ষণ করে। কখনও নিজের অতীত জীবনের গ্লানি মুছিয়া লয় সঙ্গীতের অশ্রুজলে।

৬। নিম্নস্তরের চরিত্রের মুখে তাহাদের ব্যবসায়-সূচক—কখনো বা আচরণ-প্রকাশক হাসির গান মনোমোহন দিয়াছেন।

৭। কখনও নিজের দুঃখ ভুলিবার জন্য গান রচনা করিয়া পাত্র-পাত্রী তাহা অন্যকে দিয়া গাওয়াইয়া লয়।

নাটকে মনোমোহনের সঙ্গীতপ্রয়োগের বৈশিষ্ট্য এই। এখন একটি একটি করিয়া এই প্রয়োগের গুণাগুণ বর্ণনা করিব।

নেপথ্য-গীতির দ্বারা সুখ-দুঃখের পরিস্থিতি প্রকাশ করা নাটকে চলিতে পারে যদি ঘটনা-বিকাশে বা চরিত্র-চিত্রণে ঐ সঙ্গীতের প্রয়োজন অনিবার্য হয়। আরও একটা বিষয় এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতে হইবে। যে দৃশ্যে ঐ সঙ্গীত যোজিত হইল তাহার ভাবের সহিত গানটি যেন সঙ্গতি রক্ষা করে। মনোমোহনের নাটকে নেপথ্য-গীতিগুলির বেশীর ভাগই অনিবার্য প্রয়োজনে যোজিত হয় নাই। কারণ সেইগুলি তুলিয়া দিলে অঙ্গহানি হয় না বা চরিত্রগুলিও অবিকশিত থাকে না। 'রামাভিষেক' নাটকের গানগুলি এইদিক

দিয়া একেবারেই অসার্থক। তবে ঐগুলি কখনও যাত্রার অবিকল অনুসরণ, কখনো রূপান্তরিত প্রয়োগ। যাত্রার সঙ্গীতকে মূল ধরিলে সংলাপ উহার উপরি-পাওনা। অথবা শেষ যুগের যাত্রার সংলাপটাকে প্রধান অংশ ধরিলে সঙ্গীত হইবে উহার অতিরিক্তাংশ বা লেজুর। সুতরাং সংলাপ-প্রধান নাটকে যাত্রার সঙ্গীত-যোজন-রীতি অনুসরণ করিলে তাহা বাহুল্য-দোষদুষ্ট হইবে।

মনোমোহন যাত্রাকে সংশোধন করিয়া নাট্যোপযোগী করিয়া লইতে পারেন নাই। তিনি যাহা করিলেন তাহা যাত্রারই রকমফের।

'সতী' নাটকের অনেক নেপথ্য-সঙ্গীত 'রামাভিষেক'-এর মতো অসার্থক। দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কের একাধিক সঙ্গীত প্রত্যক্ষভাবে যাত্রার শৈলী স্মরণ করাইয়া দেয়। নাটকটির সব কয়টি নেপথ্য-সঙ্গীত প্রয়োজনীয় নয়। অপ্সরাদের অস্তিত্ব জানাইবার জন্য তাহাদের মুখে যে আদিরসাত্মক "নলিনীলো, এতো নহে পিরীতি-বিধান," ইত্যাদি গানখানা দেওয়া হইয়াছে তাহা 'জগতঃ পিতরৌ' পার্বতী-পরমেশ্বরের কৈলাসের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। অবশ্য এই দৃশ্যে বা ইহার পরবর্তী দৃশ্যে বীণা-সংযুক্ত যে দুইখানা নেপথ্য-গীতি নারদের মুখে দেওয়া হইয়াছে, তাহার অনিবার্য প্রয়োজন না থাকিলেও উহা অসঙ্গত নয়, কেননা বীণাযন্ত্রে হরি বা হরপার্বতীর গুণগান করা নারদের চরিত্রেরই অংশ। তারপর তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের শেষে যে নেপথ্য-গীতিখানা রহিয়াছে, উহা যাত্রার আসরে মহাদেবের মুখে দেওয়া হইত। কিন্তু এখানেও উহা অসঙ্গত বা বেমানান হয় নাই। সতীর দেহত্যাগে কৈলাসের শোকাচ্ছন্ন পরিস্থিতির পূর্বাভাস ঐ গানখানিতে রহিয়াছে। কিন্তু ইহার পরের দৃশ্যের সমাপনী গীতিটির ঐ একই নাটকীয় সার্থকতা থাকিলেও পর পর দুইখানা একই ভাবের গান নাট্যকারের উপর যাত্রার প্রভাব স্মরণ করাইয়া দেয় এবং তাঁহার পরিমিতিজ্ঞানের অভাব সূচিত করে।

কিন্তু একদিক দিয়া এই 'সতী' নাটকের গানের ঐতিহাসিক মূল্য অনেক। যাত্রার মধ্যে আমরা মহান্ত, পৌর্ণমাসী ইত্যাদি চরিত্রের মুখে দার্শনিকতাপূর্ণ গান শুনিয়াছি। ঐ সঙ্গীতগুলি ভাব ও পরিস্থিতিকে গম্ভীর করিয়া তোলে; মানুষের জীবনের তুচ্ছ ঘটনাবলীর পর একটি দৈবী মহিমা আরোপ করে। যাত্রার এই জাতীয় সঙ্গীত ভগবানের অপার মহিমা বর্ণনা করিয়া মানুষকে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া মানবজন্ম

সার্থক করিতে বলে। এই গানের মধ্য দিয়া অবতার-তত্ত্ব, সংসারের মায়া-মোহ কাটাইবার উপদেশ ইত্যাদি পরিবেশন করা হয়। গোবিন্দ অধিকারীর 'নিমাই-সন্ন্যাস' যাত্রার ১ম অঙ্কে মহান্তের গীতি—"ধরি শ্রীপায়, ঠেলো না পায়, রেখো পায় হে গৌর হরি" অথবা "ইনি যিনি" (চাঁদ ধরা পালায় কন্বের গীতি), "কৃষ্ণ-ধনে ধনী না হলে পায় কি কেহ সুখ অধিকার।" প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। মনোমোহন যাত্রার এই চরিত্রগুলিকে রূপান্তরিত করিয়া তাঁহার নাটকে ব্যবহার করিলেন। 'সতী' নাটকের শান্তিরাম এই ধরনের প্রথম চরিত্র। যাত্রার মহান্তাদি চরিত্র হইতে ইহার পার্থক্য এই যে, যাত্রায় ঐ চরিত্রগুলি পাগলও নহে, সাধারণ মানুষও নহে। উহারা দার্শনিক, জ্ঞানী, ভক্ত, সাধক, অতিমানব। মনোমোহন ঐ সকলের গুণের সঙ্গে উন্মত্ততা যোগ করিয়া দিয়াছেন। আর একটা ব্যাপার হইয়াছে এই যে, ঐ চরিত্রগুলি যাত্রায় অপর চরিত্রের সমালোচনা করিত না, শুধু আধ্যাত্মিকতা করিত। কিন্তু মনোমোহনের "শান্তে পাগলা" শুধু দার্শনিকতা করিয়া সাধনার গূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে না, সর্ব-মানবের দোষ-ত্রুটি ধরাইয়া দিয়া একদিকে যেমন সাধারণ ভাবে সার্বজনীন কল্যাণের বাণী শুনাইয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি ব্যক্তিগত জীবনের দোষ-ত্রুটি ধরাইয়া দিয়া তাহাদের কল্যাণের পথ নির্দেশ করে। প্রমাণ-স্বরূপ প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কে শান্তিরামের নেপথ্য গীতিটির আলোচনা করা যাইতে পারে। গানটির আবেদন সার্বজনীন, কিন্তু ঐ বিশেষ ক্ষেত্রে উহার প্রয়োগ দক্ষরাজের প্রতি। দক্ষরাজই যে 'ভোগ-সাগরে লোভের চারে' পড়িয়া 'বঁড়শী-ফোঁড়ে বাঁধা প'ড়ে নাকাল-গাঁথা' রহিতেছেন, ইহাই এই সঙ্গীতের ব্যঞ্জনা।

এই শান্তে পাগলাই এই ধরনের চরিত্রের শেষ নয়। মনোমোহনের আরো দুই একটি নাটকেও এই ধরনের চরিত্রের দর্শন পাওয়া যায়। 'রাসলীলা' নাটকের কালিন্দী এবং 'আনন্দময়' নাটকের রাজেশ্বর, পাগল না হইলেও উচিত-ভাষণের দিক দিয়া শান্তিরাম, মহান্ত, বা মুনি ঠাকুর প্রভৃতির সমান জাতীয় চরিত্র।

যাত্রার আদর্শে মনোমোহন এই যে এক বিশেষ ধরনের চরিত্র সৃষ্টি করিলেন, তাহার প্রভাব পরবর্তী কালে যাত্রা ও থিয়েটারের নাটকে সমান ভাবে পড়িয়াছে। আধুনিক কালের গীতাভিনয়-রচয়িতা অঘোর কাব্যতীর্থের

'হরিশ্চন্দ্র' নাটকের 'শান্তে পাগলা' মনোমোহনের শান্তিরামের হুবহু অনুকরণ,—শুধু চরিত্রে নয়, ভাবে ও ভাষায়। অঘোরচন্দ্রের অনন্ত-মাহাত্ম্য নাটকের 'উচিত' এই ধরনের চরিত্র। গিরিশচন্দ্রের প্রায় প্রত্যেক নাটকে যে একটি সংসারত্যাগী, পাগল, মহাপ্রাজ্ঞ ভবঘুরে চরিত্র থাকে, সেইটি শান্তে পাগলার বংশধর।

নিম্নস্তরের চরিত্রের মুখে তাহাদের ব্যবসায়-সূচক গান মনোমোহন প্রয়োগ করিয়াছেন। (প্রণয়-পরীক্ষা—প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক, বেদেনীর গীতি।) এটাও 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রার মালিনী প্রভৃতি চরিত্রের প্রভাব। যাত্রার প্রভাবে নাটকে এই ধরনের চরিত্র সৃষ্টি হইতে থাকিলেও এ-সৃষ্টি সর্বত্র অসঙ্গত, অবাস্তব বা অসার্থক হয় নাই। কেননা এই ধরনের ব্যবসায়ী চরিত্রগুলি ফেরীর সময় তদ্‌বিষয়ক গান এখনও করিয়া থাকে। তবে এই জাতীয় চরিত্রের মুখে তাহাদের আচরণ-প্রকাশক হাসির গানও মাঝে মাঝে দেওয়া হয়। যেমন, 'পার্থ-পরাজয়' নাটক, ৪র্থ অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্কে দুনোর গীতি,—"ওরে আয় বাবা আয় মা রেগে যে খুব চেগে উঠেছে", ইত্যাদি। গিরিশচন্দ্রের অনেক নাটকে এই শ্রেণীর চরিত্রের ও গানের সাক্ষাৎ মেলে। 'পাণ্ডব-গৌরব' নাটকে ঘেসেরা ও ঘেসেরাণী এই ধরনের চরিত্র। এই চরিত্রগুলি নিজস্ব পরিবেশে অসঙ্গত নয়। কেননা উহাদের আচরণের ও উক্তির এমনি ধরনের অসঙ্গতি ও অসংলগ্নতা হাস্যরস সৃষ্টির উপাদান। নাটকের একটানা গাম্ভীর্যের মধ্যে একটু তারল্য সৃষ্টি করিয়া দর্শকের মনকে হাল্‌কা করা ভিন্ন এই সকল চরিত্রের আর বিশেষ কোনো সার্থকতা নাই। ইহা খুব উন্নত নাট্য-কৌশল না হইলেও একান্ত অপ্রয়োজনীয় নয়।

পরিস্থিতি-জ্ঞাপক সঙ্গীতের যে প্রয়োগ মনোমোহন তাঁহার যাত্রায় করিলেন, পরবর্তী যুগের গীতাভিনয়-রচয়িতা অনেকে তাহার অনুসরণ করিয়াছেন। বরং তাহা হইতে তাঁহারা খানিকটা অগ্রসরও হইয়াছেন। মনোমোহন গান দিয়াছেন মানব-মানবীর মুখে। আধুনিক গীতাভিনয়-লেখকগণ তাহার অতি-প্রয়োগ করিয়াছেন। পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের 'মা' পালা। ব্যাধ-কন্যাগণ জল আনিতে যাইতেছে গান করিতে করিতে; বাজারও করিতে যাইতেছে গান গাহিতে গাহিতে। নাটকের মধ্যে এই ধরনের গানের অভাব নাই। কিন্তু মনোমোহন যাহা করেন নাই, আধুনিক গীতাভিনয়কারগণ তাঁহার আদর্শ অবলম্বন করিয়াও তাঁহাকে অতিক্রম

করিয়া তাহাও করিয়াছেন। তাঁহারা নির্জীব পদার্থে সজীবত্ব আরোপ করিয়া তাহাদের মুখে পরিস্থিতি-জ্ঞাপক গান দিয়াছেন। পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের 'জয়মাল্য' নাটক। তরঙ্গ-বালাগণ গান করিতেছে, "তরতরাতর লহরে লহরে আয়গো ছুটে আয়।" এইরূপ তরঙ্গ-বালা, বনবালা, ফুলবালা ইত্যাদি অনেকের গান আধুনিক গীতাভিনয়ে দেখিতে পাই। প্রাচীন যাত্রায় এই ধরনের গানের প্রয়োগ দেখি না। ইহা মনোমোহনের আদর্শে পরবর্তী যুগে কল্পিত বলিয়াই অনুমান করিতে হইবে।

মনোমোহনের সঙ্গীত-প্রয়োগ-রীতির আলোচনা করিলাম। পরবর্তী যুগের নাটক ও গীতাভিনয়ের পর মনোমোহনের প্রভাবের আলোচনা করিয়াছি। সর্বশেষে বক্তব্য এই যে, মনোমোহনের সঙ্গীতপ্রয়োজন নাটকের সর্বত্র স্বভাবানুযায়ী হয় নাই। উহার উপর যাত্রার প্রভাব বেশী। তবে শান্তে পাগলার কয়েকটি এবং ভৈরবীর অনেকগুলি গান স্বভাবানুযায়ী হইয়াছে। উদাসীন-চরিত্রের মধ্যে অতীত-জীবনের লুক্কায়িত বেদনা সংযম-শাসনের ফলে অনেক সময় উহার তীব্রতা হারাইয়া ফেলে। বেদনাই মানুষকে বৈরাগী করিয়া তোলে। তাই নাটকের মধ্যমান ঘটনা-সঙ্ঘাতের উপর বৈরাগীর শান্ত-রসাত্মক সঙ্গীতগুলি শান্তির প্রলেপ বুলাইয়া দেয়। ঐ গানে যন্ত্রণাময় জীবনের উপর শান্তির সুধাধারা বর্ষিত হয়। আর যাহারা ঐ গান করে তাহাদের জীবন-চোয়ানো সত্য হিসাবে ঐ গানগুলি তাহাদের মুখ দিয়া বাহির হয় বলিয়া উহা নাটকে সত্য। শুধু তাহাই নহে, ঐ পাগল জাতীয় চরিত্রগুলি সত্যের আঘাতে অন্য চরিত্রকে চেতন করায়, পরিবর্তিত করায়, না হয় আন্দোলিত ও বিকশিত করে; তাই নাটকের সামগ্রিক বিকাশেও তাহারা সত্য। তবে এই ধরনের চরিত্রের মুখে গান সংযোজনে যে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়, মনোমোহন তাহা অনেক সময় করিতে পারেন নাই। 'সতী' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কে অপ্সরাদের গানের উত্তর দিতে গিয়া শান্তিরাম নিজেকে হাল্‌কা করিয়া ফেলিয়াছে।

মনোমোহন সঙ্গীত-প্রয়োগের বিশেষ সার্থকতা দেখাইয়াছেন তাঁহার শেষ নাটক 'আনন্দময়'-এ। অবশ্য এই নাটকেও মহাকালী, নৃত্যকালী ও নির্মলার গানে মনোমোহন যাত্রার একটি চিরন্তন শৈলীর অনুবর্তন করিয়াছেন,—উচ্ছ্বাসময়ী বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে এক একখানি গান জুড়িয়া

দিয়া সামাজিক নাটককেও যাত্রায় পরিণত করিয়াছেন। কিন্তু লালজী ও বাণীকণ্ঠের গান এবং ভৈরবীর গীতি কি করিয়া নাটকীয় সার্থকতায় মণ্ডিত হইয়াছে এখন তাহাই আলোচনা করিব।

নাটকে গানটি যাহার মুখে দেওয়া হইয়াছে উহা যদি তাহার চরিত্রের বিকাশ না হয় বা তাহার সমস্ত জীবনের সুখ-দুঃখের অনুভূতি হইতে উদ্ভূত না হয়, তাহা হইলে নাটকে ঐ গানের সার্থকতা নাই। আবার এমনও হয় যে, একজন অন্যজনের উদ্দেশে কখনও কখনও গান করে। তখন সেই গানের সাহায্যে যদি উদ্দিষ্ট ব্যক্তির চরিত্র এবং তাহার জীবনের সুখ-দুঃখময় অনুভূতির একটা পরিচয় আমরা পাই, তাহা হইলে বলিব গানটি নাটকে সার্থক। যে পরিবেশে গানটি গাওয়া হইতেছে সেই পরিবেশের সহিত উহার সঙ্গতি থাকা চাই। শ্মশানে শবদাহের মুহূর্তে নর-নারীর মিলনাকুতিমূলক আদিরসের গান অশোভন।

নাটকে ভৈরবীর আটটির অধিক গান আছে। তাহার মধ্যে প্রথম দুইটি বাদে সব কয়টিতেই যাত্রার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়িয়াছে বলিতে পারি। ঐ কয়টিতে গানের পর সংলাপ বা সংলাপের পর আছে গান। কিন্তু তবুও উহা ভৈরবী-চরিত্রের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্কে জড়িত। ভৈরবী সংসার-ত্যাগিনী, উদাসিনী, সন্ন্যাসিনী। গান তাহার স্বভাব-সঙ্গী। সুতরাং সংলাপের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখে গান দিলে অশোভন হয় না। গানে সে দেবতার বন্দনা করে। সঙ্গে সঙ্গে অতীত জীবনের গ্লানির জন্য অনুশোচনাও করে সে গানে। দেবতার পায়ে তাহার যে আত্মনিবেদন, তাহার মধ্যেও পূর্বজীবনের ভুলভ্রান্তির জন্য মার্জনাভিক্ষা জড়িত থাকে। ভৈরবীর সঙ্গীতেও তাহাই আছে। এখন কথা হইবে, যাত্রার ন্যায় এই গানের আদিতে বা অন্তে গদ্য সংলাপ জুড়িয়া দেওয়া চলে কি না? চলিতে পারে। কুলবধুর বা কুমারী-কন্যার মনের ভাব গানে প্রকাশ করিতে গেলে সঙ্কোচ, লজ্জা বা দ্বিধার প্রশ্ন থাকে, সন্ন্যাসিনীর বেলা সে সব থাকে না। বধূ বা কন্যা যখন গান করে, ঐ গানে তাহার মনের কথা আভাসে ইঙ্গিতে ব্যঞ্জিত হয়। ভয় থাকে, ঐ সঙ্গীতের মধ্য দিয়া অন্যে তাহার মনের সত্যকার কথা জানিয়া ফেলিল না তো! মনোমোহন যে এ কথা বুঝিতেন না তাহা নহে। প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কে ভৈরবীর মুখে গান দিবার বেলা মনোমোহন কোনো কৈফিয়ৎ দেন নাই। কিন্তু কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হইয়াছেন ভবর

গানের বেলায়,—"এই নির্জনই তো তা গাবার স্থান।" আবার গানের পূর্বে বা পরে যদি সংলাপই দেওয়া হয় তাহা লইলে যাহা গোপন করিবার একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াস থাকে, তাহাই প্রকাশিত হইয়া যায়। সুতরাং গানের সঙ্গে ঐ সংলাপ হয় মনস্তাত্ত্বিক অসত্য। সেখানে কথা হইবে আনন্দ-প্রকাশের বেলা তো গোপনতা বা সঙ্কোচের বালাই নাই। সুতরাং প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্কে আনন্দকালী, অভয়কালী ও নৃত্যকালীর গীতি অসঙ্গত হইয়াছে কি না? এখানে বক্তব্য, আমাদের কোনো শুভ সংবাদে অধীর হইয়া আমরা স্বাভাবিক প্রেরণা-বশে যাত্রার দলের সখীর মতো গান করি না। কিন্তু বিরহবেদনা প্রকাশের জন্য নির্জনতার প্রয়োজন, আর সেই নির্জনতার সঙ্গীতও আপনা হইতে আসিয়া যায়। তবে সেখানে সাধারণতঃ ঐ সময়ে অন্যের আগমন অবাঞ্ছিত। এই দিক দিয়া তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কে 'নির্মলা'র গানটির পূর্বাপর সংলাপ অসার্থক। সংলাপে ভাবের অতিস্পষ্ট প্রকাশ সঙ্গীতের ব্যঞ্জনা নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু নাটকে ভৈরবীর প্রথম দুইটি গান (১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক) খুবই সার্থক। উদাসিনী ভৈরবী যেমন আপন মনে গান গাইতে গাইতে ছুটিয়া চলে ঠিক তেমনি ভাবে সে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছে। গানটিকে একান্ত করিয়া তাহার নিজেরই ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারি। সাধকের রিপু-বিজয়ের চেষ্টায়ও সময়ে সময়ে ব্যর্থতা আসে। কিন্তু আত্মতিরস্কারের মধ্য দিয়া সাধক তাহা সংশোধন করিয়া লন। তাঁহার গোটা জীবনই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির দ্বন্দ্বের ইতিহাস। প্রথম গানটির মধ্য দিয়া ভৈরবীর দ্বন্দ্বময় মনোবৃত্তি প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং ইহাকে নিছক অন্ত চরিত্রের সমালোচনার মধ্য দিয়া নাট্যকারের আত্মপ্রকাশ বলিতে পারি না। ভুনী ধাই লোভের বশবর্তী হইয়া গয়না চুরি করিতেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যাহার গয়না চুরি করিতেছে পুনরায় দয়াবশে তাহারই সেবা করিতেছে। এই দুই বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বের সমালোচনা ফুটিয়া উঠিতেছে ঐ গানে। তারপর কিরণশশী চোখ মেলিলে ভৈরবী বলিয়া ওঠে,—"আ কি মধুর দৃষ্টি!" বলিয়াই সে আবার গান ধরে। ঐ মধুর দৃষ্টির মধ্যে সে মহাকালীর দৃষ্টি লক্ষ্য করে। তারপর মায়ের দৃষ্টি বন্দনা করিয়া সে একখানা গান ধরে। মায়ের দৃষ্টি ভক্তের প্রতি, সজ্জনের প্রতি মধুর। যাহারা দুষ্কৃতকারী, তাহাদের প্রতি সে দৃষ্টি ভয়াল, রক্তময়। কিন্তু তাপের আগুনে পুড়িয়া যে পাপ ক্ষয় করিয়াছে,

মা কেন তাহার প্রতি এখনও প্রসন্ন হইতেছেন না। গানটির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে গায়িকার বিগত উচ্ছৃঙ্খল জীবনের অনুশোচনা, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হইতেছে বর্তমান উদাসীন জীবনের অন্তরালবর্তী লোলুপ শান্তি-আকাঙ্ক্ষা। সুতরাং ইহার অক্ষরে অক্ষরে ভৈরবীর চরিত্রই প্রকাশিত হইতেছে। আবার নাটকের বিকশমান ঘটনার সঙ্গে উহার যোগ এই দিক দিয়া যে কাহিনীর ভিতরকার ষড়যন্ত্রের চরম পরিণতির এবং শেষপর্যন্ত মায়ের কৃপায় ঐ কাহিনীর একটি আনন্দময় সমাধানের ইঙ্গিত ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে এই গানে।

আর তিনটি গান। আনন্দময় চৌধুরী বৃদ্ধ। জীবনে সুখের দিন তিনি দেখিয়াছিলেন। কিন্তু নিষ্ঠুর দৈব তাঁহার সুখের সংসার ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছে। অদৃষ্টের তীব্র নির্যাতন নীরবে সহ্য করা ভিন্ন তাঁহার আর উপায় নাই। সংসারের অনিত্যতা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছেন। তাই জীবনের সায়াহ্নে তিনি ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করিতে চাহেন। বাণীকণ্ঠ ও লালজীর মুখে তাই যখন তাঁহার রচিত প্রথম গানটি (১ম অঙ্ক, ৬ষ্ঠ গর্ভাঙ্কে) শুনি তখন বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে জীবন-যুদ্ধে ক্লান্ত, পরাজিত একটি বৃদ্ধ ঈশ্বরের শান্তির স্পর্শ খুঁজিতেছেন। আনন্দময়েরই অন্তরের কথা গায়ক দুইটির মুখে ব্যক্ত হয়। কিন্তু বৃদ্ধ যতই চেষ্টা করেন, ততই নিরুদ্দেশ পুত্রের এবং হারানো পৌত্রের কথা ভুলিতে পারেন না। ফলে ঈশ্বরে মনোনিবেশ তাঁহার হয় না। বসিয়া বসিয়া নিজেরই অন্তরের পরিচয় রচনা করেন তিনি গানে। আনন্দময়ের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ভাষা হইয়া ফুটিয়া ওঠে (২য় অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্কে) গানে। আনন্দময়ের রচিত গানই তাঁহার চরিত্রের পরিচায়ক। সুতরাং উহা নাটকের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অবশেষে নাটকের সমাপ্তি হয় আনন্দময়ের রচিত সঙ্গীতে। সমস্ত নাটক ব্যাপিয়া যাঁহার দীর্ঘনিশ্বাস শ্বসিত হইয়াছে, তাঁহারই আনন্দোচ্ছ্বাসে নাটকের সমাপ্তি না হইলে চলিবে কেন? প্রণয়-পরীক্ষা নাটকের সমাপ্তি-সঙ্গীত অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয়। যাহারা ঐ গান করিতেছে তাহাদের জীবনের আকাঙ্ক্ষার শান্তিপূর্ণ সমাধানের বাণী উহা নহে। কিন্তু 'আনন্দময়' নাটকে উহা আনন্দ চৌধুরীর মর্মকথা হিসাবে ব্যক্ত হয়। উহা শুধু নাটকের উপসংহার নয়, উহা আনন্দ চৌধুরীর আগের গানের এবং তাঁহার গোটা চরিত্রের উপসংহার। সঙ্গীতের মাধ্যমে এই চরিত্রটির বিকাশ করিতে গিয়া নাট্যকার যে প্রতিভার

পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, সঙ্গীতের ব্যবহারে মনোমোহন যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু যাত্রার অনুকরণ তিনি একেবারে ত্যাগ করেন নাই। তাই গানের ব্যবহারে তাঁহার নাটকে দোষগুণ উভয়ই মিশিয়া রহিয়াছে। ফলে গানের দিক দিয়া মনোমোহনের শৈলী কিছুটা প্রাচীন। দুইরীতি মিলিয়া একটি সর্বাঙ্গ-সুন্দর মধ্য-রীতির সৃষ্টি হয় নাই।

মনোমোহনের নাট্যশৈলী সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই বলা যাইতে পারে। যাত্রার শৈলী অবলম্বন করিয়া মনোমোহনের আবির্ভাব। 'রামাভিষেক' হইতে 'আনন্দময়' পর্যন্ত তাঁহার রচনা-শৈলীর ক্রমবিকাশ অবশ্যই আছে। কিন্তু মনোমোহনের রচনা যাত্রা-শৈলী অতিক্রম করিয়া কোনোদিনই বিশুদ্ধ নাট্যশৈলীতে পরিণত হয় নাই। অবলম্বিত যাত্রা-শৈলীর মধ্যে মাঝে মাঝে সুন্দর চরিত্র-সৃষ্টি ও ঘটনা-বিন্যাসপদ্ধতি দেখা যায়। স্থানে স্থানে তাহা উৎকৃষ্ট নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দেয়। কিন্তু দেশী যাত্রা ও বিদেশী নাট্যরীতির সমন্বয় মনোমোহনের কোনো রচনায় হয় নাই। মনোমোহন চেষ্টা করিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্র ঐ চেষ্টাকে আরো অনেকখানি ফলবতী করিয়া তুলিলেন, আর এই দুইটি রীতি একটি সুন্দর সঙ্গতি লাভ করিল ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'নর-নারায়ণ' নাটকে। তাই উহা বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক।

এইবার মনোমোহনের নাটকগুলির আলোচনা করা যাক।—

'রামাভিষেক' নাটক। এক কথায় ইহাকে বলিতে পারা যায় সঙ্গীত-বাহুল্য-বর্জিত যাত্রা। কাহিনীর বহির্দ্বন্দ্ব কিংবা চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব, অথবা দুইটি একসঙ্গে, ইহাই নাটকের প্রাণ। এই দ্বন্দ্বের জন্য নাট্যকাহিনীও অবারিত গতিতে চলিতে থাকে। উহার উত্থান-পতন আছে। কিন্তু যাত্রার কাহিনী সরল রেখায় জানা-গল্পের বিবৃতি মাত্র। কাহিনীর মধ্যে যেখানে যেখানে একটুমাত্র উচ্ছ্বাস-প্রবণতা আছে, সেইখানেই শুধু কর্মহীন বাক্যের স্রোত বহিতে থাকে। 'রামাভিষেক' নাটকের গল্পটিও ঠিক ঐ রকম। রামের রাজ্যাভিষেকের প্রস্তাব ও আয়োজন সরলভাবে সম্পন্ন হয়। কৈকেয়ীর বর-প্রার্থনা, দশরথের তাহা অনুমোদন এবং রামেরও সঙ্গে সঙ্গে বনে যাওয়া, ইহার কোনটির পিছনে কর্তব্যাকর্তব্যের দ্বন্দ্ব ও নীতির সহিত মমতার সঙ্ঘাত নাই। নিষ্ঠুর সত্যের সহিত স্নেহ-মমতার দ্বন্দ্বে অশ্রু-পিছল পথে

কর্তব্যের জয়-যাত্রার আলেখ্য এই নাটকে ফুটিয়া ওঠে না। ফলে এই নাটকে গল্প আছে, ঘটনা নাই, পাত্র-পাত্রী আছে, চরিত্র নাই। চরিত্র কথাটির মূলীভূত উপাদান হইতেছে 'চর্' ধাতু। উহার অর্থ 'বিচরণ করা', অর্থাৎ গতি। যে জীবন পরিবেশের প্রতিকূল সঙ্ঘাতে প্রতিক্রিয়া করে না, বা অনুকূল পোষণে হৃষ্ট ও পুষ্ট হয় না, তাহা চরিত্র নয়। জগতে ভাল মন্দ দুইটি দিকই আছে। ক্রিয়ার সহিত প্রতিক্রিয়াও নিশ্চয়ই থাকিবে। মানুষ যখন জীবনের কল্যাণকর ও পুষ্টিকর বলিয়া কোনো নীতিকে মানিয়া লয়, এবং তাহার জন্য যখন ভোগ্য বা প্রেয় বস্তুকেও ত্যাগ করে, তখনও কিন্তু সে দ্বন্দ্ব বা বিচারণার হাত হইতে অব্যাহতি পায় না। মহাপুরুষের জীবন নির্দ্বন্দ্ব অর্থ এই নয় যে সেখানে সঙ্ঘাত নাই। সঙ্ঘাতকে তিনি সামঞ্জস্যে আনিতে পারেন। কিন্তু তাহার জন্য বিচারণাকে ত্যাগ করেন না। আর তাঁহার ঐ সামঞ্জস্য-পূর্ণ সমাহিত জীবনকে বিচলিত করিবার জন্য তাঁহাকে ঘিরিয়া ক্ষুব্ধক্ষিপ্ত পরিবেশের যে সঙ্ঘাত সূচিত হয়, তাহাই তাঁহার তথাকথিত দ্বন্দ্বহীন জীবনকে আরো দৃঢ় করিয়া তোলে। তাই তিনি আহত না হইয়াও নিজের স্থৈর্যের দ্বারা পারিপার্শ্বিককে আহত করিয়া তোলেন। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের গোবিন্দমাণিক্য এমনি ধরনের চরিত্র। মনোমোহনের রামের জীবনে ঠিক তেমনি দ্বন্দ্বের অবকাশ ছিল। নাট্যকার তাহা ফুটাইতে পারেন নাই। তাহার স্থানে তিনি তরল উচ্ছ্বাস আনিয়া নাটক ভর্তি করিয়াছেন। ইহা যাত্রার প্রভাব। যাত্রা-শৈলীকে মনোমোহন আরো পল্লবিত করিলেন। গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রায় উচ্ছ্বাসপূর্ণ দীর্ঘ বিবৃতির যে উদাহরণ আমরা দেখিয়াছি, তাহাই ব্রজমোহন রায়ের যাত্রাপালায় অতি-বিস্তৃত হইয়াছে। আর এই অতি-বিস্তৃতির পথ প্রথম দেখাইয়া দিলেন মনোমোহন বসু। ব্রজ রায় এবং মতি রায়ের যাত্রায় প্রায় সর্বত্রই যে উচ্ছ্বাসপূর্ণ দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা পাইতেছি তাহা মনোমোহনের এই আদর্শে রচিত হইয়াছে। প্রাচীন যাত্রায় কারুণ্যপূর্ণ দীর্ঘ বক্তৃতা মাঝে মাঝে পাই। কিন্তু পালার প্রায় সর্বত্রই অতিদীর্ঘ বক্তৃতার পর বক্তৃতা সংযোজন করিবার রীতি দেখি না। মনোমোহনের প্রায় সব কয়খানি নাটকেই দেখিতেছি, যেখানেই তিনি দুঃখ-শোকাদির পরিস্থিতি পাইয়াছেন, সেখানে অক্লান্তভাবে দীর্ঘ বক্তৃতা ও গানের ব্যবহার করিয়াছেন। 'রামাভিষেক'-এর দ্বিতীয়াঙ্ক পর্যন্ত করুণ

পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং সেখানে সংলাপের ভাষা বিবৃতিমূলক হইলেও দীর্ঘ বক্তৃতা নহে। কিন্তু তৃতীয় অঙ্ক হইতে সংলাপের দৈর্ঘ্য বাড়িয়া গেল। কারণ করুণ পরিস্থিতির এখান হইতে সূচনা। মনোমোহনের নাটকগুলিতে আক্ষেপের দৃশ্যগুলি খুব করুণ হয় এবং বক্তৃতা খুব লম্বা হয়। তাহার সঙ্গে পতন ও মূর্ছা, মস্তকে করাঘাত, বিধাতার নিন্দা, দুষ্কৃতকে ভর্ৎসনা ইত্যাদি শোক-প্রকাশের স্থূল দিকটা খুব বেশী ফুটিয়া ওঠে। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া এই সুখ-দুঃখের সংযত সুকৌশলী প্রকাশ মনোমোহনের নাটকে হয় না। পরবর্তী গীতাভিনয়ে মনোমোহনের এই শৈলীর অনুবর্তন করা হইয়াছে। কেহ কেহ শুধু বক্তৃতাগুলিকে দীর্ঘ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। এই সকল দৃশ্যকে ক্লান্তিকর দৈর্ঘ্য দান করিয়াছেন। আধুনিক যাত্রায় ঐ গুলিকে mad scene বলে। এই mad scene-এর জনক মনোমোহন বসু। এই উন্মত্ত দৃশ্যগুলি একবার জমিয়া উঠিলে যাত্রার দর্শক 'আহা-উহু' করিতে শুরু করিবে এবং তাহার মধ্য দিয়া কোনো এক মুহূর্তে অভিনেতৃগণ নাটক সমাপন করিয়া প্রস্থান করিবে। 'রামাভিষেক' নাটকের তৃতীয় অঙ্ক হইতে শেষপর্যন্ত কাহিনীর ক্রমবিকাশ কিছুই নাই। রাম বনে যাইবেন স্থির হইয়া গিয়াছে। সুতরাং কাঁদিতে হইবে। কৌশল্যার ঘরে, সুমিত্রার ঘরে, সীতার ঘরে সর্বত্র সবাই এক একবার কাঁদিয়া লইবে। এই অশ্রুর সলিলে শেষপর্যন্ত দশরথের সমাধি রচিত হইবে। এইভাবে 'রামাভিষেক নাটক' নামক 'যাত্রার' শেষ হয়।

'সতী নাটক' সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। শৈলীর পরিবর্তন বিশেষ কিছুই নাই। এই নাটকেও প্রধান পাত্র-পাত্রীর ভূমিকাগুলি চরিত্র হয় নাই। কারণ কাহারও অন্তর্দ্বন্দ্ব ও তজ্জনিত সঙ্ঘাতে ঘটনার বহির্দ্বন্দ্ব ঘটে নাই। রামাভিষেকের কাহিনী যে পদ্ধতিতে ঘটিয়া চলিয়াছে সতীর কাহিনীও সেইরূপ। পরিবর্তনের মধ্যে তিনি দীর্ঘ উক্তিগুলি খর্ব করিয়াছেন। কিন্তু নাটকের মূল প্রকৃতির পরিবর্তন হয় নাই। অর্থাৎ এ নাটকেরও মূল প্রকৃতি যাত্রার। বিষয়-ব্যবস্থা তদনুরূপ, চরিত্র-চিত্রণ প্রায় পূর্ববৎ। তবে 'রামাভিষেক' হইতে 'সতী' নাটকে খানিকটা ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। রামাভিষেকে একটি চরিত্রে খানিকটা স্বাভাবিকতা আছে। মন্থরার সংলাপ মাঝে মাঝে স্বাভাবিক ভাবে তাহার অন্তরের কথা টানিয়া বাহির করিয়াছে।

উহা তাহার চরিত্রকে বিকাশ করে। রামাভিষেক নাটকে সার্থক সংলাপ বা চরিত্র সৃষ্টি ঐটুকু। যেমন,—

"সে তোমার মাথা। তোমার মা তোমার মাথা খেয়ে, তুমি এইটে বুঝতে পারনা, যে রাম রাজা হলে তোমার বাঘিনী সতীন কৌশল্যে, রাজার মা হয়ে সব্বেসব্বা কত্তা হবে যা মনে করবে তাই কত্তে পার্বে যারে যা দেবে সে তাই পাবে, তখন তুমি তার হাততোলার ছ্যাটানি খেয়ে কেবল গুমরে গুমরে মরবে, আর তার ঐশ্বর্য্যি দেখে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকবে।" —[৩য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক]

ইহা ঠিক দাসীর ভাষা। ভর্ত্রীর কল্যাণ কামনাই এখানে প্রবল নয়, নিজের প্রাপ্তির আশা ব্যাহত হইবার যে ভয় অন্তরে জাগিয়াছে, তাহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এই হিতবাণী। আবার মন্থরা-চরিত্রের নীচতার দিকটা তীব্র ভাবে প্রকট হইয়াছে নিম্নলিখিত উক্তিতে,—

"কৈকেয়ি, এতদিনে মনোরথ পূর্ণ হলো, আর ভাবনা নেই। এখন এক কাজ কর, রাজার মুখে জল দেও, পাখার বাতাস কর। আজকের রাতটা কোনো মতে কাটিয়ে রাখতে পারলেই হয়।"

—[৩য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক]

ইহা ভিন্ন আর সব কয়টি চরিত্রই এক একটি বিশেষ ভাবের বিগ্রহীভূত অভিব্যক্তি মাত্র। অর্থাৎ তাহারা স্বাভাবিক চরিত্রে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে বিকশিত না হইয়া পিতৃভক্তি, স্বামিভক্তি, ভ্রাতৃভক্তি প্রভৃতি এক একটা সার্বজনীন ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র হইয়াছে। তাহাদের সংলাপের মধ্য দিয়াও ব্যক্তিগত ধারণা-ভাবনার চেয়ে সার্বজনীন ভাবাভিব্যক্তির রূপটিই ফুটিয়া ওঠে বেশী। মন্থরার পরামর্শে কৈকেয়ী উদ্বুদ্ধ হইতেছে! কিন্তু তাহার ভাষায় প্রকাশ পায় যে কৈকেয়ী একটি বিশেষ পরিবারের বিশেষ বধূ নহে, সে সার্বজনীন সপত্নী নারী; বিদ্বেষের একটি মূর্তি মাত্র, জীবন্ত নারী নহে। "একি সত্য, না দ্বেষ! এযে মনে লাগে। এযে সব উল্টে দেয়। হা স্বপত্নীদ্বেষ! তুমি কি এত কালে প্রবল হলে,—সুযোগ পেলে? হা ঈর্ষ্যা! তুমি কি শেষে মন্থরা রূপে এলে।"

* * * * *

'সতী' নাটকের দুঃখময় অংশ যাত্রার দীর্ঘ বিবৃতি, mad scene। কিন্তু এই নাটকে একটি নহে, কয়েকটি চরিত্রের স্বাভাবিকত্ব এবং বিকাশ আছে।

সে দিক দিয়া 'সতী' নাটকে মনোমোহনের শৈলীর বিকাশ হইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু এই বিকাশ অতি সামান্য, কয়েকটি অপ্রধান চরিত্রে। প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কটি নাট্য-কৌশলের সুন্দর পরিচয়। এই দৃশ্যে শিব কর্তৃক দক্ষরাজের অপমান ও দক্ষের শিবহীন যজ্ঞের আয়োজনের নীরস বর্ণনা নাই। যে তিন ব্যক্তি এই কাহিনী বিবৃত করিতেছে, তাহাদের নিজস্ব চরিত্রও এই ঘটনা অবলম্বনে প্রকাশ পাইতেছে। শৈব বৈষ্ণবদের পারস্পরিক বিদ্বেষের ভাবটি ফুটিয়াছে চমৎকার। শৈব নির্বাসনের আজ্ঞায় বৈষ্ণবটি উৎফুল্ল হইতেছে। তাহার অনুরোধ, শৈব-নির্বাসনের আজ্ঞা পালনের কাজটি যেন তাহার সহিত বিবদমান উপস্থিত শৈবটিকে দিয়াই নগরপাল শুরু করে। কিন্তু নগরপাল রাজ-আজ্ঞা ঘোষণা ও পালন করিতে আসিলেও তাহার অন্তর শৈবনির্বাসন চায় না। সে বুঝিয়াছে যে রাজার এই আজ্ঞাটি অন্যায়। ইহা তাহার কথায় বেশ ফুটিয়া ওঠে। আবার ইহা যে অহঙ্কারান্ধ রাজার অজ্ঞতা-প্রসূত আজ্ঞা, আর ইহার পরিণাম যে ঐ রাজারই সর্বনাশ সৃষ্টি করিবে, তাহা স্পষ্ট হইয়া ওঠে শান্তিরামের নেপথ্য-সঙ্গীতে।

আর তিনটি চরিত্র রক্ত-মাংসের মানুষ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। নাট্যকার এখানে খানিক কবি-দৃষ্টির পরিচয়ও দিয়াছেন। সতীর তিনটি ভগিনী,—অশ্বিনী, অশ্লেষা ও মঘা। শেষের দুইটি নক্ষত্র জ্যোতিষ-শাস্ত্রে খুবই অশুভ। সুতরাং মমতাহীন নিষ্ঠুর বাক্যগুলি তাহাদের মুখ দিয়া বাহির করা হইয়াছে। অথচ অশ্বিনীর মধ্যে ফুটানো হইয়াছে স্বাভাবিক ভগিনী-স্নেহ। এই চরিত্র কয়টি দেবী হয় নাই, মানবী হইয়াছে। তাহাও আবার মনোমোহনের সময়কার বাঙালী-কন্যা। খানিকটা অংশ উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করিতেছি,—

"অশ্বি। কেন সতি, কাঁদিস কেন? যেমন তপস্যা আপনাদের তেমনি ঘরে পড়েছিস্। সকলেরই কি বড় ঘরে বে হয়? তা কি করবি বোন, চুপ কর।

মঘা। কতদিন পরে দেখা হলো, কোথায় হাস্‌বি, খেলবি, আমোদ কর্বি, না কান্না—এই এক ধ্যান আর কি!

জয়া। মা কি সেইজন্য কাঁদছেন যে তোমরা অমন কথা বলে আরো কাঁদাচ্ছ?

অশ্লেষা। তবে আবার কি? শিব তো ভাল আছে?

বিজ্ঞ। বালাই! তিনি ভাল থাকবেন না কেন?

অশ্বি। ও সতী! তবে কিসের জন্য কাঁদছিস বল্ না?

মঘা। (জয়ার প্রতি)। হ্যাঁলো জয়া, এর মধ্যে ছেলে-পিলে হয়ে ত যায় নি?

জয়া। অভাগ্যি, ওমা সে কি?

মঘা। তবে আর কি ছাই? আর কার কথাই বা জিজ্ঞাসা কর্বো? ভূত-পেত্নী তো সব ভাল আছে? (হাস্য)

অশ্লেষা। হয়তো বুড়ো বলদটাই বা মরে গেছে।

অশ্বি। ও কি কথার শ্রী! সতী কি তোদের ঠাকুঝি? সতী না ছোট বোন? ও কি দুঃখে কাঁদছে,······তা জানলিনে, উল্টে পরিহাস!"

স্বামী-পুত্রের অমঙ্গল হইলে বা ধন-সম্পত্তি নষ্ট হইলেই ঘরের বৌ কাঁদিয়া থাকে। অশ্লেষা-মঘার জিজ্ঞাসাও সেই বিষয়ে। অশ্বিনীর উক্তির মধ্যে বাঙালী ঘরের ননদ-ভাজের সম্পর্কটি স্পষ্ট হইয়া ওঠে।

নারদের চরিত্রটি মাঝে মাঝে বেশ সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। 'দেবানাং ধূর্তঃ নারদঃ।' নারদ শব্দের অর্থ পুষ্টিদাতা। যেখানে যে ব্যক্তি হরি-ভক্তির এতটুকু বিঘ্ন ঘটাইতেছে, নারদ বুদ্ধি-কৌশলে তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া ভক্তির মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছেন। যে ব্যক্তি বুদ্ধি-দোষে অহঙ্কারে বা স্বার্থের জন্য দেব-বিধান উল্লঙ্ঘন করে, নারদ তাহার পতন ঘটাইয়া বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কল্যাণের দূত। ভক্ত অথচ ধূর্ত রাজনীতিকের বুদ্ধি-সম্পন্ন এই নারদ। তাই তিনি দেবতাদের দূত। মনোমোহনের নাটকে নারদের এই রূপটি ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সর্বত্র তিনি সার্থক হন নাই। নারদের সংলাপে ও আচরণে মাঝে মাঝে স্থূলতা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু কোথাও কোথাও নারদের সংলাপ চমৎকার হইয়াছে। যথা,—

"আমা হতে কিছুই না—সব আপনার নিজগুণে—আমি উপলক্ষ্য মাত্র। ফলকথা এই অ-শিব যজ্ঞটির ফল যে কি আশ্চর্য হবে তা ধ্যান করে দেখ্‌লে শরীর রোমাঞ্চিত হয়—আপনি কি আর নরলোকের লোক থাকবেন? না, এই নরাকৃতি আর আপনার থাক্‌বে? মুখশ্রী তখন আর একরূপ হয়ে উঠবে—নয়নের জ্যোতিঃ অদ্ভুত হবে, এমন কি কেশ-শ্মশ্রু পর্যন্ত অপ্রাকৃত ভাব ধারণ করে। ত্রিভুবনে এমন কেউ নাই যে, আপনাকে দেখলে চমকিত ও ভীত না হবে। যতকাল শাস্ত্র থাকবে, যতকাল কবি ও কাব্য থাক্‌বে, যতকাল

অদ্ভুতরসের আদর থাকবে, যতকাল চন্দ্র-সূর্য-পৃথিবী থাকবে, ততকাল আপনার অলৌকিক কাণ্ড কীর্তিত হবে, সন্দেহ মাত্র নাই। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালবাসী কাহারও সহিত আপনার উপমা হবে না।"

—[সতী, ৫ম অঙ্ক]

মহারাজ দক্ষ অহঙ্কার-বশে যে শিবহীন যজ্ঞ করিতেছেন, নারদ তাহা সমর্থন করিতেছেন না। ঐ অহঙ্কার চূর্ণ করারও প্রয়োজন। তাই তিনি যজ্ঞের নিমন্ত্রণের ভার লইয়াছেন। তিনিই পরামর্শ দিয়া দক্ষরাজকে উত্তেজিত করিয়াছেন। কিন্তু দিব্য-দৃষ্টি-বলে তিনি এ যজ্ঞের পরিমাণ জানেন। তাই ব্যাজস্তুতির মধ্য দিয়া দক্ষকে তাহাই জানাইয়া দিতেছেন। কিন্তু নারদের কথার প্রকৃত অর্থ দক্ষ বুঝিতেছেন না,—তিনি জানিতেছেন না যে, তাঁহার এতবড় যজ্ঞের ফল ছাগ-মুণ্ড-প্রাপ্তি। Dramatic irony-র ইহা একটি উদাহরণ।

'হরিশ্চন্দ্র' নাটকের ঘটনা-বিন্যাসে একটু বৈচিত্র্য আছে। ধার্মিক, প্রজা-বৎসল লোকমান্য রাজা হরিশ্চন্দ্রের পাশাপাশি অনাচারী, উচ্ছৃঙ্খল বিশ্বাস-ঘাতক নাগেশ্বরের চরিত্র নাট্যকার অঙ্কন করিয়াছেন। বিপরীত চরিত্রের সঙ্ঘাতে নাটক জমিয়া উঠিতে পারে। কিন্তু নাট্যকার নাগেশ্বর-চরিত্রের রূপায়ণে দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। বিশ্বামিত্র কেন যে এমন একটি বর্বরকে রাজ্য-শাসনের ভার দিলেন তাহার যৌক্তিকতা নাট্যকার কিছুই দেখান নাই। তারপর নাগেশ্বর যখন কমলাকে হরণ করিল, তখন ঋষি বিশ্বামিত্র তাহার সমর্থন করিলেন। পরে কমলার অবস্থা কি হইল, নাট্যকার তাহা বলেন নাই। বিশ্বামিত্র হঠাৎ কেন যে এত কঠোর হইয়া মহারাজ হরিশ্চন্দ্রকে এমন দুঃখ ভোগ করাইলেন, তাহা বুঝা কষ্ট। ফলে কোনো চরিত্রই ঠিক বিকশিত হয় নাই। কোনো পার্শ্ব-চরিত্রও নহে। এদিক দিয়া 'সতী' নাটক হইতে 'হরিশ্চন্দ্র' সাহিত্যাদর্শে নিকৃষ্ট। শৈলীর দিক দিয়া ইহা আদ্যন্ত যাত্রা। দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতায় অতিক্রন্দনের ছড়াছড়ি চলিয়াছে নাটকে। দুই-তিন পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া এক একখানা উক্তি এ-নাটকে প্রায়ই আছে। চতুর্থ অঙ্ক ও ষষ্ঠাঙ্কের আরম্ভে রাজার স্বগতোক্তি দুইটিকে উদাহরণ-স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

নাটক হিসাবে 'হরিশ্চন্দ্র' সার্থক রচনা না হইলেও পরবর্তীকালের গীতাভিনয়ের উপর ইহার প্রভাব অনেক। সে দিক দিয়া এই নাটকটির

ঐতিহাসিক মূল্য আছে। পরবর্তীকালের অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ, পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি গীতাভিনয়-লেখকদের রচনায় দেখা যায়, রাজ-পরিবার ও মন্ত্রী-সেনাপতি-পরিবারের মধ্যে নর-নারীর প্রেমাকর্ষণ থাকে। তাহা নাটকীয় কাহিনীকে আকর্ষণীয় করিয়া তোলে। আত্মীয় বা বন্ধুবেশী নবীন প্রতারক যখন ক্ষমতা হাতে পাইয়া অত্যাচার শুরু করে, তখন রাজার বিশ্বস্ত প্রাচীন মন্ত্রী, সেনাপতির দল নির্যাতিত হইয়াও প্রভুর কল্যাণ কামনা করে। চরমে কিন্তু তাহাদেরই জয় হয়। ইহা মনোমোহনের 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকের প্রত্যক্ষ প্রভাব। মনোমোহনের নাগেশ্বর এবং বসন্ত অঘোর কাব্যতীর্থের 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকে যথাক্রমে জলন্ধর সিংহ এবং বীরেন্দ্র সিংহে পরিণত হইয়াছে।

মনোমোহনের 'পার্থ-পরাজয়' এবং 'রাসলীলা' নাটক যাত্রা। "প্রসিদ্ধ বাহু প্রভৃতি গ্রাম-নিচয়-নিবাসী ভদ্র যুবক-সম্প্রদায় কর্তৃক এই পার্থ-পরাজয় নাটক গীতাভিনয়-রূপে অভিনীত হইয়াছিল। ফলতঃ তাঁহাদের অনুরোধেই ইহা রচিত হয়, এই জন্যই ইহাতে গীতিবাহুল্য ঘটিয়াছে।"

—'পার্থ-পরাজয়' নাটকের বিজ্ঞাপন।

সেই উচ্ছ্বসিত দীর্ঘ উক্তির পর গান, কান্নার অতি-প্রয়োগ, কর্মহীনতা ইত্যাদি যাত্রার লক্ষণ সকলই ইহার মধ্যে আছে। 'রাসলীলার মধ্যে নূতনত্ব কিছুই নাই। তবে 'পার্থ-পরাজয়'-এর কাহিনীর এবং চরিত্র সম্বন্ধে কিছু আলোচ্য আছে। 'পার্থ-পরাজয়' অর্থাৎ অর্জুন ও বভ্রুবাহনের সহিত যুদ্ধের কাহিনীর সত্যকার আরম্ভ হয় তৃতীয় অঙ্ক হইতে। তাহার আগের দুইটি অঙ্কের কোনো নাটকীয় প্রয়োজন নাই। 'পার্থ-পরাজয়ে'র ঘনো, রনো হয়গ্রীব, ভীষণ, লম্বোদর, লকুলকী, বাকুড়ী প্রভৃতি নীচস্তরের লোকের চরিত্রগুলি নাটকের মধ্যে বেশী স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে। উহাদের আচরণ ও বাক্যের দ্বারা সৃষ্ট হাস্যরস নাটকের প্রধান আকর্ষণ। মুখ্য কাহিনীর বিকাশে ঐ চরিত্রগুলি অনেক সময় বাধা সৃষ্টি করে। মনোমোহনের আদর্শে পরবর্তী যুগের যাত্রায় ইহা একটা ফ্যাসান হইয়া দাঁড়ায়। পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের 'ধর্মপথ' নাটকের ভজহরি হাস্যরস সৃষ্টির উপাদান যোগাইয়াছে। কিন্তু তর্কচঞ্চু ও ন্যায়পঞ্চানন উপাধিধারী দুইটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-সন্তানকে দিয়াও চট্টোপাধ্যায় মহাশয় হাস্যরস অর্থাৎ ভাঁড়ামি সৃষ্টি করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্রের বহু নাটকে যে মনোমোহনের এই নিম্নশ্রেণীর চরিত্রগুলির প্রভাব পড়িয়াছে, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

মনোমোহন আরও দুইখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন, 'প্রণয়-পরীক্ষা' ও 'আনন্দময়'। গ্রন্থ দুইখানিকে সামাজিক নাটক না বলিয়া পারিবারিক রোমান্স বলা যায়।

'আনন্দময়' নাটকের উপর সমাজশক্তির প্রভাব কিছুই নাই। স্নেহশীল মনিবের ভালবাসার সুযোগে স্বার্থান্ধ কর্মচারীর ষড়যন্ত্র এই নাটকের বিষয়বস্তু। 'প্রণয়-পরীক্ষা' নাটকের আরম্ভ সামাজিক। সপত্নী-বিদ্বেষ হইতে ঘটনার সূচনা। কিন্তু কোনো নাটকের ঘটনাই সুস্থ স্বাভাবিক লৌকিক জীবন-ধারায় সঙ্ঘটিত হয় নাই। প্রণয়-পরীক্ষায় দ্রব্য-গুণের অলৌকিক প্রভাবেই সমস্ত কাহিনী নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। 'আনন্দময়' নাটকে দৈব দুর্ঘটনা. সন্ন্যাসীর কৃপা, ভৈরবীর সহায়তা ইত্যাদিই ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। ঘটনার রহস্যময়তা থাকিলেও নাটক দুইটিতে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ খুব কম।

বিষয়বস্তুর, সংলাপ বা চরিত্র-চিত্রণের কোনোটির দিক দিয়া এই নাটক দুইখানিকে সামাজিক নাটক বলা যায় না। 'প্রণয়-পরীক্ষা' নাটকের নায়ক শান্তশীল চৌধুরী, তাঁহার বয়স্য সদারংবাবু, শ্যালীপতি রসিক-বাবু ইত্যাদি প্রধান প্রধান চরিত্রের কার্যে ও বাক্যে যাত্রার অমোঘ প্রভাব পড়িয়াছে। নারী-চরিত্রের মধ্যে সরলা, সুশীলা ও তরলার চরিত্রে স্বাভাবিকত্ব অনেক বেশী। স্বাভাবিক চেহারা মোটামুটি ভাবে ফুটিয়াছে মহামায়া ও কাজলার চরিত্রে। নটবরের পরিবর্তন নিতান্ত আকস্মিক। দুই একটি স্থানের উদাহরণ দেওয়া যাক। প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে আমরা যেখানে শান্তবাবু ও সদারংবাবুর সহিত প্রথম পরিচিত হই, সেখানে দেখি, কথা হইতেছে শান্তবাবুর দুই স্ত্রী এবং দাম্পত্য জীবনের সম্বন্ধে। কিন্তু আরম্ভ হইল ফুলের সঙ্গে, লতার সঙ্গে তুলনা দিয়া। কৃষ্ণের মতো রাসপূর্ণিমার রাতে মাধবীকুঞ্জে মানভঙ্গের অভিনয় করিয়াছেন নিজের স্ত্রীর সঙ্গে উনবিংশ শতকের এই জমিদার। তাহার বর্ণনার ভাষা ও আদ্যন্ত কৃষ্ণযাত্রার,—

"এই মানকুঞ্জে বসে দুজনে কপোত-কপোতীর ন্যায় কতই হাস্য-কৌতুক রসালাপে মগ্ন ছিলেম। একে শরতের শেষ, তায় পৌর্ণমাসী,—নির্মল আকাশ, নির্মল বাতাস, নির্মল জলের ধার, নির্মল প্রেম, সুখও যতদূর নির্মল হতে পারে, তাই হচ্ছিল। এমন সময় গ্রহ-দোষে, কিংবা সুখের একশেষ হলেই নাকি দুঃখ স্বভাবতই এসে থাকে যে কারণেই

হউক আমি কথায় কথায় পরিহাস করে বল্লেম দেখ সরলা, আমার পুত্র, কন্যা হয় নাই, এইজন্যই পুনর্বার বিবাহ করে তোমা হেন অমূল্য রত্ন পেয়েছি। কিন্তু ভয় করে, যদি তুমিও পুত্রবতী না হও তবে পাঁচজনে মিলে আমাদের এমন প্রণয়-রাজ্যে এক ভাগীর উপর আবার আর একটি ভাগী বা জুটিয়ে দেয়, তাই বলি এইবেলা বুঝে সুঝে চল।”

ইহা স্বাভাবিক কথ্য ভাষা নহে। যাত্রার পল্লবিত বাক্যবিন্যাস যে সামাজিক নাটকে অশোভন মনোমোহন তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

শুধু বাক্যে নয়, কার্যেও শান্ত চৌধুরীর চরিত্রে যাত্রার প্রভাব আছে। মহামায়ার ষড়যন্ত্রে শান্তবাবু সরলাকে যখন ভ্রষ্টা বলিয়া জানিতে পারিলেন তখন তিনি তাহাকে হত্যা করিতে যাইতেছেন তরবারির দ্বারা। [৪র্থ অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক] তারপর যখন তিনি জানিতে পারিলেন, যে এ সমস্তই মহামায়ার কাণ্ড, তখন তিনি যে শোক করিতেছেন তাহার ভাব, ভাষা সমস্ত কিছুতেই যাত্রার প্রভাব লক্ষিত হয়। সেই দীর্ঘ দীর্ঘ উক্তির মারফৎ শোকের অতিপ্রকাশ, অস্থির অঙ্গভঙ্গী, সংযম-হারা উন্মত্ত আচরণ, সকলই সেখানে ফুটিয়াছে। সর্ব-সমক্ষে প্রিয়াকে চুম্বন, আলিঙ্গন, তাহার শোকে ঝম্প প্রদান, প্রভৃতি স্বাভাবিক নহে, সঙ্গতও নহে।

নারী-চরিত্রের দিক দিয়া আবার দেখা যায়, সরলা শান্ত চৌধুরীর দ্বিতীয় সংস্করণ। ঊনবিংশ শতকের আদর্শ বালিকা করিতে গিয়া দীনবন্ধু মিত্র যেমন লীলাবতী, সরলতা প্রভৃতি চরিত্রকে অসার্থক করিয়া তুলিয়াছেন, মনোমোহন বসুও তেমনি তাঁহার উচ্চশ্রেণীর নারী-চরিত্রগুলি টাইপ্ করিয়া ফেলিয়াছেন। সরলা শুধু সূচীকর্মে নিপুণাই নয়, নিজে কবিতা রচনা করে; তরলা স্বামীর নিকট হইতে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত শিখে। তাহাতে কোন দোষ নাই। জমিদারের গৃহিণী ও শ্যালিকা অবশ্যই দশের কোঠায় একাদশ জন হইতে পারে। কিন্তু সরলার দৈহিক লাবণ্য এবং বয়সের তারুণ্য ভিন্ন আর এমন কোন্ গুণ তাহার ছিল, যাহার জন্য স্বামী তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে? সরলার সূচীশিল্প ও কবিত্ব-শক্তি যে তাহার স্বামীকে আকৃষ্ট করিয়াছে, এমন কোনো ইঙ্গিত নাটকে নাই। তরলার জীবন-নাট্যের দ্রুত পট-পরিবর্তনের গল্প আমরা অন্যের মুখে শুনিয়াছি। তাহার নিজের আচার-আচরণ, কথা-বার্তার মধ্য দিয়া নিজ জীবনের এমন একটি বিপদের কোনো প্রকাশই হয় নাই। সুতরাং

আগন্ত নাটকে আমরা গল্প অনেকখানি শুনিয়াছি, কিন্তু ঘটনা পাই নাই। নর-নারীর জীবন্ত হৃদয়ের আন্দোলন নাটকে খুব কম। তাহা যদি কিছুটা হইয়া থাকে, তবে হইয়াছে কাজলা ও মহামায়ার চরিত্রে। এখানে আর গল্প নয়,—কর্ম। বিশেষ কোনো বাসনা-বশে দুইটি নারীর তদনুপাতিক ধারণা-ভাবনা কর্মে যতই রূপায়িত হইতেছে, তাহাদের অন্তরের অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তির ততই পরিচয় আমরা পাইতেছি।

নাটকের প্রথম গর্ভাঙ্কেই আমরা মহামায়া ও কাজলাকে পরামর্শ করিতে দেখি। শান্ত চৌধুরী দুইটি স্ত্রীর মধ্যে কাহাকে ভালবাসেন তাহার পরিচয় তাহারা লইতে চায়। সপত্নী-বিদ্বেষ নাটকটির বীজ। সেই বীজের ফল মহামায়ার মৃত্যু। আরম্ভ হইতে শেষপর্যন্ত মহামায়া-চরিত্রের বিকাশ না থাকিলেও প্রকাশ আছে। বিকাশ নাই বলার অর্থ চরিত্রটির কোনো ক্রম-বিবর্তন বা পরিবর্তন নাই। সপত্নী-বিদ্বেষটি তাহার কোনো দিনই পরিবর্তিত হয় নাই; আর ইহাই তাহার চরিত্রের মূল উপাদান। কিন্তু এই সপত্নী-বিদ্বেষের জন্য সে যে ষড়যন্ত্র করিয়াছে তাহার একটা ক্রমবিকাশ আছে। ঘটনার আভ্যন্তরীণ সঙ্গতিও আছে।

নাটকে বার সাতেক আমরা মহামায়া ও কাজলার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। তাহার প্রথম বারের উল্লেখ করা হইল। দ্বিতীয়বার মহামায়া ও কাজলাকে পাই দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কে। ঠিক যেখানে তাহাদের কথাবার্তা শেষ হইয়াছিল, তাহার সূত্র ধরিয়া নাটকের আরম্ভ,—

"কাজ। কবার খাওয়ানো হলো ?

মহা। এই দেড় মাসের মধ্যে তিনবার হয়েছে।"……

মহামায়া তিন তিনবার পরীক্ষা করিয়া স্থির-নিশ্চয় হইল যে শান্ত চৌধুরী সরলাকেই ভালবাসেন বেশী। এইবার সে অতি দরদের মধ্য দিয়া সরলার সর্বনাশ করিতে শুরু করিল। মহামায়াকে নাট্যকার ঠিক ঠিক শয়তানী করিয়া আঁকিতে পারিয়াছেন। তাহার মনের দুরভিসন্ধি কেহই টের পায় নাই। যখন সে চরম সর্বনাশ করিতেছে, তখনও তাহার ভাষায় কত দরদ। সে সার্থক অভিনয় করিয়া যাইতেছে। নিজে সে আভিচারিক ঔষধের সাহায্যে ঘুমন্ত অবস্থায় শান্তবাবুকে সরলার ঘরে প্রবেশ করাইয়াছে। কাজলার দ্বারা মিষ্ট কথায় সরলাকে ভুলাইয়া ঘর খুলিয়া রাখিয়াছে। শান্ত চৌধুরী নিজের অজ্ঞাতসারে, অর্থাৎ আচ্ছন্ন অবস্থায়, সন্তানের জনক

হইতেছেন। সরলার গর্ভের কথা ইচ্ছা করিয়াই মহামায়া স্বামীকে জানায় নাই। গর্ভের পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে একদিন সে প্রমাণ করাইয়া দিবে, সরলা অসতী। সেই সুযোগই সে খুঁজিতেছে। অথচ তাহার ভাষা মনোভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত,—

"এসব কথা কি বোন্, হতে না হতেই পুরুষ মানুষকে আগে ভাগে শোনায়? (সহাস্যে) তায় আবার তিনি নাকি আমার সঙ্গে একটু লুকোচুরি খেলেছেন, আমিও একটু খেলি। কিন্তু ঠাকুরঝি! আমায় কোনো কথা লুকোনো তাঁর অন্যায়, আমি কি ছোট বৌকে সতীন ভাবি যে, তিনি ভয় করেন? ছোট বৌ তো আমার ছোট বোন্, তরলা মেজো, আর আমি বড়।"··· —[৩য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক]

মহামায়ার ষড়যন্ত্র সিদ্ধির মুখে। শান্তবাবুর নিকট নিজের গর্ভাবস্থা জানাইয়া সরলা যে চিঠিটি লিখিয়াছিল, মহামায়া তাহা সদারংবাবুর নামে লিখিত একখানা খামের মধ্যে পুরিয়া কৌশলে কাজলাকে দিয়া শান্তবাবুর হাতে দিবে। সব ঠিক। এই মুহূর্তে শান্তবাবুর নিকট সরলার গর্ভের কথা প্রকাশ করা দরকার। তাহার আলাপে বুঝা যাইতেছে, সরলার সন্তান-সম্ভাবনায় সে কত আনন্দিত, অথচ ব্যাপারটি কেমন করিয়া ঘটিল, সে কিছু জানে না,—

"মহা। তবে সত্যিই কি তুমি শোনোনি? কিন্তু আমারো ভুল, যে তোমায় আবার জিজ্ঞাসা কর্চ্ছি। সে কি তোমায় বল্‌তে পারে? সে আমাদের কাছেই লজ্জায় মরে যাচ্চে।

শান্ত। কেন, কি হয়েছে?

মহা। ছোট বৌ যে পোয়াতি।

শান্ত। সে কি? না! যদি দশ মাসের পূর্বে হয়ে থাকে, তবে সম্ভব বটে। যদি দশ মাসের মধ্যে হয়ে থাকে, তবে অসম্ভব।

মহা। সবে এই পাঁচ মাস।" —[৪র্থ অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক]

ক্ষেত্র প্রস্তুত! কাজলা চিঠিটা দিতে আসিয়া ঐ পত্রটিই খুঁজিবার ভাণ করিতেছে। মহামায়া কপট ক্রোধে তাহাকে তাড়াইয়া দিতেছে,—"তুই যা এখন চিঠি খোঁজবার সময় নয়,—আমার ঘরে কিছু পড়ে টড়ে নেই।"

"* * * * মা দুর্গা! কি করে মা! এখনও মিছে করে দাও মা। আমি সোনার পিত্তিমে গড়িয়ে তোমার পুজো দেব! * * * * এ

সর্বনাশ হবে, তা জান্‌বো কেমন করে? জান্‌লে নয় সাবধান হতেম। তা হলে কি ও পোড়ারমুখোকে এতকাল এত আদর করি, না, এ বাড়ীর ভেতর আস্‌তে দিই?—তা হলে কি ছোট বৌকে এত বেহায়া হতে দিই?—যার তার সঙ্গে কথা কইতে দিই—?"

—[৪র্থ অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক]

কথাগুলি সমবেদনা ও অনুশোচনার সুরে বলা হইলেও তাহার শেষের দিকে সরলা ও সদারং-এর অসংযত মেলা-মেশার (যাহা তাহারা কোনদিন করে নাই) মধ্য দিয়া একটা অবৈধ সম্পর্ক গড়িয়া ওঠার ইঙ্গিতই যে মহামায়া দিতেছে, তাহা স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া ওঠে।

তারপর সরলা শান্তবাবুর মুখে যখন শুনিল যে তাহার সন্তান-সম্ভাবনার বিষয় তাহার স্বামী জানেন না, ইহা তাঁহার দ্বারা সম্ভব হয় নাই, তখন তাহার আত্মগ্লানির ভাষার সূত্র ধরিয়া মহামায়া চরম অস্ত্র প্রয়োগ করিল,—

"হায়! হায়! বুক ফেটে যায়! এখন আর পেত্যয় না করি কিসে? আপন মুখে কবুল করে গেল! হায়! এমন ছোট বৌর এমন পির্বিত্তি কেন হলো?" —[৫র্থ অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক]

ইহার পর আর নাটকে মহামায়ার প্রয়োজন নাই। সুতরাং আর তাহাকে পাই না। কিন্তু মহামায়ার মৃত্যুটি আকস্মিক। নাট্যকার এখানে সস্তা সাহিত্যিক বিচার দেখাইতে গিয়া ভুল করিয়াছেন।

নাটকখানির আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। কাহিনীটি আদ্যন্ত বাস্তব বা জটিল না হইলেও কোনো অংশ অবান্তর বা অপ্রয়োজনীয় নহে। কাহিনীর গ্রন্থন-নৈপুণ্য প্রশংসনীয়।

'আনন্দময়' নাটকটিও গল্প-রচনার দিক দিয়া প্রশংসা পাইতে পারে। কাহিনীর কোনো অংশই অবান্তর অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় নয়। গল্পের রসটি জমিয়া উঠিয়াছে ভাল। মনোমোহনের প্রথম নাটকটি যেমন আদ্যন্ত যাত্রা, তাঁহার শেষ নাটকটি তেমনি প্রধানতঃ আদ্যন্ত নাটক। একদিক দিয়া 'আনন্দময়' মনোমোহনের সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। এই নাটকের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ এই যে, ইহার কাহিনীর মধ্যে আদ্যন্ত একটি কৌতুহল জাগ্রত থাকে। নৌকাডুবি দিয়া কাহিনীর আরম্ভ। কিরণশশী উদ্ধার পাইল। কিন্তু তাহার নিরুদ্দিষ্ট স্বামী-পুত্রের কি হইল জানিবার জন্য দর্শক ব্যাকুল হয়। এদিকে আবার

নিরুপায় হইয়া নবজাত পুত্রকে সে পরের হাতে তুলিয়া দিল। অদৃষ্টের পরিহাসে জননীর শিশুর ধাত্রী নিযুক্ত হইল। অন্য দিকে পুত্র ও পৌত্রের শোকে আনন্দবাবুর দিনগুলি অনিদ্রায়, নিরানন্দে চলিয়া যাইতেছে। বৃদ্ধ জীর্ণ-শীর্ণ-দেহে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছেন! অথচ তিনি আশা ত্যাগ করিতেছেন না। তাঁহার এই বিষণ্ন প্রতীক্ষাকে আরো করুণ করিয়া তোলে কপট, মিষ্টভাষী, বন্ধুরূপী শয়তান কান্তবাবুর ষড়যন্ত্র। সব কিছু মিলিয়া ঘূর্ণিপাক খাইতে খাইতে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। শেষপর্যন্ত রাধু সরকার ভূষণকে আবিষ্কার করিল। কিন্তু আবিষ্কার করিলেই সব গণ্ডগোল দূর হইল না। ওদিকে কান্তবাবুর পুত্র বলিয়া পরিচিত নিজের পুত্রকে লইয়া কলিকাতায় থাকার সময়ে কিরণশশী স্বামী পুত্রের সন্ধান পাইল। কিন্তু ঘটনা সেখানে থামিল না। হত্যার অভিযোগে ললিতকে হাজত বাস করিতে হইল। সুতরাং নাটকের শেষ অঙ্কে আসিয়াও আমাদের কৌতুহল রহিয়া যায়, ঘটনা-স্রোত কোন্‌দিকে প্রবাহিত হইবে। ভৈরবীর কৌশলে শেষপর্যন্ত ঘটনার পরিণতি ঘনাইয়া আসে। আনন্দময়বাবুর সংসার আবার আনন্দে ভরপুর হয়।

এই নাটকখানিতেই সংলাপের পৌনে-ষোল-আনা অংশ নাটকীয় হইয়া উঠিয়াছে। যেটুকু হয় নাই, অর্থাৎ যেখানে যেখানে যাত্রার প্রভাব পড়িয়াছে, তাহার আলোচনা পূর্বেই করিয়াছি। সংলাপ এই নাটকে বিবৃতি-মূলক না হইয়া কর্ম-মূলক হইয়াছে। তাই উহা প্রায়ই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। কয়েকটি স্থলে ভিন্ন দীর্ঘ হয় নাই। অল্প কথায় চরিত্রের মর্মোদ্‌ঘাটন করিবার দক্ষতা নাট্যকার এই নাটকে অনেক জায়গায় দেখাইয়াছেন। রাধু সরকার নরপশু, হত্যাকারী। সে ভূষণবাবুর নৌকা ডুবাইয়া দিয়া আসিয়াছে। জলমগ্ন ভূষণবাবুর মাথায় সে লাঠি মারিয়াছে। কিন্তু ইহাও তাহার শয়তানীর শেষ পরিচয় নহে। সে চরম শয়তানী করিয়াও চরম কপট সাজিতে পারে।—

> "লাস পেলে তো চৌধুরীগড়ের সিংহদরজার সামনে এনে দড়াম করে ফেলতেম্, ফেলে কেঁদে কেঁদে মুখ ফুলিয়ে তুল্‌তেম—দেখে নোকে বলতো, রেখো দুষ্টু দানো যাই হক্, ওর শরীরে দয়া-মায়াটা আছে।"
>
> —[২য় অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক]

তাহার ভণ্ডামি এবং স্বার্থপরতা আরো প্রকট হইয়া ওঠে, যখন সে বলে,—

"তার আর কসুর হচ্ছে না। শুধু কি খোঁজা, গোঁজা আর চোক্ বোজা শুদ্ধই খোঁজা হয়েছে। এখন পৌত্র পুলিনটাকে একবার খুঁজে বার করতে পারলেই কিছুই আর বাকী থাকে না…কিন্তু ধর্ম-অবতার, যেখানেই থাকুক, বার কর্বোই কর্বো…।" —[১ম অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক।]

রাধু সরকার আনন্দময়বাবুকে নির্বংশ করিতেছে কিসের জন্য? ভবিষ্যৎ নায়েবীর আশায়। তাই কান্তবাবুর মতো অতবড় নেমকহারাম শয়তানও তাহার নিকট 'ধর্মাবতার।'

শুধু দুষ্ট-চরিত্রগুলিই যে তাহাদের কর্ম ও বাক্যের মধ্য দিয়া ভালভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই নহে। সৎ-চরিত্রগুলিও ফুটিয়াছে ঠিক সমান সুন্দর হইয়া। ষড়যন্ত্রকারী কান্তবাবু ও শয়তান রাধু সরকারের পাশাপাশি যদি চিরবিষণ্ণ, স্নেহশীল, ভোলানাথ-পুরুষ আনন্দময়ের চরিত্রটি সার্থক ভাবে অঙ্কিত না হইত তাহা হইলে নাটকটি এতখানি আকর্ষণীয় হইত না। এই Tragi-Comedy-র বিধি-নির্দিষ্ট নায়ক বৃদ্ধ আনন্দময় চৌধুরী। তিনি নিষ্ক্রিয়। কিন্তু তাঁহার নিষ্ক্রিয়তা, বিষণ্ণতা এবং কান্তবাবুর উপর সরল বিশ্বাস প্রভৃতি মিলিয়া তাঁহার চরিত্রকে যেমন মধুরতা দান করিয়াছে, তেমনি শয়তানদের ষড়যন্ত্রের সুযোগ করিয়াও দিয়াছে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে তিনিই নাট্যকাহিনীর স্রষ্টা। নাট্যকার অনেক সময় না-বলা কথায়ও আনন্দময়ের ব্যর্থ হাহাকার কেমন সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন,—

"অ্যাঁ। এবার পুত্র-সন্তান! আ! কি আহ্লাদ! এতক্ষণ তা না বলে ছাইভস্ম কথায় কাল কাটাচ্ছিলি। আবার তবে আমি নাতির দাদা হলেম। হা পুলিন।—যাক্ যাক্—সে কথা এখন না! কান্তরে! অনেক দিনের পর আজ আবার যে সুখী কল্লি, তা আর কি বলবো।…"

কান্তবাবুর পুত্র জন্মিয়াছে এই সুখের সংবাদে বৃদ্ধ আনন্দময়ের পৌত্র পুলিনের কথা মনে পড়িয়া যায়। কিন্তু এই সুখের মুহূর্তে বৃদ্ধ তাহা ভুলিতেই চেষ্টা করেন। তারপর তিনি যে চৌধুরী-বংশের উপযোগী করিয়া নব-জাতকের জন্মোৎসবের ব্যবস্থা করেন, তাহার মধ্য দিয়াই প্রকাশ পায়, হারাইয়া যাওয়া পৌত্রের শোক তাঁহার অন্তরে কত গভীর ভাবে বাজিতেছে! বাহিরে ইহা তাহারই প্রতিক্রিয়া মাত্র।

আনন্দ চৌধুরীর সরল বিশ্বাস এবং বিষয়ে ঔদাসীন্যের সুযোগ লইয়া কান্ত মিত্র কেমন করিয়া একটি পাকা শয়তান হইয়া উঠিয়াছে, নাট্যকার

তাহা সুন্দর ভাবে দেখাইয়াছেন। রাধু সরকারের সহিত কান্ত মিত্রের যখন আলাপ হয়, তখন তাহার নারকীয় রূপটি প্রকাশ পায়। তাহার শয়তানী বুদ্ধি কথায় নয়,—কার্যেও ফুটিয়া ওঠে। তাহারই ষড়যন্ত্রে ভূষণবাবু গৃহহারা, পলাতক। আজ সপরিবারে দেশে আসিবার পথে তাহার চক্রেই সর্বহারা। অথচ এই শয়তান যখন আনন্দময়ের নিকট আসে, তখন কেমন ভাল মানুষের অভিনয় করিয়া যায়। আনন্দময়কে সন্তুষ্ট রাখিয়া কলে-কৌশলে তাঁহার বিষয় হস্তগত করাই ইহার উদ্দেশ্য। তাই চাটুকারের মতো সে মনিবের মেজাজ বুঝিয়া চলে। আনন্দবাবুর ঘরে প্রবেশ করিয়াই সে বুঝিল মনিবের মন এখন বিষণ্ণ। সুতরাং সে তদুপযোগী অভিনয় করিতেছে,—

> "(স্বগত) এখন দেখ্‌ছি কৃষ্ণপক্ষ, শুক্ল করা চাই। (প্রণাম পূর্বক প্রকাশ্যে) কাল রাত্রে ঘুম হয়েছিল তো? রায় মশাইতো জোর করে বলেছিলেন, এ পাক-তেল ছ-সাত দিন মাখলেই নিদ্রা হবে—কৈ, বংশে এখনও তেল আনেই নি? দু-চার দণ্ড গায় না বস্‌লে তেলের কাজ হবে কেন? বংশে! বংশে! তেল আন্‌ না।"
>
> —[১ম অঙ্ক, ৬ষ্ঠ গর্ভাঙ্ক]

এই কপট সেবাই কান্ত মিত্রের অস্ত্র। এবিষয়ে কান্ত মিত্র 'প্রণয়-পরীক্ষা' নাটকের মহামায়ার সগোত্র। অবশ্য চরিত্রটি সর্বাংশে সার্থক হয় নাই। কান্ত মিত্রের মদ্যপায়িতা নাট্যকার না দেখাইলেও পারিতেন। কেন না, নাট্য-কাহিনীতে কান্ত-চরিত্রের ঐ-দিকটার কোনো সার্থকতা নাই।

আনন্দময়, কান্ত মিত্র এবং রাধু সরকার, ইহারাই প্রধান চরিত্র। এই চরিত্রগুলি সার্থক হইয়া উঠিলেই নাটক সার্থক হইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু ছোটখাটো পার্শ্ব-চরিত্রগুলিও জীবন্ত হইয়া ফুটিয়াছে। ভূনী ধাই-এর চরিত্রে অলঙ্কার-অপহরণ-বিদ্যার সঙ্গে আর্তের প্রতি দয়া-গুণের মিশ্রণ হইয়াছে। সন্তান-বদলের ষড়যন্ত্র তাহারই সৃষ্টি। ইহা মনিব-পত্নীর প্রতি কৃতজ্ঞতার বশেই সে করিয়াছে। সুতরাং দোষে-গুণে চরিত্রটি জীবন্ত। নাটকের ঘটনায়ও তাহার সক্রিয় অংশ আছে। নিরঞ্জনবাবুর চরিত্র সৃষ্টি করিয়া মনোমোহন তৎকালীন শিক্ষিত যুবকদের চরিত্রের একটি দিক অতি সুন্দরভাবে আঁকিয়াছেন। তদানীন্তন ব্রাহ্ম-সমাজের শিক্ষা ও নারী-মুক্তি আন্দোলনের গৌণ ফল হিসাবে যে একশ্রেণীর নর-নারীর চারিত্রিক অধঃপতনের রাস্তাই প্রস্তুত হইতেছিল, তাহাও তিনি এই চরিত্রটির মাধ্যমে

দেখাইয়াছেন। কিন্তু শুধু সমাজ-সংস্কারের যন্ত্র হিসাবে নাটকে কোনো চরিত্রের আমদানি করা চলিতে পারে না। চরিত্রটির আভ্যন্তরীণ সঙ্গতিও রহিয়াছে। তবে চরিত্রটি অপ্রয়োজনীয়। কেন না, মূল ঘটনার সঙ্গে ইহার কোনো সংযোগ নাই। সে-দিক দিয়া ভৈরবী-চরিত্রটি নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আনন্দময়বাবুর সুখের সংসারে আগুন লাগিয়াছে তাহাকে অবলম্বন করিয়া। আবার সেই সোনার সংসার সুখের হইয়া ভরিয়া উঠিয়াছে তাহারই দ্বারা। যে চণ্ডী মালিনীর হত্যার জন্য ভূষণবাবু পলাতক, ভৈরবী সেই চণ্ডী মালিনী। চণ্ডী ভূষণকে ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু সে বামনের চাঁদে হাত দেওয়ার মতো। তাই আহত প্রেম ঈর্ষ্যায় পরিণত হইল। চণ্ডী ভূষণের পুত্র চুরি করিয়া পালাইল! কিন্তু সে দুষ্টা হইলেও নারী। চুরি-করা ছেলেকে কেন্দ্র করিয়া তাহার মাতৃস্নেহ জাগিয়া উঠিল। তাই নিতান্ত উদরান্নের জন্য যখন সে ছেলেকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হইল, তখন হইতে সে হইল পাগলিনী। তাহার ভৈরবী-জীবনের পিছনে যে দুঃখময় ইতিহাস রহিয়াছে, তাহা নাটকের ঘটনার মূল-প্রেরণা। সুতরাং আদ্যন্ত নাট্য-কাহিনীতে আনন্দময় কান্ত মিত্রের মতো সেও একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। নাটকীয় পরিস্থিতি গম্ভীর ও বিষণ্ণতর হইয়া উঠিয়াছে ভৈরবীর আত্ম-গ্লানিমাখা সংলাপে ও গানে। তাই একটু গভীরভাবে বিচার করিতে গেলে দেখা যাইবে, ভৈরবী, কান্ত মিত্রের বিপরীত চরিত্র। কান্ত মিত্রের ব্যর্থতার মূল এই ভৈরবী। সপরিবার ভূষণকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র সে ব্যর্থ করিয়াছে। নাটকের আরম্ভেই ভূষণের স্ত্রীকে সে রক্ষা করিয়া গেল। শেষবারের মতো ললিতের মুক্তি হইল তাহারই বুদ্ধি-কৌশলে। নাটকের সমাপ্তিতে হারাইয়া-যাওয়া পুলিন ফিরিয়াছে দেখিয়া ভৈরবী বিদায় লইল,—ঘরের বৌ সরলার হঠাৎ জঙ্গলে পালানো স্বাভাবিক নহে। তেমনি মহামায়াকে বাঘে-খাওয়া বাস্তবে সম্ভব হইলেও নাট্যকার যে আর স্বাভাবিক উপায়ে একটা সঙ্গত পরিণতি সৃষ্টি করিতে পারিতেছেন না, ঐ-ঘটনা তাহারই পরিচয় দেয়। আবার নাটকের শেষে সংজ্ঞাহীনা সরলার স্বামীর গলা-ধরিয়া জাগিয়া উঠায় আসরে করতালির সম্ভাবনা খুব বেশী থাকিলেও তাহা নাট্য-কৌশলের দীনতাই সূচিত করে। কিন্তু আনন্দময় নাটকের সমাপ্তিতে এই আকস্মিকতা নাই। সব কয়টি পাত্র-পাত্রীকে শেষপর্যন্ত একত্রিত করার জন্য নাট্যকার দৈবের আশ্রয় লইয়াছেন। তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে কিরণশশী পুত্র ললিতকে ফিরিয়া

পাইতেছে। ইহা আকস্মিক হইলেও অসম্ভব নহে। দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্কে গয়াক্ষেত্রে ব্রহ্মচারিবেশী ভূষণের সঙ্গে রাসু নায়েবের সাক্ষাৎ হঠাৎ হইলেও অবাঞ্ছিত নহে। ভূষণের খোঁজ করিবার জন্যই রাসু নায়েব তীর্থ-যাত্রা করিয়াছিল। সব চেয়ে বড় কথা, সমস্ত নাটক জুড়িয়া যে ট্রাজেডীর লীলা-খেলা চলিতেছিল, তাহার মধ্যে কমেডীর সুর জাগাইয়া রাখিয়াছিল ভৈরবী। কিরণ-শশী বা ভবকে সে শুধু দৈহিক মৃত্যু হইতেই রক্ষা করে নাই, নিরাশার হাত হইতেও বহুবার আশ্বাস দিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। আর আনন্দময় কিরণ-শশী প্রভৃতির নিরাশার মধ্যে ঐ আশ্বাসের বাণী মাঝে মাঝে শুনা গিয়াছে বলিয়া নাটকের সমাপ্তি আকস্মিক হয় নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গিরিশচন্দ্র

['গৈরিশ' ছন্দের প্রকৃতি বিশ্লেষণ, এই প্রসঙ্গে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের আলোচনা; সংলাপের ভাষার বৈশিষ্ট্য; কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র প্রচ্ছদপটে লিখিত অমিত্রাক্ষরের আলোচনা; গৈরিশ ছন্দের প্রয়োগ-ক্ষেত্র; ব্রজমোহন রায়ের ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষরের আলোচনা; সামাজিক ও পারিবারিক নাটকের পার্থক্য; 'শাস্তি কি শান্তি', 'হারানিধি', ও 'প্রফুল্ল' নাটকের আলোচনা; মুখ্য ও গৌণ কাহিনীর প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য; 'শঙ্করাচার্য' ও 'রামানুজ' নাটকের তুলনা-মূলক আলোচনা; 'তপোবল' নাটক ; গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকে যাত্রার প্রভাব; 'পাণ্ডবগৌরব', 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', 'জনা' ও 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের আলোচনা।]

মনোমোহন বাংলা নাট্য-সাহিত্যে যে নূতনত্বের সম্ভাবনা দেখাইলেন তাহার উন্নততর ও পরিণততর রূপ দেখিতে পাই আমরা গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকে। রাজকৃষ্ণ রায়, অতুলকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি এই পরিণতির মধ্যবর্তী স্তরভেদ মাত্র। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টিকে যতখানি আকর্ষণ করে, তাঁহার পূর্বসূরিগণের বিশেষত্ব ততখানি করে না।

গিরিশচন্দ্রের ভাগ্যে প্রশংসা এবং নিন্দা উভয়েরই অতি-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। তাঁহার সমালোচকগণ তাঁহাকে অতি বড় নাট্যকার বলিয়াছেন। আবার অন্যান্য সমালোচকবর্গ নিরপেক্ষতার দাবী করিয়া নাট্যাদর্শের দিক দিয়া যে বিচার করিয়াছেন, তাহাতে তিনি দ্বিতীয়শ্রেণীর নাট্যকারের মর্যাদাও পান নাই। তাই গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে কোনো কিছু বলিতে গেলে আমাদিগকে অতি সংযত ও সুচিন্তিতভাবে বলিতে হইবে। যেন আমরা কোনো পূর্ব-সংস্কারের দ্বারা অভিভূত হইয়া মহাকবির প্রতি অবিচার না করি। কেন না, যুক্তিহীন পূজা এবং অকারণ নিন্দা এই দুইটির কোনোটিই গ্রন্থকারের প্রাপ্য হইতে পারে না।

গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে সর্বপ্রথম তাঁহার অপূর্ব 'গৈরিশ'ছন্দের কথাই মনে পড়ে। অপূর্ব অর্থে ইহা অভূতপূর্ব নয়। এই ছন্দ সর্বপ্রথম ব্রজমোহন রায় তাঁহার 'দানব-বিজয়' নাটকে এবং পরে রাজকৃষ্ণ রায় তাঁহার নাটকাবলীতে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের হাতে

সংস্কার লাভ করিয়া এই ছন্দ এতই সুন্দর ও সার্থক হইয়াছে যে উহা 'গৈরিশ' ছন্দ নামেই অভিহিত হইয়া আসিতেছে।* গিরিশচন্দ্রের সহিত তাঁহার পূর্বগামীদের ব্যবহৃত ছন্দের আলোচনা করিলেই তাঁহার অপূর্ব প্রতিভার বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করিতে পারিব।

'গৈরিশ' ছন্দ ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর। ভাঙ্গা-অমিত্রাক্ষরের আলোচনা করিবার পূর্বে গোটা অমিত্রাক্ষরের আলোচনা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন বাংলা নাট্য-সাহিত্যের প্রকাশের দৈন্য দূর করিবার জন্যই অমিত্রাক্ষরের সৃষ্টি করেন। আমরা আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব, মাইকেলী অমিত্রাক্ষরের শেষ পরিণতি নাটকীয় সংলাপের নিতান্ত উপযোগী হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বাঙালী অভিনেতা এবং শ্রোতার কান অমিত্রাক্ষরের জন্য প্রস্তুত ছিল না বলিয়াই তিনি নাটকে অমিত্রাক্ষরের যোগ্য ব্যবহার করিতে পারেন নাই। ভবিষ্যৎ নাট্যকারের ব্যবহারের জন্য রাখিয়া দিয়াছেন।† কিন্তু মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ জন্ম হইতেই নাট্যোপযোগী হইয়া দেখা দেয় নাই। ক্রমবিকাশের স্তর বহিয়াই উহা ক্রমপরিণতি লাভ করিয়াছিল। এই ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণের কিছুটা প্রয়োজন মনে করি।

মাইকেলী অমিত্রাক্ষরের বিশ্লেষণে অতি সাধারণ ভাবে যে বিশিষ্টতা আমাদের চোখে ধরা দেয়, তাহা হইতেছে এই যে, মধুসূদন চতুর্দশ-অক্ষরাত্মক পয়ার ছন্দের অন্ত্যানুপ্রাস তুলিয়া দিয়া তাঁহার এই অভিনব ছন্দ প্রবর্তিত করেন। কিন্তু অন্ত্যানুপ্রাস তুলিয়া দিলেই অমিত্রাক্ষরের পূর্ণতা হইল কি? সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বিচার্য যে মধুসূদন কেন ত্রিপদী-চৌপদী প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া অমিত্রাক্ষর সৃষ্টি করেন নাই। একটু ভাবিয়া দেখা যাক।

* "'গৈরিশ' ছন্দ গিরিশচন্দ্রের আবিষ্কার নয়, তাঁহার পূর্বে ব্রজমোহন রায় নাটকে এবং রাজকৃষ্ণ রায় কাব্যে ভাঙ্গা পয়ার (মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর) ছন্দের অল্প-স্বল্প ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের দ্বারাই নাটকে এবং অভিনয়ে এই ছন্দের সার্থক ব্যবহার হইয়াছিল, এবং গিরিশচন্দ্রের এই কৃতিত্ব সমসাময়িক নাট্যকারগণের দ্বারা অনুকৃত হইতে মোটেই বিলম্ব হয় নাই।"

—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ডাঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ৩৬৩

† "I should like very much to see Blank-verse gradually introduced in dramatic literature."

—যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখিত 'জীবন-চরিত', পৃঃ ২১০

আগেই বলিয়াছি, নাটকীয় সংলাপ শুধু চিন্তা বা শুধু ভাবের ভাষা নয়। মানুষের মনের মধ্যে চিন্তা, অনুভূতি বা কর্ম-প্রচেষ্টা জটার কেশ-পাশের মতো জড়াইয়া আছে। তাহাদিগকে অক্ষত এবং স্বয়ং-সম্পূর্ণ ভাবে পৃথক করিবার উপায় নাই। এই বৃত্তিত্রয়ের সামন্বয়িক, পরিপূর্ণ, সুসঙ্গত প্রকাশই হইল নাটকীয় সংলাপ। মন যখন প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির অস্থির তাড়নায় চিন্তা, অনুভূতি ও কর্মের আন্দোলন সৃষ্টি করে, তখন যে ভাষা সেই আন্দোলিত অন্তরের সম্পূর্ণ সত্তাকে রূপদান করে, তাহাকেই নাটকীয় সংলাপ বলা হয়। তাই এই সংলাপের ভাষার আবেদন শুধু হৃদয়ের কাছে নয়। গীতিকাব্যের সঙ্গীত-মুখরতাকে সেইজন্য সংযত হস্তে দমন করিতে হয় সংলাপে। আবার যে-ভাষা ভাবের সঙ্গে আদৌ যোগ না রাখিয়া কেবল মাত্র চিন্তার উদ্রেক করে, সেই উপদেশাত্মক প্রবন্ধের ভাষাও নাটকীয় সংলাপ নয়। যে দার্শনিকতা মানুষের চিন্তা, ভাব ও কর্মের অচ্ছেদ্য সম্পর্কে জন্মলাভ করে না, (অর্থাৎ যিনি সেই দার্শনিকতার বাণী আওড়াইলেন, তাহা যদি তাঁহার জীবন-নিঃসৃত নির্যাস হিসাবে বাহির হইয়া না আসে) নাটকে তাহার স্থান নাই। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে ম্যাক্‌বেথের যে বিষণ্ণ, নিরাশ উক্তি, তাহা সার্বজনীন সত্য নয়। তবুও ম্যাক্‌বেথের নিজস্ব জীবনে উহাই যে চরম সত্য, তাহার কারণ, ম্যাক্‌বেথের সমস্ত জীবনের চিন্তা, অনুভূতি ও কর্ম উপচিয়া এই সত্য তীব্রতম অভিজ্ঞতারূপে জন্ম লাভ করিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আবার একটি বিষয় আমাদের বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। নাট্যসংলাপে কখনও বিচার-বিশ্লেষণাত্মক চিন্তার প্রাধান্য থাকে, কখনোও থাকে অনুভূতি বা ভাবের প্রাধান্য। কিন্তু উহাতে সব সময়েই চিন্তা ও অনুভূতির মধ্যে প্রয়োজন-অনুপাতে সঙ্গতি থাকেই। নাটকীয় সংলাপের ভাষাকেও তাই সব সময়েই গদ্য-পদ্যের মিশ্রণ হইতে হয়। পদ্যে ভাবের তীব্রতা সুরে ও ছন্দে দোলায়িত হয়। কথাকে ছন্দের স্পন্দন 'অর্থের বন্ধন' হইতে মুক্তি দান করে 'ভাবের স্বাধীন লোকে' আর গদ্যের ভাষা অর্থকে স্বপ্রকট রাখিয়াও তাহার ভিতর যে-টুকু ছন্দঃস্পন্দ সৃষ্টি করা যায়, তাহারই পথ খোঁজে। তাই গদ্যের ছন্দঃস্পন্দ অর্থের অনুগামী। গদ্যে এই ঝোঁককে বলা হয় ছেদ। এই ছেদ কোনো নিয়মিত অক্ষর বা মাত্রার পর বসে না। অর্থের অনুরোধে আমাদের জিহ্বা উচ্চারণে যেখানে

যতটুকু বিরতি লাভ করে, সেখানে পড়ে ততটুকু মাত্রার ছেদ। যে শব্দের বাক্যের মধ্যে যতটুকু প্রাধান্য, তাহা উচ্চারণে ততটুকু গুরুত্ব লাভ করিয়া স্বরাক্রান্ত হয়। কিন্তু পদ্যের মাত্রা থাকে নিয়ন্ত্রিত। সমান সংখ্যক বা নির্দিষ্ট পর্যায়ের মাত্রার পর বসে যতি, অর্থের অনুরোধে ছেদ সেখানে পড়ুক আর নাই পড়ুক। তাই মাইকেলের অমিত্রাক্ষরে যে বিদ্রোহ তাহা শুধু অন্ত্যানুপ্রাসের বিরুদ্ধে নয়। কেন না পয়ারের মূল বৈশিষ্ট্য তাহার চরণদ্বয়ের শেষের মিলে নয়, উহার আট-ছয়-মাত্রার যতির একান্ত-অনুগামী ছেদে। অন্ত্যানুপ্রাস তুলিয়া দিলে মাত্র মিলহীন পয়ারের সূচনা হয়। 'তিলোত্তমা-সম্ভব' কাব্যে মধুসূদন প্রায়শঃ এই মিলহীন পয়ার রচনা করিয়াছেন। হেমচন্দ্রের অমিত্রাক্ষরও মিলহীন পয়ার ভিন্ন কিছুই নহে। কিন্তু মাইকেলের অমিত্রাক্ষরের মধ্যে আট-ছয়ের যতির স্থান অব্যাহত থাকিলেও ছেদটি হইতেছে অর্থের অনুগ। তাই পদ্যের ধ্বনি-ঝঙ্কার যেমন একদিকে রক্ষিত হইতেছে, অন্যদিকে তেমনি অর্থের ঝোঁকে ছেদকে দ্রুত, বিলম্বিত, যাহা ইচ্ছা করিতে পারিতেছি। গদ্যের মধ্যে অর্থানুগ ঝোঁক প্রকাশের যে অবাধ স্বাধীনতা আমরা উপভোগ করি, পদ্যের মধ্যেও তাহা করিতে আরম্ভ করিলাম। সুতরাং পদ্যের ভাষা আর আমাদের মুখের ভাষার স্বাভাবিকত্বকে অস্বীকার করিতে পারিল না। তাই উহা সংলাপের উপযোগী হইল।* কেন না, সংলাপের ভাষা পাত্র-পাত্রীর চরিত্র, পরিবেশ ও শিক্ষাসংস্কৃতির তারতম্যে সরলতা বা গুরুগাম্ভীর্যের যতই স্তরভেদ স্বীকার করুক না কেন, আমরা সব সময়েই সারস্বত বিশ্বাসের এতটুকু সেখানে দাবী করি, যেন ঐ

---

* মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের আলোচনা অনেকে করিয়াছেন। এই ছন্দ যে মহাকাব্যের উপযোগী, সেকথাও কেহ কেহ বলিয়াছেন। কিন্তু ইহার নাট্যরূপ সম্বন্ধে আলোচনা কেহ বিশেষ করেন নাই। কয়েকটি উক্তি দিতেছি:—

"একমাত্র মধুসূদনের অমিত্রছন্দই মহাকাব্য রচনার সর্বাপেক্ষা উপযোগী ছন্দ একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।"

—ছন্দোবিজ্ঞান, শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ২১৯

"মধুসূদনের ভাষার সবচেয়ে বড় লক্ষণ তাহার সংগীত-গুণ।"

—কবি শ্রীমধুসূদন, মোহিতলাল মজুমদার, ১ম খণ্ড, ৯ম অধ্যায়, পৃঃ ৯৬

"মধুসূদনের ছন্দ মহাকাব্যের ছন্দ।"

—কবি শ্রীমধুসূদন, মোহিতলাল মজুমদার, ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়

পরিস্থিতিতে ঐ ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যে এবং ঐ ভাব-বৈশিষ্ট্যে সে ভাষা ঐ ব্যক্তির মুখের কথ্যভাষার স্বাভাবিকত্ব অর্জন করে। বিশেষ ভাষার বাক্যরীতি ও স্বাভাবিক ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য যেন সে ভাষা কখনও অস্বীকার না করে। আমরা জানি, বাংলা ভাষার উচ্চারণের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য এই যে, উহাতে লঘু-গুরু মাত্রাভেদ নাই ; হ্রস্বস্বর-দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ-ভেদ আমরা স্বীকার করি না। এক শব্দের পর আর একটি শব্দ উচ্চারণের সময়ে আমরা ধ্বনিকে সন্ধির মতো মিশ্রিত করিয়া ফেলি না। শব্দগুলি গোটা গোটা উচ্চারিত হয়। তবে বাক্যকে তখন গুরুগম্ভীর করিবার প্রয়োজন আমরা বোধ করি, তখন যুক্তব্যঞ্জনাত্মক সংস্কৃত তৎসম শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করি। বাংলা পদ্যে একমাত্র তানপ্রধান পয়ার ছন্দই বাংলা উচ্চারণের এই স্বাভাবিকত্বকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে।* হাল্‌কা চালের স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দ বা গীতি-মুখর ধ্বনি-প্রধান ছন্দে এই স্বাভাবিকত্বকে বর্জন করা হয়। সেইজন্য মাইকেল পয়ার ছন্দকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা করিয়াছেন। বাংলা পয়ার ছন্দ উচ্চারণের স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখিয়াও কতখানি নমনীয় এবং কতখানি শোষণগুণসম্পন্ন হইতে পারে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ছন্দঃ' গ্রন্থে তাহা অতি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার আলোচনার মধ্যে ইহাও দেখাইয়াছেন যে অতিলঘু হাস্যচপল বর্ণনায়ও পয়ার যেমন উপযোগী, অতি গুরুগম্ভীর ভাবের উদ্বেলিত প্রকাশেও উহা ততখানি যোগ্য। কিন্তু পয়ারের সঙ্কীর্ণতা এখানে যে উহা নিজের আট-ছয়-যতির নিয়ন্ত্রিত বন্ধন ও অন্ত্যানুপ্রাসের স্বাভাবিক বিরাম-প্রবণতাকে অতিক্রম করিতে পারে না। তাই ভাব বা অর্থের আবেগ যখন ঐ দুইটি মাত্র পংক্তির সংকীর্ণ বন্ধনে নিজের প্রকাশের পরিপূর্ণতা পায় না তখন উহা তোৎলার রাগের মতো আপন অন্তরের মধ্যে আপনিই গুমরিতে থাকে এবং অপ্রকাশের যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর দার্শনিক নিবন্ধের পয়ারের ভাষা পর্যালোচনা করিলেই এই উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে। মধুসূদন অমিত্রাক্ষরের পয়ারের

* "এই পয়ার ছন্দেই সহজ বাচন-ভঙ্গির অবকাশ আছে, বাঙ্গালা বাক্য-রীতি এই পয়ারের ভিতর দিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে।...বাঙ্গালা অমিত্রাক্ষরের মূল উপাদানগুলিকে, তিনি সেই দৃষ্টির দ্বারা, ঐ পয়ারের মধ্যেই অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন।"

—শ্রীমধুসূদন, মোহিতলাল মজুমদার, ২য় খণ্ড, ১ম অধ্যায়, পৃঃ ১৮৫

অন্ত্যানুপ্রাস তুলিয়া দিয়া এবং ছেদকে যতির অনুগামী না করিয়া অর্থের অনুগামী করিয়া ভাষাকে মুক্ত করিলেন। আর এক দিক দিয়া অমিত্রাক্ষরে মধুসূদন অভিনব বৈশিষ্ট্য আনয়ন করিলেন। মধুসূদনের পূর্বপর্যন্ত আমরা পয়ারের আট-ছয়-যতির মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য উহাকে সুর করিয়া পড়ার নেশায় শব্দকে গোটাগুটি উচ্চারণ না করিয়া ভাঙ্গিয়া উচ্চারণ করিতাম। সুরের ঝোঁক অর্থের ঝোঁককে অস্বীকার করিয়া যাইত।

OO O O O O O O OOO O O O
মহাভার তের কথা অমৃতস-মান
O O O O O O OO O O OO OO।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্য বান।

উপরি-উদ্ধৃত ছন্দোলিপিতে দেখা যায় 'মহাভারতের' শব্দটিকে আমরা উচ্চারণাত্মক পর্বাঙ্গ-বিন্যাসের জন্য ভাগ করিতেছি। আবার ঐ একই প্রয়োজনে 'সমান' শব্দের 'স,' একদিকে লইয়া 'মান'কে বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্য দিকে লইতেছি। মধুসূদন এই ধরনের ছন্দোবিন্যাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় অতীব পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের ছন্দ স্পষ্ট নির্ভর করিতেছে stress বা স্বরাঘাত বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যের উপর। তিনি দেখাইয়াছেন, এই দিক দিয়া মধুসূদন মিল্‌টনের সগোত্র।* ফলে এই দাঁড়াইল যে, উচ্চারণের গীতি-প্রবণতাকে পয়ার হইতে অব্যাহতি দিয়া ঝোঁকপ্রবণতাকে স্বীকার করা হইল।† তাই এখন আর আমাদের অর্থানুপাতিক উচ্চারণের ঝোঁক পর্ব বা পর্বাঙ্গের যতির কঠোর অনুশাসন মানিল না। স্তবকের মধ্যে চরণের শাসন চরম নহে। অমিত্রাক্ষরের স্তবক তাই নির্দিষ্ট মাত্রার পরিমিত পর্ব বা পর্বাঙ্গের সমন্বয়ে সংগঠিত নিয়মিত সংখ্যক চরণের যোজনা নহে। অর্থের বা ভাবের অনুরোধে বাক্যের ঝোঁক যেখানে বা যতদূর গিয়া থামিতেছে, ততদূরব্যাপী এক একটি অনুচ্ছেদ রচিত হইতেছে। ইহার মধ্যে ছন্দকে স্পন্দিত করিবার জন্য

* কবি শ্রীমধুসূদন—মোহিতলাল, ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়, পৃঃ ২০৬-২২৫

† "মাইকেলের অমিত্র পয়ারে গীতিধর্ম বা সুর-প্রবাহ কম এবং শক্তি-প্রয়োগ বেশী। ভাষার উচ্চারণ যত রকমে সজোরে করিতে পারা যায়, মধুসূদন তাহার কোনটিকে বাদ দেন নাই।"

—ছন্দোবিজ্ঞান, শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ২১৯

মাইকেল কয়েকটি বিশিষ্ট উপায় খুঁজিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি তাঁহার কাব্যে অজস্র অনুপ্রাস ব্যবহার করিয়াছেন। মনে হইতে পারে অনুপ্রাসের এই অকৃপণ ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে অতি-প্রাচুর্য দোষে দুষ্ট। কিন্তু একটু নিবিষ্টভাবে আমরা যদি ভাবিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিব, ছন্দের যতি-প্রবাহকে বাড়াইয়া গভীর ও ঝঙ্কারমুখর করিবার জন্য ইহার নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। পয়ারের অন্ত্যানুপ্রাসের মধ্যে চরণের অন্তে অন্তে যে ধ্বনিসাম্যটুকু বর্তমান ছিল, অমিত্রাক্ষর তাহাকে অস্বীকার করার ফলে একদিকে যেমন লাভ হইল, অন্যদিকে তেমনি ক্ষতিও হইয়াছিল অনেকখানি। সেই ক্ষতিকে পূরণ করিবার জন্য মধুসূদন চরণের মধ্যে অত অনুপ্রাস প্রয়োগ করিয়াছেন। অনুপ্রাস সম-ব্যঞ্জনের পর্যায়ক্রমিক উচ্চারণের মধ্য দিয়া ধ্বনিকে শ্রুতিমধুর করে, আর সেই অনুপ্রাসের সঙ্গে যদি যুক্ত-ব্যঞ্জন থাকে তাহা হইলে ধ্বনির শ্রুতি-মাধুর্যের সঙ্গে ভাবের গাম্ভীর্য অপূর্ব ভাবে যুক্ত হয়। শুধুমাত্র অনুপ্রাসের সুসঙ্গত প্রয়োগের মধ্য দিয়া কি করিয়া পরিস্থিতির গাম্ভীর্য সুর-ঝঙ্কারের মধুর মূর্ছনায় মর্মস্পর্শী আবেদনে ফাটিয়া পড়ে, তাহার অপূর্ব প্রয়োগ-নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন মধুসূদন তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যে। রাক্ষসগৌরব মেঘনাদ মাতা, পিতা, স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধবাদির একান্ত অজ্ঞাতে যজ্ঞশালায় প্রাণ বিসর্জন করিল। লঙ্কার যে কত বড় বিপদ ঘটিয়া গেল, তাহা কেহ জানিল না।—পিতা লঙ্কেশ্বর, মাতা মন্দোদরী বা স্ত্রী প্রমীলা, কেহই নহে। অথচ কবি তাঁহার অনবদ্য ভাষার ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে উহাদের অনবহিত, নিয়তি-নিয়মিত প্রচেষ্টার বর্ণনা-মাত্রের মধ্য দিয়া সেই পরিস্থিতির বিষণ্ণতাকে কী অপূর্ব উপায়ে ফুটাইয়াছেন।—

> "সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিয়া শঙ্করে,
> প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল,
> আত্ম-বিস্মৃতিতে হায় অকস্মাৎ সতী
> মুছিলা সিন্দূরবিন্দু সুন্দর ললাটে,
> মূর্চ্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী সতী
> আচম্বিতে।"

ফলে এই দাঁড়ায় যে, আমাদের মন একদিকে যেমন বাক্য-গত শব্দগুলিকে অনুসরণ করিয়া একটা অখণ্ড অর্থ-স্থাপনার চেষ্টা করে, অন্যদিকে তেমনি

অনুপ্রাসাত্মক ধ্বনির মাধুর্যটুকুও উপেক্ষা করিতে চাহে না। তাহার জন্য সমস্ত বাক্যটি ব্যাপিয়া অর্থানুসরণের যে একটা গতি থাকে তাহাকে ঐ বিশেষ শব্দের নিকট আসিয়া একটু মন্দীভূত করিতে হয়। উচ্চারণে তাহা অবশ্য স্পষ্টভাবে ধরা দেয় না। কিন্তু ঐ সামান্যতম ধীরগতির জন্যই পরের গুরুমাত্রিক বা যুক্ত-ব্যঞ্জনাত্মক শব্দের উচ্চারণ বা অর্থানুধাবনের পথে আমাদের প্রয়োজনীয় বিরতিটুকু এইখানেই লাভ হইয়া যায়।

উদাহরণের দ্বারা বক্তব্যটিকে স্পষ্ট করিতে চেষ্টা করা যাক।—'সম্মুখ-সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি বীরবাহু,' 'শূলী শম্ভু-নিভ কুম্ভকর্ণ' প্রভৃতি বাক্যের প্রয়োগ মধুসূদনের কাব্যে অপ্রচুর নহে।

এইভাবে আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব, পদ্যের ছন্দ এবং ভাবধর্ম বজায় রাখিয়াও অমিত্রাক্ষরে ভাষা কি করিয়া গদ্যাত্মক হইয়াছে।* কিন্তু তবুও বিচার্য রহিয়া যায়, মেঘনাদবধ পর্যন্ত কাব্যে ভাষার যে ক্রমবিকাশ হইয়াছে, তাহা কি তখনও সর্বাংশে নাটকীয়? আমরা বলিব, এ পর্যন্ত মধুসূদনের ভাষা মহাকাব্যোচিত হইয়াছে, কিন্তু নাটকোচিত হয় নাই। মহাকাব্যের ভাষায় ও চরিত্রে গাম্ভীর্য বা বিরাটত্ব যতখানি থাকে, ততখানি স্বাভাবিকত্ব থাকে না; উহার প্রয়োজনও হয় না। মেঘনাদবধের ভাষায় মেঘনির্ঘোষ আছে, আবার চতুর্থ সর্গে গীতিকাব্যের ভাবোচ্ছ্বাস আছে। কিন্তু গাম্ভীর্য হইতে সারল্যে, মনের এক বিশেষ অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে যাইবার স্বাভাবিক, অনাকস্মিক পরিণতি নাই। সেই জন্য প্রমীলা-চরিত্রে কল্পনার অসঙ্গতি আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহিণী রাধিকার খণ্ডিতাবস্থার তীব্র অন্তর-বেদনা লইয়া সখী-পরিবেষ্টিতা প্রমীলার বিরহ-বিধুর রাত্রি-জাগরণের করুণ-চিত্র দর্শন করিতে করিতে আমরা যে ভাব-তন্ময়ত্ব লাভ করি তাহার আবেশ কাটিতে না কাটিতে আমরা নারী-দেশের অধীশ্বরী অর্জুন-প্রণয়িনী প্রমীলার অশ্বারূঢ় যে চিত্র ইন্দ্রজিৎ-বধূ প্রমীলার মধ্যে দেখি তাহা যে শুধু কল্পনার দৈন্যজনিত আকস্মিকতার অসঙ্গতিরই পরিচয় দেয়, তাহাই নহে,

---

* "সেকালের অন্যান্য কবিগণ যে ভাষার গদ্যত্ব ঘুচাইয়া তাহার রস-সংস্কৃতি সাধন করিতে পারেন নাই—মধুসূদন তাঁহার সেই নূতন গদ্যছন্দকেই যেমন অমিত্রাক্ষরের সঙ্গীত-সুরধুনীতে পরিণত করিয়াছিলেন, তেমনই তাঁহার সেই গদ্য বাগ্-বৈভবকেই রস-সিঞ্চিত করিয়া তাহা হইতে নব্যরূপ সরস্বতীর বীণাপাণি মূর্তি আবিষ্কার করিয়াছিলেন।"

—কবি শ্রীমধুসূদন, মোহিতলাল, ১ম খণ্ড, ৯ম অধ্যায়, পৃঃ ১৪১

ভাষারও সেখানে দীনতা রহিয়াছে অনেক। তাই শ্রীরামচন্দ্র এক নিঃশ্বাসে 'ভিখারী' ও 'নৃমণি' উভয়ই হইয়া পড়েন। অবশ্য ইহাও স্বীকার্য যে ভাবের সংযমের অভাবই ভাষার এই অসঙ্গতি ঘটাইয়াছে। ভাব ও প্রকাশের হর-পার্বতী সম্পর্ক আজিও ভুলিবার কোনো কারণ নাই। এই সংযম ভাষায়, বর্ণনায়, কল্পনায় ও চরিত্র-চিত্রণে সার্থকভাবে আসিল বীরাঙ্গনা কাব্যে। অমিত্রাক্ষরের বিবর্তনে ও ভাষার নাট্যোপযোগিতার উদাহরণে বীরাঙ্গনা কাব্যের স্থান সর্বোচ্চে। বলা বাহুল্য, বীরাঙ্গনায় আসিয়াই মাইকেলের কাব্যদৃষ্টি নাট্যদৃষ্টিকে বরণ করিয়াছে। নাট্যকার জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে নিরাসক্ত। পাত্র-পাত্রীর সংলাপের মধ্য দিয়া তাহাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ফুটানোই সার্থক নাট্যকারের শক্তির পরিচায়ক। তাঁহার নিজস্ব ধারণা-ভাবনা চরিত্রগুলির অন্তর-সত্যরূপে তাহাদের জীবন উপচিয়া প্রকাশ পায়। চরিত্র ও কাহিনী-নিরপেক্ষভাবে তিনি নিজে কিছু বলেন না। আর চরিত্রের প্রকাশ হয় তাহার চলা ও বলার মধ্য দিয়া। চলা ও বলাকে নিয়ন্ত্রিত করে মানুষের চিন্তা, কর্ম, ও অনুভূতি-সম্পন্ন সমগ্র মনঃসত্তা। অথচ মন ব্যাপারটি নিতান্ত জটিল। এই জটিল মনের বাঙ্ময় রূপই হইল নাটকীয় সংলাপ। বীরাঙ্গনার ভাষা নাটকীয় সংলাপের কতখানি যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে একটু আলোচনা করিলেই আমরা তাহা বুঝিতে পারিব। 'শকুন্তলা-পত্রিকা' লইয়া আলোচনা শুরু করা যাক। স্বামী-কর্তৃক পরিত্যক্তা শকুন্তলা প্রিয়তমের আশ্বাস-বাণী অবলম্বন করিয়া দিনের পর দিন গণিয়া যাইতেছে। কিন্তু রাজা দুষ্যন্ত আর আসিলেন না। প্রেমের প্রথম জাগরণে যে প্রিয়কে অত অন্তরতম করিয়া পাওয়া গিয়াছিল, সে-ই যখন এমন নিষ্ঠুর ভাবে ভুলিয়া গেল, নারীর সমস্ত প্রেম তখন পর্যবসিত হইল অভিমানে। অভিমান বাধাহত, আঘাতিত, রোষরুদ্ধ প্রেম। অভিমানিনীর অন্তর আঘাতে আঘাতে শতধা বিদীর্ণ হইলেও তাহার মুখ দিয়া ভাষা বাহির হয় না; হইলেও তাহা অতি সংক্ষিপ্ত, জ্বালাময়ী, আঘাতের ভাষা বা ব্যঙ্গের ভাষা। তাই চিঠিতে শকুন্তলার প্রথম কথাই হইতেছে 'বন-নিবাসিনী দাসী নমে রাজপদে, রাজেন্দ্র!' যেন নায়িকা বলিতে চাহে, যেহেতু আমি সামান্যা আশ্রম-বালিকা, তোমার মতো মহারাজের দাসী হইবার যোগ্য নহি, সেইজন্যই তুমি আমাকে ভুলিয়া যাইতে পার। ভাষার সরলার্থে যাহা বুঝায়, তাহাই পর্যাপ্ত নহে। এই উক্তির অন্তরে অন্তরে গুমরিয়া কাঁদিতেছে এই আবেদন, আমাকে তোমার ভুলিয়া যাওয়া কি উচিত হইল!

অভিমানে নায়িকার উদ্দেশ্য, আঘাত দিয়াও সে যেন প্রিয়কে জাগরিত করিয়া আবার ফিরিয়া পাইতে পারে। তাই অভিমানের এই আবেদনের ভাষা সযত্নে নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু নারীর সহজাত ধর্মই এই যে, সে যাহাকে একবার মনে-প্রাণে ভালবাসিয়াছে, তাহার উপর অভিমান করিয়াও সে শান্তি পায় না। তাহার অন্তরের আকুল বাসনা থাকে, যে দয়িত তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে, সে বুঝুক, প্রিয়া তাহাকে কতটুকু ভালবাসিয়াছিল। তাই ইহার পরেই শকুন্তলার উক্তি, 'যদিও তুমি ভুলিয়াছ তারে, ভুলিতে তোমারে কভু পারে কি অভাগী?' যখনই একবার সে স্বীকার করিল যে সে দুষ্মন্তকে ভুলিতে পারে নাই, তখন কিন্তু ভাষা আর সংযত, সংক্ষিপ্ত থাকিল না। রুদ্ধপ্রেমের প্রকাশে ভাষায় উচ্ছ্বাসের বন্যা প্রবাহিত হইল।—

"হায়, আশামদে মত্ত আমি পাগলিনী!
হেরি যবে ধূলারাশি, হে নাথ, আকাশে,
পবন-স্বনন যদি শুনি দূর বনে,
অমনি চমকি ভাবি,—মদকল করী,
বিবিধ রতন অঙ্গে, পশিছে আশ্রমে,
পদাতিক, বাজীরাজি, সুরথ, সারথি
কিঙ্কর-কিঙ্করী সহ!"

অন্তরের আবেগ ভাষাকে ছন্দিত, স্পন্দিত ও বাক্যকে লম্বিত করিয়া ছুটাইয়া লইয়াছে। তাহার পর 'আশার-ছলনে' মুগ্ধ হইয়া শকুন্তলা যখন প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া সখীকে ডাকিয়া জানায় বুঝিবা মহারাজ আসিতেছেন, তখন সখীরা নীরবে তাহার গলা ধরিয়া কাঁদিয়া ওঠে। কেন কাঁদে সে রহস্য শকুন্তলার নিকট উদ্ঘাটিত হয় নাই। তাই এই ঘটনাটুকুর বর্ণনাও সংক্ষিপ্ত, আবেগ-মুখর নহে। কিন্তু তারপরই যখন আবার অতীত সুখের মধুময়ী স্মৃতি অনির্বাণ আগুনের মতো জ্বলিয়া ওঠে, ভাষা তখন যেন ভাবের আন্দোলিত প্রকাশকে গতি দিয়া উঠিতে পারে না। তাই অজস্র যুক্তব্যঞ্জনধ্বনির শ্রুতিমধুর কোমল অক্ষর, অনুপ্রাসের গুঞ্জরণ প্রভৃতি সমেত বাক্যাবলী আপন প্রকাশের আবেগে হইতেছে অতিলম্বিত।—

"দ্রুতগতি ধাই আমি সে নিকুঞ্জ-বনে,
যথায়, হে মহীনাথ, পূঁজিনু প্রথমে
পদযুগ, চারিদিকে চাহি ব্যগ্রভাবে।

দেখি প্রফুল্লিত ফুল, মুকুলিত লতা,
শুনি কোকিলের গীত, অলির গুঞ্জন,
স্রোতোনাদ, মরমরে পাতাকুল নাচি,
কুহরে কপোত সুখে বৃক্ষশাখে বসি,
প্রেমালাপে কপোতীর মুখে মুখ দিয়া।
সুধি গন্ধি ফুলপুঞ্জে,—হে নিকুঞ্জশোভা,
কি সাধে হাসিস তোরা! কেন সমীরণে
বিতরিস্ আজি হেথা পরিমল-সুধা?"

এই ভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, বীরাঙ্গনার ভাষার বৈশিষ্ট্যই হইল এই যে, ভাবাবেগের তীব্রতা অথবা মৃদুলতাভেদে ভাষা যেখানে যতটুকু উচ্ছ্বাসপূর্ণ বা উচ্ছ্বাসহীন হওয়া উচিত তাহা হইতেছে। সুতরাং প্রকাশভঙ্গীর উপর কবির অধিকার আসিয়াছে। একদিকে যেমন সংযম রহিয়াছে এবং যুক্তিপ্রবণতা উচ্ছ্বাসকে প্রশমিত করিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি প্রয়োজনবোধে ভাষা উচ্ছ্বসিত হইয়া সুরে ও ছন্দে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সঙ্গে সঙ্গে দেখিতেছি, ভাব হইতে ভাবান্তর প্রকাশের যথাযোগ্য গৌরব ও সংহতি রক্ষা করিয়া ভাষা নিজের স্থিতিস্থাপকতার পরিচয় দিতেছে। সমগ্র কাব্যখানির বিষয়-বস্তু ও চরিত্র-চিত্রণ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, মধুসূদনের ভাষা বারাঙ্গনা উর্বশীর ভোগোদ্দীপ্ত প্রেম, কুমারী রুক্মিণীর শ্রদ্ধাবনত আত্মনিবেদন, পুত্রশোকাতুরা জনার অভিমান-ক্ষুব্ধ ভৎর্সনা, কৈকেয়ী কর্তৃক স্বার্থপর ভালবাসার স্বেচ্ছাচার-জনিত রোষে স্ত্রৈণ স্বামীর নিন্দা, কর্তব্যচ্যুত স্বামী জয়দ্রথকে দুঃশলার ভয়-মিশ্রিত তিরস্কার, সমস্ত কিছুরই বর্ণনায় নায়িকাদের ভাবাবেগ-জনিত হৃদয়স্পন্দনের ও চরিত্র-বিকাশের সঙ্গে সমান তাল রাখিয়া চলিতেছে। কোথায়ও তাহার এতটুকু অসঙ্গতি নাই। তাই মনে হয়, এই ভাষায় যদি মধুসূদন নাটক রচনা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার রচনায় বাংলা নাট্য-সাহিত্য আরো সমৃদ্ধ হইয়া উঠিত।

পরবর্তীকালে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরকে যথাসম্ভব সার্থকভাবে নাটকে প্রয়োগ করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র অমিত্রাক্ষরকে ভাঙ্গিয়া এক নূতন ছন্দ সৃষ্টি করিলেন। অবশ্য তিনি এই ছন্দের স্রষ্টা বা প্রবর্তক নহেন,—সংস্কারক মাত্র। নাটকে ভাঙ্গা-অমিত্রাক্ষর

ছন্দ প্রথম ব্যবহার করেন যাত্রাওয়ালা ব্রজমোহন রায়। তারপর রাজকৃষ্ণ রায়, অতুলকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি নাট্যকারগণ নাটকে ইহার প্রয়োগ করেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের হাতে এই ভাষার যে সংস্কার হইল, তাহাতে ইহা একেবারে নূতন রূপ ধারণ করিল। তাই ইহা এখনও তাঁহারই নামানুকরণে 'গৈরিশ' ছন্দ বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

শুনা যায়, ভাঙ্গা-অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রেরণা রাজকৃষ্ণ ও গিরিশচন্দ্র পাইয়াছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠায় মুদ্রিত নিম্নলিখিত কয়টি ছত্র হইতে,—

"হে সজ্জন ! ৪
স্বভাবের সুনির্মল পটে, ... ৪+৬
রহস্য রসের রঙ্গে ... ... ৬+২
চিত্রিনু চরিত্র দেবী সরস্বতী বরে ... ৬+২+৬
কৃপা-চক্ষে হের একবার ... ... ৪+৬
শেষে বিবেচনা মতে ... ... ২+৬
তিরস্কার কিংবা পুরস্কার যাহা হয় ... ৪+৬+৪
দিও তাহা মোরে ৬
বহুমানে লব শির পাতি" ... ... ৪+৬

কালীপ্রসন্নের এই ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দ যে 'গৈরিশ' ছন্দের পূর্বপুরুষ তাহা অবশ্যই স্বীকার্য। এই ছন্দের প্রথম বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার চরণগুলি চতুর্দশ-অক্ষরাত্মক নয়। একটি বাক্যাংশ বা বাক্যের অন্তর্গত ভাবের একটি ছেদনযোগ্য অংশ যেখানে থামিতেছে, অর্থাৎ গদ্য বাক্য-রচনায় আমরা স্বভাবতঃ যে জায়গায় ছেদ বা বিরামচিহ্ন বসাইতাম, এই চরণগুলি সেই সেই জায়গায় শেষ হইতেছে এবং প্রত্যেক নূতন চরণ আবার ঐরূপ বৈশিষ্ট্য লইয়া রচিত হইতেছে। তাই ভাব ও ছেদের অনুরোধে চরণগুলির দৈর্ঘ্য সমান নয়। পর্যায়ক্রমিক কোনো ঐকতান নিয়মেও ধরা দেয় না। তাই এই ছন্দ সত্যকার 'মুক্তছন্দ'। গদ্যের বাক্য বা বাক্যাংশ যেমন অক্ষর গণিয়া নির্ণয় করা যায় না, তেমনি এই ছন্দেও বলার উপায় নাই, কোন্ চরণ কতটুকু লম্বা হইবে বা বলার আবেগ কয়টি চরণের পর গিয়া থামিয়া বাক্যকে পূর্ণতা দান করিবে। আমাদের সংলাপের ভাষাও ভাবের ব্যঞ্জনা এবং অর্থের দ্যোতনার অনুরোধে কখনও লম্বিত, কখনও সংক্ষিপ্ত, কখনও পুষ্পিত,

কখনও নিরলঙ্কৃত হইবে। অমিত্রাক্ষরের মধ্যে ভাষার গদ্যাত্মক স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু প্রতি চরণে চতুর্দশ অক্ষরের নিয়ন্ত্রণকে মানিতে গিয়া মুক্তির মধ্যেও অনেকখানি বন্ধন মানিতে হইত। অমিত্রাক্ষরে চরণের চার, ছয়, আট, দশ, তিন, দুই যে কোনো সংখ্যক মাত্রার পর ছেদ বসে। কিন্তু যেহেতু চতুর্দশ অক্ষরে চরণ শেষ হইবে, সেই জন্য ঐ চতুর্দশ অক্ষরের পরেও, যত স্বল্পই হউক, একটু বিরাম বা ছেদ বসেই। তাই প্রথম দিক দিয়া যত বেশী মাত্রার পর ছেদ বসে, চরণের শেষদিক দিয়া পর্বের মাত্রার সংখ্যা তত কমিয়া যায়। তাই সেখানে অর্থের প্রকাশাবেগ ও ছন্দের স্পন্দনাকৃতির সাম্য রক্ষা করিয়া সংলাপ সৃষ্টি করা অমিত্রাক্ষর-রচয়িতার পক্ষে অনেকখানি শক্তিমত্তার পরিচয় হইয়া দাঁড়ায়। অবশ্য মাইকেলের রচনাকে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গা-অমিত্রাক্ষরে সাজানো যায়। যথা,—

> "বাজিছে রাজতোরণে রণ-বাদ্য আজি,
> হ্রেষে অশ্ব, গর্জে গজ,
> উড়িছে আকাশে রাজকেতু,
> মুহুর্মুহু হুঙ্কারিছে মাতি
> রণ-মদে রাজসৈন্য,
> কিন্তু কোন্ রঙ্গে ?
> সাজিছ কি নররাজ যুঝিতে সদলে
> প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে ?
> নিবাইতে এ শোকাগ্নি ফাল্গুনির লোহে ?
> এইত সাজে তোমারে,
> বীরর্ষভ তুমি,
> যাও বেগে,…
> যমদণ্ডসম শুণ্ড আস্ফালি নিনাদে,
> টুট কিরীটীর গর্ব আজি রণস্থলে।

বুঝিলাম 'ভাঙ্গা'-অমিত্রাক্ষরের বীজ 'গোটা'-অমিত্রাক্ষরের মধ্যেই নিহিত ছিল। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব, গিরিশাদির ছন্দে যতটুকু অবাধ স্বাধীনতা আছে মাইকেলী ছন্দকে ভাঙ্গিলেও সেই স্বাধীনতার পরিচয় মেলে না। 'গৈরিশ' ছন্দের চরণ সবচেয়ে বেশী লম্বিত হইলে হয় চতুর্দশ অক্ষরের। এই ছন্দে আট, ছয়, দশ, বারো প্রভৃতি যতগুলি

সংখ্যক অক্ষরের চরণকে যে কোনো রকমে সাজানো যায়। কিন্তু মাইকেলী ছন্দকে ইচ্ছা মতো ঢালিয়া সাজা যায় না। প্রথম চরণ আট অক্ষরের লইলে পরের চরণ হয় ছয় না হয় দশ অক্ষরের লইতে হইবে। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই তাহার পরবর্তী চরণ ঐরূপ আট বা দশ অক্ষরের লওয়া যাইবে না। কারণ পরবর্তী ছেদে যেখানে ঐ চরণকে শেষ করিতে হইবে, তখন তাহা আট বা দশ অক্ষরের পর না-ও করা যাইতে পারে। কিন্তু কালীপ্রসন্নের ঐ লেখাটুকুর মধ্যে প্রথমে ছন্দের এই স্বাধীন পদক্ষেপ দেখা গেল যে, অমিত্রাক্ষর মুক্ত হইয়াও চতুর্দশ অক্ষরের যে বন্ধনটুকু মানিত, তাহা আর মানিল না। সুতরাং মধুসূদনের ছন্দ হইতে সংলাপের ক্ষেত্রে ইহা অনেকখানি অগ্রগতি সন্দেহ নাই। কিন্তু এই মুক্তির মধ্যে কবি-কৌশলের যোগ না থাকিলে এই ছন্দে বিপদও যথেষ্ট। যেহেতু অক্ষর-পরিমিতি, অনুপ্রাস, যতি ইত্যাদির বিশেষ কোনো বালাই নাই, সুতরাং যাহা কিছু যেমন-তেমন করিয়া পদ্য-ভঙ্গীতে সাজাইয়া দিলেও এই ছন্দ হইতে পারে। তাই খুব বিবেচনার সহিত 'গৈরিশ' ছন্দ প্রয়োগের ক্ষেত্র নির্ণয় করিতে হইবে।

'গৈরিশ' ছন্দ রোমান্স-ধর্মী কাল্পনিক আখ্যায়িকা সমন্বিত নাটকের এবং পৌরাণিক নাটকের পক্ষেই বিশেষ উপযোগী। ইহা সামাজিক নাটক বা হাস্যরস-বহুল প্রহসন রচনার উপযোগী নহে। কারণ, বাস্তবের চেয়ে কল্পনা যেখানে উদ্দাম নয়, চরিত্র-চিত্রণের মধ্যে ঘটনার গতি যেখানে স্বাভাবিক ও মন্থর, অথবা জীবনের হাস্য-তরল লঘু দিকটারই যেখানে রূপায়ণ, সেখানে সংলাপের ভাষা অবশ্যই হইবে অনাড়ম্বর গদ্য। কিন্তু যেখানে কল্পনার উদ্দাম ঘনঘটা চরিত্র-বিকাশের স্বাচ্ছন্দ্য অতিক্রম করিয়া বিস্মিত আনন্দে আমাদের মনকে অভিভূত করে, চরিত্রের অতিচারী দিকটার যেখানে প্রকাশ হয়, যেখানে আমাদের ভাব-রাজ্যের প্রতিটি দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাত অতি-প্রাবল্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে, সেখানে ভাষার হৃৎস্পন্দনের মধ্যেও ভাবের উচ্ছল আবেগকে ধরিতে হয়। তাই ভাষা সেখানে অবশ্যই হইবে পদ্য। বাংলার পৌরাণিক নাটকের মধ্যে যাত্রার গীতি-প্রবণতা ও ভক্তিধর্ম আসিয়া গেল; জীবনের স্বাভাবিকত্বতে দার্শনিকতা-মণ্ডিত করিয়া মহত্ত্ব দান করা হইল; পৌরাণিক কাহিনী ও চরিত্রের মধ্যেও ছিল পূজনীয় বিরাটত্ব। ইহার সব কিছুর প্রকাশের জন্য প্রয়োজন ছিল পদ্যের।

যাত্রায় সর্বপ্রথম এই প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করিলেন অধিকারী

ব্রজমোহন রায়। অমিত্রাক্ষর বা ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষরের প্রয়োজন বহুদিন হইতেই উপলব্ধি হইতেছিল। ভাবাকুলতাপূর্ণ যাত্রায় হর্ষ, বেদনা, অভিমান প্রভৃতি প্রবৃত্তির অতি-প্রকাশের উপরই বেশী জোর দেওয়া হইত। সেই গুলির প্রকাশের জন্য কথকতার মতো কবিত্বপূর্ণ, পুষ্পিত গদ্য প্রয়োগ করা হইত। প্রকৃতপক্ষে উপযুক্ত পদ্য সংলাপের ভাষা থাকিলে নাট্যকারগণ যে সেখানে কিছুতেই গদ্য ব্যবহার করিতেন না ইহা নিশ্চিত। প্রথমে যাত্রায় কিন্তু ঐ সকল জায়গায় সঙ্গীতই ব্যবহৃত হইত। ব্রজমোহন রায় ঠিক সেই সেই ক্ষেত্রে অমিত্রাক্ষর এবং ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষরের প্রয়োগ করিয়াছেন। অমিত্রাক্ষর-প্রয়োগের উদাহরণ তাঁহার 'তারকাসুর বধ'। কুমার কার্তিকেয় দেব-সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। পরাজিত দেবগণ তাই বিপুল উল্লাসে সিংহনাদ করিতেছেন। বিস্মিত দৈত্যরাজ দূতকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন —

" ' " ' ' "
"কহ দূত, কহ শুনি সে গূঢ় কাহিনী।
" ' " '
কি হেতু অমর পুনঃ মাতিল সমরে?
" ' "
কার বলে বলী হেন? সুষুপ্ত শৃগাল
" " " '
নাদিলা ভীষণ রবে, ক্ষিপ্ত করি অরি?
" " "
কি বিস্ময়! নিঃসহায় নিরীহ অমর
' " "
দলিত ভূ-লতা সম, দৈত্য পদতলে?
" " "
তাড়িত তস্কর যথা ত্রাসিত জীবনে
" " '
পলায় পথাদি প্রায় নির্জন গহ্বরে
" ' "
তেমনি নির্বীর্য ভীরু পৌরুষ-বিহীন,

" " " '
কি সাহসে গর্জে হেন প্রলয় গর্জনে
" ' '
ঘোরতম ঘন যথা ইরম্মদধারী ?
" " "
অসম্ভাব্য, অবিশ্বাস্য, রহস্য-জনক।
" " ' '
ভৌতিক কৌতুকাবহ হবে কি রে দূত ?
" " " '
সত্য কহ, কিংবা সব নিশার স্বপন ?"

—তারকাসুর বধ, ৪র্থ অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক

উদ্ধৃত অংশে দেখা যাইতেছে, এ-ভাষার মধ্যে ওজস্বিতা আছে, গতিও আছে। সুতরাং যুদ্ধোৎসাহ-ব্যঞ্জক রৌদ্ররসের প্রকাশে এ-ভাষা যথেষ্ট উপযোগী। যুক্ত ব্যঞ্জনের প্রয়োগে ধ্বনি-গাম্ভীর্য সৃষ্টি হয় এবং অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দের প্রয়োগ রৌদ্র ও বীর-রসের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে। সেদিক দিয়া ব্রজমোহনের ত্রুটি হয় নাই। উদ্ধৃত অংশে শব্দাবলীর উপর একক ও যুগ্ম স্বরাঘাত চিহ্ন দিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে ক্রিয়া ও বিশেষণ-গুলির উপর তীব্র শ্বাসাঘাত পড়িয়াছে। বিশেষ্যগুলির পর আঘাত তত তীব্র নহে। দৈত্যরাজ যে দেবগণের শক্তি ও কার্যে বিস্মিত হইতেছেন, এই সংলাপের ভাষায় তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং শব্দ-গ্রন্থন এবং ছন্দো-বিন্যাসের দিক দিয়া ইহার উপযোগিতায় সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। তবুও ইহাকে নাটকীয় সংলাপ হিসাবে সার্থক বলিতে পারি না।

তাহার কারণ দুইটি। প্রথমটি হইল এই যে, এই ছন্দে আট-ছয়-মাত্রার যতি-নিয়ন্ত্রণ ইহাকে মিল-হীন পয়ারের বাঁধন হইতে মুক্তি দেয় নাই। তাই ইহা মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের স্বজাতীয় না হইয়া হইয়াছে নবীনচন্দ্রের ভাষার সগোত্র। দ্বিতীয়তঃ নাট্যকার মধুসূদনের প্রযুক্ত শব্দ, উপমা, এমন কি বিশিষ্ট বাক্যগুলিও চয়ন করিয়া প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার ফলে শ্রুতিকটুত্ব এবং অতিকথন-দোষে তাঁহার রচনা দুষ্ট হইয়াছে। উদ্ধৃত অংশে ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তিতেই কিন্তু দৈত্যরাজের বক্তব্য নিঃশেষে বলা হইয়া গিয়াছে। তাহার পর তিনি যাহাই বলিতেছেন না কেন, তাহার দ্বারা পরিস্থিতির নূতনত্ব

কিছুই প্রকাশ পাইতেছে না। নাট্যকার অকারণ কতগুলি উপমার বহর বৃদ্ধি করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে মধুসূদনের ব্যবহৃত 'ইরম্মদ' 'নিশার স্বপন' প্রভৃতি শব্দগুলিকে গাঁথিয়া তুলিতেছেন। কিন্তু তিনি ভুলিয়া যাইতেছেন যে, রচনার গৌরব কতকগুলি বাছা বাছা শব্দের যথেচ্ছ প্রয়োগে বৃদ্ধি হয় না, শব্দগুলিকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে যথা-প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে হয়।

কিন্তু ভাঙ্গা-অমিত্রাক্ষরের প্রয়োগে ব্রজমোহন অনেকখানি সার্থকতা দেখাইয়াছেন। যদিও নাটকে ভাঙ্গা-অমিত্রাক্ষরের প্রথম প্রয়োগকর্তা ব্রজমোহন তাঁহার ছন্দকে পরিমার্জিত বা দোষ-শূন্য করিতে সমর্থ হন নাই, বহুস্থানে ছন্দে আড়ষ্টতা রহিয়াছে, তবুও মাঝে মাঝে তিনি ইহার এমন সার্থক প্রয়োগ করিয়াছেন, যেমনটি গিরিশচন্দ্রের পূর্বে অনেকেই পারেন নাই। একটি উদাহরণ দিতেছি,—

"এ রণ-সাগরে ৬
কাণ্ডারী যখন তুমি জগৎ-জননী, ... ৮+৬
তখন কি আর ভয় মাগো? ... ... ৬+৪
এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড মাঝে, ... ৬+২
ভয়-নিবারিণী যবে দিলেন অভয়, ... ৮+৬
তখন কি ডরি আর সামান্য দানবে? ... ৪+৪+৬
প্রাণপণে করিব সমর। ... ... ৪+৬
যতক্ষণ আদ্যাশক্তির শক্তি রবে দেহে, ... ৪+৫+৬
ততক্ষণ দানবের ভীম-প্রহরণে ... ... ৪+৪+৬
হব না কাতর। ৬
ত্যজিব না রণভূমি। ... ... ৪+৪
দেখাব না পৃষ্ঠদেশ আজিকার রণে।" ... ৪+৪+৪+২

—দানব-বিজয়, ৪র্থ অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক

উদ্ধৃত অংশে 'তখন কি' এবং 'আদ্যা-শক্তির' এই শব্দ কয়টিতে দুঃশ্রাব্যত্ব-দোষ এবং 'আদ্যাশক্তির' শব্দটিতে মাত্রাধিক্যবশতঃ ছন্দঃপতন-দোষ ঘটিয়াছে। তাহা ছাড়া ভাবের বাহন হিসাবে ছন্দটি ত্রুটি-হীন। কালীপ্রসন্ন সিংহের লেখাটুকুর আলোচনা-প্রসঙ্গে ভাঙ্গা-অমিত্রাক্ষর ছন্দের যে বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়াছি তাহার সব কিছুই উদ্ধৃত অংশটিতে মিলিতেছে।

অধিকন্তু ছন্দের স্পন্দন বাড়িয়া যাওয়ায় ভাব স্বাধীনভাবে পদক্ষেপ করিতেছে। ছন্দঃস্পন্দনকে অবলম্বন করিয়া ভাবের এই মুক্তি ভাব-প্রধান পৌরাণিক নাটকের সৃষ্টি সম্ভব করিয়া তুলিল। সত্যকার নাটক হইল কি না হইল তাহা এখানে বিচার্য নহে। যে ভাষার অভাবে নাটক রচনা সম্ভব হইতেছিল না, সে ভাষা অন্ততঃ সৃষ্ট হইল। গিরিশচন্দ্র এই ভাষার উপর অঙ্গরাগ চড়াইয়াছেন মাত্র। তাই বলিয়া সেদিক দিয়া তাঁহার কৃতিত্বও কম নহে।

গিরিশচন্দ্রের ছন্দ ব্যবহারে কয়েকটি বিশিষ্টতা আমরা লক্ষ্য করি। ভাব যেখানে উচ্ছ্বসিত, বর্ণনায় যেখানে প্রয়োজন মনোহারিত্ব, গিরিশচন্দ্র সেখানে ছন্দকে স্পন্দিত করিয়া তুলিয়াছেন,—

'রাজবংশে একক নন্দন,
ছিল রত্ন-ধন,
আসিয়াছি প্রাণসমা প্রেয়সী ত্যজিয়া।'

'রাজ-বংশে একক নন্দন' দশ অক্ষরের এই চরণটির মধ্যে 'রাজ' ও 'একক' শব্দের পর আঘাত পড়িতেছে। সুতরাং মধুসূদনের ছন্দের যাহা বৈশিষ্ট্য তাহা এখানেও লক্ষিত হয়। কিন্তু তাহা হইলেও গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব এইটুকু যে তিনি ছন্দকে আরো স্পন্দিত করিতে পরিয়াছেন। একদিকে যেমন 'নন্দন' ও 'ধন' এর অন্ত্যানুপ্রাস ছন্দ-ঝঙ্কারকে মুখরিত করিয়া তুলিল, অন্যদিকে তেমনি প্রথম চরণ দশ অক্ষরের হওয়ায় সুরের যে প্রসার হইয়াছিল, পরের চরণ ছয়-অক্ষরের হওয়ায় তাহাকে মাত্রানুপাতিক ভাবে সংযত করিতে হইল। বক্তব্যের আবেগ-প্রাবল্যকে প্রথমতঃ ছাড়িয়া দিয়া দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে আবার টানিয়া ধরা হইল। কিন্তু ইহা ভাব ও ভাষাকে আরো উচ্ছ্বসিত করার জন্য মাত্র। আবার যেখানে তীব্র মর্মজ্বালা সংলাপে ব্যক্ত হয়, সেখানে লক্ষ্য করা যায় যে, চরণের পর চরণে অন্ত্যানুপ্রাস আসিয়া যাইতেছে। কিন্তু যাহাতে ক্রমানুসৃত অন্ত্যানুপ্রাসের ফলে ছন্দ একঘেয়ে হইয়া না যায়, তাহার জন্য হঠাৎ অন্ত্যানুপ্রাস বন্ধ করিয়া একটি চরণকে পর্যাপ্ত পরিমাণে লম্বিত করা হইতেছে। ঐ লম্বিত চরণের মধ্যে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত অবরুদ্ধ আবেগকে মুক্ত করিয়া দিই,—

"অপমান সভাতলে,
অপমান জয়দ্রথ-ছলে,
তিল না গণিনু,

আঁখি-বারি অঞ্চলে মুছিনু,
চলিলাম সিংহিনী সমান
মৃগরাজ পাছে পাছে।"

দ্বিতীয়তঃ প্রবল হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রকাশের ভাষায় তিনি প্রায়ই এমন চরণ ব্যবহার করেন যাহা লঘু ত্রিপদীর প্রথম চরণ রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, এবং ঐ ক্ষেত্রে উহা ত্রিপদীর গীতিঝঙ্কার ও ভাবমর্মিতা প্রাপ্ত হয়,—

"চিন্তামণি—কভু এলোকেশী
উলঙ্গিনী ধনী,
বরাভয়করা, ভক্ত-মনোহরা
শবোপরে নাচে বামা।"

অথবা

"পিতৃ-শ্রাদ্ধ দিনে, ধৈর্য নাহি প্রাণে,—
ঘোর নিশা, মহা-ঝঞ্ঝাবাতে
তরঙ্গের সনে রণ।"

শুধু ধ্বনি-মাধুর্যে নয়, ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশের পক্ষেও এ ভাষা কতখানি উপযোগী হইয়াছে তাহার উদাহরণ দিতেছি।—

"শ্রীকৃষ্ণ।—এস ভাই, এস বৃকোদর,
দণ্ডীরে এসেছ সঙ্গে লয়ে?
ভীম।—না জানি কি গুরু অপরাধে
বহু লজ্জা দিতেছ শ্রীহরি।
ত্রিভুবন অযশ গাহিবে,
দুর্যোধন সহায় হইলে
অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে হয় সাধ।
হে মুরারি!
তব পদ স্মরি করিয়াছি পণ
রণে দুর্যোধনে করিব নিধন
গদাঘাতে ভাঙ্গি উরু,
মরমে দহিয়ে তোমারে স্মরিয়ে
পাঞ্চালী খুলেছে বেণী,
যাক মম প্রতিজ্ঞা অতলে,

রহুক দ্রৌপদী এলোকেশী চিরদিন,
কুশলে কৌরব-কুল
রহুক হস্তিনাপুরে,
খেদ নাহি করি।
কিন্তু আশ্রিতে ত্যজিব,
এ কলঙ্ক অর্পিতে মাথায়
ইচ্ছা কি হে তব ইচ্ছাময় ?
সন্ধিহেতু আসি নাই চক্রধারি !"

পরম-বন্ধু, বিপদে আপদে একমাত্র আশ্রয়-স্থল, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আজ নিতান্ত আশ্রিতরক্ষণধর্মের অনুরোধে পাণ্ডবদের যুদ্ধ করিতে হইতেছে। সুতরাং ভীমের অন্তরে কর্তব্য ও বন্ধুত্বের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে। হঠাৎ কর্ণের সঙ্গে কুন্তীর নিভৃত আলাপে ভীমের মন আরো বিষাক্ত হইয়া উঠিল। তাহারই সৃষ্ট পরিস্থিতির জন্য আজ পাণ্ডব-মাতা হীন সূতপুত্রকে পাণ্ডব-পক্ষে যুদ্ধ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। অতএব ভীমের মনে দারুণ অভিমানের সৃষ্টি হইল। কিন্তু কাহার নিকট এই অভিমান প্রকাশ করা যায় ? তাই শ্রীকৃষ্ণের নিকট ভীমের আগমন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ জানেন না, কি হইয়াছে। তাই তিনি ভীমকে সরল ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ভীম দণ্ডীকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন কি না। এদিকে ভীমের রুদ্ধ অভিমান প্রথম বাক্যেই প্রকাশ হইয়া পড়িল। ভীম ভাবিয়াছিল শ্রীকৃষ্ণের নিকট বেশী কিছু কথা বলিবে না, অতি সরল ভাষায় সংক্ষেপে দ্বৈরথযুদ্ধের আহ্বানটি জানাইয়া দিবে। কিন্তু যে দণ্ডীকে ফিরাইয়া দিতে সে কিছুতেই রাজি নয়, তাহারই প্রশ্ন শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলে ভীমের অভিমান উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু মর্মজ্বালাকে কঠোর ভাবে সংযত রাখিয়াই ভীম উত্তর করিল,—'না জানি কি গুরু অপরাধে বহুলজ্জা দিতেছ শ্রীহরি।' কথাটি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ইহার মধ্যে ভালবাসা-মিশ্রিত অনুযোগ আছে, আর আছে অভিমান। অভিমানের ভাষা বক্তৃতা হয় না। তারপর নিজের অন্তর-বেদনা এতটুকু শ্রীকৃষ্ণের নিকট জানাইয়া ভীম মনকে ভারমুক্ত করিতে চাহে,—'দুর্যোধন সহায় হইলে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে হয় সাধ।' মনের কথা যখন শত্রুরূপে পরিণত বন্ধুর নিকট না বলিতে চাহিয়াও বলিয়া ফেলিতে হয়, তখন কিন্তু অভিমান

আরো বাড়িয়া যায়। আর সেই ব্যথাহত অভিমানের ভাষা হয় যতদূর সম্ভব উচ্ছ্বসিত,—

"হে মুরারি!
তব পদ স্মরি করিয়াছি পণ,—
রণে দুর্যোধনে করিব নিধন
গদাঘাতে ভাঙ্গি উরু।"

প্রথমে চার মাত্রায় ছোট সম্বোধন। তারপর সুর চড়িল,—বারো মাত্রা। সেই সুরের রেশ চলিল পরের বারো-অক্ষরাত্মক চরণে। কিন্তু তাহার পরেই আসিল বাক্যে সংযম, হঠাৎ চারিটি অক্ষর কমিয়া গেল। কিন্তু আবেগ থামিয়াও থামিল না, আরো প্রবল হইয়া দেখা দিল ত্রিপদীর ভঙ্গীতে,—

"মরমে দহিয়ে তোমারে স্মরিয়ে
পাঞ্চালী খুলেছে বেণী।"

ধীরে ধীরে উচ্ছ্বাস বন্ধ হইলে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, যুক্তিপ্রবণ পুরুষমনের জাগরণ হইল,—

"যাক্ মম প্রতিজ্ঞা অতলে,
রহুক দ্রৌপদী এলোকেশী চিরদিন,
কুশলে কৌরবকুল
রহুক হস্তিনাপুরে,"

এই ভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, এই ভাষা আন্দোলিত মনের বিক্ষোভ-মথিত নির্যাস। হৃদয়বৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাতে এভাষা কখনো উচ্ছ্বাস-তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়াছে, কখনো শান্তভাবে বহিয়া চলিয়াছে, জীবন-প্রবাহ কোনও সময়েই হারায় নাই।

গিরিশচন্দ্রের এই ভাষাই পরবর্তী কালের প্রায় প্রত্যেক পৌরাণিক নাট্যকার অনুসরণ করিয়াছেন। কেহ কেহ ঐতিহাসিক নাটকেও ইহার ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার কারণও আছে। ভাব-প্রবণতা ও সঙ্গীত-প্রীতি বাঙালীর মজ্জাগত। নয়টি রসের যে কোনটিরই প্রকাশের বেলায় বাঙালী একটু উচ্ছ্বাসের যোগান না দিয়া পারে না, তাহা সাম্য রসেরই হউক আর ভয়ানক রসেরই হউক। 'গৈরিশ' ছন্দে এই উচ্ছ্বাস থাকায় ইহা হৃদয়াবেগের উপযুক্ত বাহন হইল। পৌরাণিক নাটকে বৈচিত্র্যময় মানব-জীবনের বহু-বিচিত্র ভাবের তীব্র দ্বন্দ্ব নাই। সমস্যা-সঙ্কুল, অসমাধেয় দ্বন্দ্বময়

দার্শনিক জিজ্ঞাসা যাহাতে মানুষকে উন্মাদ করিয়া তোলে, শ্রুতি-স্মৃতির বিধি দ্বারা অনুশাসিত, অদৃষ্টবাদী, মহামানব, ভক্ত, সর্বজ্ঞ-ঋষির অনুসরণকারী, বিশ্বাসী বা আস্তিক ভারতবাসীর অন্তরকে তাহা কোনোদিন ব্যাকুল করিয়া তোলে নাই। তাই হ্যাম্‌লেটের "হওয়া-না-হওয়া"র জিজ্ঞাসা, ম্যাক্‌বেথের বিষাক্ত জীবন-দর্শন প্রভৃতি বাংলা নাটকে স্থান পায় নাই। সুতরাং গিরিশচন্দ্রের ছন্দ ঐ ভাব-রাজির প্রকাশের পক্ষে যোগ্য ছিল কি না তাহা বিচার করা কষ্ট। তাহা 'গৈরিশ' ছন্দে শেক্‌স্‌পীয়ারের অনুবাদ করিলেই বুঝা যাইবে। তবে প্রবল মনঃ-ক্ষোভ, উৎকট জিঘাংসা, ব্যাকুল স্নেহ, নিরাসক্ত নির্বেদ প্রভৃতি মানব-জীবনের বিভিন্ন ভাব অতি সুন্দর ভাবে 'গৈরিশ' ছন্দে রূপায়িত হইয়াছে।

'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকে ভীমের উক্তি ক্রোধ-মিশ্রিত প্রবল মর্মজ্বালার উদাহরণ,—

"উরুভঙ্গে কুঞ্চিত-বদন
ঊর্ধ্বদৃষ্টে চাহিবে যখন,
ধীরে ধীরে করিব চরণাঘাত!
গিরি চূর্ণ হয় যে প্রহারে,
সে চরণ না হানিব বলে।
কভু না বধিব,—
শৃগালে অর্পিব সেই ভার।
মনে পড়ে কীচকের ঘূর্ণিত নয়ন!
জীবিত থাকিতে খর নখে উৎপাড়িব।
ফাটে প্রাণ,—
যুধিষ্ঠির ভৃত্যাসনে!
নপুংসক গাণ্ডীবী ফাল্গুনি।
হায়! প্রাণের নকুল,
অরিকুল আকুল যাহারে হেরি,
পরাশ্রিত, অশ্ব-রজ্জু করে।

* * *

আরে দুর্যোধন! আরে দুঃশাসন!
আরে নরাধম সূত-সূত

বিরাট-শ্যালক।
কুক্ষণে-কুক্ষণে—
ভীমসেনে কুক্ষণে করিলি অরি!
কতদিন আর
কণ্টক-শয্যায় শোব।"

অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণার্জুন' নাটকে শকুনি পাশা-খেলায় জয় লাভ করিয়াছেন। এই কপট দ্যূতক্রীড়ার ফলেই যে ভবিষ্যতে কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধের সূচনা হইবে, বৃদ্ধ শকুনি তাহা জানেন। কৌরব-কারাগারে পিতা ও উনশত ভ্রাতার মৃত্যুর মর্মান্তিক দৃশ্য দেখিয়াও শুধু প্রতিশোধ লইবার জন্য শকুনি জীবিত রহিয়াছেন। শকুনির স্বগতোক্তি জ্বালাময়ী ভাষায় তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়,—

"ধীরে মেশে কাল অনন্তের কোলে।
কহ অন্তর্যামী!
কতদিন আর!…
আজো মনে পড়ে,
হস্তিনার রাজ-কারাগারে
বন্দী পিতা গান্ধার-ঈশ্বর,
সহ শত ভাই মোরা।
জরা-জীর্ণ দেহভারে
মৃত্যু দিল মুক্তি একে একে,
আমি শুধু রহিলাম প্রাণে
পিতৃ-সত্যে আবদ্ধ শকুনি
কুরুকুল ধ্বংস-ব্রত উদ্‌যাপন হেতু।
অস্থি তব পরিণত অক্ষের আকারে
অতি যত্নে রাখি বক্ষঃ-মাঝে
দধীচির অস্থি সম।
কহ পিতা, কহ,
কত দিনে এই বজ্রে
কুরু-চূড়া পড়িবে খসিয়া?
কত দিনে ঋণ-মুক্ত হব আমি?
কত দিনে শত-বিনিময়ে শত,

শত-ভাই দুর্যোধন লুটাবে ধরায় ?
কত দিনে শত-ক্ষুধিতের অন্ন-ঋণ
শোধিবে শকুনি একা ?"

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'নর-নারায়ণ' নাটক। মহাবীর কর্ণ জানেন যে তিনি সূত-পুত্র। তাই তিনি অনাত্মীয় অথচ যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী অর্জুনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া যখন কর্ণের জন্মরহস্য প্রকাশ করিয়া দেন, কর্ণের অন্তর তখন যে কতখানি ব্যাকুল হইয়া ওঠে, 'গৈরিশ' ছন্দে তাহা প্রকাশ পায়,—

"মনঃক্ষোভ ? হতেছে তোমার ?
কিরূপ সে প্রিয়তম ?
বল কৃষ্ণ, বল ভাই,
কিরূপ তীব্রতা তার ?
স্বর্গ-মূল্য-হীন করা উপহার—
ভ্রাতৃত্ব তোমার
লইতে অশক্ত আমি।
প্রতিযোদ্ধা-জ্ঞানে
এতকাল যার বধে
নিশিদিন করিয়াছি উপায়-কল্পনা,—
অদৃষ্টের তীব্র পরিহাস,
আজ সে আমার কৃষ্ণ কনিষ্ঠ সোদর।
দূর হতে যারে দেখে প্রমত্ত কামনা
ছুটিবে বাঁধিতে বক্ষে মুগ্ধ আলিঙ্গনে,
হে প্রিয়, হে প্রিয়তম,—
এক হস্ত বক্ষে দিয়া,
অন্য বাহু প্রসারিয়া,
বিঁধিতে হইবে মোরে মর্মহীন শরে
প্রাণাধিক সেই ধনঞ্জয়ে।
মর্ম চায় পরাজয়, সত্য চায় জয়,
মনুষ্যত্ব চায় নিষ্ঠুরতা।
বাসুদেব !

মর্ম-ভাঙ্গা-প্রীতি-পুষ্প অঞ্জলিতে ধরি',
শুনাতে আসিলে তুমি মনঃ-ক্ষোভ কথা!"

—নর-নারায়ণ, ২য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য

পূর্বোদ্ধৃত ভীম ও শকুনির উক্তিগুলির মধ্যে যে উচ্ছ্বাস-প্রবণতা ছিল, কর্ণের উক্তিতে তাহা নাই। ধূর্ত রাজনীতিবিদ্, কর্মী, কঠোর-প্রতিজ্ঞ, আত্ম-বিশ্বাসে অচলপ্রতিষ্ঠ কর্ণের অন্তরে কর্মহীন উচ্ছ্বাসের স্থান কোথায়? সমস্ত জীবনের ঘটনাই উলট-পালট হইয়া গেল, অথচ কর্ণ কত সংযত।

পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের 'ধর্মপথ' নাটকের নায়ক ব্রাহ্মণ কালাচাঁদ কর্তব্যাকর্তব্যের দ্বন্দ্বে পড়িয়া আত্মহারা হইতেছেন, সত্যাসত্য নির্ধারণ করিতে না পারিয়া তিনি তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে পড়িয়াছেন। ধর্মরক্ষা করিবেন, না নবাব-নন্দিনীকে বিবাহ করিয়া প্রেমের মর্যাদা রক্ষা করিবেন? বিশ্বাস, শাস্ত্র প্রভৃতি তো এই সমস্যা হইতে মুক্তিলাভ করিবার সাহায্য করিতেছে না! তাই তাঁহার জিজ্ঞাসা,—

"ধর্ম, রুচি, সংস্কার
তিন যেন হলো একাকার।
অনাচারে অধর্ম অপার
পুনঃ তায় ধর্ম-আবিষ্কার!
পাপে কেন পুণ্যের সঞ্চার?
অনলেতে শৈত্যের কল্পনা?
মৃত্যু-পাশে মৃত্যু-সঞ্জীবনী?
উন্মাদ-কল্পনা ইহা,—চিত্তের বিকার!···
ঐতো নেহারি পুনঃ সম্মুখে আমার
মলিনা কনক-লতা ধূলিধূসরিতা
মরণ-পথের যাত্রী সংস্কার-বশে!
এইতো রয়েছি আমি
মরণের আশা-পথ চেয়ে!
সংস্কার-তমোরাশি সম্মুখে আমার,···
কে করিবে পার?
জ্ঞানহারা, দিশেহারা আমি ভাগ্যহীন,···
কে আছ আমার,

ধর্মপথ দেখাও আমারে।
যে-হও সে-হও, আল্লা কি ঈশ্বর,
জগতের সৃষ্টিকর্তা যেবা,
খুলে দাও জ্ঞানের নয়ন
নির্ণিবারে সত্য ধর্ম-পথ।"

আর উদাহরণের মহাভারত সঙ্কলন করিব না। মধুসূদনের কাব্যগুলি কোনদিন নিম্নশ্রেণীর হইলেও হইতে পারে। কিন্তু কালজয়ী হইয়া বাঁচিয়া থাকিবে তাঁহার ছন্দ। তেমনি ঘটনা ও চরিত্র সৃষ্টির দিক দিয়া গিরিশচন্দ্র হয়তো একখানাও সার্থক নাটক রচনা করিতে পারেন নাই; কিন্তু যতদিন বাংলা নাট্য-সাহিত্য থাকিবে এবং ভক্তিপূর্ণ পৌরাণিক নাটক রচনার প্রয়োজন থাকিবে, ততদিন গিরিশচন্দ্রের ছন্দের মূল্য কমিবে না।*

রঙ্গমঞ্চের তাগিদে গিরিশচন্দ্র বহু নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কয়েকখানি মাত্র সুপ্রতিভার পরিচয় বহন করে। সুতরাং তাঁহার সব কয়খানি নাটকের আলোচনা না করিয়া কয়েকখানির সমালোচনা মাত্র করিব। আর একটা কথা,—গিরিশচন্দ্রের নাট্য-প্রতিভার ক্রমবিকাশ নির্ণয়ের জন্য তাঁহার রচনার কালানুক্রমিক স্তর-বিভাগ সম্ভব নয়। কারণ তাঁহার সর্বশেষ রচনা 'তপোবল' নাট্যাংশে পূর্ববর্তী সৃষ্টি 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', 'পাণ্ডব-গৌরব' প্রভৃতি হইতে অনেক নিকৃষ্ট। তবে তাঁহার রচনার মধ্যে ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকগুলি হইতে পৌরাণিক ও ধর্মমূলক নাটকগুলি উন্নততর।

সামাজিক নাটক সংজ্ঞাটিকে আমরা অনেকখানি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করি। পারিবারিক ও সামাজিক নাটকের মধ্যে যে বেশ কিছুটা প্রভেদ আছে আমরা তাহা ভুলিয়া যাই। প্রত্যক্ষে হউক আর পরোক্ষেই হউক, সমাজই নাট্যকাহিনীর মূল সূত্র ধরিয়া রাখে। সামাজিক নাটকে এই সামাজিক প্রভাব দুই রকমের হইতে পারে। সুস্থ স্বাভাবিক সমাজ-জীবনের মধ্যে অনেক সময় নাটকীয় পরিবেশ গড়িয়া ওঠে। সেখানে দ্বন্দ্ব-বিরোধহীন সমাজের মধ্যে ব্যক্তি-জীবন রস আহরণ করিয়া বিকশিত হয়। সমাজের

* মোহিতলালের মতে 'গৈরিশ' ছন্দ "গিরিশচন্দ্রের মিলহীন doggerel."—কবি শ্রীমধুসূদন, ২য় খণ্ড, ১ম অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৮৫

এই শ্রদ্ধাহীন উক্তিটি সমর্থনযোগ্য নহে।

প্রভাব সেখানে মাধ্যাকর্ষণের মতো অননুভূত বা অপ্রত্যক্ষ হইলেও ব্যক্তি-জীবন তাহা মানিয়া লয়, নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কর্মাকর্ম উহার সঙ্গে যুক্ত করে। রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' বা 'গোড়ায় গলদ' এই ধরনের সামাজিক নাটক। সমাজের আকর্ষণে চিরকুমার-ব্রত ভঙ্গ হইয়াছে, সমাজের তাগিতেই গোড়ায় গলদের পাত্র-পাত্রীরা নানারূপে আকর্ষণ-বিকর্ষণের তির্যগ্-পথে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। সমাজ এখানে প্রবল নয়, অভিভবশীল নয়, ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করে না। তথাপি তাহার প্রবাহিত বায়ু-হিল্লোলেই ব্যক্তি-জীবন পরিণতি লাভ করে।

দ্বিতীয় প্রকার নাটকে সমাজ ব্যক্তি-জীবনের বিকাশের পথে প্রবল অন্তরায়। তাহার শাসনে নিপীড়িত ব্যক্তি-সত্তা বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। আপন প্রচেষ্টায় পরিবেশকে আয়ত্তে আনিয়া সে সমাজ-শাসনকে অস্বীকার করে,—সমাজের উপর ব্যক্তিই করে জয়লাভ। অথবা নিজের সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও ব্যক্তি পরাজিত হইয়া ভগ্ন-মনোরথে সমাজের দুর্লঙ্ঘ্য নীতির নিকট বলির পাঁঠার মতো আত্মসমর্পণ করে। সমাজের এই বাধার মূর্তিটি কোনো কোনো সময় বৃহত্তর পরিবেশে সমাজের বিভিন্ন স্তরের নর-নারীর চিন্তা ও কর্মের মধ্য দিয়া বিশেষ স্পষ্ট হইয়াই দেখা দেয়। শরৎচন্দ্রের 'রমা' এই স্তরের সামাজিক নাটক। আবার অনেক নাটকে বাধা শক্ত হইলেও তাহা প্রত্যক্ষ নয়,—অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো তাহার প্রবাহ। বাহির হইতে দেখিলে মনে হইবে, উহা পারিবারিক নাটক। একটি বা দুইটি পরিবারের সুখ-দুঃখের কাহিনী লইয়া উহা রচিত। শরৎচন্দ্রের 'বিজয়া' এই শ্রেণীর। তিন বন্ধুর প্রতিজ্ঞা হইতেই নাট্যকাহিনীর প্রধান সূত্রের উৎপত্তি। নরেন্দ্রের প্রতি বিজয়ার প্রেম নারীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ বরণের স্বাভাবিক আকর্ষণ। উভয়ের মেলা-মেশা এবং আলাপ-ব্যবহারের মধুরতা ইহাকে প্রবল করিয়াছে মাত্র। বিলাসবিহারীর যৌন-ঈর্ষ্যা এবং রাসবিহারীর বিষয়-লিপ্সা ঐ পরিস্থিতিকে জটিল করিয়াছে। ইহার ভিতর সমাজ কোথায়? কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ ও হিন্দু-সমাজের অপ্রত্যক্ষ বিরোধই এই নাটকীয় ঘটনার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের মূল কারণ। বিজয়া যে নরেনকে ভালবাসিয়াও তাহা দৃপ্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে পারে নাই, তাহার কারণ অন্তরের অবচেতন-স্তরে প্রবাহিত ব্রাহ্ম-প্রভাব। বিলাসবিহারীকে অন্তর দিয়া ভাল না বাসিলেও বা তাহার প্রতি ঘৃণা ও বিরক্তির ভাব পোষণ করিলেও বিজয়া শেষপর্যন্ত

তাহাকেই বিবাহ করিতে সম্মত হইল। তাহার মনে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব দৃঢ় না হইলে তাহা কিছুতেই সম্ভব হইত না। ইহা সমাজের নিকট ব্যক্তির স্বেচ্ছাকৃত আত্মসমর্পণ। রাসবিহারীর কঠোর অভিভাবকত্বের পিছনে বিষয়-লিপ্সার তুলনায় সাম্প্রদায়িকতা যে এতটুকু কম ছিল না, তাহা বুঝিতে পারি, যখন তিনি দয়ালকে নিঃসহায়ের মতো প্রশ্ন করেন, বিবাহটা কি শেষপর্যন্ত হিন্দু মতে হইল ?

সমাজের এই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব যে নাটকে নাই, পারিবারিক স্বার্থ-সঙ্ঘাত, সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব প্রভৃতিই যাহার মূল উপজীব্য, তাহাকে সামাজিক নাটক না বলিয়া পারিবারিক নাটক বলাই ভাল। এই অর্থে গিরিশচন্দ্রের কয়েকখানি নাটক পারিবারিক আর কয়েকখানি সামাজিক।

হিন্দু সমাজের দুইটি চিরন্তন করুণ সমস্যা লইয়া গিরিশচন্দ্র দুইখানি নাটক রচনা করেন। 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকের অবলম্বন বাল-বিধবার ত্রিধা-বিভক্ত সমস্যা। অল্পবয়স্কা বিধবা কন্যা যে কঠোর সংযম অবলম্বন করে, করুণ-হৃদয় মাতা-পিতা ও শ্বশুর-শাশুড়ীর চক্ষে তাহা এক মর্মভেদী দৃশ্য। তাহারা ইহা সহ্য করিতেও পারে না, সমাজের এই কঠোর বিধান হইতে কন্যা বা বধূকে অব্যাহতিও দিতে পারে না। অনেক বিধবা স্বেচ্ছায় অথবা দুষ্ট পুরুষের প্রলোভনে পড়িয়া পদস্খলিত হয়। সমাজ তাহাদের অন্তরের অবরুদ্ধ কামনা-বাসনার দিকে তাকায় না। তাহাদিগকে কলঙ্কিনী, কুলত্যাগিনী বলিয়া নির্যাতিত করে। দুষ্ট নর-পশুরা নিজেদের ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য সরলা বিধবা বালিকাকে কুলের বাহির করিয়া আনে। তারপর অচিরেই কাম-বাসনা চরিতার্থ হইয়া গেলে তাহাদিগকে নির্দয়ভাবে তাড়াইয়া দেয়। কেহ অনুশোচনায় আত্মহত্যা করে, কেহ গণিকালয়ে পতিতা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিতাবস্থায় মৃত হইয়া থাকে। ইহাদের প্রতি করুণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যদি বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন করা যায়, তাহারও বিপদ কম নহে। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যাইবে, হয় দুশ্চরিত্র, নয় বৃদ্ধ অথবা নির্ধন, অথবা যুগপৎ এই তিন দোষ-যুক্ত ব্যক্তিই বিধবাকে বিবাহ করিতে সম্মত হয়। সে বিবাহ বিবাহ নয়,—বলি। আরো একটি গূঢ় মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা আছে। হিন্দু নারী একদিনের জন্যও যাহাকে স্বামী বলিয়া জানিয়াছে, তাহার স্মৃতি সে ভুলিতে পারে না। স্বামী ভিন্ন অন্য

পুরুষকে সে অন্তরে স্থান দিতে পারে না। অন্য পুরুষকে স্পর্শ করিবার সময় তাহার সমস্ত সত্তাই যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সুতরাং বিধবাবিবাহের মধ্য দিয়া কন্যাকে সুখের সংসার করিতে দেওয়া হয়, না তাহাকে বিগত স্বামী ও বর্তমান স্বামীর প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণের তীব্র আন্দোলনের ভিতর ফেলিয়া দিয়া সত্যকার দ্বি-চারিণী বা দুই পুরুষে পর্যায়-ক্রমে অব্যবস্থিত চিত্তে বিচারিণী করিয়া তোলা হয়? দাম্পত্য-জীবনের শান্তি, সমাজ-জীবনের সুপ্রজনন-নীতি প্রভৃতির দিক দিয়া বিধবা-বিবাহ আদৌ সু-ফলপ্রদ কি না তাহাও বিশেষ বিবেচনার বিষয়।

গিরিশচন্দ্রের মনে এই সকল প্রশ্নই জাগিয়াছিল। 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকে তিনি নিজের বিবেচনা মতে তাহারই উত্তর দিয়াছেন।

'বলিদান' নাটকের বিষয়-বস্তু পণ-প্রথা। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার সর্বস্বান্ত হইয়াও নিস্তার নাই। পাত্রের পিতা কসাইয়ের মতো তাহাকে হত্যা করিবে। ইহার পর একাধিক কন্যা হইলে, দায় ঠেকিয়া কোনো কোনোটিকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষে বিবাহ দিতে হয়। পণ বা দান-সামগ্রী কম পড়িলে নববধূকে শ্বশুরবাড়ির চাকর-চাকরানীরও পর্যন্ত কথা শুনিতে হয়। তাহার ভাগ্যে নির্যাতনের অভাব নাই। অনেক সময় গহনা-পত্র রাখিয়া দিয়া কন্যাটিকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। পিত্রালয়েও ভ্রাতৃবধূ ইত্যাদির নির্যাতনে হতভাগিনীর জীবন দুর্বহ হইয়া ওঠে।

'হারানিধি' নাটককে ঠিক এই অর্থে সামাজিক বলিব না। কেন না, সমাজের কোনো দুরপনেয় সমস্যা এই নাটকের বিষয়-বস্তু নহে। বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতাই ইহার অবলম্বন। তাই বলিয়া ইহা পারিবারিক নাটকও নহে। কারণ, যদিও এই নাটকের অবলম্বন মুখ্যতঃ দুইটি পরিবার, তবুও সমস্ত সমাজ পট-ভূমিকা হিসাবে ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে। উনবিংশ শতকের কলিকাতা ইহার সংযোগ-স্থল। তৎকালীন ধনী সম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খলতা, অর্থলিপ্সা, প্রতারণা, জাল জুয়াচুরি, শিক্ষিত, অর্থশালী জমিদার-পুত্রের বারাঙ্গনাসক্তি প্রভৃতি ইহার নাট্যকাহিনী ও চরিত্রগুলিকে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। মোহিনী যে প্রতারণা করিয়া বন্ধুর সর্বনাশ করিতেছে তাহা শুধু নিজের চরিত্রের দোষেই নয়। আপন যুগের তথাকথিত ধনীরাই তাহার এই আচরণের প্রেরণা যোগাইয়াছে; উহাই ছিল তখন সমাজে এক শ্রেণীর লোকের বড় হওয়ার, খ্যাতি-লাভ করার আদর্শ।

"ক্রোর টাকার সম্পত্তি কি অমনি হয়? গ্রাম জ্বালিয়ে প্রজা শাসন করিতে হয়, গচ্ছিত ধন ফাঁকি দিতে হয়; নাতোয়ানের বিষয় কেড়ে নিতে হয়, তবে বড়লোক হয়। বিষয় হলে লাঠির আগায় বিষয় রক্ষা করতে হয়।...তুমি মনে কর আমি মেয়ের হাতে টাকা দিয়ে গরীবের বাড়ী পাঠাই, দয়া শেখাতে? তা নয়—খবরের কাগজে লিখ্‌বে যে মোহিনী বাবু সদাশয়, তাঁর কন্যা দীন-দুঃখীর বাড়ী বাড়ী গে, যার অন্ন নেই তারে অন্ন দেয়, যার বস্ত্র নেই তারে বস্ত্র দেয়, দশটা বাড়িয়ে লেখে, এ খুন, দাগাবাজী, ঘর-জ্বালানোর হজ্‌মি গুলি।"

—হারানিধি, ১ম অঙ্ক, ৬ষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

সুতরাং এই নাটকের মূলেও সমাজ-শক্তির অদম্য প্রভাব বর্তমান। ইহা বিশেষ দেশের, বিশেষ কালের, বিশেষ সমাজের শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

কিন্তু 'প্রফুল্ল' ও 'গৃহলক্ষ্মী' নাটক দুইখানির মূল প্রেরণা এক। বিষয়-বস্তু ও মূল তত্ত্ব অভিন্ন নহে। 'প্রফুল্ল' নাটকে প্রতারক ভাই অন্য দুই ভাইয়ের সম্পত্তি হরণের জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে, 'গৃহলক্ষ্মী'তে ভ্রাতুষ্পুত্রের ষড়যন্ত্র পিতৃব্যের বিরুদ্ধে। 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশের 'সাজানো বাগান' শুকাইতে লাগিল, গৃহলক্ষ্মীতে উপেন্দ্রনাথের সংসারে আগুন লাগিল। 'প্রফুল্ল' নাটকের নামকরণ রমেশের স্ত্রী প্রফুল্লের নামে, আর 'গৃহলক্ষ্মী'র অবলম্বন উপেন্দ্র-নাথের বিধবা জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ 'বিরজা'। 'প্রফুল্ল' নাটকের ষড়যন্ত্রের প্রধান আড্ডাখানা জগমণির বাড়ি, 'গৃহলক্ষ্মী'র বারাঙ্গনা কুমুদিনীর গৃহ। এক কথায় 'গৃহলক্ষ্মী' 'প্রফুল্ল' নাটকের ছায়া। আর এই দুইখানি নাটকই পারিবারিক বিষাদান্ত নাটক।

গিরিশচন্দ্রের পূর্বে আরো দুইজন শক্তিমান নাট্যকার সামাজিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহারা দীনবন্ধু মিত্র ও মনোমোহন বসু। দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'র অভিনয় প্রসঙ্গে রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব। নিম্ন শ্রেণীর উনপাজুরে বদ্‌মায়েস চরিত্রসৃষ্টির আদর্শ গিরিশচন্দ্র গ্রহণ করিয়াছিলেন দীনবন্ধুর নিকট হইতে। দীনবন্ধুর সৃষ্ট পতিত, মদ্যপ ব্যক্তিদেরও মাঝে মাঝে দিব্যজ্ঞানের উদয় হইত। স্বগতোক্তিতে তাহাদের মর্মজ্বালা মাঝে মাঝে প্রকাশ পাইত। কেহ কেহবা ঠেকিয়া চৈতন্য লাভ করিত। গিরিশচন্দ্রের নাটকেও নিম্নশ্রেণীর চরিত্রের এইরূপ বিবর্তন বহুবার ঘটিয়াছে ইহা গিরিশচন্দ্রের উপর দীনবন্ধুর প্রত্যক্ষ প্রভাব। শিক্ষিত, মাতাল নিমচাঁদ

মদের আড্ডায় মেশে, শ্বশুরের অন্ন ধ্বংস করে, কুলবতী স্ত্রীকেও ঘরের বাহির করিয়া আনিয়া অপমান করে। কিন্তু এমন কর্ম আছে যাহা সে-ও করিতে পারে না। অটল নিমচাঁদের খুড়-শাশুড়ীকে ধরিয়া বৈঠকখানায় আনিবার প্রস্তাব করিলে নিমচাঁদ তাহা অস্বীকার করিল। মাঝে মাঝে নিজের শোচনীয় অবস্থা সে উপলব্ধি করিয়াছে। দীনবন্ধুর প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বৈঠকখানায় নিজের স্ত্রীকে আনীত দেখিয়া অটল কু-সঙ্গ ত্যাগের প্রতিজ্ঞা করিল। গিরিশচন্দ্রের 'হারানিধি' নাটকের অঘোর-চরিত্রের উপর এই দিক দিয়া দীনবন্ধুর প্রভাব পড়িয়াছে। অঘোর শয়তান, প্রতারক, চরিত্রহীন। কিন্তু তাহার মধ্যেও অনেকখানি মনুষ্যত্ববোধ আছে। মাঝে মাঝে তাহার বিবেক জাগ্রত হয়,—

> "বাবা ভদ্রলোকের ছেলে দারোয়ানের বাক্স ভাঙ্গি, ক্যাসবাক্স রাহাজানি করি, অন্ধ নাচার সেজে প্যাঁচার মতো গা-ঢাকা দিয়ে বেড়াই? সেয়ানা হলেম? না হয় এণ্ট্রান্স্ ফেল হয়েছিলেম ফের একজামিন্ দিলে হতো, না হয় চাকরী করলে হতো, তা নয়—'অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ।' সাত ঘাটের পানি খেয়ে বেড়াচ্ছি, কোন ব্যাটা চিন্‌তে পারলে সোনা তাঁবা হয়ে যাবে! সেয়ানা হলে কি বাবা দুর্গতি হয়?"

এই ধরনের চরিত্র মনোমোহনের নাটকেও অনেক মেলে। মনোমোহনের 'প্রণয়-পরীক্ষা' নাটকের নটবর মূর্খ, মদ্যপ, এবং কু-সঙ্গী। সে ইতর জনের মতো অমার্জিত ভাষায় তামাসা করে। কিন্তু সে যাহা সত্য সত্য অন্যায় বলিয়া উপলব্ধি করে, তাহার প্রতিকার করিতে নাছোড়-বান্দা হইয়া লাগে। সুকৌশলে অন্যকে প্রতারিত করিবার ক্ষমতাও তাহার অদ্ভুত। সে জানে কাজলা সরলার অমঙ্গলের মূল। তাহার জন্য দাসীচাকরানীদের দুর্দশা। অমনি তাহার উপস্থিত বুদ্ধি জুটিয়া যায়। ভিক্ষুককে কাজলার পূর্বজন্মের পুত্র সাজাইয়া তাহার দ্বারা উঁচুডালের বেল প্রার্থনা করাইল। তারপর মই সরাইয়া লইয়া বাঁশ দিয়া তাহাকে তাড়না করিল। আবার স্ত্রীর সেবা-কৌশলে (অবশ্য কিরূপ সেবা-কৌশল নাট্যকার তাহা স্পষ্ট করেন নাই) নাটকের শেষে নটবরের পরিবর্তন আসিল। অঘোর ভবঘুরে, অশিক্ষিত নয়,—অল্প-শিক্ষিত। জীবন-ধারণের জন্য হাতুড়ে ডাক্তার সাজা হইতে আরম্ভ করিয়া ভদ্রবেশী প্রতারণা যাহা যাহা হইতে পারে, সকলই সে করিয়াছে। শেষ-পর্যন্ত ইতর পরিবেশে নামিতে বাধ্য হইয়াছে। নটবরের মতো উপস্থিত-বুদ্ধি

তাহার আছে। তবে তাহার বিদ্যা-বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা প্রভৃতির জন্য উহা আরো একটু কৌশল-পূর্ণ। দারওয়ানের বাক্স হইতে টাকাচুরি [হারানিধি, ১ম অঙ্ক, ৫ম গর্ভাঙ্ক] ইহার উদাহরণ। আবার স্ত্রীর সতীত্বের আদর্শে মুগ্ধ হইয়া অঘোর শেষকালে পরিবর্তিত দেবতা হইয়া গেল।

গিরিশচন্দ্রের নাটকে প্রায়ই মামলা-মকদ্দমা, ষড়যন্ত্র, হত্যা, জাল-জুয়াচুরি দেখা যায়। দুর্বৃত্ত নিজের দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য বিধবা অথবা কুলবধূকে বাহির করিয়া আনে। তারপর একদিন নির্মমভাবে তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। নির্যাতিতা, অপমানিতা অনাথা আত্মহত্যা করিতে গিয়া প্রতিশোধ লইবার বাসনায় বদ্ধপরিকর হইয়া ফিরিয়া আসে। পরে সে হয় অনাথ-আতুর, নিপীড়িতার পালনকারিণী। মনোমোহনের 'আনন্দময়' নাটকেও এই ধরনের চরিত্র-চিত্রণ ও ঘটনা-বিন্যাসের পরিচয় পাই। গিরিশ-চন্দ্র বিভিন্ন নাটকে উহাই একটু পুষ্পিত করিয়া রূপায়িত করিয়াছেন। সুতরাং মনোমোহনের প্রভাব গিরিশচন্দ্রের উপর কম নহে।

শুধু বিষয়-বস্তুর নির্বাচনে নয়, নাট্য-রূপায়ণেও গিরিশচন্দ্রের রচনার সহিত মনোমোহনের রচনার সাদৃশ্য আছে। তবে প্রকৃতপক্ষে উহা যাত্রার প্রভাব; মধু-দীনবন্ধুর মধ্য দিয়া মনোমোহনের এবং গিরিশচন্দ্রের উপর নামিয়া আসিয়াছে মাত্র। মনোমোহনের মতো গিরিশচন্দ্রের নাটকেও দেখা যায়, শোক-দুঃখের করুণ পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য স্থলে সঙ্গীত এবং প্রায়ই দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা রহিয়াছে। উহা গিরিশচন্দ্রের নাটককেও যাত্রা করিয়া দিয়াছে। দুই একটি উদাহরণ দিতেছি। ['হারানিধি' নাটক, ২য় অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক।] হাওড়ার পুলের ধারে গঙ্গায় ডুবিয়া মরিবার জন্য কাদম্বিনী আসিয়া হাজির হইয়াছে। জনাকীর্ণ কলিকাতা। ধরিলাম রাত্রিকালে গঙ্গাতীর এবং গঙ্গাবক্ষ নীরব। আত্মহত্যা আর দুই-চারিজনকে জানাইয়া করা যায় না। কিন্তু যাত্রায় এতবড় একটা করুণ পরিস্থিতিতে একখানা গান অবশ্যই থাকে। যাত্রার কান-ওয়ালা বাঙালী দর্শক এখানে গান না হইলে চক্ষের জল ফেলিবে কি করিয়া? গিরিশচন্দ্র কাদম্বিনীর মুখে একখানা নয় দুইখানা গানই দিয়া দিলেন। তারপর 'হারানিধি' নাটকে হরিশের, 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশের এবং 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকে পার্বতী-প্রসন্নের বিষাদময়ী উক্তিগুলি যাত্রার মতো দীর্ঘ ও কারুণ্য-পূর্ণ। 'শাস্তি কি শান্তি'র ভুবন ও প্রকাশের প্রেম-নিবেদনের ভাষায় যাত্রার দৈর্ঘ্য ও কর্মহীন উচ্ছ্বাস অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ

পাইয়াছে। সুতরাং গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলি নাট্যীকৃত যাত্রা। 'নাট্যীকৃত' বলার অর্থ এই যে, যাত্রার এই প্রভাব স্বীকার করিয়া লইয়াও গিরিশচন্দ্র অনেক সময় সুন্দর নাট্যকাহিনী ও চরিত্র সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। তিনি যে সব সময় সর্বাঙ্গ-সুন্দর চরিত্র-চিত্রণ করিতে পারিয়াছেন, তাহা নহে। তবে তাঁহার পূর্বে এতটুকু সার্থক চরিত্রও অনেকে সৃষ্টি করিতে পারেন নাই এবং নিজেদের নাট্যকাহিনীকে বাঙালীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাল-লাগা, মন্দ-লাগার বস্তু করিয়া তুলিতেও পারেন নাই। সংলাপের মধ্য দিয়া বাঙালী-চিত্তের সঙ্গে এমন নিবিড় যোগ ইহার আগে কেহই স্থাপন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। অনেক ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের নাটকে বাস্তবতাই প্রধান আকর্ষণ। যেখানে আঘাত করিলে বাঙালীর অন্তরে তখনই তাহার প্রতি-ক্রিয়া হইবে, যে কথায় বাংলার বধূর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে, গিরিশচন্দ্র তাহা জানিতেন। যাত্রার প্রভাবে উহার প্রকাশে একটু আতিশয্য থাকিলেও তিনি কিন্তু সেই মর্মের কথাই প্রকাশ করিয়াছেন। আর ইহা যেখানে যেখানে পারিয়াছেন, সেখানে তিনি সার্থক। সেখানে তিনি রস-স্রষ্টা। ইহার সঙ্গে মাঝে মাঝে চরিত্র-চিত্রণও হইয়াছে সুন্দর। পারিপার্শ্বিক জগৎ ও জীবনের সাড়ায় চরিত্রের স্বতঃস্ফূর্ত ক্রমবিকাশ কি করিয়া হয়, গিরিশচন্দ্র তাহা অনেক জায়গায় দেখাইয়াছেন। তিনি যত সুন্দর করিয়া দেখাইয়াছেন তেমন আর কেহ পারেন নাই। তাই নাট্যকার গিরিশচন্দ্র বাঙালী-জীবনের মহাকবি।

কয়েকখানি নাটকের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া উপরি-লিখিত উক্তির সমর্থন করিতেছি।

'শাস্তি কি শাস্তি'—বাঙালী ঘরের বাল-বিধবার ত্রিবিধ সমস্যা-পূর্ণ জীবনই এই নাটকের বিষয়-বস্তু। তিনটি বিধবা বালিকার জীবনের মধ্য দিয়া সেই সমস্যার রূপ দেওয়া হইয়াছে। আর ঘটনাটি ঘটিয়াছে একই সংসারে; নির্মলা প্রসন্নকুমারের পুত্রবধূ, ভুবনমোহিনী ও প্রমদা তাহার

মহাকবি গিরিশচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের লব্ধযশা নাট্যকার। তাই বলিয়া তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাই ভাল বলিতে পারি না। কারণ সমালোচনা স্তাবকতা নহে,—দোষ-গুণের সম্যক বিচার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গিরিশচন্দ্র বক্তৃতা' দান করিতে আসিয়া কেহ 'কবিপ্রতি' 'শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রীতি' সমর্পণ করিয়া 'দীন-ভক্তের প্রণতি' জানাইয়াছেন [গিরিশচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ বসু], কেহ বা তাঁহার 'মত ব্যক্তি যে, এই সুযোগে গিরিশচন্দ্রের নিকট' তাঁহার 'অপরিশোধ্য ঋণ প্রকাশ করিতে' পারিবেন 'এই আশায়' 'উক্তপদ গ্রহণ' করিয়াছিলেন [গিরিশচন্দ্র, শ্রীকুমুদবন্ধু সেন, ভূমিকা ।৵০ পৃষ্ঠা], আবার কাহারও কাছে 'গিরিশচন্দ্র...শুধু

দুইটি কন্যা। নির্মলা বিধবার সনাতন ব্রহ্মচর্যের বিধান মানিয়া লইল। তাহার জীবন তাই দ্বন্দ্বহীন, শান্ত এবং দেবোপম। ভুবনমোহিনী নিজেকে সংযত রাখিতে পারিল না। বিধবার আচার-নিষ্ঠাও তাহার ছিল না। প্রকাশের সহিত অবাধ মেলা-মেশার ভিতর দিয়া সে ধীরে ধীরে পাপের শেষ স্তরে অবতরণ করিল। তাহার জীবনকে অবলম্বন করিয়াই তাহার মাতা-পিতার শান্তি ব্যাহত হইয়াছে; সংসারে আগুন জ্বলিয়াছে। তাহার উপর অভিমানেই তাহার পিতা বিধবা প্রমদার পুনরায় বিবাহ দিতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু প্রমদার জীবনও সুখের হইল না। সমস্ত আয়োজন মিলিয়া এক বিষাদময়ী পরিস্থিতি সৃষ্টি করিল।

মহাকবি নহেন,' 'তাঁহাকে...সাহিত্যগুরু ভাবিয়া' তিনি 'নিজেকে...চিরদিনই ধন্য' মনে করেন [গিরিশ নাট্য-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়, ভূমিকা।৵৹ পৃষ্ঠা]। ইঁহারা শ্রদ্ধাবশে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা গিরিশ-প্রশস্তি হইলেও সমালোচনা বা সম্যক আলোচনা হয় নাই। আর এই সকল সমালোচনার প্রভাবেই হউক বা অন্য কোনো কারণেই হউক, গিরিশচন্দ্রের উপর একটি অন্ধ শ্রদ্ধার ভাব আমাদের দেশের অনেকের মধ্যে দেখিতে পাই। যাঁহারা সাহিত্য-রসবেত্তা বলিয়া নিজেদের মনে করেন, তাঁহাদের অনেকের মধ্যেও। মহাকবির প্রতি আমাদেরও শ্রদ্ধা কম নহে। আমরাও তাঁহার রচনায় যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচয় পাইয়াছি। কিন্তু সেইজন্য তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার সকলই অনবদ্য এমন কথা বলিতে পারি না। কারণ সত্য গিরিশ-চন্দ্রের চেয়েও অনেক বড়। তাই সত্যের খাতিরে অনেক জায়গায় গিরিশচন্দ্রের দোষ-ত্রুটিও দেখাইতে হইয়াছে। অনেকের সঙ্গে আলাপ করিয়া দেখিয়াছি, তাঁহারা মনে করেন, গিরিশ-চন্দ্র শেক্‌স্‌পীয়ারের চেয়েও বড় নাট্যকার। এই গোষ্ঠীর একজন বৃদ্ধ অধ্যাপক একবার বর্তমান গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পড়িয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন, 'গান তো শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকেও আছে। শোকের সময়ে বা আসন্ন সর্বনাশের মুহূর্তে শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকের পাত্র-পাত্রীও তো সঙ্গীতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং গিরিশচন্দ্রের দোষটা কি হইল?'

হাঁ, গুরু-গম্ভীর, বিষাদময়ী পরিস্থিতিতে গানের ব্যবহার শেক্‌স্‌পীয়ারও করিয়াছেন। কারণ হৃদয়ের অসহ্য বেদনায় গুরুভার পাত্র-পাত্রীগণ সেখানে গানের মধ্য দিয়া স্বাভাবিকভাবেই লাঘব করিতে চাহিয়াছে। প্রমাণ স্বরূপ Henry VIII নাটকের ৩য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্যের এবং জুলিয়াস সিজার-এর ৪র্থ অঙ্ক, ৩য় দৃশ্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। অবশ্য Henry VIII নাটকের আদ্যন্ত শেক্‌স্‌পীয়ারের রচনা নয় বলিয়া অনেকে যে সন্দেহ প্রকাশ করেন ["With Henry V Shakespeare's work in the English history plays ends, except to that elaborate piece of pegeantry Henry VIII of which he was part author."—A Short History of English Drama, B. Ifor Evans, pp. 61, Pelican Book. A 172], তাহা জানিয়া লইয়াই আমরা আলোচনা করিতেছি। দুর্ভাগিনী রানী ক্যাথারিন্‌ বিনা দোষে সৌভাগ্যের স্বর্ণ-সিংহাসন হইতে বঞ্চিত হইতে চলিয়াছেন। আজ যিনি রানী, কাল

ঘটনা যাহাই হউক বা সমস্যা যেমনই হউক না কেন, আমাদের প্রধান প্রশ্ন, উহা নাটকীয় হইয়াছে কি না? ঘটনা নাটকীয় হয় তখনই, যখন উহা প্রবৃত্তির সঙ্ঘাতে পাত্র-পাত্রীর চরিত্রকেই কর্মের মধ্য দিয়া রূপায়িত করে। সেই দিক দিয়া নাট্য-কাহিনীর প্রধান অংশ নাটকীয়। অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, একই পরিবারে পর পর তিনটি বালিকাকে বিধবা করার মধ্য দিয়া নাট্যকারের উদ্দেশ্য-মূলকতা স্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে। কাহিনীর স্বাভাবিকত্ব উহা অবশ্যই ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। কিন্তু একটা কথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না। নাটকের রসানুভূতির ঐক্যের জন্যই কাহিনীটিকে একই পরিবারে ঘটানো হইয়াছে। এই নাট্যের নায়ক প্রকাশ নহে,—প্রসন্নকুমার। ভুবন, প্রমদা নিজেদের জীবন দিয়া প্রসন্নকুমারকে বিকশিত করিয়াছে মাত্র। প্রসন্নকুমারকে

তিনি ভিখারিণীর থেকেও ভিখারিণী হইলেন। এতবড় একটা দুঃখের মুহূর্তে নিজের ঘরে বসিয়া আপন পরিচারিকাকে তিনি আদেশ করেন, অন্য কাজ বন্ধ রাখিয়া একটা গান করিতে। রানী ভাবেন, ঐ গানের সুরে তিনি ক্ষণিকের জন্য ব্যথা-বেদনা ভুলিতে পারেন কিনা। আপন গৃহের বিজন পরিবেশে এই গভীর দুঃখের সঙ্গিনী পরিচারিকার গান শোনা স্বাভাবিক। এ-গান পরিস্থিতি ও পরিবেশের সঙ্গতি নষ্ট করে না তাই উহা নাটকীয়।

সাধু, ন্যায়বান, শক্তিমান ব্রুটাস আজ কর্মক্লান্ত। তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী Portia মৃতা; আসন্ন পরাজয়ের সম্ভাবনাও তিনি আজ পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করিতেছেন। কিন্তু ধৈর্যশীল দার্শনিক মনের চাঞ্চল্য ও হৃদয়ের শোকোচ্ছ্বাস ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না। তবে তিনি যে আত্মস্থ নহেন, তাহা প্রকাশ পায় কেসিয়াসের সঙ্গে অপ্রত্যাশিত বাক্-যুদ্ধে। বন্ধুর সহিত এই কলহের প্রেরণা যে, তাঁহার অন্তরের ব্যথা-বেদনা হইতে আসিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়াই আবার তিনি সংযত হইয়া বলিলেন, তিনি আত্মস্থ নহেন। কারণ 'Protia is dead',—তাঁহার মৃত্যু-শোকই ব্রুটাস্‌কে অস্থির করিয়াছে। কেসিয়াস সমবেদনা জানাইয়া বিদায় লইলেন। ব্রুটাসের উদ্বেগ কমিল না। তিনি ভৃত্যদের ডাকিয়া তাঁহার শিবিরে ঘুমাইতে বলিলেন। চিন্তায়, শোকে ও রাত্রি-জাগরণে ক্লান্ত ব্রুটাস্ অন্তরের বেদনা আর সহ্য করিতে পারিতেছেন না। ভৃত্যদেরও যে তিনি কি আদেশ করিয়াছেন তাহা ভুলিয়া যাইতেছেন। শিবির নীরব, নির্জন হইল। কিন্তু ব্রুটাসের বিশ্রামের অবকাশ কোথায়? উদ্বেগে ও শোকে তাঁহার ঘুম আসিতেই পারে না। তাই তিনি ভৃত্যকে গান করিতে আদেশ করেন। পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া চরিত্র-বিকাশে সাহায্য করে বলিয়া এই গানটির নাটকীয় উপযোগিতা স্বীকার করিব।

কিন্তু 'হারানিধি' নাটকের ব্যাপারটি তো তাহা নহে। কাদম্বিনী যদি নিজের বিজন ঘরে গভীর রাতে দরজা বন্ধ করিয়া গান করিত এবং তৎপর বিষপানে, উদ্‌বন্ধনে বা অন্য যে-কোনো প্রকারে আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করিত, তাহা হইলে আমাদের কিছু বক্তব্য থাকিত না। হাওড়ার পুলের নীচে, গভীর নিশীথে, লোক-চক্ষুর অন্তরালে আত্মহত্যা করিতে আসিয়া এক [illegible] করিয়া পাড়া জাগানোটা অসঙ্গত এবং অস্বাভাবিক বলিয়াই অনাটকীয়।

ঘিরিয়া নাটকীয় ঘটনার আবর্তন-বিবর্তন হইয়াছে। বিধাতার অভিশাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে গিয়া প্রসন্নকুমার বার বার ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছেন। প্রসন্নকুমার এই নাটকের ঘটনার নিরপেক্ষ সাক্ষী নহেন,—তিনি ইহার ভোক্তা ও স্রষ্টা। নাটকের আরম্ভে দেখি, প্রসন্নকুমারের মস্তকে বজ্রাঘাত হইয়াছে,—জ্যেষ্ঠ পুত্র মারা গিয়াছে। বৃদ্ধের ধৈর্যের অভাব নাই। মৃত্যু বিধির ইচ্ছা। যে চলিয়া গিয়াছে হাজার কাঁদিলেও তাহাকে আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না। কিন্তু বাল-বিধবা পুত্র-বধুকে লইয়াই বৃদ্ধের চিন্তা। প্রসন্নের কথা দিয়াই নাটকের আরম্ভ হয়,—

> "কান্না তো চিরদিনই রইল, কান্না তো আর ফুরোবার নয়। আমরা চিতেয় না পুড়ে আর সুশীলকে ভুলব না, কিন্তু পরের মেয়ের কি ভাবছ ?…"

প্রশ্নের উত্তর দেয় নির্মলা,—

> "না বাবা—না মা—আমি তোমাদের কাঁদতে দেবো না, তোমরা আমার মুখ চেয়ে স্থির হয়ে থাকো। আমি ঠাকুরপোর বেটা কোলে করে তোমাদের কোলে দেবো, তোমরা কেঁদো না, তোমাদের ঘর আমি বজায় করব।"

ছোট ছোট কয়েকটি কথা। কিন্তু ইহার মধ্য দিয়া সমস্ত পরিস্থিতির বেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে। নারীর চরম সাধনা মাতৃত্ব। বিবাহিত জীবনের উহা শ্রেষ্ঠ ফল। স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে নারীর সেই মাতৃত্বের আশাও নষ্ট হইল। তাহার জীবন তখন নিষ্ফল মরু। তারপর শ্বশুরের ঘরে দেবর-পুত্রকে মানুষ করা কঠোর কর্তব্য মাত্র। উহা নিষ্কাম কর্ম।

মাতা-পিতা পুত্রের বিবাহ দেন, পৌত্রের মধ্য দিয়া নিজের বংশের ধারা অব্যাহত রাখিবার জন্য। পুত্রের অকাল-মৃত্যুতে তাহার সম্ভাবনা লুপ্ত হয়। দেবরের পুত্রকে বিধবা পুত্রবধূ পালন করে শ্বশুরের বংশ-রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব হিসাবে। বিধবা-জীবনের কর্তব্য ও ত্যাগের দৃশ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে নির্মলার এই সামান্য কথার মধ্য দিয়া। নির্মলা বিধবা-জীবনের এই যে পবিত্র আদর্শ গ্রহণ করিল, তাহা হইতে সে কখনও বিচলিত হয় নাই। সেই জন্যই নির্মলার চরিত্রের কোনো ক্রমবিকাশ নাই। এই চরিত্রটি স্থাণু। আর উহা স্থাণু হইতে বাধ্য। কেন না, কোনো বিশেষ আদর্শের প্রতি যে চরিত্রের নিষ্ঠা যত প্রবল, বিপরীত ভাবের দ্বন্দ্ব তাহার ভিতর তত কম। তাই সে

জীবনে বৈচিত্র্যও নাই। কিন্তু বৈচিত্র্য না থাকিলেই যে চরিত্র অবাস্তব, অসুস্থ বা অসঙ্গত হইবে তাহা নহে। তবে নির্মলার চরিত্রের বিশেষ কোনো নাটকীয় আকর্ষণ নাই। চরিত্রটির ব্যাপ্তি খুব কম। নাটকের ঘটনা-পুঞ্জের ক্ষুব্ধ ঘূর্ণিবায়ুর বহু দূরে দাঁড়াইয়া চরিত্রটি অবিকম্পিত দীপ-শিখার মতো জ্বলিতেছে মাত্র।

নাট্যকাহিনী গতি-প্রবণ হইয়া উঠিয়াছে ভুবন ও প্রকাশের চরিত্র-সঙ্ঘাতে। বেণীমাধবের পদ-ভঙ্গ হইতেই যে নানা প্রকার বিপরীত প্রবাহে নাট্যকাহিনী আন্দোলিত হইতে লাগিল, ভুবনের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাহা শান্ত হয় নাই। এই প্রসঙ্গে নাটকের সংলাপের ভিতর দিয়া নাট্যকার মোটামুটি মনস্তত্ত্ব-সম্মত চরিত্র-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মাতা-পিতৃহীন বেণী,—শ্বশুর-শাশুড়ীর নিকট সে পুত্রাধিক স্নেহের পাত্র। অসুস্থ হইয়া সে বুঝিতে পারিয়াছে, তাহার দিনের হিসাব-নিকাশ হইয়া গিয়াছে। প্রিয়তমা স্ত্রীকে সে কাহাকে দিয়া যাইবে?—বন্ধু প্রকাশকে।

প্রকাশের সহিত ভুবনের সম্বন্ধ কি? আধুনিক সভ্যতার একটা অভিশপ্ত দিক এখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বয়স্কা-কুমারীর সহিত অসম্পর্কিত পাশের 'বাড়ির দাদা'র পরিচয়টি যে উভয়ের প্রতি উভয়ের প্রচ্ছন্ন অনুরাগের বশেই ঘটিয়া থাকে, কন্যার অভিভাবক ইচ্ছা করিয়াই অনেক সময় তাহা লক্ষ্য করেন না। যখন উহাদের মধ্যে বিবাহের কোনো সম্ভাবনাই থাকে না, তখন দাদাটি হয়ত নেহাৎ ভাল মানুষের মতো বোনটির বিবাহের ব্যবস্থা করেন, তাঁহার এক বন্ধুর সঙ্গে। তারপর বন্ধু ও বন্ধু-পত্নীর দাম্পত্যজীবনের দৈনন্দিন ব্যাপারেও নিজেকে নেহাৎ প্রীতিবশে জড়াইয়া ফেলেন। উহা যে বন্ধুর অন্তরস্থিত প্রচ্ছন্ন কামের ফল, নব-বিবাহিত দম্পতি তাহা লক্ষ্যও করে না। ভুবন, প্রকাশ ও বেণীর মধ্যে এই ধরনের বন্ধুত্বের সম্পর্ক। সুতরাং ভুবন বিধবা হইল বলিয়াই যে প্রকাশ অতি সহজে তাহাকে পাপের পথে নামাইতে পারিয়াছিল তাহা সত্য নহে। এই পাপ-বীজ বিকাশের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছিল কুমারী ভুবনের হৃদয়ে। একটু উদ্ধৃত করিতেছি,—

"বেণী।...প্রকাশ আমার কে—শোনো,—প্রকাশ আমার বন্ধু নয়, ভাইয়ের অধিক, তোমাকে সে ভগ্নীর চেয়ে স্নেহ করে।

ভুবন।...হ্যাঁগা, প্রকাশবাবুর পরিচয় আমায় কি দিচ্ছ? আমাদের পাড়ার,—ছেলে-বেলা থেকে আমাদের বাড়ী আসে, কত আদর

করতো,—কতদিন আমার সঙ্গে খেলা করেছে,—আমি প্রকাশ বাবুকে জানিনে?

বেণী।…তুমি জেনো, তোমার মুখ-পানে যদি কেউ চায়—আমার রাগ হয়, কিন্তু প্রকাশকে তোমার কাছে একলা রেখে বেরিয়ে যাই। সে তোমার হয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া করে। ভাল গহনা কোথাও দেখলে জোর করে কিনে আনে।"

—শাস্তি কি শান্তি, ১ম অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক

সঙ্গ, দান, খাওয়া, খাওয়ানো প্রভৃতি প্রীতি-লক্ষণগুলি সবই যে ভুবন ও প্রকাশের মধ্যে বিদ্যমান, তাহা লক্ষ্য করিবার মতো। অথচ বেণী কিন্তু ইহাতে কোনো আপত্তি করে নাই। আধুনিক কালের যুবক সে। নর-নারীর মধ্যে এটুকু প্রীতির সম্পর্ক স্বীকার্য বলিয়াই সে ধরিয়া লইয়াছে। বেণীর মনটি রক্ষণশীলও নয়। উনবিংশ শতকের শিক্ষিত যুবক বহু-বিবাহ মানিতে পারে না, কিন্তু বিধবা-বিবাহ স্বীকার করে। সতীনের ঘর করিতে গিয়া দুঃখ ভোগ করিতে না হইলে, সে বন্ধুর সহিত নিজের ভাবী বিধবা স্ত্রীর বিবাহের ঘটকালি করিয়া যাইত। এতটুকু উদারতা (?) বেণীর ছিল—

"প্রকাশের যদি স্ত্রী না থাকতো, আমি সমাজ মানতুম না, আমি প্রকাশকে অনুরোধ করতুম, তোমায় বিবাহ করে।"…

—শাস্তি কি শান্তি, ১ম অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক

স্বামী জীবিতাবস্থায় বন্ধুর সহিত স্বীয় পত্নীর প্রেমের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, মৃত্যুর পূর্বে নিজের অজ্ঞাতেই তাহার পূর্ণ সমর্থন করিয়া গেলেন মাত্র। কিন্তু এ সত্য পাগলের দৃষ্টি এড়ায় নাই। পাগল প্রকাশকে শুনাইয়া দিল,—

"আমার বন্ধু হয়ে কি করবে? আমার যুবতী মাগও নাই, টাকাও নাই।"…

—শাস্তি কি শান্তি, ১ম অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বেণী মরিয়াছে। প্রকাশ তাহার স্ত্রীর অভিভাবক এবং সম্পত্তির রক্ষক। কিন্তু বন্ধু-পত্নীর এই অভিভাবকত্ব যে নিজের অন্তরস্থিত কাম-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য, তাহার আচার-আচরণ ও কথাবার্তায় তাহা প্রকাশ পাইতে লাগিল। ভুবনও প্রকাশের প্রতি অনুরক্ত থাকিলেও কিন্তু নারীর স্বাভাবিক সঙ্কোচশীলতার জন্যই হউক আর যে জন্যই হউক, প্রথমে আত্মপ্রকাশ করে নাই। কিন্তু প্রকাশকে অবাধ মেলামেশার সুযোগ দিয়া, তাহাকে অঙ্কিকোল

মাথাইবার ছলে অঙ্গ-স্পর্শ করিতে দিয়া, প্রকাশের প্রেমকে সে ইঙ্গিতে নীরব অভিনন্দন জানাইয়াছে। এই অংশে নাট্যকারের সংলাপ-সৃষ্টির কৌশল প্রশংসনীয়।—

"প্রকাশ। কি ভাবছি—বুঝতে পাচ্ছ না। মকদ্দমা—মামলা নিয়ে, বিষয়-বন্দোবস্ত নিয়ে, তোমার সঙ্গে হামেসা দেখা করতে হবে। তুমি যুবতী, আমারও বয়স ঢলেনি। আমি নিন্দুক লোককে বড় ভয় করি।

ভুবন। তুমি সে ভয় করো না, যে যা বলে বলুক।

প্রকাশ। আমি আমার জন্যে ভাবিনে। তোমার নামে যদি কলঙ্ক রটে, আমার বজ্রের মত বাজ্‌বে।

ভুবন। প্রকাশ বাবু ঠিক বলো, আমার ভার কি তোমার বেশী বোধ হচ্ছে? তোমার আসা-যাওয়াতো নূতন নয়? তোমার স্ত্রীর সঙ্গে—তোমার সঙ্গে এক গাড়ীতে গিয়ে থিয়েটার দেখে এসেছি। সে কাজে যেতো, তোমাতে আমাতে সমস্ত দিন দুজনে কথাবার্তা কয়েছি।—তুমি হারমোনিয়ম বাজিয়েছ, আমি গান করেছি, আজ কেন তুমি আমাকে কলঙ্কের ভয় দেখাচ্ছ?

* * * *

ভুবন। তুমি অমন গম্ভীর হয়ে কথাবার্তা কইচ কেন?

প্রকাশ। যাক্, সেকথা চুকে গেল,—আজ আর তো মাথা ধরে নি?

ভুবন। একটু টিপটিপিনী সুরু হয়েছে।

প্রকাশ। এই বেলা অডিকলন দাও না? কই শিশিটে কোথায়? (তাক হইতে শিশি লইয়া) নাও, ভাল করে মাথায় দাও। আজ মালীরে ফুল দিয়ে যায় নাই?

ভুবন। না,—আমি বারণ করে দিয়েছি।

প্রকাশ। কেন ফুলের তোড়ায় দোষ কি? ফুল প্রকৃতির নির্মল আদর্শ।

ভুবন। ফুলটুল ঘরে রাখলে লোকে নিন্দে করবে।

প্রকাশ। কেন—কি নিন্দে? তুমি কি মনে করেছ—তুমি একবেলা হবিষ্য করে ভূমি-শয্যায় দিন কাটাবে—সেই আমি দেখবো?…"

—শাস্তি কি শাস্তি, ২য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক

প্রকাশ সু-চতুর। প্রথম প্রশ্নেই যদি সে বুঝিত, তাহার আসা-যাওয়া, মেলা-মেশা ভুবন পছন্দ করে না, তাহা হইলে সে সংযত হইত বা অন্য পথ ধরিত। কিন্তু সে দেখিল, ভুবন শুধু তাহাকে স্বীকারই করিতেছে না, আগ্রহান্বিত অভিনন্দন জানাইতেছে,—"তুমি অমন গম্ভীর হয়ে কথাবার্তা কইচ কেন?"—তখন, সে আর একটু অগ্রসর হইল। এবার সে প্রেমিকার অঙ্গ-স্পর্শ করিবার সুযোগ খুঁজিয়া লইল। এই দ্বিতীয় পদক্ষেপেও কিন্তু সে বাধা পাইল না। সে বুঝিতে পারিল, ইহাকে অতি সহজে জয় করা যাইবে। সে তাহাকে ফুলের সাজ পরাইবে, তাহার বিধবার বেশ ঘুচাইবে।

ভুবন বাধা দিল না কেন? দিল না তাহার কারণ এই নহে যে প্রকাশের প্রতি তাহার প্রেম অতিমাত্র উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। উনবিংশ শতকের শিক্ষিত সমাজের অনেকে বিধবার কঠোর ব্রহ্মচর্যকে নারীর প্রতি পুরুষের অকারণ অত্যাচার বলিয়া ব্যাখ্যা করিত। পর-পুরুষের সহিত যুবতী নারীর নির্জনে আলাপ, স্বামীর বন্ধুর সহিত থিয়েটারে যাওয়া ইত্যাদি সভ্যতার অংশ বলিয়াই বিবেচিত হইত। স্বামী থাকিতে যাহা পারা গিয়াছে, স্বামীর মৃত্যুর পর তাহা পারা যাইবে না কেন? ভুবন এই সংস্কারে পুষ্ট হইয়াছে বলিয়া, হরমণি যখন ভুবনকে বিধবার কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহা মূর্খের প্রতি উপদেশের মতো ভুবনের ক্রোধ বৃদ্ধিই করে! স্বামীর ঘর বিধবা স্ত্রীর দেবালয়! ফুল দিয়া তাহা সাজাইয়া রাখিতে হইবে। সেই দেব-মন্দিরেই যে প্রকাশের তুষ্টির জন্য ভুবন বিলাসের ফুল ছড়াইতেছে, হরমণি তাহা জানে না। এই অজ্ঞতার সুযোগে নাট্যকার সুন্দর dramatic irony সৃষ্টি করিয়াছেন,—"স্বামী-পূজার জন্য বুঝি সুগন্ধ এনেছিলে? কিন্তু বড় ঝাঁজ।...এ ঘরটি যেন তোমার ঠাকুর-ঘর হলো, এখানে তো কাউকে আস্‌তে দেবে না। তুমিতো তোমার আলাদা ঘর করেছ—যখন এখানে আস্‌বে তখন তুমি সধবা, নইলে তুমি অদৃষ্ট-ঘোরে বিধবা হয়েছ—বিধবার মতোইতো থাক্‌বে, সেই ভাল —সেই ভাল।"

এই সহৃদয় মধুর উপদেশ-বাণী ভুবনের নিকট ক্ষত-স্থানে লবণ প্রক্ষেপের মতো যন্ত্রণাময়। তাহার দেবালয়ে, স্বামীর ঘরেই যে সে বিলাসের নরক-কুণ্ড সৃষ্টি করিতেছে, ভবিষ্যৎ ব্যভিচারের আয়োজন করিতেছে, তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিতেছে। কিন্তু প্রবৃত্তির বেগ সে সামলাইতে পারিতেছে না।

মানুষ প্রবৃত্তি-অনুযায়ী যুক্তি খোঁজে। যে কথা নিজের প্রবৃত্তির সহিত মিলিয়া যায়, তাহা সে বেদবাক্য বলিয়া স্বীকার করে এবং সেই বাক্যের বক্তা তাহার নিকট শ্রদ্ধার্হ হইয়া ওঠে। ভুবনেরও তাহাই হইল,—

> "বিধবার কি লাঞ্ছনা! ভিখারী মাগীও দুকথা বলে যায়, কান পেতে শুনতে হয়। বিধবা যেন চোর, সদাই ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে। এ শাস্ত্র কই মাগ্‌ মলে নাই? প্রকাশ বাবু ঠিক বলে,—যাদের বিধবাকে চিতের আগুনে পুড়িয়ে মার্‌বার নিয়ম, তাদের শাস্ত্রে আর কি হবে?"

প্রকাশের শিক্ষার ফলেই যে ভুবন আগে হইতেই তৈয়ারী হইয়াছিল তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। সুতরাং বৈধব্যই শুধু তাহার অধঃপতনের কারণ নহে। বাল্যের অবাধ পুরুষ-সংসর্গ, বিবাহিত জীবনে স্বামীর আধুনিক চালচলনের জন্য স্বামীর বন্ধু এবং নিজের পূর্ব-পরিচিত ব্যক্তির সহিত নিবিড় মেলা-মেশা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশের দেওয়া সংস্কার-ভাঙ্গার শিক্ষা প্রভৃতি তাহাকে চিরদিনই হিন্দুনারীর সনাতন সংস্কার হইতে দূরে রাখিয়াছে। তাই একদিকে যেমন বিধবার ব্রহ্মচর্যের প্রতি তাহার নিষ্ঠা গড়িয়া ওঠে নাই, অন্যদিকে নিজের আচরণের জন্য তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের অবকাশও তাহার জোটে নাই, কেন না নিজের আচরণ সম্বন্ধে তাহার এতটুকু অন্যায়-বোধ জাগে নাই।

প্রসন্নকুমারের আবার বিপদ ঘনাইয়া আসিল। কনিষ্ঠা কন্যা প্রমদার বিবাহের রাত্রেই তাহার স্বামী কলেরায় মারা গেল। এই ঘটনায় তিনি ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। জীবনের উপর তাঁহার অনুরাগ কমিয়া আসিল। বিধবা কন্যা ও পুত্রবধূর প্রতি সমবেদনায় তিনি মাছ ছাড়িয়া দিয়াছেন। মাছ ছাড়িয়া দেওয়া বাঙালীর পক্ষে কম ত্যাগ নহে। কনিষ্ঠা কন্যা প্রমদার কষ্ট দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। তিনি এবার বিধাতার বিরুদ্ধে ও সমাজের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে চাহেন। প্রমদার আবার বিবাহ দিবেন। কিন্তু স্ত্রী এবং পুত্রবধূর জন্য পারিয়া উঠিতেছেন না। হঠাৎ একদিন ভুবন ও প্রকাশকে আলাপ করিতে দেখিয়া প্রসন্নকুমার শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। দ্বিতীয় অঙ্ক, পঞ্চম গর্ভাঙ্ক। দৃশ্যটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। ইহা নাট্যকাহিনীর সমস্ত স্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিল। অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া ঘুর-পাক খাইতে খাইতে চরিত্রগুলি বিবর্তিত হইয়া উঠিতেছে। প্রমদার কষ্ট দেখিয়া শুধু স্নেহের অনুরোধেই বৃদ্ধ প্রসন্নকুমার বিধবা-বিবাহে মত করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্তরের সংস্কার ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাই

পুত্রবধূ ও স্ত্রীর প্রতিবাদে নিরস্ত হইয়াছিলেন। এবার ভুবন ও প্রকাশের ব্যভিচারে তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। তাই প্রমদাকে পুনরায় বিবাহ দেওয়ার চেষ্টাকে শুধু সমাজের বিরুদ্ধে অভিযান বলিতে পারি না। কন্যার অন্যায় আচরণে ক্ষুব্ধ পিতার অভিমানই যে এ-বিবাহের ঘটকালি করিতেছে তাহা অবশ্যই স্বীকার্য। সুতরাং প্রমদার দ্বিতীয়বার বিবাহ বাহিরের কোনো পরিস্থিতি নহে। ভুবন ও প্রকাশের আচরণের সঙ্ঘাতে প্রসন্নকুমারের অন্তর বাহিরে যে প্রতিক্রিয়া করিয়াছে তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফল মাত্র। অর্থাৎ এই ঘটনা প্রসন্নকুমারের চরিত্রেরই বিকাশ। সুতরাং ইহা নাটকীয়। ভুবন এবং প্রকাশের চরিত্রও কেমন করিয়া গতিশীল হইয়া উঠিয়াছে বা ক্রমবিকশিত হইয়াছে এই দৃশ্যে তাহাও লক্ষ্য করিবার মতো। পূর্বে আমরা দেখিয়াছি, প্রকাশই ভুবনের প্রতি তাহার প্রেমাসক্তি প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ভুবন তাহা অনুকূলভাবে গ্রহণ করে কি না সেই ভয়ে সে মনোভাব প্রকাশ করিতে গিয়াও স্পষ্ট করিতে পারে নাই। ভুবনই সে সঙ্কোচ দূর করিয়া দিয়াছিল। এখন ভুবন প্রগল্‌ভা নায়িকা। সে-ই এখন প্রকাশের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে,—

> "ভুবন।…তুমি তিন দিন আসো নাই, আমার কি করে কেটেছে তা আমিই জানি। আজ যদি তুমি না-আসতে, এ সাজানো ঘর দেখতে পেতে না, আমি ফুলদান, ছবি আসবাব, সব ঘর থেকে বার করে দিতুম।"…

—শাস্তি কি শান্তি, ২য় অঙ্ক, ৫ম গর্ভাঙ্ক

প্রকাশ বুঝিল, শিকার প্রস্তুত। এখন উপযুক্ত স্থানে আঘাত করিতে পারিলেই হয়। সে-যে পর-পুরুষ এবং ভুবন যে পর-নারী। নারী-পুরুষের সামাজিক ব্যবধানই যে তাহাদের মিলনের পথে বাধা হইতেছে, ভুবনকে সেই কথাই শুনাইয়া দিল। আর তাহার কথা শুধু যুক্তি নয়, হৃদয়ের ব্যাকুল উচ্ছ্বাস।—

> …"আমার আক্ষেপ হয় কেন দিন-রাত তোমার কাছে থাকতে পারি না, কেন দিন-রাত তোমায় যত্ন করতে পারি না। বিধাতার বিড়ম্বনায় কেন আমরা প্রভেদ। যদি আমি স্ত্রীলোক হতেম্ বা তুমি পুরুষ হতে, তাহলে এক মুহূর্তে বিচ্ছেদ হতো না। বিধাতার বিড়ম্বনা। আর অধিক কি বলব।"

—শাস্তি কি শান্তি, ২য় অঙ্ক, ৫ম গর্ভাঙ্ক

ভুবনের মনও যে প্রকাশের জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে তাহা বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না। ঘরে হঠাৎ প্রসন্নকুমার প্রবেশ করিলেন। প্রমদার বিবাহ দিবেন কি না তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে তিনি আসিয়াছিলেন। ঘরে ঢুকিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভুবন, তোমার মত কি?" প্রকাশকে তিনি নির্জনে তাঁহার বিধবা কন্যার সঙ্গে অমনভাবে আলাপ করিতে দেখিবেন আশা করেন নাই। প্রকাশও তাহা বুঝিল। তাই পরিস্থিতিকে অন্য দিকে ঘুরাইয়া দিবার জন্য সে কপট বাক্য প্রয়োগ করিল,—

"আজ্ঞে হাঁ। অসুখ করেছে শুনলুম,—তাই দেখ্‌তে এসেছি কেমন আছে। রোজ বিকেলে মাথা ধরে বল্‌ছেন - তাই ডাক্তার একটা ওষুধ দিয়েছিল, তাই দিতে এসেছি। আমি চল্‌লুম, আফিস্ থেকে এসেছি, এখনো বাড়ী যাই নাই।"

—শান্তি কি শান্তি, ২য় অঙ্ক, ৫ম গর্ভাঙ্ক

অসুখ যে মিথ্যা, প্রসন্নকুমার তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি বুঝিলেন, মেয়ের আর এখানে থাকা উচিত নয়। কিন্তু যে প্রকাশই সমস্ত অনর্থের মূল, ভুবন তাহার আদেশ ভিন্ন যাইবে না।

বাঙালী হিন্দু পিতার অসুবিধা কোথায়? বিবাহের পর কন্যাস্বাধীনা। সে যদি স্বেচ্ছায় পিত্রালয়ে যাইতে না চাহে, পিতা তাহার পর জুলুম করিতে পারেন না। অথচ কন্যা কলঙ্কিনী হইলে পিতৃকুল দুর্নাম হইতে অব্যাহতি পাইবে না। নিরুপায় প্রসন্নকুমারের মুখে সেই শোচনীয় দুর্দশার বাণীই আমরা শুনিতে পাই,—

"তোমার গর্ভধারিণী অনুরোধ করেছিল, বউমা অনুরোধ করেছিল, তুমি অনুরোধ রক্ষা করনি, আজ আমার কথা উপেক্ষা করলে। যা ভাল বোঝ কর, তুমি স্বাধীন, আমার ত জোর নাই। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) আমি তোমায় কি জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলুম জানো? প্রমদার আবার বে দেবো কিনা?—আমি উত্তর পেয়েছি, চল্লুম।"

—শান্তি কি শান্তি, ২য় অঙ্ক, ৫ম গর্ভাঙ্ক

পরিস্থিতি প্রসন্নকুমারকে বিধবা-বিবাহ দিতে বাধ্য করিতেছে। প্রসন্নকুমার এখন হইতেই সমাজের বিদ্রূপাত্মক অঙ্গুলি-সঙ্কেত লক্ষ্য করিতে শুরু করিয়াছেন। ভুবনের বাড়ির চাকর-বাকর পর্যন্ত প্রসন্নকে দেখিয়া কেমন হইয়া যায়, পুরাতন খানসামার ইচ্ছা তাঁহাকে বৈঠকখানায় বসাইয়া রাখিয়া ভুবনকে খবর দেয়। তারপর ভুবনের বসন-ভূষণ, ঘরের আসবাব এবং

প্রকাশের সন্ত্রস্ত আচরণ প্রভৃতি প্রসন্নকুমারের সন্দেহকে দৃঢ় করিয়া তোলে। বৃদ্ধ সব বুঝিতেছেন। কিন্তু তাঁহার করিবার কিছুই নাই। বাঙালীর জীবনে বিরাট বৈচিত্র্য নাই। সুতরাং জটিল কর্ম-সঙ্ঘাতপূর্ণ নাটকের উপাদান সে-জীবনে মিলিবে না। কিন্তু বাঙালীর পারিবারিক জীবনে বা সমাজ-জীবনে যে কী দুঃখময়ী পরিস্থিতির সৃষ্টি হইতে পারে, গিরিশচন্দ্র তাহা জানিতেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে তিনি তাহা কুড়াইয়া লইয়া নাটকে সাজাইয়াছেন। বিধবা-কন্যার নিরুপায় পিতার শোচনীয় চিত্র বাস্তবভাবে অঙ্কিত হইয়াছে প্রসন্নকুমারের চরিত্রে।

প্রসন্নকুমার প্রমদার' বিবাহ দিতে চাহেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী পার্বতী এত দেখিয়া শুনিয়াও স্বামীর মতে মত দিতে পারেন নাই। ইহাও বাঙালী ঘরের আর একটি বাস্তব চিত্র। উনবিংশ শতকের বাঙালীর ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে ইংরেজী সমাজ ও শিক্ষার আদর্শে স্বদেশী সমাজ ও সভ্যতার উপর পুরুষের বিরাগ আসিয়াছিল, পুরুষ বিকৃত হইয়াছিল। কিন্তু নারীর ভিতর সাধারণতঃ সে বিকার বা বিক্ষেপ দেখা দেয় নাই। নারী স্বভাবতঃ রক্ষণশীলা। এত বিপৎপাতেও পার্বতী কিন্তু সে রক্ষণশীল মনোভাব বিসর্জন দিতে পারে নাই—

> "কি বলব। মা হয়ে কেমন করে পর-পুরুষকে দিতে বল্‌ব। তুমি যন্ত্রণায় বল্‌চ—বড় যন্ত্রণা। তুমি ভাল করে বুঝে দেখ,—যা শাস্ত্র-সঙ্গত নয়, যা লোকাচার-বিরুদ্ধ, এমন কাজ কেন করতে চাচ্ছ? শুনেছি, এতে দ্বিচারিণী হয়। আমরা আপনার পেটের মেয়েকে কেমন করে দ্বিচারিণী করব?"
> —শাস্তি কি শান্তি, ২য় অঙ্ক, ৭ম গর্ভাঙ্ক

প্রসন্নকুমার এবার ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। হিন্দু-নারীর চরম দুর্বলতা কোথায়? সে দুনিয়ার সমস্ত দুঃখ মানিয়া লইতে পারে, কিন্তু স্বামীর এতটুকু অকল্যাণের কথা ভাবিতেও পারে না। স্বামীর জন্য পুত্র-কন্যাও বিসর্জন দিতে পারে। প্রসন্নকুমার স্ত্রীকে আত্মহত্যার ভয় দেখাইয়া তাহার সম্মতি আদায় করিলেন।

> "এখনো মেয়ের সুখ চাও,—নিষ্কলঙ্ক মেয়েকে কলঙ্ক-সাগরে ফেলো না,—ব্যভিচার হতে রক্ষা করো—সম্মত হও। তুমি কঠোর জননী, তুমি সর্পিণীর ন্যায় নিজ সন্তান নষ্ট কর্‌তে পারো, তুমি সন্তানের দুঃখে কাতর নও, তুমি প্রস্তর-নির্মিত, তোমার মমতা নাই। এখনো বলছি, —নিষ্ঠুর হয়ে কঠোর যন্ত্রণা দেখ না। বিবাহ দিতে সম্মত হও, দাও—

সম্মতি দাও, কন্যাকে কঠোর যন্ত্রণা হতে ত্রাণ করো। (সম্মুখস্থ টেবিল হইতে ছুরিকা গ্রহণ করিয়া) নচেৎ পতিহত্যা দেখ—স্বয়ং বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করো,—তা হলে বুঝবে,—কি যন্ত্রণা।" (বক্ষে ছুরিকাঘাত করিবার উদ্যম)" —শাস্তি কি শাস্তি, ২য় অঙ্ক, ৭ম গর্ভাঙ্ক

শুধু সম্মতি আদায় করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন না। স্ত্রীকে দিয়া নিজের পা-ছোঁয়াইয়া প্রতিজ্ঞা করাইলেন। হিন্দু কুলবধূ স্বামীর পাদস্পর্শ করিয়া যে-প্রতিজ্ঞা করে স্বামীর অকল্যাণের ভয়েই তাহা ভঙ্গ করে না। প্রমদার বিবাহের আয়োজন পূর্ণ হইল। এই দৃশ্যে নাট্যকাহিনীর চরমোত্থান। ইহার পর ঘটনা নিশ্চিত পরিণতির দিকে সরলভাবে ছুটিয়া চলিয়াছে।

প্রমদার বিবাহ হইল। প্রসন্নকুমারের বিপদ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল। ভুবন ও প্রকাশ তাঁহার মুখে আগে হইতেই চূণ-কালি মাখাইতে শুরু করিয়াছে। প্রমদার বিবাহ দিয়াও তাঁহার শান্তি হইল না। বিধবা-বিবাহ বিবাহই নয়। হরমণির কথায় বলিতে গেলে,—"যারা সমাজ মানে না, তারা টাকার জন্যে বিধবা-বিবাহ করে।"—[৩য় অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক]। সুতরাং বিধবার মধুময় দাম্পত্য-জীবনের আশা আকাশ-কুসুম কল্পনা। প্রমদার বর্তমান দাম্পত্য-জীবনের চিত্র এইরূপ,—

"ঘেঁচী। তোমার স্বামী। তাই বের দিন পর-পুরুষ বলে শিউরে উঠেছিলে—মূর্চ্ছা গিয়েছিলে। স্বামী কে? টাকা পেয়েছিলুম, তোমায় নিয়েছিলুম। টাকা চাই—যোগাড় কর। বাপের কাছ থেকে পার আর বাগানে গিয়ে মিঃ বাসুর কাছ থেকেই আদায় করো, একটা ঠিক করো (ঘড়ি দেখিয়া) এখনি তারা আসবে,—বাপের কাছে না যাও, বাগানে যেতে হবে—আমি টেনে তোমায় গাড়ীতে তুলে নিয়ে যাব। গাড়ীর শব্দ হচ্ছে—ঐ বুঝি তারা এলো, কি করবে বল?

* * * *

প্রমদা। আমি যাচ্ছি, যাচ্ছি—বাপের বাড়ী যাচ্ছি।

ঘেঁচী। আচ্ছা যাও, টাকা আন্‌তে পারো ফিরে এসো, আর বাগানে যেতে চাও—বহুৎ আচ্ছা, নইলে তোমার যেথায় ইচ্ছে চলে যাও।"

তিনটি বিষয় এখানে লক্ষ্য করিবার মতো। প্রমদা নিজে ঘেঁচীকে বিবাহ করে নাই, বাপের ইচ্ছায় বাধ্য হইয়াছে মাত্র। তাহার অন্তরে

কিন্তু স্বামীর সংস্কার রহিয়াছে। তাই ঘেঁচী যে পর-পুরুষ ইহা সে ভুলিতে পারে নাই। যে নারীর অন্তরের ভিতর স্বামীর সংস্কার এমন ভাবে জীবিত থাকে তাহাকে পুনরায় বিবাহ দিলে তাহার উপকারের নামে অপকারই করা হয়। দ্বিতীয়তঃ দুশ্চরিত্র ঘেঁচী টাকার লোভে প্রমদাকে বিবাহ করিয়াছে মাত্র। যেখানে বিবাহের মূল উদ্দেশ্য টাকা, শান্তি সেখানে আসিবে কি করিয়া? নারীর ধর্মই হইল একগামিত্ব। শ্রেষ্ঠ পুরুষকে অবলম্বন করিয়া সে শান্তির নীড় রচনা করিতে চায়। তৃতীয়তঃ হাজার বিপদে পড়িলেও নারী তাহার মর্যাদা বিসর্জন দিতে চায় না। ঘেঁচীর অত্যাচার প্রমদা সহ্য করিতেছে; কিন্তু তাহার বন্ধুদের অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই সে পিত্রালয়ে ছুটিয়া পলাইল।

কিন্তু সেখানেও কি প্রমদার শান্তি আছে? পিতা টাকা দিয়া দিয়া সর্বস্বান্ত। ওদিকে সমাজ তাহার পিছনে লাগিয়াছে। প্রমদা এখন হিন্দু ঘরের বধূ নহে,—সে বিবি খ্রীস্টান। বাপের বাড়ি আসার অর্থ বাবাকে বিপদে ফেলানো। সে থাকিলে তাহার ভাইকে কেউ কন্যাদান করিবে না। বাড়ির দাসী পর্যন্ত বিদায় লইয়া যাইবে। কিন্তু প্রমদার আর থাকিবার জায়গা নাই। তাহার নিতান্ত নিঃসহায় অবস্থা সামান্য কয়টি বাক্যের মধ্য দিয়া অতি করুণ ভাবে ফুটিয়া ওঠে,—

> "হ্যাঁ মা, আমি যদি এ-বাড়ীতে দাসীর মতন হয়ে থাকি, যদি দাসীদের একটা ঘরে শুই,—আলাদা খাই—আলাদা থাকি, তাহলেও কি জাত যাবে? হ্যাঁ মা, তাহলে কোথায় দাঁড়াব? আমার কি হলো মা?"
>
> —শান্তি কি শান্তি, ৩য় অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক

পিত্রালয়ে কন্যা দাসীর অধমা। তবুও তাহার স্থান নাই। ইহা হইতে করুণ চিত্র আর থাকিতে পারে না। প্রমদা কিন্তু পিত্রালয়ে থাকিয়া পিতাকে বিপন্ন করিল না। সে ভাবিল, যত কষ্ট হউক না কেন, স্বামীর ঘরেই সে থাকিবে। স্বামী তাহাকে রাত্রি-বেলা একাকী রাস্তায় বাহির করিয়া দিল। প্রমদা মরিতে চলিল। কিন্তু মরিল না। সমাজকর্তৃক নির্যাতিতা আর একটি নারী তাহাকে আশ্রয় দিল।

এবার ভুবন। প্রমদার বিপদ তাহার নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য নহে। ভুবনের জন্য। ভুবনের অবস্থা কি? নাট্যকার ভুবন ও প্রকাশ উভয়ের মনে একটু দ্বন্দ্ব সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা অস্থায়ী এবং অকিঞ্চিৎকর।

ভুবন ও প্রকাশ উভয়েই যে উভয়ের প্রেমে উন্মাদ তাহা তাহারা জানে। ইহা যে পাপ তাহাও বোঝে। তাই তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল [৩য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক] আর উভয়ে দেখা-সাক্ষাৎ করিবে না। এই প্রতিজ্ঞা কিন্তু কাহিনীর মোড় ফিরাইয়া দেয় নাই। উহাদের অন্তর-রাজ্যেও কোনো পরিবর্তন আনে নাই। তৃতীয় অঙ্ক, পঞ্চম গর্ভাঙ্কে আবার যখন ভুবন ও প্রকাশের সাক্ষাৎ হইল, তখন তাহাদের কথাবার্তায় পরিষ্কার বোঝা গেল, প্রেমের গাছে ফল ফলিয়াছে। বরং নদীতে ভাঁটা ধরিয়াছে। এই প্রেম, অর্থাৎ কাম কাম্যকে সুস্থ, স্বস্থ ও শ্রী-মণ্ডিত করিয়া তুলিতে চাহে না। পুরুষের এখানে চাহিদা থাকে নারীর দেহ-সম্ভোগ। তাহা যতক্ষণ না পায়, ততক্ষণ পুরুষ থাকে নারীর চাটুকার। নারী ততক্ষণ তাহার নিকট দেবী, জীবনের আশা-ভরসা, তাহার দর্শনে জীবন, অদর্শনে মৃত্যু। তারপর যখন চাটুকারিতায় ভুলিয়া দুর্বল মুহূর্তে নারী ধরা দেয়, লম্পট পুরুষ তাহার সমস্ত মর্যাদা লুণ্ঠন করিয়া নিজকৃত পাপের সমস্ত কালিমা তাহার অঙ্গে লেপন করিয়া সরিয়া পড়ে। পুরুষও ঐ নারীকে আর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না, দেখিতে পারে না। প্রলোভনে ভুলিয়া আনত হইলেও সে যে তাহার কাছেও ভ্রষ্টা।—

"প্রকাশ।……বোনাই আসবে, আমোদ-আহ্লাদ চলবে, আমি পুরোন হতে চল্লুম, নতুন মানুষ পাবে।

ভুবন। বেইমান তো এক রকম নয়। এখন বাবুকে সাতবার ডাকৃতে পাঠাতে হয়, আবার কত ভিরকুটি হচ্চে।"

—শাস্তি কি শান্তি, ৩য় অঙ্ক, ৫ম গর্ভাঙ্ক

কোথায় গেল প্রেমের সেই হৃদয়-ঢালা উচ্ছ্বাস। এ যে একেবারে গদ্য। নিতান্ত অভব্য উক্তি। ভুবনের প্রতি প্রকাশের আকর্ষণই শুধু কমে নাই, তাহার আগমনও কমিয়া গিয়াছে। ভুবনের দুর্ভাগ্যের সূচনা হইয়াছে।

পাপের গাছে ফল ধরিয়াছে। এবার তাহার ভোগের পালা। চতুর্থ অঙ্ক হইতে নাট্যকার প্রকাশ-চরিত্রচিত্রণে সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। ভুবনের প্রতি প্রকাশ আকৃষ্ট হইয়াছিল তাহার ধর্ম নষ্ট করিয়া সম্পত্তি ভোগ করিবার জন্য নহে। ভুবনের প্রতি ভালবাসাই ঐ আকর্ষণের কারণ। কিন্তু সন্তান-সম্ভবা ভুবনকে যে সে কেন ত্যাগ করিতে চাহে, কেন তাহাকে বিবাহ করিতে রাজি হয় না, নাট্যকার তাহার কোনো কারণ দেখান নাই।

যে-আকর্ষণ সমাজ-শাসন অস্বীকার করিয়াছিল, সেই দুর্বার যৌন আকর্ষণই তাহাদিগকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারিত। কোন্ আদর্শের সজ্ঘাতে প্রকাশের চৈতন্য হইল তাহার উল্লেখ নাই। প্রথম হইতে প্রকাশের চরিত্রে আমরা প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির তেমন কোনো দ্বন্দ্বও দেখি নাই যে পরবর্তীকালে তাহাই বিকশিত হইয়া এই বিষাদময়ী পরিস্থিতি সৃষ্টি করিবে। প্রকাশের সাংসারিক জীবনের কোনো চিত্রই আমরা পাই নাই। তাহার চরিত্রে শয়তানের অন্য কোনো লক্ষণ আমরা দেখি নাই। নাট্যকার দুইটি নর-নারীর প্রেম-বিকাশের চিত্র যতদূর টানা যায়, ততদূর অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহার নিষ্ঠুর পরিণতি ঘটাইবার জন্য হঠাৎ আকস্মিকতার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। প্রকাশ বেণীর বিষয় বন্ধক দিয়া নিজের ঋণ শোধ করিয়াছে, সদাশিব-চায়েনরূপের গদীতে জাল-নোট ভাঙ্গাইয়াছে। প্রকাশ-চরিত্রে ইহা নাট্যকারের আকস্মিক আরোপ। প্রকাশ ও ভুবনের প্রেম-কাহিনীর ইহা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নহে। এই দেনার দায়ে প্রকাশ যখন বিব্রত হইয়া টাকার লোভে নির্মলাকে মিঃ বাসুর বাগানে আনিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া ভুবনকে দিয়া চিঠি লেখায়, তখন চরিত্রটির এই আকস্মিক পরিণতি আমরা সহজে স্বীকার করিতে পারি না। ভুবনকে যে অত ভালবাসিয়াছিল, সে তাহাকে বেশ্যা প্রতিপন্ন করিয়া তাহাকে দিয়া সাফাই লিখিয়া লইবে, তাহাকে ভ্রূণ হত্যার পরামর্শ দিয়া তাহাকে আবার পুলিশে ধরাইয়া দিতে চেষ্টা করিবে, এই আকস্মিক ঘটনাগুলি মানিয়া লওয়া যায় না। অন্ততঃ ইহার জন্য মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতি নাই। নাট্যকার স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার মধ্যে রোমান্সের অবাঞ্ছিত প্রবেশ করাইয়া নাট্য-কৌশল ব্যর্থ করিয়াছেন। শেষের দিকে প্রকাশের আকস্মিক পরিবর্তন যাত্রার আকস্মিক ঘটনাবলী স্মরণ করাইয়া দেয়। দীর্ঘ দীর্ঘ উক্তিতেও যাত্রার প্রভাব লক্ষণীয়।

কিন্তু অন্যতম দুইটি চরিত্র সমানভাবে বিকশিত হইয়াছে। ভুবন ও প্রসন্নকুমার। ভুবন আজ নিরুপায়। লাম্পট্যের জন্য সমাজে পুরুষের শাস্তি হয় না, হয় নারীর। কলঙ্কের সাক্ষী থাকে তাহারই দেহে। সে প্রকাশের পায় ধরিয়া কাঁদিয়া নিজের অসহায় অবস্থা নিবেদন করিতেছে,—

> "প্রকাশ, আমায় এ যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করো। আমার যথাসর্বস্ব নিয়েছ তাতে আমি দুঃখিত নই। তুমি সাফাই লিখে নিতে চাও, আমি রাজি আছি,—আমায় কলঙ্ক থেকে মুক্তি

দাও—তুমি আমায় বিবাহ করো। আমি তোমার গলগ্রহ হব না, আমি কুঁড়ে ঘরে গিয়ে থাকবো, ভিক্ষা করে খাব। কিন্তু লোকে বেশ্যা বলে ঘৃণা করবে,—ভিক্ষা করতেও বাড়ী ঢুক্‌তে দেবে না। বাপ, ভাই কাছে আস্‌বে না—আমায় এ বিপদ থেকে উদ্ধার করো।"

—শাস্তি কি শান্তি, ৪র্থ অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক

উপায়ান্তর না দেখিয়া ভুবন আত্মহত্যা করিবে। তার পূর্ব-মুহূর্তের করুণ উক্তিটি তাহার কলঙ্কিত জীবনের প্রতিও সমবেদনা জাগাইয়া তোলে। নারীর মা হইবার বাসনা সহজাত। মা সে হইতে চলিয়াছে। কিন্তু এ মাতৃত্ব সমাজের অবাঞ্ছিত। গর্ভস্থ সন্তানের উদ্দেশ্যে তাহার বেদনা উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে। সে যে নিতান্ত অনিচ্ছায়, দায় ঠেকিয়া আত্মহত্যার সঙ্গে সঙ্গে সন্তান-হত্যা করিতেছে, ইহা মাতার কার্য নয়। গর্ভস্থ শিশুর নিকটও সে অপরাধী। সে তাহার নিকটও মার্জনা চাহিতেছে,—

"যে আমার জঠরে এসেছ, তুমিও আমায় মাপ করো। আমিও তোমার সঙ্গে মর্‌চি, তুমি অভাগা তাই অভাগিনীর জঠরে এসেছ। আমি যখন সধবা, তখন কেন এসোনি তাহলে কি আদর তা দেখতে।"

ভুবন কিন্তু আফিং খাইয়া আত্মহত্যা করিতে পারিল না। হরমণি তাহাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সে-যাত্রায় রক্ষা পাইলেও ভুবন মরিল।

অভাগা প্রসন্নকুমার। কন্যার বিবাহ দিয়াও তাঁহার শান্তি নাই। সেই কন্যার স্বামীই তাঁহাকে দুঃশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করিয়া গেল,—

"সত্য কথা বল্‌ছি, আমি যদি তোমার জামাই হই, প্রকাশ বাবু তোমার বড় জামাই নয়? ঐ বটকৃষ্ণ আর শুভঙ্কর একটা ছুঁড়ি এনে মালা বদল করে দিয়েছে—তাই বুঝি ধরা পড়েছি? আমিও তোমার যেমন জামাই, প্রকাশ বাবুও তোমার তেমনি জামাই। তবে মাঝে এই বে-দেওয়া hypocrisyটা নাই।"

কথাগুলি প্রসন্নকুমারের পক্ষে মর্মান্তিক। ভুবনের ব্যভিচার দেখিয়া অভিমানে এবং দুর্নামের ভয়েই তিনি কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। বিধবা হইলেও সে পুনরায় বিবাহিতা। সমাজ তাহাকে ব্যভিচারিণী

বলিবে না। কিন্তু বিধাতার অপূর্ব বিধান, সেই কন্যার স্বামীই বলিয়া গেল, এই বিবাহ মূলতঃ লাম্পট্য। বিবাহ ভাণ মাত্র। এ আঘাতেও প্রসন্নকুমার বিচলিত হন নাই। পুরুষের মতো অবিচল ধৈর্য ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রমদার অপমৃত্যুর আশঙ্কা করিয়া পার্বতী মাথা ঠিক রাখিতে পারিলেন না। প্রসন্নকুমারের স্ত্রী পাগল। রাস্তায় বাহির হইলে পাড়ার ছেলেরা ছড়া আবৃত্তি করিয়া টিট্‌কারী দেয়। ইহার পর বিনা অপরাধে পুলিশের নির্যাতন। প্রসন্নকুমার আর ধৈর্য রাখিতে পারিলেন না। উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া গিয়া ভুবনকে হত্যা করিলেন। তখনকার উক্তিটি বড় করুণ। অপমানের যন্ত্রণা এবং পিতৃস্নেহ উহার মধ্যে মিশিয়া রহিয়াছে,—

> গঙ্গাজল মুখে নে, যদি বেচে থাকিস্—শোন—আমি তোরে মাপ করেছি। শুনে যা—ভুবন বলে ডাক্‌ছি শোন্—ভুবন—ভুবন আমার ভুবন,—মা আমার! —না শুন্‌তে পেলিনি। চল্, তোর সঙ্গে যাই! তুই ছেলে মানুষ,—একলা যেতে পারবিনি।"

প্রসন্নকুমার আত্মহত্যা করিতে পারিলেন না। তাঁহার হাতের অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া প্রকাশ আত্মহত্যা করিল। প্রসন্নকুমার পড়িয়া গিয়া রক্তবমন করিয়া মারা গেলেন। বিধাতাকর্তৃক নির্যাতিত, সমাজকর্তৃক অপমানিত, ব্যথিত মানবাত্মা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। এ মৃত্যু স্বাভাবিক। ধীরে ধীরে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কর্মসঙ্ঘাতের মধ্য দিয়া এই মরণের প্রস্তুতি হইতেছিল। একটা কথা আমাদের এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে। দীনবন্ধুর নীলদর্পণের মতো গিরিশচন্দ্রের কয়েকখানি সামাজিক নাটকে মৃত্যু-বাহুল্য ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহা বলিয়া এই নাটকখানি অতি-নাটক বা melodrama হইয়া ওঠে নাই। মৃত্যু-বাহুল্য থাকিলেই নাটক অতিনাটক হয় না। সেই মৃত্যুর স্বাভাবিক পরিণতির জন্য পূর্ব হইতে প্রস্তুতি থাকা চাই। প্রসন্নকুমার, পার্বতী এবং ভুবনমোহিনীর মৃত্যুর জন্য সেই স্বাভাবিক প্রস্তুতি ছিল। প্রকাশের মৃত্যুকে আমরা অসম্ভব বলিব না। কিন্তু চতুর্থ অঙ্কের পূর্ব পর্যন্ত প্রকাশ-চরিত্রের যে সঙ্গত, স্বাভাবিক বিকাশ আমরা লক্ষ্য করি, চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কে তাহা নাই। এই দুই অঙ্কে চরিত্রটি আকস্মিকতা-দোষ-দুষ্ট সুতরাং অপরিণত।

নাটকের প্রধান কাহিনী ও চরিত্রগুলির বিশ্লেষণ করা গেল। এই নাটকে আরো দুইটি গৌণ কাহিনী পাশাপাশি চলিয়াছে। সর্বেশ্বর,

চিত্তেশ্বরী এবং ঘেঁচী ও তাহার ইয়ারগণকে লইয়া মনুষ্য-নামধারী পশুদের কাহিনী এই নাটকের একটি অংশ। আবার হরমণি, পাগল ও তাহাদের আশ্রিতা কন্যাদের লইয়া আর একটি শান্তির রাজ্যও পাশাপাশি গড়িয়া উঠিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের সমস্ত সামাজিক নাটকেই আমরা এই ত্রিধাবিভক্ত জগতের সন্ধান পাই। ইহার নাটকীয় সার্থকতা কি ?

বাঙালীর বৈচিত্র্যহীন কর্মজীবনে দ্রুত পট-পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা নাই। দুঃসাহসিক অভিযান, অভিনব আবিষ্কারের চমকপ্রদ কাহিনী বা রাজনৈতিক সঙ্ঘর্ষের দ্বন্দ্বীভূত ইতিহাস উনবিংশ শতকের বাঙালীর জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা নহে। তাহার জীবনে ঘটনার এতটুকু বৈচিত্র্য আনিতে হইলে বড়জোর একটা জালিয়াতি, জুয়াচুরি, কৌশলে সম্পত্তি-হরণ, দুশ্চরিত্র মাতালের নেশার ঝোঁকে মার-পিট প্রভৃতিরই আশ্রয় লইতে হয়। শহর কলিকাতা। এখানে ইতর ভদ্র সর্বপ্রকার লোক বাস করে। ইতরের পার্শ্বেই ভদ্র, ভদ্রের পার্শ্বেই ইতরের অবস্থান। তথাকথিত ভদ্র ঘরের ছেলে যদি জাহান্নামে যাইতে চাহে, একবার বাড়ি হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় নামিলেই সে সুবিধা পাইয়া যাইবে। আবার অপেক্ষাকৃত ধনী এবং ভদ্রঘরের সন্তানদের সর্বনাশের পথে টানিয়া আনিয়া তাহাদের অর্থে নিজেদের ঘর পুষ্ট করিবার জন্য একদল লোক ওঁৎ পাতিয়া থাকে। ছেলেদের সূত্র ধরিয়া উহারা তাহাদের মাতা-পিতার স্নেহের সুযোগ গ্রহণ করে ও সেখান হইতেও অর্থাদি হরণের সুবিধা করিয়া লয়। নাটকে বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য এবং নাট্য-কাহিনীর পরিণতি ঘটাইবার জন্য গিরিশচন্দ্র কলিকাতার এই ইতর-জনের জগৎটি টানিয়া আনিয়াছেন। আইন-সম্বন্ধে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এখানে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছে অনেক। আমাদের প্রশ্ন, এই জগৎটি কতখানি নাট্যোপযোগী হইয়াছে।

যে দুষ্ট সমাজের বিষয় গিরিশচন্দ্র নাটকে অবতারণা করিয়াছেন, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সেই সমাজ-পরিবেশের বিষাক্ত নিঃশ্বাসের স্পর্শ অনুভব করিয়াছিলেন। সেই বিষের জ্বালায় অস্থির হইয়া তিনি বহু বিনিদ্র-রজনী অশ্রুজলে উপাধান সিক্ত করিয়াছেন আর ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিয়াছেন, "কে কোথায় ত্রাণকর্তা আছ, আমাকে এই নরকযন্ত্রণা হইতে মুক্তি দাও।" মুক্তিদাতা আসিলেন। উনবিংশ শতকের গুণী-জ্ঞানী ভদ্র-সন্তান হইতে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত তাঁহাকে পাগল বলে। কেহ বড় একটা তাঁহার

সংস্পর্শে যায় না, কেহ কেহ দূর হইতে অকথ্য ভাষায় নিন্দা করে। কিন্তু ব্যথা-বেদনা লইয়া যে একবার তাঁহার সংস্পর্শে গিয়াছে, সে-ই তাঁহার অন্তরের গভীর প্রেমের স্পর্শ পাইয়াছে। সে বুঝিয়াছে, তিনি উন্মাদ নন,—দিব্যোন্মাদ, ব্রহ্মজ্ঞানী। মানুষের প্রতি ভালবাসায় তাঁহার হৃদয় ভরপুর। নিজে তিনি নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী। কিন্তু তাঁহার মতো লিপ্ত সংসারী কেহই নহে। বিশ্ব-দুনিয়াটাই তাঁহার সংসার। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে গিরিশচন্দ্র প্রেম, ত্যাগ ও সেবার আদর্শ পাইয়াছিলেন। তাই ব্যথিত; নির্যাতিত, আশ্রয়হারা নরনারীর জন্য গিরিশচন্দ্র কাল্পনিক সেবাশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। নরকের দহন-জ্বালা নিবারণের জন্য তিনি করিয়াছিলেন স্বর্গের শান্তি-কুঞ্জ রচনা। কারণ গিরিশচন্দ্র সমাজের নিরপেক্ষ দ্রষ্টা ছিলেন না, তিনি নূতন সমাজের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। এখন আমাদের দেখিতে হইবে, আদর্শ যত বড়ই হউক না কেন, নাটকে তাহার সঙ্গত রূপায়ণ হইয়াছে কি না।

নাটকে এক বা একাধিক গৌণ কাহিনী থাকিতে পারে। কিন্তু উহা মূলকাহিনী হইতে আত্যন্ত বিচ্ছিন্ন থাকিবে না। প্রধান কাহিনীকে পুষ্ট করিবার জন্যই উহার আগমন। কিছু দূর পর্যন্ত গৌণ কাহিনী বিচ্ছিন্ন ভাবে চলিলেও উহা প্রধান কাহিনীর অনিবার্য প্রয়োজনে কোনো এক সময়ে উহার অংশীভূত হইয়া মিশিয়া যাইবে। তখন দেখা যাইবে, নাটকের প্রধান ঘটনার পরিণতির জন্য ঐ গৌণ কাহিনী না-থাকিলে চলিত না। সর্বেশ্বর, ঘেঁচী, চিত্তেশ্বরী, শুভঙ্কর, বটকৃষ্ণ, মিঃ বাসু প্রভৃতির নাটকীয় প্রয়োজন অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রসন্ন-প্রকাশ-ভুবন কাহিনীর প্রয়োজনেই নাটকে ইহাদের আগমন। প্রত্যক্ষে হউক আর পরোক্ষে হউক, এই পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া চরিত্রগুলি বিকশিত হইয়াছে। প্রসন্নকুমারের পরিবারের অশান্তি সৃষ্টির জন্য বা ভুবন-প্রকাশ প্রেম-কাহিনীর শোচনীয় পরিণতি ঘটাইবার জন্য ইহাদিগকে না-হইলে চলিতই না। তবে এইটুকু মাত্র বলিতে পারি, কোনো কোনো স্থানে এই গৌণ কাহিনীর দুর্বলতা আছে। কোনো কোনো চরিত্র ঠিকমতো ফুটিয়া না-ওঠার জন্য কাহিনীর বিকাশেও বাধা ঘটিয়াছে। গৌণ-কাহিনীর ভিতর সবচেয়ে অবিকশিত চরিত্র সর্বেশ্বর। সে অশিক্ষিত, বর্বর, শয়তান ঘেঁচীর পিতা। নিজেও ভদ্রবেশী শয়তান। মনুষ্যত্ব বা মমতা তাহার নাই। নিজের দুইটি কন্যাকে সে বিবাহ দিয়াছে—একটি দ্বিতীয় পক্ষে, অন্যটি তৃতীয় পক্ষে।

তাহার লোভ ছিল, জামাইয়েরা মরিলে তাহাদের সম্পত্তি হস্তগত করিবে। ছোট জামাই মরণাপন্ন হইয়া পড়িলে তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করার কথা তাহার মনে আসে নাই, জামাইয়ের ঘর-দুয়ারে তালা লাগাইবার চিন্তাই তাহার মাথায় খেলিয়া গেল। এই নর-পশুটিই যে স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য প্রভু প্রকাশের সর্বনাশ করিয়াছে, এ-বিষয় নাটকে তাহার ক্রিয়া-কলাপের ভিতর দিয়া দেখানো হয় নাই। তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে হঠাৎ আমরা দেখিলাম সর্বেশ্বর আসিয়া প্রকাশকে সংবাদ দিতেছে, প্রকাশ যে বেণীবাবুর বিষয় বাঁধা দিয়াছে তাহা আর গোপন নাই। বেণীবাবুর জ্ঞাতিরা প্রকাশের নামে নালিশ করিবে। প্রকাশকে রক্ষা পাইবার যে পথ সে দেখাইয়া গেল, তাহার ভিতর নিজের কোনো দুরভিসন্ধি নাই। "উকিল বলেছে ভুবন-মোহিনী বিরূপ হলে সর্বনাশ! ভুবনমোহিনীর দেনায় বিষয় বাঁধা পড়েছে না দেখালে, আপনার নিস্তার নাই।" ইহার ভিতর মনিবের হিতচিন্তা ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। তাই প্রকাশ যখন বলে,—"তোমার অপরাধ নাই, আমারই সম্পূর্ণ অপরাধ। নইলে, তোমার মত ব্যক্তি আমার পরামর্শদাতা হবে কেমন করে?"—[৪র্থ অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক] তাহার অর্থ বুঝিতে পারি না। প্রকাশ যে সদাশিব চায়েন-রূপের গদীতে জাল হ্যাণ্ডনোট ভাঙ্গাইয়াছে সর্বেশ্বর তাহা জানে না। সুতরাং প্রকাশের সহিত অন্যায়-আচরণের সঙ্গী হিসাবে সে যে নাই তাহা বুঝা গেল। কিন্তু চিত্তেশ্বরী যখন প্রশ্ন করে যে নির্মলাকে কোথায় আনিয়া তুলিবে, তখন সর্বেশ্বরই ভাঙ্গা বাড়ির কথা বলিয়া দেয়। ইহাও পুত্রের অর্থ-প্রাপ্তি এবং দুরাচরণের জন্য,—মনিবের অকল্যাণের জন্য নহে। পঞ্চম অঙ্ক, পঞ্চম গর্ভাঙ্কে সর্বেশ্বর ইন্সপেক্টরকে অনুরোধ করিতেছে, নির্মলাকে সে যেন মিঃ বাসুর বাগানে লইয়া যায়। তাহাতে বুঝা যায়, ঘেঁচীর ষড়যন্ত্রের ভিতর সে আছে। আর এই ষড়যন্ত্রের কারণ যে অর্থলিপ্সা তাহাও অনুমান করা যায়। কিন্তু চরিত্রটি অতি ক্ষুদ্র এবং নিষ্ক্রিয়। ঘেঁচী ও প্রকাশের মধ্যে যোগ-সূত্র হিসাবে অবস্থান করিয়া সর্বেশ্বর কাহিনী জটিল করিয়া তুলিতে পারিত। প্রকাশ-চরিত্রের যে অংশ যবনিকার অন্তরালে থাকিবার জন্য নাটকটি ত্রুটি-পূর্ণ হইয়াছে সর্বেশ্বরের চরিত্র বিকাশের মধ্য দিয়া সেই ত্রুটি দূর হইতে পারিত।

কিন্তু দুইটি চরিত্র পূর্ণ-বিকশিত। নাট্যকাহিনীর জটিলতার জন্য, ইহার পরিণতি ঘটাইবার জন্য এই চরিত্র দুইটি অবশ্য প্রয়োজনীয়। ঘেঁচী

এবং চিত্তেশ্বরী,—ইহারা কলিকাতার সমাজ-জীবনের পচা নর্দমার কীট। অনেক সময়ে প্রাসাদের সিঁড়ি বাহিয়া ইহারা ভদ্র পরিবারের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে, গৃহলক্ষ্মীর শুভ্র শয্যাকেও বিষাক্ত, পঙ্কিল করিয়া তোলে। ঘেঁচী মাতাল, লম্পট, চিত্তেশ্বরী তাহার কুট্টনী। প্রসন্নকুমারের জীবনে এই দুইটি রন্ধ্রগত শনির মতো দুষ্ট গ্রহ। ইহারাই তাঁহার সুখের সংসারে আগুন লাগাইয়াছে। এই ঘেঁচী-চিত্তেশ্বরীর চরিত্র-বিকাশের জন্যই শুভঙ্কর বটকৃষ্ণের আবির্ভাব।

নাটকের প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কেই আমরা প্রধান কয়টি দুষ্ট চরিত্রকে পাইতেছি। নাট্যকার আদি হইতেই সু-কৌশলে ইহাদিগকে মূল কাহিনীর অংশীদার হিসাবে আনয়ন করিয়াছেন। দৃশ্যটির আরম্ভ হয় প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে সর্বেশ্বরের উক্তিতে। তাহার কথায়ই আমরা জানিতে পারি, প্রসন্নকুমারের শুধু পুত্রের মৃত্যু হয় নাই, এবার তাঁহার জামাইয়ের অবস্থাও শোচনীয়। বটকৃষ্ণ ও শুভঙ্কর সর্বেশ্বরের দুই সঙ্গী। সর্বেশ্বর অর্থ-পিশাচ, বটকৃষ্ণ সর্বেশ্বরের মতো সুযোগ পায় না বলিয়া আপশোষ করে। পুত্রকে সে চুরি-বিদ্যা শিক্ষা দেয়,—"হ্যাঁরে হেবো, তুই হরমণির কাছে যাস্ শুনতে পাই, তার টাকা কড়ি এদিক ওদিক পড়ে থাকে, কিছু সরাতে পারিস নি?" শুভঙ্কর মূর্খ গ্রহাচার্য। শান্তি-স্বস্ত্যয়নের নামে সরল ধর্মভীরু গৃহস্থকে ঠকাইয়া খাওয়াই তাহার পেশা। চিত্তেশ্বরী তাহার যজমান যোগাড় করে। প্রসন্নকুমারের বাড়িতে স্বস্ত্যয়ন করিবার জন্য তাহার ডাক পড়িল। শুভঙ্করের প্রথম আবির্ভাবেই আমরা নাটকে তাহার প্রয়োজন বোধ করিলাম। কিন্তু বটকৃষ্ণ ও সর্বেশ্বরের সহিত পরিচয় হইয়া রহিল মাত্র।

প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক। কলিকাতায় প্রতারকের অভাব নাই। এই ধরনের পুরোহিত, জ্যোতিষী ইহার এক শ্রেণী-বিশেষ। গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে ইহারা অন্তঃপুরে প্রবেশের সুযোগ করিয়া লইয়া নিজেদের বাক্য-বিন্যাস-কৌশলে নারীদের সরল চিত্ত জয় করিয়া লয়। শান্তি-স্বস্ত্যয়নের নামে মোটামুটি রকমে টাকা-পয়সা লইয়া সরিয়া পড়ে। শুভঙ্কর আচার্যের চরিত্রের মধ্য দিয়া গিরিশচন্দ্র ইহাদের বাস্তব রূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইহারা যে মূর্খ এবং প্রতারক তাহা ইহাদের ভাষায়ই প্রকাশ পায়। অশুদ্ধ সংস্কৃত শ্লোক, নিজেদের হাতে-গড়া দুই-চারিটা ছড়া প্রভৃতি

ইহাদের সম্বল। আচরণের ভিতর কপট বিষয়-বিতৃষ্ণা, বাক্যে সময় সময় গাম্ভীর্য, কথনো হঠাৎ মৌনাবলম্বন প্রভৃতি ইহাদের প্রতারণার কৌশল মাত্র। শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদির ফর্দ যাহা দিবে তাহার ভিতর প্রাপ্তির ভাগটি বেশ বড় করিয়াই উল্লিখিত থাকে। শুভঙ্কর আচার্যের কথিত শনির দোষ-শান্তির বচন,—

> "মাষকলাইঞ্চ তৈলঞ্চ মহিষাঞ্চ লোহাং
> চণকঞ্চ বস্ত্রং তণ্ডুলস্ত গাদা।"

গৃহিণী পার্বতী সংস্কৃত জানে না। তাঁহার নিকট দুই চারিটি 'ঞ্চ'-ই মন্ত্রের পক্ষে যথেষ্ট উপকরণ। সুতরাং গ্রহাচার্যের উক্তিকে বেদবাক্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে তাহার আটকায় না। বিষয়-বুদ্ধিতে চিত্তেশ্বরী শুভঙ্করের আচার্য। ফর্দটি হাজার টাকার মতো ধরিয়া দিল। কিন্তু শেষ কালে পার্বতীর যাহাতে অবিশ্বাস না হয় তাহার পথ করিয়া রাখিল,— "আর দক্ষিণে যা দিতে পারো।" কারণ সাধক নির্লোভ ব্রাহ্মণ জন-কল্যাণের জন্যই স্বস্ত্যয়ন করিতে আসিয়াছেন,—অর্থের জন্য নহে। তাই বলিয়া দেবতাকে ঠকানো যায় না। নির্মলা কিন্তু চিত্তেশ্বরীর ষড়যন্ত্র ভেদ করিয়াছিল। সে বলিয়াছিল,—"মা এরা জোচ্চর।" কিন্তু পার্বতীর মাতৃ-হৃদয় তাহা মানিতে চাহিতেছিল না। অর্থের মমতা ত্যাগ করিয়াই যে তাহাকে জামাতার কল্যাণ কামনা করিতে হইবে।—"গ্রহ-শান্তিতে করণ-কস্থি করেও লোকে ফল পায় না।" সন্তানের জন্য মাতৃ-হৃদয়ের এই শুভাকাঙ্ক্ষাটুকু ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই এই দৃশ্যে ঐ-দুইটি হীন-চরিত্রের অবতারণা সার্থক হইয়াছে।

প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক। স্বস্ত্যয়ন হইয়া গেল। আচার্য আগে হইতেই ভারী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। জিনিস-পত্র সব সরাইয়াছে। দক্ষিণা লইয়া পালাইবার অবকাশ যে আর নাই, চাকর-বাকরদের কানাকানিতে শুভঙ্কর তাহা বুঝিতে পারিল। তাই সে অ্যাঁ—অ্যাঁ করিয়া কোনোমতে পলাইয়া বাঁচিল।

এইবার ঘেঁচী-চিত্তেশ্বরীর পালা। শুভঙ্কর-চিত্তেশ্বরীর শিকার ছিল পার্বতী, এবার ঘেঁচী-চিত্তেশ্বরীর শিকার প্রসন্ন। ঘেঁচী সংবাদ পাইয়াছে, প্রসন্নকুমার বিধবাকন্যা নির্মলার বিবাহ দিবেন। ঘেঁচী তাহার পিতাকে প্রসন্নকুমারের নিকট ঘটকালির জন্য পাঠাইতে ইচ্ছা করিতেছে। কিন্তু পিতার যোগ্যতায় সন্দিহান হইয়া সে নিজেই রওনা হইল।

দ্বিতীয় অঙ্ক, ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক। প্রসন্নকুমার ভুবনমোহিনীর ঘরে প্রকাশকে দেখিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার অন্তর ভুবনের আচরণে বিষাক্ত হইয়া রহিয়াছে। এই সুযোগ্য মুহূর্তে চিত্তেশ্বরী ও সর্বেশ্বরের আগমন হইয়াছে। বিধবা-বিবাহে যেটি সমস্যা তাহার উল্লেখ করিয়াই দৃশ্যটির আরম্ভ হয়। চিত্তেশ্বরী বলিতেছে,—"বাবু, পুরুত না পাও আমার ভাই তোমার পুরুত হবে। এই বটকৃষ্ণ সর্বেশ্বরের পুরুত হবে, আমি জনকতক মেয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এয়ো হব।" নাট্যকার এই স্থানটিতে সংলাপের সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। চিত্তেশ্বরী বা সর্বেশ্বরের উক্তির মধ্যে অসঙ্গতি নাই। সর্বেশ্বর বরের পিতা। অধিক কথা তাহার শোভা পায় না। সে আগে কথাও বলে নাই। প্রসঙ্গ তুলিয়াছে চিত্তেশ্বরী। সর্বেশ্বর বলিল,—"আমি কি প্রস্তুত থাকব?" কিন্তু হেবোর উক্তি দুইটি পরিস্থিতির গুরুত্ব নষ্ট করিয়া দিয়াছে। নাট্যকার এখানে হেবোকে না আনিলেই ভাল করিতেন। ঘেঁচীর ষড়যন্ত্র ভেদ করিবার জন্য পরে হেবো চরিত্রের প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু এখানে তাহার প্রয়োজন নাই।

ঘেঁচীর সহিত প্রমদার বিবাহ হইয়া গেল। তাহাদের দাম্পত্য-জীবনের স্বরূপ পূর্বেই উদ্‌ঘাটন করিয়াছি। সুতরাং পুনরুক্তি করিব না। মাতাল, লম্পট ঘেঁচী। ঊনবিংশ শতকের লেখাপড়া-জানা, অভব্য বিলাত-ফেরৎ বা ইংরেজী চাল-চলনের অনুকারী বঙ্গ-নন্দনের প্রতিনিধি সে। প্রমদাকে সে বিবাহ করিয়াছিল টাকার লোভে। প্রমদার পিতার অর্থ শোষণের যখন আর পথ থাকিল না, তখন তাহার শ্লীলতার মূল্যে সে অর্থ আহরণের চেষ্টা করিল। নারী তাহার নিকট ভোগের সামগ্রী। নিজের স্ত্রীর ঘরে সে মাতাল ছাড়িয়া দেয়। তাহাকে পণ্যের মতো বিক্রয় করিতে চেষ্টা করে। প্রমদা যখন তাহার প্রস্তাবে রাজী হইল না, তখন সে তাহাকে শুধু দূর করিয়াই দিল না, তাহার মৃত্যুর মধ্য দিয়া অর্থ-গ্রহণের সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। প্রমদা আত্মহত্যা করিতে গঙ্গায় ছুটিয়াছে। সে মরিলে প্রসন্নকুমারকে কন্যার মৃত্যুর জন্য দায়ী করিয়া সে নালিশ করিবে। এদিকে আবার টাকার লোভে সে চিত্তেশ্বরীর সহিত পরামর্শ করিয়া নির্মলাকে মিঃ বাস্থর বাগানে আনিবার চেষ্টা করিতেছে।

চতুর্থ অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক—চিত্তেশ্বরীর চরিত্র-বিচারের জন্য দৃশ্যটি প্রয়োজনীয়। নির্মলার নিকট চিত্তেশ্বরী ভুবনের চিঠি লইয়া আসিয়াছে।

মিথ্যাকথার মধ্য দিয়া সে নির্মলার মনে বিশ্বাস জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছে,—

> "মা কু-কাজ করে ফেলেছে, ঘর-দোর সব ভেসে গিয়েছে, বাড়ী নাই, মরবার সময় তোমার সঙ্গে দেখা করে কি বল্‌বে। দুর্বুদ্ধি দেখোনা, কর্‌লি—কর্‌লি, নিজের বাড়ীতে কর্‌—তা নয় আস্তাবল বাড়ীতে গে উঠেছে।"

কু-কাজ যে করিয়া ফেলিয়াছে তাহা বিশ্বাস করিতে নির্মলার সময় লাগিবে না। কারণ ভুবন-প্রকাশ-প্রসঙ্গ সে জানে। ভুবন যত অপরাধই করুক না কেন, মরণ-সময়ে নির্মলা তাহাকে ক্ষমা করিবে এবং তাহার মৃত্যু-শয্যার পাশে আসিবে ইহা স্বাভাবিক। পাছে আবার সে ভুবনের বাড়িতে আসিয়া না ওঠে, তাহার জন্য চিত্তেশ্বরী ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছে,—"কর্‌লি,—কর্‌লি, নিজের বাড়ীতে কর্‌—তা নয়, আস্তাবল বাড়ীতে গে উঠেছে।" ইহার পর নির্মলা আর প্রশ্ন করিবে না যে কোথায় গিয়া উঠিবে। কিন্তু এই ষড়যন্ত্র যদি ধরা পড়িয়া যায়? সেই ভয়ে চিত্তেশ্বরী শেষ চাল দিয়া গেল। নির্মলা যাহাতে আর কাহারও সঙ্গে এবিষয়ে আলাপ না করে সেজন্য সাবধান করিয়া গেল,—"তবে যেও মা,—লজ্জার কথা,—থানা-পুলিশের কথা,—পাঁচজনকে বলো না। আমি বলিগে, তুমি আসছ।" কিন্তু চিত্তেশ্বরীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। নির্মলা তাহার বাবার নিকট চিঠিখানা দিয়া দিল। ওদিকে হেবো হরমণির নিকট চিত্তেশ্বরীর ষড়যন্ত্র ভেদ করিয়া দিল।

চিত্তেশ্বরী কিন্তু এখানে থামিল না। প্রমদাকে যে প্রসন্নকুমার বিষপান করাইয়া হত্যা করাইয়াছেন ইহা প্রমাণ করিবার জন্য একটি মিথ্যা মামলার ষড়যন্ত্র সে করিতেছে। বাড়ির ঝি-চাকরদের সঙ্গে চিত্তেশ্বরী-জাতীয় চরিত্রের পরিচয় ঘনিষ্ঠ। সে প্রসন্নবাবুর ঝি এবং বেয়ারাকে হাত করিয়াছে। তাহারা সাক্ষ্য দিবে যে প্রসন্নবাবু তাঁহার স্ত্রীকে বলিয়াছেন কন্যাকে বিষ দিতে। শুভঙ্কর সাক্ষ্য দিতে রাজি হইল না। কিন্তু সে চোর। হোম করিতে গিয়া বেনেদের বাড়ি হইতে সোনার বাট চুরি করিয়া আনিয়াছে। চিত্তেশ্বরী উহা প্রকাশ করিবার ভয় দেখাইয়া তাহাকে বাধ্য করিল। পুলিশ আসিয়া প্রসন্নকুমারকে বন্দী করিল। চিত্তেশ্বরী নির্মলাকে টানিয়া বাহির করিল। প্রসন্নকুমার আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। চিত্তেশ্বরীর গলা টিপিয়া ধরিলেন। প্রসন্নকুমারকে উত্তেজিত করিতে ভুবন,

প্রকাশ, ঘেঁচীর ন্যায় চিত্তেশ্বরীও সমান অংশ গ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের সমবেত অন্যায় আচরণেই শেষপর্যন্ত প্রসন্নকুমার ধৈর্যহারা হইয়া উঠিলেন। সমস্ত নাটক জুড়িয়া প্রধান ও অপ্রধান কাহিনী পরস্পরের সজ্ঘাতে গতি-প্রবণ হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের সমবেত শক্তির প্রয়োগ হইয়াছে নাটকের শেষ দৃশ্যে। দুই একটি চরিত্রের সামান্য অস্ফুটতার জন্য কাহিনীর যোগসূত্র মাঝে মাঝে ক্ষীণ বা অস্পষ্ট হইয়াছে মাত্র। কিন্তু কোথায়ও বিচ্ছিন্ন হয় নাই।

এইবার পাগল-হরমণি কাহিনী। হরমণি সামাজিক নির্যাতনের আর একটি দিক। জমিদার-পুত্র ষড়যন্ত্র করিয়া তাহার স্বামীর মিথ্যা মৃত্যু-সংবাদ রটাইয়াছে; তাহাকে বিধবা সাজাইয়া তাহার মর্যাদা নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছে। শেষপর্যন্ত সে যাহার আশ্রয় পাইল, সে তাহার স্বামী। কাহিনীটি কর্মহীন বর্ণনার মধ্য দিয়া রূপকথার মতো বিবৃত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু নাটকে হরমণি যেখানে যেখানে প্রধান পাত্র-পাত্রীর সংস্পর্শে আসিয়াছে, সেখানে সেখানে নাটকে তাহার প্রয়োজন অস্বীকার করিবার মতো নয়। কিন্তু কয়েক জায়গায় ইহা আকস্মিকতা-দোষদুষ্ট। রাত্রিকালে প্রমদা আত্মহত্যা করিতে ছুটিলে সঙ্গে সঙ্গে হরমণি সংবাদ পায়। পাগল-চরিত্রে স্বাভাবিকত্ব একেবারেই বিবর্জিত হইয়াছে। পাগল নামটি কেন হইল বুঝি না। কারণ তাহাকে কখনও প্রলাপ বকিতে শুনি নাই। সুস্থ মস্তিষ্কে সে সব সময়ই কথা বলিয়াছে। তাহাকে পাগলবেশী পরোপকারী ধরিয়া লইতে আমাদের আপত্তি থাকিত না। পরোপকার সে করিয়াছেও অনেক। কিন্তু তাহার চরিত্রটি একেবারেই অবিকশিত অবস্থায় যবনিকার অন্তরালে রহিয়া গিয়াছে। সদাশিব-চায়েনরূপ-এর গদীর প্রধান অংশীদার সদাশিব যদি পাগল সাজিয়া থাকে, অথবা কখনও পরোপকার করিবার জন্য পাগল সাজে, তাহাই বা কি করিয়া গোপন থাকিয়া হঠাৎ একদিন প্রকাশ পাইল? পাগল-হরমণি নাট্য-কাহিনীতে অবিচ্ছেদ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছে সত্য, কিন্তু চরিত্র দুইটির সার্থক রূপায়ণ হয় নাই।

"শাস্তি কি শান্তি" নাটকের বিস্তৃত আলোচনা করিয়া দেখা গেল, গিরিশচন্দ্রের নাটকখানি সামাজিক। সমাজের সমস্যাই উহার মূল অবলম্বন। রূপায়ণের দিক দিয়া নাটকখানি দোষ-ত্রুটি-বর্জিত না হইলেও বহুস্থানে উহা নাট্যকরের উচ্চাঙ্গের সৃজনী প্রতিভার পরিচয় বহন করে চরিত্র-চিত্রণের

মধ্য দিয়া নাট্যকারের সমাজপরিচিতি, লোকচরিত্রজ্ঞান এবং সমসাময়িক জীবন-সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তী সামাজিক বা পারিবারিক নাটক সম্বন্ধেও ঐ একই কথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিতে হইবে। সুতরাং নাটকগুলির বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া উহাদের বৈশিষ্ট্যটুকুরই আলোচনা করিব।

হারানিধি নাটকখানি প্রহসন-ধর্মী। সমাজ-জীবনের কোনো গভীর সমস্যা এই নাটকের আলোচ্য বিষয় নহে। মোহিনীমোহন স্বভাবশয়তান। সে বদমায়েস্। ঘরের বৌ বাহির করিয়া আনে। বন্ধুকে সুকৌশলে ঠকাইয়া তাহার সম্পত্তি হরণ করে। নিজের কন্যা-স্থানীয়া বন্ধুকন্যার প্রতি তাহার দৃষ্টি পতিত হয়। বিবাহিত জীবনেও সে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে শেখে নাই। কিন্তু তাহার ভিতর সন্তান-স্নেহ আছে,—কন্যা হেমাঙ্গিনীকে সে ভালবাসে। এই হেমাঙ্গিনীর প্রতি স্নেহই তাহাকে সুপথে ফিরাইয়া আনিল। কিন্তু চরিত্রটি গতানুগতিক। ইহার ক্রমবিকাশের স্তরগুলি সুস্পষ্ট নহে। নাট্যকার এই চরিত্রটির উপর খুব গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন বলিয়াও মনে হয় না। অঘোর-চরিত্র বিকাশেই এই নাটকে গিরিশচন্দ্রের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হইয়াছে। নীলমাধব একটি আদর্শ চরিত্র, কিন্তু জীবন্ত নহে। পিতার সম্পত্তি-হীনতায়, মাতা ও ভগিনীর নির্যাতনে তাহার মনে কোনো আন্দোলনের সৃষ্টি হয় নাই। সে মূর্তিমান পরোপকার, ক্ষমার জীবন্ত বিগ্রহ। নাটকে নীল-মাধবের চরিত্র বলিয়া কিছুই নাই। হৈমবতী, সুশীলা, কমলা প্রভৃতি বাঙ্গালী ঘরের সাধারণ কন্যা। তাহাদের চরিত্রে বৈচিত্র্য নাই। নাট্যকাহিনীর পরিণতিতে হেমাঙ্গিনীর একটু স্থান আছে। মাতালের আক্রমণে মানসিক আঘাত পাইয়া সে অসুস্থ হইল। ডাক্তার রোগের গোড়া আবিষ্কার করিলেন। নীলমাধবের প্রতি প্রেমের অবরোধই তাহার অসুস্থতার কারণ। কিন্তু নাটকের কোথাও পূর্ব হইতে তাহার কোনো প্রস্তুতি নাই। সে একটি সরলা বালিকা। সুশীলার সঙ্গে তাহার যে আলাপ হইয়াছে, তাহা হইতে এইটুকু বুঝা যায় যে তাহার নাবালিকা ভাব এখনও কাটে নাই। সে নিতান্তই কচি খুকী। হঠাৎ সেই কন্যার অবচেতন মনের রুদ্ধ প্রেমকে টানিয়া বাহির করিয়া তাহার দ্বারা নাটকের পরিণতি ঘটাইবার চেষ্টা করিলে উহা আকস্মিকতা-দোষদুষ্ট হইবে।

মোহিনীর সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়াছে অঘোর। সে নাট্যের নায়ক।

দর্শকের সমস্ত কৌতূহল কেন্দ্রায়িত হয় অঘোরের চরিত্রে। আর এই অঘোরের চরিত্রের জন্যই নাটকটি প্রহসনধর্মী হইয়াছে। অঘোরের উপস্থিত বুদ্ধি, শঠতাপূর্ণ বাক্য ও আচরণ নাটকখানিকে আদ্যন্ত হাস্যরসে অভিষিক্ত করিয়া রাখে। কিন্তু সেই হাস্যের অন্তর্নিহিত মর্মজ্বালা নাটকখানিকে সময় সময় এমন গাম্ভীর্য দান করে যাহাতে উহা আর প্রহসন থাকে না, ট্রাজেডীর গভীরতা উহার ভিতর খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

অঘোর কিন্তু স্বভাব-শয়তান নহে। পরিস্থিতি তাহাকে শয়তানী অবলম্বন করিতে বাধ্য করিয়াছে মাত্র। শয়তানী তাহার আত্মরক্ষার অবলম্বন। এন্‌ট্রান্‌স ফেল করার পর অন্য কোন চাক্‌রী-বাক্‌রী যোগাড় করিতে না পারিয়াই সে সৎ-মায়ের সিন্দুক ভাঙ্গিয়াছে, পশ্চিমে ডাক্তারী করিতে গিয়া হত্যার দায়ে পড়িয়াছে। পুলিশ-রিপোর্টে সে মৃত। সুতরাং অঘোর মিত্র স্ব-নামে বাঁচিয়া উঠিলেই মরিয়া যাইবে। তাই সে প্রেতের মতো অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া চলা-ফেরা করে। বাঁচিবার প্রয়োজনেই সে প্রতারণার অনেক রকম কৌশল শিক্ষা করিয়াছে। অর্থের অভাব তাহার হয় না। কোথাকার কোন্ জমিদার-পুত্র বাড়ি হইতে পলাইয়া আসিয়াছে। তাহার খোঁজে আসিয়াছে দেশের লোক। তাহাকে ঠকাইয়া টাকা আদায় করিবার মতো উপস্থিত বুদ্ধি অঘোরের জুটিয়া যায়। দারোয়ানের বাক্স ভাঙ্গিয়া টাকা চুরি করার কৌশলটিও বেশ। তাহার প্রতিটি প্রতারণার কার্যের মধ্য দিয়া যে হাস্যরসাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, এই কর্ম-সঙ্ঘাত-হীন নাটকের তাহাই একমাত্র আকর্ষণ।

বাহিরে যে অঘোর শয়তান, তাহার অন্তরে একটি দেবতা ঘুমাইয়া ছিল। সুশীলার পতি-প্রেমের স্পর্শে তাহার জাগরণ হইল। নাট্যকার ইহা লইয়া কাব্যের উচ্ছ্বাস করেন নাই। সুশীলার প্রেমের সংস্পর্শে ধীরে ধীরে অঘোর-চরিত্রের যে বিকাশ ঘটিয়াছে, সুকৌশলে তিনি তাহা দেখাইয়াছেন। কোথাও কোথাও ইহার প্রকাশ হইয়াছে স্থূল, কোথাও তাহা সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব-সম্মত। প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্যে নবর মুখে অঘোর সুশীলার কঠোর বৈধব্য ব্রতের কথা শুনিয়াছে। কিন্তু উহা সে সহজে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। কারণ তাহার মতে,—"বিধুমুখীদের যখন সোয়ামী মরে, তখন মাছের শোকেই হোক আর সোয়ামীর শোকেই হোক খানিক উপুড় হয়ে পড়েন, তারপর চিনির পানা মুখে দিয়ে উঠে বসেন, তারপর দিনদিন প্রবল শোকে ফুলতে

থাকেন,—যেমন রাগে ফোলেন তেমনি অনুরাগে ফোলেন।"—[হারানিধি, ২য় অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক।] নারী-চরিত্র সম্বন্ধে যাহার এই ধারণা, সেই ব্যক্তি শনির দাওয়ায় বসিয়া অন্যের মুখে তাহার স্ত্রীর সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছে তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছে। খুড়তুতো শ্বশুরের মুখে স্ত্রীর কথা শুনিয়া সে বিশ্বাস করে নাই, অন্যের মুখে শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছে। তাহার ধারণা, "বুঝিবা দুর্মতি ছেড়ে এই স্ত্রী নিয়ে ঘর করতে পারলে সুখী হতুম।" কিন্তু যে ঘর ভাঙ্গিয়াছে তাহা বাঁধিবার আশা আর তাহার নাই। কোনো মতে ধরা পড়িলেই বিচারালয়ে হাজির হইতে হইবে। পত্নীর প্রতি প্রেমই রূপান্তরিত হইল শ্বশুরের উপকারের বাসনায়। আর শ্বশুরের উপকার করার অর্থ মোহিনীর সর্বনাশের রাস্তা তৈয়ার করা। মোহিনীকে দিয়াই সে তাহার শ্বশুরের সম্পত্তি ফেরৎ লিখাইয়া লইবে। অঘোর মোহিনীর দুর্বলতা জানে। তাই সে গোহিরপুরের জমিদারের ভূমিকা অভিনয় করিয়া মোহিনীকে উত্তেজিত করিয়া গেল। জমিদারপুত্রের মন সুশীলার উপর আর নাই, এখন সে গুণনিধির স্ত্রীর উপর নজর দিয়াছে, মোহিনীকে শুনাইয়া সে এই কথা বলিয়া গেল। মোহিনী অঘোরের চাল বুঝিতে পারিল না। একদিকে সে গুণনিধির নিকট তাহার স্ত্রীকে দান করিবার প্রস্তাব করিয়া বসিল, অন্য দিকে সুশীলাকে হাত করিবার জন্য নবর পিছনে পিছনে ছুটিতে লাগিল। ওদিকে অঘোর গোহিরপুরের জমিদার সাজিয়া মোহিনীর নিকট হইতে হ্যাণ্ডনোট কাটিয়া লইয়া তাহার বিরুদ্ধে সেই টাকা দিয়া মামলা চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই মামলার সাহায্যকারিণী হিসাবে কাদম্বিনীকে যোগাড় করায় অঘোরের সুচতুর বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। রাস্তায় বসিয়া কাদম্বিনী গান করিতেছিল। অনেকে তাহাকে চাউলাদি ভিক্ষা দিতেছিল। মোহিনীর মেয়ে একটি টাকা দিলে কাদম্বিনী তাহা ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। ইহা হইতে অঘোর নিশ্চয়ই বুঝিয়াছিল, মোহিনীর প্রতি প্রবল ঘৃণা না থাকিলে তাহার মেয়ের একটা টাকা ভিখারিণী কখনও ফেলিয়া দিয়া যাইতে পারে না। ইহা নব বুঝিল না। সে কখনও ভিখারী সাজে নাই। ভিখারীর নিকট একটা টাকার কি মূল্য তাহা সে জানে না। অঘোর টাকার মূল্য জানে। এ হেন টাকাটাও যে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া যায় তাহার অন্তরে ভিক্ষাদাতার প্রতি ঘৃণা কত প্রবল! তাহার জীবন তাহাকে অপূর্ব অভিজ্ঞতা দান করিয়াছে।

প্রধান ঘটনা। সুতরাং অলৌকিকত্ব শঙ্কর-জীবনীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শুধু শঙ্করাচার্যের নয়,—মহাপুরুষ মাত্রের জীবনীই অলৌকিক গল্পের সমন্বয়ে অদ্ভুত হইয়া আমাদের গোচরীভূত হয়। তবুও যিনি সুকৌশলী নাট্যকার, তিনি ঐ অলৌকিক কাহিনীর সঙ্গে লৌকিকতার সমন্বয় করেন। মহাপুরুষের জীবন আমাদের সাধারণ মানুষের জীবনের ন্যায় অতি-পরিচিত নয় সত্য, কিন্তু তাঁহাদের জীবনে দ্বন্দ্বসজ্ঘাতের অভাব নাই। মহাপুরুষের জীবন-চলনার সহিত পারিপার্শ্বিক সাধারণ মানুষের চলনার ও নীতি-বোধের পার্থক্য থাকার জন্য অনেক সময় স্বাভাবিক বিরোধ দেখা দেয়। প্রবৃত্তি-পরতন্ত্র মানুষের নিকট হইতে তাঁহারা যতখানি বাধা পান, ততখানি আর কেহ পায় না; তাহাদের দ্বারা যতখানি নির্যাতিত হন, ততখানি আর কেহ হয় না। সুতরাং বাধা-বিপত্তির সজ্ঘাতে তাঁহাদের জীবন কর্ম-চঞ্চল ও দ্বন্দ্বময় হইতে বাধ্য। সেইজন্য মহাপুরুষজীবনীর ভিতর নাটকীয় উপাদান যথেষ্টই থাকে। সেই সব বাধা-বিঘ্ন-সঞ্জাত অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বকে নিছক অলৌকিক কাহিনীর দ্বারা অভিভূত করিয়া দিলে নাটকের আকর্ষণ কিছুই থাকে না। তাই 'শঙ্করাচার্য' নাটকে এত ঘটনা ও এত দার্শনিকতার সমাবেশ থাকিলেও তাহা নাটকীয় হয় নাই।

প্রসঙ্গতঃ এখানে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'রামানুজ' নাটকের সহিত গিরিশচন্দ্রের শঙ্করাচার্যের খানিকটা তুলনা করা যাইতে পারে। শঙ্করাচার্য ও রামানুজ উভয়েই বেদান্ত-ব্যাখ্যাতা। উভয়েই অবতারপুরুষ। উভয়েই ধর্মের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। উভয়েরই জীবনে অনেক অলৌকিক লীলার প্রসঙ্গ রহিয়াছে। কিন্তু দুই শক্তিমান নাট্যকারের রচনায় এই দুই চরিত্র চিত্রণে কতখানি পার্থক্য! শঙ্করাচার্যে মহামানব মানবীয় জগতের সঙ্গে বাস্তবতার সম্পর্ক রক্ষা করেন না; হৃদয়-বৃত্তিও বুদ্ধিবৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাতে তাহার চরিত্র রূপায়িত হয় না। কিন্তু রামানুজে কাহিনীর বাস্তবতাগুণ ও চরিত্রের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ দেখা যায়। উভয়েই পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী। নাটকের আরম্ভে উভয়েরই মহাতত্ত্ব-জিজ্ঞাসা স্বগতোক্তির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু শঙ্করাচার্যের উক্তির মধ্যে সত্যবোধ বা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আছে, হৃদয়-বৃত্তির দ্বন্দ্ব নাই। তাই উহা যেন নীরস ধ্বনির মতো শুনায়। রামানুজের ব্রহ্মবোধ যাদবাচার্যের অপব্যাখ্যা এবং নিজের

স্বাভাবিক সংস্কারের সঙ্গে মহাদ্বন্দ্ব তুলিয়াছে। ভাব-চিন্তায় তন্ময় মানুষটিকে আমরা 'রামানুজ' নাটকের আরম্ভে পাই। 'শঙ্করাচার্য' নাটকের প্রথম অঙ্কে প্রথম দৃশ্যের আরম্ভেই শঙ্করের যে স্বগতোক্তি তাহা শঙ্করের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও ব্রহ্মজ্ঞানের পরিচয় দেয়, অন্তর্দ্বন্দ্বের নহে—

"……কর আঁখি নিমীলন,
হের নিত্য চৈতন্যস্বরূপ তুমি।
কার্যে নরকায়, এসেছ ধরায়,
যাও নিত্যধামে পুনঃ কার্য অবসানে।"

ইহার পর এই আজন্মসিদ্ধ মহাপুরুষ মাতা বিশিষ্টার সঙ্গে যখন আলাপ করিতেছেন, তখন আমরা পরিষ্কার বুঝিতে পারি, ইনি আর যাহা কিছুই হউন না কেন, সাধারণ মানুষ নহেন। তিন বৎসর বয়সের মধ্যেই তাঁহার বর্ণপরিচয় এবং পুরাণপাঠ সমাপ্ত হইয়াছে। শৈশব হইতেই বেদবিদ্যা তাঁহার স্বভাবগত। তারপর তিনি জানেন, তিনি অল্পায়ু। সুতরাং সন্ন্যাস তাঁহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে।

আমরা জানি, মহাপুরুষদের অল্প-বয়সেই দিব্যজ্ঞান হয়। কিন্তু পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিবার জন্য তাঁহাদের ঐ অলৌকিক জীবনেও লৌকিকত্ব থাকে। শ্রীচৈতন্য, সমর্থ রামদাস স্বামী, কবীর প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ পর্যন্ত কোনো মহাপুরুষই লৌকিক জীবনের বাস্তবতা ও দ্বন্দ্বসঞ্জাত অস্বীকার করেন নাই। করিলে তাঁহাদের জীবনকে আমরা আজ এতখানি মহনীয় করিয়া দেখিতাম কিনা জানিনা। তাই প্রশ্ন হয়, শঙ্করাচার্যের জীবন কি শুধু নির্দ্বন্দ্ব অলৌকিকতা পূর্ণ ছিল?

সে যাহাই হউক 'রামানুজ' নাটকের আরম্ভেও আমরা সর্বপ্রথমে রামানুজের ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার বাণীটিই শুনি। কিন্তু সে জিজ্ঞাসা যে একটি রক্ত-মাংসের দেহধারী সামাজিক মানুষ করিতেছে, তাঁহার চিন্তার তন্ময়তায়, তাঁহার গুরুভক্তি ও আত্মজ্ঞানের দ্বন্দ্বে তাহা অতি স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে। আর সুদক্ষ নাট্যকারের পরিবেশ-রচনার কৌশলে এই দৃশ্য জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। বাহ্য-জ্ঞান-বিরহিত, সমাহিতচিত্ত রামানুজ ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ত্ব লইয়া নিজের অন্তরে তীব্র আন্দোলন তুলিয়াছেন। আর বাহিরে দাঁড়াইয়া তাঁহার জনৈক সতীর্থ তাঁহাকে ডাকিতেছেন। কিন্তু রামানুজের কানে সে ডাক পৌঁছাইতেছে না। সতীর্থ যতবার ডাকিতেছেন, রামানুজের চিন্তা স্বগতোক্তিতে ততই প্রবল

আকার ধারণ করিতেছে। এমন সময় তাঁহার মা আসিয়া ধ্যান ভাঙাইয়া দিলেন। তিনি জানাইলেন, আচার্য যাদব-প্রকাশ তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। পুত্র মাতাকে জানাইলেন, তিনি যাদবাচার্যের ব্যাখ্যা স্বীকার করেন না। ভীতা জননী পুত্রকে ভৎর্সনা করিলেন। পুত্র প্রতিজ্ঞা করিয়া গেলেন, নিজের ধর্মমত সম্বন্ধে, জিজ্ঞাসিত না হইলে তিনি কিছুই বলিবেন না। রামানুজের এই চিন্তাতন্ময়তা ও আত্মসচেতনতা একদিকে যেমন তাঁহার ভবিষ্যৎ মহাপুরুষত্ব ঘোষণা করে অন্যদিকে তেমনি মাতৃ-আজ্ঞা পালনে তাঁহার মানবীয় মহিমাকেও প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু তাই বলিয়া অলৌকিক কোনো বাক্য বা কার্যের দ্বারা তিনি মাকে প্রবোধিত করেন নাই। যাদবাচার্যের সঙ্গে একটা মতবিরোধের আভাস যাহা আমরা মাতাপুত্রের কথার মধ্য দিয়া পাইলাম, তাহারই জটিল সম্ভাবনার ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিল দীপ্তিমতী ও কান্তিমতীর আলাপে। রামানুজের মতো অল্পবয়স্ক, নিম্নশ্রেণীর ছাত্রের নিকট বেদান্তের পাঠ লইবার জন্য যাদবাচার্য তাঁহার শিষ্যদিগকে আদেশ করিয়াছেন আর, সমস্ত শিষ্য ইহাতে অপমান বোধ করিয়া বিদ্রোহ করিয়াছে। সুতরাং দেখিতেছি, ঘটনার বহির্দ্বন্দ্ব নাটকীয় কৌশলে অন্তর্দ্বন্দ্বের পাশাপাশি চলিয়াছে। যাদবাচার্য ও রামানুজের এই দ্বন্দ্ব বরাবর নাটকীয় ভঙ্গীতে প্রবাহিত হইয়াছে। গোণ্ডারণ্যে রামানুজের বধের চেষ্টা ও রাজকন্যার ভৌতিক অভিভবে যাদবাচার্যের ঈর্ষ্যামূলক আচরণ মানবীয়তাকেই অনুসরণ করে।

অবশ্য গিরিশচন্দ্রের প্রভাবে এই নাটকে অলৌকিকত্বের যথেষ্ট আগমন হইয়াছে। চণ্ডাল-চণ্ডালিনীবেশে হর-পার্বতী শঙ্করাচার্যকে ছলনা করেন এবং মণ্ডনমিশ্রের পরাজয়ে সাহায্য করেন। সেইমত রামানুজকে গভীর অরণ্যে ব্যাধ ও ব্যাধ-পত্নীবেশে লক্ষ্মী-নারায়ণ রক্ষা করেন। রামানুজের নিকট যাদবাচার্যের শেষ পরাজয় লৌকিক উপায়ে হয় নাই। নাটকে পূর্বাপর যে মহাজ্ঞানী প্রতিপক্ষ নিজের মানবীয় কর্মপ্রচেষ্টা ও অহঙ্কার দ্বারা রামানুজের বিরোধিতা করিয়াছেন, ব্রহ্মদৈত্যের এক বক্তৃতার দ্বারা তাঁহাকে অমন করিয়া পরাজিত করানোর পিছনে ঐতিহাসিক সমর্থন থাকিলেও উচ্চাঙ্গের নাট্য-কৌশল নাই। অবশ্য ইহার মধ্যেও রামানুজ-চরিত্রের অলৌকিকত্ব বিশ্বাসের সীমা অতিক্রম করে নাই। গোণ্ডারণ্য-প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-জন্মের যে স্মৃতি তাঁহার মধ্যে জাগ্রত হইল, সেই জাতিস্মরত্ব অতিলৌকিক হইলেও অলৌকিক নহে। কিন্তু বালক মূর্তিতে বরদরাজের কাঞ্চিপূর্ণের সঙ্গে নিত্যলীলা

আমাদিগকে ঐতিহাসিক মহাপুরুষ-চরিত্রের পরিবেশ হইতে পৌরাণিক যুগের অলৌকিক পরিবেশে লইয়া যায়, যেখানে দেব ও মানব একসঙ্গে লীলা করিয়াছেন। কিন্তু এই অলৌকিকত্বের অবাঞ্ছিত আগমনেও আদ্যন্ত মানুষের হৃৎস্পন্দন সমানভাবে চলিতে থাকায় নাটকীয় কৌতূহল শেষপর্যন্ত বজায় থাকে। সংসার-ত্যাগোন্মুখ সন্ন্যাসী পত্নীর অনুরোধে মহাব্রত ত্যাগ করিয়া সংসারে আবদ্ধ হইতে যে মুহূর্তে ইচ্ছা করেন, ঠিক তখনই তাঁহার শ্রীচরণস্পর্শে জমাম্বার পূর্বজন্মের স্মৃতি জাগ্রত হয়। আর তিনি স্বামীকে নিজের মায়ায় আবদ্ধ রাখিতে চাহেন না। রামানুজ মুক্ত হইলেন। কিন্তু স্বেচ্ছাধৃতব্রতা সন্ন্যাসিনীর নারী-জীবনের অপূর্ণ মাতৃত্বের বেদনা তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলে যে তীব্র হাহাকার জাগাইয়া রাখে, তাহারই পূরণের জন্য যখন বরদরাজের অংশজাত অণ্ডাল-পুত্র পরাশর জমাম্বার ঐ মাতৃ-অঙ্কে আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন আমরা মায়ের এই অতৃপ্ত বাসনার চরিতার্থতায় পুত্রলাভের সামান্য অলৌকিকত্বটুকু ভুলিয়া যাই। তাই দেখা যায়, 'রামানুজ' নাটকে অলৌকিকত্ব থাকিলেও তাহা প্রধান চরিত্র ও মুখ্য ঘটনাবলীর লৌকিকত্বকে অভিভূত করে নাই। চরিত্র মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষায়, চিন্তায় ও ভাবে আন্দোলিত হৃদয়ের বাণীরূপ ও কর্মরূপ। এই চরিত্রের বাস্তবতার আকর্ষণ নাটকে আদ্যন্ত বজায় থাকে। এইখানে 'শঙ্করাচার্য' হইতে রামানুজের শ্রেষ্ঠত্ব। আবার তপোবলের আলোচনা করিলেও দেখিতে পাইব, অলৌকিকত্ব নাটকত্বকে কতখানি ক্ষুণ্ণ করিয়াছে।

অবশ্য 'তপোবল' ঠিক শঙ্করাচার্যের মতো নহে। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়। বিশ্বামিত্র মানুষ। ক্ষত্রিয়ের দুর্দমনীয়তা এবং মানুষের উচ্চাশা বিশ্বামিত্রকে রাজ-সংসার ত্যাগ করাইয়া গভীর অরণ্যে কঠোর সাধনার রাজ্যে টানিয়া লইয়া গেল। ক্ষত্রিয়ের অভিমানই তাহাকে বশিষ্ঠের সঙ্গে বিরোধিতা করাইয়া লইয়াছে। ঐশ্বর্য-পিপাসু রাজা সম্পত্তির জন্য হোমধেনু সবলাকে হরণ করিতে গিয়া দেখিলেন, ক্ষত্রিয়ের বাণের চেয়ে ব্রাহ্মণের দণ্ডের শক্তি অনেক বড়। তাই অভিমানে তিনি পরজন্মে ব্রাহ্মণত্ব লাভের বাসনায় ত্রিবেণীতে দেহত্যাগের সঙ্কল্প করিতেছেন। ঠিক এমন সময় বালকবেশী ব্রহ্মণ্যদেব তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, তপঃ-প্রভাবে যে-কেহই ব্রাহ্মণ হইতে পারে। বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যায় মগ্ন হইলেন। এই তপস্যার পথে ইন্দ্রের ছলনা, মেনকার প্রেম প্রভৃতিও বাধা দিতে পারিল না। রাজর্ষিত্ব লাভ করিলেও

যখন বশিষ্ঠ তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করিলেন না, তখন বিশ্বামিত্র ক্রোধে বশিষ্ঠ-নিধন-যজ্ঞ সূচনা করিলেন। বশিষ্ঠ নিজে সেই যজ্ঞের হোতা হইলেন। এইবার বিশ্বামিত্রের চৈতন্যোদয় হইল। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মজ্ঞান, ক্ষমা, ধৈর্য ও আত্মত্যাগের পরিচয় পাইয়া বিশ্বামিত্র বিস্মিত ও অনুতপ্ত হইলেন। অনুতাপের অশ্রুতে অহঙ্কার ধৌত হইল। এইবার তিনি ব্রাহ্মণ হইলেন। সুতরাং বিশ্বামিত্র চরিত্রে বেশ খানিক ক্রমবিকাশ রহিয়াছে। কিন্তু তবুও দেখা যাইবে, নায়ক বিশ্বামিত্রের চরিত্র-চিত্রণে যে সামান্য দোষ-ত্রুটি ঘটিয়াছে, তাহা উপেক্ষা করিতে পারিলেও, আমরা এই নাটকের ঘটনা-সংস্থান ও অন্যান্য চরিত্র-সৃষ্টির অনিপুণতা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারি না। বরং তাহাই এই নাটকটির মহিমা খর্ব করিয়াছে।

নাটকের মধ্যে পার্শ্বচরিত্র এবং প্রতিনায়ক চরিত্রের প্রয়োজন হয় সাহচর্যে বা সঙ্ঘাতে নায়ক-চরিত্রকে বিকশিত করিবার জন্য। একদিকে নায়কের সহিত তাহাদের সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য অন্যদিকে তাহাদের ব্যক্তিগত চরিত্রের গুরুত্ব উভয়ের মধ্যেই যদি সঙ্গতি না থাকে তবে নায়ক চরিত্রের উপর তাহাদের প্রভাবও অনাটকীয় বা অতিনাটকীয় হইবেই। বিশ্বামিত্র স্বীয় শক্তির বলে, তপস্যার বলে, ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে যাইতেছেন। ইহা অতিমানবীয় হইলেও মানবীয় চেষ্টা বই কিছুই নয়। মানুষের মধ্যেই যে অসীম শক্তি এবং জ্ঞানের সম্ভাবনা নিহিত থাকে তাহাকে ক্রমবিকশিত করিয়া সৃষ্টি ও স্রষ্টার রহস্য জানার নামই ব্রহ্মবোধ। এই ভাবে নিজের ইন্দ্রিয়শক্তির মধ্য দিয়া যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ। অতীন্দ্রিয় অনুভূতি তাই ইন্দ্রিয়বোধাতিরিক্ত নয়,—উহা ইন্দ্রিয়বোধের অতিমাত্রিকতা। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানও মানবীয়শক্তি-সাধ্য। এই মানবীয় জীবনধর্মমূলক বাস্তবাখ্যায়ী নাটকের মধ্যে রূপক-ধর্ম আনিয়া তিনি নাট্যমূল্য খর্ব করিয়াছেন এবং বিশ্বামিত্রের স্বাভাবিক বিকাশে ও মহত্ত্ব সৃজনে বাধা জন্মাইয়াছেন। ব্রহ্মণ্য-দেবকে তিনি মানুষ মূর্তিতে হাজির করাইলেন এবং আনিলেন একটি বালক রূপে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বালকের মুখে বৃদ্ধের পিতার বুদ্ধি-সঞ্জাত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। বশিষ্ঠকে উপেক্ষাকারী, অবজ্ঞাকারী, শক্তিমান, উচ্চাভিলাষী রাজা কি না একটি বালকের কথায় আত্মচৈতন্য লাভ করেন। অবশ্য বালকের কথায় যে মহামানবেরও চৈতন্যলাভ হয় না তাহা নহে। কিন্তু নাটকে যে সংলাপের দ্বারা নায়কের বা পাত্র-পাত্রীর চরিত্র-বিবর্তন

সূচিত হইবে, তাহার কার্য-কারণ-শৃঙ্খলা খুঁজিয়া না পাইলে আমরা সে সংলাপকে সার্থক বলিব না। বিশ্বামিত্রের যাহা সমগ্র সত্তার সমস্যা, এক বালকের চাপল্য-জনক কথায় তাহার সমাধানের ইঙ্গিত আসে। মহারাজ তপস্বী হইতেছেন। বালক তাহাকে বানরের মতো খাঁচায় পুরিতে সাহস করিতেছে।* তিনি ব্রহ্মণ্যদেব হউন আর না হউন, রাজা বিশ্বামিত্রও শক্তিমান বিশ্বামিত্রের মর্যাদা তিনি কোথায় রাখিতেছেন? আর আশ্চর্য, এই বালকটিকে পাগল না মনে করিয়া বিশ্বামিত্র তাহারই কথায় নিজের ভাবী কর্তব্যের ইঙ্গিত পাইলেন।

ঠিক এই মতো বশিষ্ঠ সম্পর্কে ত্রিশঙ্কুর বাক্যাবলীর মধ্য দিয়া আমরা "যতির্বশিষ্ঠঃ যমিনাং বরিষ্ঠঃ"-এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন দেখি না। বর্তমান কালের বাঙ্গালী পুরোহিত ব্রাহ্মণের একটি অবজ্ঞেয়, অশ্রদ্ধেয় রূপ পাই। ত্রিশঙ্কুর বাক্যের মধ্যে রাজকীয় গাম্ভীর্য নাই। অন্যদিকে অকারণ আদর্শবাদ ও অপ্রয়োজনীয় দার্শনিকতা এই নাটকখানিকে আদ্যন্ত ভারাক্রান্ত করিয়াছে। বিশ্বামিত্র-পত্নী সুনেত্রার স্পর্শে পাষাণী রম্ভার মুক্তি-মণ্ডপে সতীত্বের মহিমা সম্বন্ধে একখানা ধর্মবক্তৃতা দেওয়াইবার লোভ গিরিশচন্দ্র ত্যাগ করিতে পারেন নাই। নাটকে আদর্শবাদ তখনই অসার্থক, প্রচারাত্মক বক্তৃতা হইয়া দাঁড়ায় যখন তাহা চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বে প্রসূত না হয়। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব বহির্দ্বন্দ্বের সংস্পর্শ 'তপোবল' নাটকে কোথাও প্রবল ভাবে ফোটে নাই। বিশ্বামিত্রের পারিপার্শ্বিক যদি লৌকিক বাস্তবতায় নামিয়া আসিত, তবে তাহা হইতেও পারিত। কিন্তু নায়ক-চরিত্র ও পার্শ্বচরিত্রেব এই অবাঞ্ছিত অসঙ্গতি নাটকখানিকে ব্যর্থ করিয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের কয়েকখানি পৌরাণিক নাটক তাঁহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় বহন করে। তিনি বহু পৌরাণিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তাহার সব কয়খানির সমালোচনা করিবার অবকাশ নাই। যে কয়খানির মধ্যে তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাদের আলোচনাই করিব। এই নাটকগুলির আলোচনায় একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মতো।

---

* "ব্রহ্মণ্য। পুষ্‌ব্ কি জান না?—যেমন বানর পোষে, হনুমান পোষে, ভালুক পোষে—
বিশ্বা। আমি জানোয়ার?
ব্রহ্মণ্য। জানোয়ারের বাড়া, জানোয়ারেবা মব্‌তে চায় না, তুমি মরতে চাও।"—ইত্যাদি
—তপোবল, ১ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক।

গিরিশচন্দ্রের এই নাটকগুলি যাত্রারই ক্রমবিকশিত রূপ। মনোমোহন বসুর রচনায় যাত্রা যে বিশেষ রূপ পাইয়াছিল তাহাই পরিমার্জিত হইয়া দেখা দিয়াছে গিরিশচন্দ্রের এই নাটকগুলিতে। যাত্রার শৈলী প্রধানতঃ বজায় রাখিয়া তাহার সহিত তিনি নাট্য-শৈলীর মিলন ঘটাইয়াছেন। তাই নাট্যকার হিসাবে গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালীর নিকট অত জনপ্রিয় হইয়াছিলেন। যাত্রায় সুপরিচিত কাহিনীর রূপায়ণ থাকে। পৌরাণিক কাহিনীর অভিনবত্ব বিশেষ কিছুই নাই। ভক্তি-রস এবং দার্শনিকতা যাত্রার একটি প্রধান লক্ষণ। মনোমোহন ইহাকে প্রধানতঃ সংসার-ভোলা পাগল-জাতীয় চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্রের নাটকে কঞ্চুকী ঠিক এই ধরনের চরিত্র। যাত্রার মধ্যে ভাবাবেগ যেখানে যেখানে প্রবল হয়, সেইখানে সঙ্গীতের আমদানি হইয়া থাকে। মনোমোহনের নাটকাবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহার সঙ্গীত-প্রয়োগ রীতির আলোচনা করিয়াছি। গিরিশচন্দ্র এ বিষয়ে মনোমোহনের অনুসরণ করিয়াছেন। একটা পরিচিত গল্পের আদ্যোপান্ত রূপায়িত করাই যাত্রার উদ্দেশ্য। নায়ক নায়িকার অন্তরে বীজাকারে অবস্থিত কোনো বিশেষ বাসনা-সংস্কারের কর্ম-মুখর রূপায়ণ এই কাহিনীর মধ্য দিয়া হয় না। নাট্যরূপায়ণে তাই কাহিনীর যে অংশ প্রত্যক্ষভাবে নায়ক-চরিত্রের অভিব্যক্তির জন্য প্রয়োজন হয় না, তাহাকে অবান্তর বিবেচনায় নাটক হইতে বাদ দেওয়া হয়। যাত্রার কাহিনীতে হয়ত রামায়ণ মহাভারত বা পুরাণ প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ অধ্যায়ের বা পর্বের মধ্যে যাহা যাহা লিখিত আছে, তাহার আগাগোড়াই এক একটা পালায় রূপ দেওয়া হইত। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের অনেকগুলির মধ্যে কাহিনীর এইরূপ অপ্রয়োজনীয় আমদানি দৃষ্ট হয়। ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর রুচি মিটাইবার জন্য যাত্রার রচয়িতা একদিকে যেমন অতিরিক্ত মাত্রায় করুণ রসের যোগান দিয়াছেন, তেমনি জনসমাজের বিকৃত রুচি মিটাইবার জন্য হাস্যরসের নামে ভাঁড়ামিও অনেক করিয়াছেন। ব্রজমোহন রায় দুর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি প্রভৃতি উচ্চস্তরের পাত্র-পাত্রীকে দিয়া এই ভাঁড়ামি করাইয়াছেন। মনোমোহন ব্যাধ, ব্যাধপত্নী, অশ্ব-রক্ষক প্রভৃতি নিম্নস্তরের পাত্র-পাত্রীর মুখ দিয়া এই হাস্যরস পরিবেশন করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র এই দিক দিয়া মনোমোহনকেই বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। তবে গিরিশচন্দ্র মনোমোহন হইতে বেশীও অনেকখানি করিয়াছেন। মনোমোহনের সংলাপ প্রাচীনতার ছাপ অতিক্রম করিতে পারে নাই। কথকতার ভঙ্গীতে

দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা তাঁহার নাটকের সংলাপকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকে সর্বপ্রথম পরিমিত, সার্থক সংলাপের যোজনা হইল। সংলাপ আর বক্তৃতা রহিল না (তাঁহার 'জনা' নাটকের কথা বলিতেছি না। জনার দীর্ঘ দীর্ঘ উক্তি মনোমোহনাদির যাত্রার গদ্য সংলাপের পদ্য সংস্করণ। জনা-চরিত্রের এই উক্তিগুলিই নাটকখানির ব্যর্থতার প্রধান কারণ।) তাহার ফলে নাটক হইতে ভাবের উচ্ছ্বাসপ্রবণতা কমিয়া যাইবার জন্য কাহিনীর ভিতর গাম্ভীর্য এবং সংহতি আসিল। পাত্র-পাত্রীর উক্তি-প্রত্যুক্তিগুলিও আর নিছক বাহিরের বস্তু থাকিল না। সংলাপগুলি চরিত্রের অভিব্যক্তি হিসাবেই দেখা দিতে লাগিল। তবুও এই নাট্যগুলিকে শেক্‌স্‌পীয়রীয় শৈলীর সার্থক অনুসরণ বলিতে পারিব না। কেন না, শেক্‌স্‌পীয়ারের উৎকৃষ্ট নাটকগুলিতে নায়ক-নায়িকার চরিত্রের অভিব্যক্তিই নাট্যকাহিনী গড়িয়া তোলে। আর এই নাটকগুলির মধ্যে কাহিনীর নিরবচ্ছিন্ন স্রোতে যে নর-নারীরা আনাগোনা করিতেছে, নাট্যকার তাহাদের চরিত্র বিকাশের যেটুকু অবকাশ পাইয়াছেন তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং ইহা যাত্রাও নয়, নাটকও নয়। উভয়ের মিশ্রিতরূপ। গিরিশচন্দ্রের চারিখানি শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক অবলম্বনে উপরি-লিখিত বক্তব্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছি।

'পাণ্ডব-গৌরব','পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস','জনা' এবং 'বিল্বমঙ্গল', এই চারিখানি নাটক রচনার দিক দিয়া কালানুক্রমিক পারম্পর্য রক্ষা করে না বটে, কিন্তু নাটক চারখানির মধ্যে শৈলীর ক্রমোৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায়। পাণ্ডব-গৌরবের কাহিনী-বিন্যাস, চরিত্র-সৃষ্টি এবং সঙ্গীত-যোজনা মূলতঃ যাত্রা শৈলীরই পরিচয় দান করে। দণ্ডীপর্বকাহিনী মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বেশ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। কেন না, বহু কবি শুধু দণ্ডীপর্ব অবলম্বন করিয়া স্বতন্ত্র কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। সেই পরিচিত কাহিনীর সিদ্ধ-রসবিগ্রহ পাত্র-পাত্রীকে অবলম্বন করিয়া গিরিশচন্দ্র যখন নাট্য রচনা করিলেন, তখন চরিত্রের দ্বন্দ্ব-সজ্ঘাত ফুটাইয়া তুলিবার দিকে তিনি বিশেষ মনোযোগ করেন নাই। ঘটনাকে মনোজ্ঞ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কর্মময়, ইচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণের কূটচক্রী রূপটিকে আড়ালে রাখিয়া তাঁহার লীলাময়, ভক্ত-ভগবান মূর্তিটিই তিনি তুলিয়া ধরিয়াছেন। কর্মকে গৌণ করিয়া দিয়া ভক্তি, বিশ্বাস ও লীলার প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ইহা যাত্রারই বৈশিষ্ট্য। নাটকের আরম্ভেই আমরা দেখিতে পাই, দণ্ডীরাজ মৃগয়া করিতে গিয়া তুরঙ্গিণীর পশ্চাদ্ধাবন

করিতে করিতে নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার মনে সন্দেহ জাগিয়াছে, তুরঙ্গিণী মায়া। কিন্তু হঠাৎ যখন বনের মধ্যে একটি অপূর্ব নারীমূর্তি দর্শন করিলেন, তখন তিনি কিন্তু তাহাকে মায়া-নারী বলিয়া ভাবিলেন না। কেন ? রাজার রূপমোহ এত প্রবল যে তাহা তাঁহাকে পরিবেশ ও পরিস্থিতির গুরুত্ব ভুলাইয়া দেয়। ইহা প্রেম নয়—কাম। কামের ধর্ম চিত্তকে বিমূঢ় করিয়া দিয়া কার্যাকার্য ভুলাইয়া দেওয়া। উর্বশীর সঙ্গে দণ্ডীর আলাপের মধ্য দিয়া এইটুকু বোঝা গেল, অপ্সরার জীবন একটা ব্যর্থ প্রহসন মাত্র। মহারাজ পুরুরবাকে উর্বশী যেমন শ্রদ্ধা দিয়া বরণ করিয়াছিল, দণ্ডীরাজকে সে নিশ্চয়ই সেভাবে গ্রহণ করিবে না। একদিকে কামমুগ্ধ পুরুষের রূপতৃষ্ণা, অন্যদিকে দহমান-হৃদয়া নারীর অনিচ্ছাকৃত আত্ম-সমর্পণ, এই দুইটি ভবিষ্যতে একটা মহাঝড় তুলিবে, নাটকের প্রথম গর্ভাঙ্কেই তাহা বুঝিতে পারি। তারপর এই গর্ভাঙ্কের শেষে নারদের উক্তির মধ্য দিয়া অষ্টবজ্র-মিলনের পূর্বাভাস যেমন পাইতেছি, তেমনি উহা ঘটানো যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তাহাও বুঝিতেছি। সুতরাং ইচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণই যে এই মহাকার্যের ভার লইবেন, তাহাও স্পষ্ট বোঝা যায়। স্বর্গ-মর্ত্য দুই ভাগ করিয়া যুদ্ধ বাধানোর দরকার। যাহাতে দেবতা ও মানব উভয়ের মিলিত আটটি বজ্র যুদ্ধে সক্রিয় হইয়া ওঠে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে, ন্যায়-যুদ্ধে এক মাত্র পাণ্ডব ভিন্ন কেহই অস্ত্র ধারণ করিবে না। ওদিকে পাণ্ডবের সমস্যা প্রবল। 'ত্রয়োদশ বর্ষ পরে বিরাট নগরে' পাণ্ডব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। একথাও নির্দিষ্টভাবে জানা হইয়া গিয়াছে যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। এই অবস্থায় সুভদ্রা দ্বারকা হইতে বিদায় লইতেছেন। আসন্নবিপদের কথা নিবেদন করিলে শ্রীকৃষ্ণ ভগিনীকে বলিলেন,—ধর্ম ধার্মিককে রক্ষা করে, আর ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম আশ্রিতরক্ষণ। নাট্যকার ধীরে ধীরে আয়োজন সম্পূর্ণ করিতেছেন। কারণ পরবর্তী কালে দেখা যাইবে, শ্রীকৃষ্ণের এই নির্দেশকে অবলম্বন করিয়াই সুভদ্রা শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পাণ্ডবদের উত্তেজিত করিতেছেন। সুভদ্রা বিদায় লইতে না লইতেই নারদ আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট তুরঙ্গিণীর সংবাদ পরিবেশন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অন্যায় করিবেন না। তিনি যোগ্যাধিক মূল্য দিয়া তুরঙ্গিণী ক্রয় করিতে চাহিলেন। নারদ এইবার নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে নারদ মহাভক্ত। তিনি হরিভক্তির পুষ্টিদাতা। জ্ঞানের অহঙ্কারে, ঐশ্বর্যের মোহে, রূপের গর্বে বা ক্ষমতার মত্ততায় মানুষ যখন ভগবদ্‌ভক্তি এবং দৈবী চলন

বিসর্জন দেয়, সুচতুর নারদ তখন নিজের কুটবুদ্ধির আশ্রয়ে ঐ মানুষকে উত্তেজিত করেন। এই ধূর্ত ঋষির আসল উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া সে তাহার পরামর্শে নিজের কর্মের দ্বারা নিজের বিপদ সৃষ্টি করে। তখন দায় ঠেকিয়া সুপথে ফিরিয়া আসা ভিন্ন আর গতি থাকে না। আর যদিই বা কেহ না ফিরিয়া আসে, তাহার আসুরিক বুদ্ধি তাহাকে ধ্বংসের দিকে লইয়া যায়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে নারদের এই রূপের বিকৃতি ঘটিয়াছে। নারদ তাঁহার ঢেঁকি বাহনে পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরিয়া নানাপ্রকার মিথ্যার জাল বুনিয়া শুধু বিবাদেরই সৃষ্টি করেন। প্রাচীন যাত্রায় নারদ মুনি একটি হাস্যরসাত্মক চরিত্রে পরিণত হইয়াছেন। গিরিশচন্দ্রও যাত্রার সেই প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। এখানেও নারদ নানাপ্রকার মিথ্যা কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে উত্তেজিত করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ একেবারে যদু-সেনা সাজাইতে আদেশ করিলেন।

এই নাটকে কৃষ্ণ-চরিত্রের কোনো বিকাশ নাই। চরিত্রটি চলিষ্ণু নহে—স্থাণু। কেন না তিনি হৃষীকেশ অর্থাৎ সমস্ত বৃত্তি-প্রবৃত্তির অধীশ্বর। সুতরাং তাঁহার জীবনে অন্তর্দ্বন্দ্ব বা বহির্দ্বন্দ্ব নাই। দ্বন্দ্বহীন জীবন নাটকীয় নহে। তবে যদি এমন হয় যে সংযত, সমাহিত জীবনের ঔদাসীন্যের আঘাতে পারিপার্শ্বিক ক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে এবং নিজের বৃত্তি-প্রবৃত্তি দিয়া ঐ জীবনকে যতই আঘাত করে, ততই তাহার দৃঢ়তায় অভিভূত হয়, তাহা হইলে নাটকীয় ঘটনা জমাট বাঁধিয়া ওঠে। এই নাটকে কৃষ্ণের সমাহিত জীবনকে অবলম্বন করিয়া বিক্ষুব্ধ পারিপার্শ্বিকের তেমন কোনো দ্বন্দ্ব সৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু অবকাশ অনেক ছিল। ইচ্ছাময়, লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের আচরণ দুর্বোধ্য ও রহস্যময় হইয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু নাট্যকার সে অবকাশ গ্রহণ করেন নাই। রুক্মিণী ও সাত্যকির বাক্যের মধ্য দিয়া পুনঃ পুনঃ প্রকাশ পাইয়াছে, এই অশ্বিনী-হরণ-বাসনা বা সমরায়োজন অভিনয় বা লীলা মাত্র। ইহার পিছনে শ্রীকৃষ্ণের গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। সমস্তই লীলাময়ের লীলা, গোড়ায় এই কথা মানিয়া লইলে নাট্যকাহিনী হাল্‌কা হইয়া পড়ে। পাণ্ডব-গৌরব নাটকে তাই আরম্ভ হইতে শেষপর্যন্ত কাহিনীর একটা অবিচ্ছিন্ন চলমানতা থাকিলেও কেন্দ্রগত কৃষ্ণচরিত্রের এই বিকাশ-রাহিত্য নাটকখানিকে দুর্বল করিয়াছে।

চরিত্র যেখানে নীতির বাঁধনকে স্বাভাবিক ভাবে স্বীকার করিয়া লয়, সেখানে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির দ্বন্দ্ব প্রশমিত হইয়া যায়। কিন্তু সম-মর্যাদার দুই নীতির মধ্যে কোন্‌টা গ্রহণীয় কোন্‌টা বর্জনীয় ইহা লইয়া মানুষের তীব্র

অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হইতে পারে। এই নাটকে পাণ্ডবদিগেরও সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব আসিতে পারিত। একদিকে ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্য দিকে তাঁহার আদেশ,—আশ্রিত-রক্ষণ-ধর্ম, এই দুয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধিতে পারিত। এই দ্বন্দ্ব সুভদ্রা, অর্জুন, যুধিষ্ঠির সকলেরই সম্ভব হইত। নাট্যকার সে সম্ভাবনাও সুকৌশলে অতিক্রম করিয়াছেন। সুভদ্রা কৃতনিশ্চয়া, ভীম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বৃদ্ধ ভীষ্ম দ্রোণের পরামর্শে সন্ধি করিতে চাহিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ক্ষাত্রধর্ম তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে উত্তেজনা দান করিল। সুতরাং নাট্যকাহিনী জটিল না হইয়া সরল রেখায় চলিল। সুভদ্রা ধর্মপ্রাণা ক্ষত্রিয়ানী। তাঁহার চরিত্র মহিমময় ও গম্ভীর। কিন্তু ধীর-স্থির। আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত এই চরিত্রটির কোনো বিকাশ নাই। নাটকে ভীমের কিছুটা অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু তাহার ক্রমবিকাশের সূত্র বড় ক্ষীণ। যুদ্ধে সাহায্য করিতে দুর্যোধনাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে ভীমের ইচ্ছা ছিল না। ইহাতে তিনি অপমান বোধ করিয়াছেন। ওদিকে কুন্তীকে কর্ণের সহিত নির্জনে আলাপ করিতে দেখিয়া ভীম সন্দেহ করিয়াছেন, মাতা কৌরবের এই কৃতদাসকে যুদ্ধের জন্য অনুরোধ করিতে আসিয়াছেন। এই অপমানের জ্বালা জুড়াইবার জন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট ছুটিয়া আসিলেন। এই দৃশ্যের সংলাপের মাধুর্য ও মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু সমগ্র নাটকের পটভূমিকায় দৃশ্যটি যথোপযুক্ত পূর্ব-প্রস্তুতি-হীন।

সমগ্র নাটকখানির মধ্যে দুইটি মাত্র চরিত্র অনেকখানি নাটকীয় সম্ভাবনা দাবী করিতে পারে। চরিত্র দুইটি উর্বশী ও দণ্ডী। কামুক, রূপমুগ্ধ রাজা দণ্ডী। তিনি রাজ্য, রানী, প্রাণের মমতা সমস্তই উর্বশীর রূপের নিকট বিসর্জন দিয়াছেন। কিন্তু তিনি উর্বশীর দেহ পাইয়াছেন, মন পান নাই। এদিক দিয়া উর্বশীরও দোষ কিছু নাই। স্বর্গ-বারবিলাসিনী উর্বশী। তাহার অন্তরে নন্দন-কুসুমের স্মৃতি। সুধা-পানোন্মত্ত দেবরাজের প্রণয়কাতরতার স্মৃতির রোমন্থনে তাহাকে মানবীয় রূপ-পিপাসার কদর্যতা অনুভব করাইয়া দেয়। কঠিন ধরণীর স্পর্শ তাহার দেহে প্রতি মুহূর্তে আঘাত করে। স্বর্গ-বাসিনী হইলেও সে বারনারী। তাহার চরিত্রের আরম্ভে বারনারীজীবনের ব্যর্থতার বাণী। তাহার স্বগতোক্তিতে অশ্রেয় পুরুষের স্পর্শ-পীড়িতা নারীর মর্মবেদনা। রূপমুগ্ধ দণ্ডী প্রথম হইতেই উর্বশীর নিষেধ শুনেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন, এত রূপ কখনও প্রেমহীন হইতে পারে না। কিন্তু মোহের উপঢৌকন

লইয়া তিনি উর্বশীর নিকট যতই অগ্রসর হইয়াছেন, উর্বশী ততই কঠোর ভাবে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। 'কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।' দণ্ডীরাজ উর্বশীকে লইয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলেন। এমন সময় উর্বশী অর্জুনের নিকট আত্ম-প্রকাশ করিল। ঘটনার মোড় ফিরিল। কামুক ব্যক্তি অন্য জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকেও নিজের মতো দুর্বল বলিয়া সন্দেহ করে। দণ্ডী ভাবিলেন, উর্বশী অর্জুনের প্রতি আসক্ত। তাই অর্জুন ও উর্বশী উভয়কেই শাস্তি দিবার জন্য দণ্ডী শ্রীকৃষ্ণের সভায় উপস্থিত হইলেন। দণ্ডী-চরিত্রের প্রত্যক্ষ অভিঘাতেই নাট্যকাহিনী যাহা কিছু গতিলাভ করিয়াছে। দণ্ডী ও উর্বশীর অন্তর-দ্বন্দ্ব নাটকে যে-টুকু বিকশিত হইয়াছে, তাহাই খানিকটা নাটকীয় কর্ম সৃষ্টি করিয়াছে। এই দুইটি বাদে এই নাটকে গতিধর্মী চরিত্র একটিও নাই।

চরিত্র সৃষ্টির দিক দিয়া না হইলেও অন্য অনেক দিক দিয়া নাটকটি প্রশংসার যোগ্য। সব চেয়ে বেশী প্রশংসনীয় এই নাটকের কাহিনীর ঐক্য এবং মহত্ত্ব। উর্বশীকে দিয়া নাটকের আরম্ভ। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া নাট্য-কাহিনী গতি-চঞ্চল হইয়াছে। তাহার শাপমুক্তিতেই নাটকের পরিসমাপ্তি। সুতরাং অবান্তরত্ব পরিহার, যাহা নাটকীয় ঘটনা-বিন্যাসের একটা প্রধান গুণ তাহা এই নাটকে আছে। নাটকটির মধ্যে এমন কোনো কাহিনী নাই বা এমন কোনো চরিত্র নাই যাহা মূলতঃ প্রধান কাহিনীর পরিণতিতে সাহায্য করে না। এই ঘটনা-বিন্যাসকৌশলের সঙ্গে মনস্তত্ত্বসম্মত চরিত্র সৃষ্টির দক্ষতা যুক্ত হইলে নাটকখানি সার্থক হইত সন্দেহ নাই।

নাটকটিতে যাত্রার প্রভাব অনেক। নিম্ন-চরিত্রগুলির সংলাপ ও কর্মে এই প্রভাব পড়িয়াছে হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়োজনে। এদিক দিয়া গিরিশচন্দ্র মনোমোহনের বেশী উপরে উঠিতে পারেন নাই। গিরিশচন্দ্রের ঘেসেড়া-ঘেসেড়াণী. দ্বারকার দূত প্রভৃতির বাক্য ও আচরণ মনোমোহনের নাটকের ব্যাধ, ব্যাধ-পত্নী, অশ্ব-রক্ষক প্রভৃতিকে হুবহু স্মরণ করাইয়া দেয়। এই হাস্যরস জীবনের মূলে প্রবেশ করিয়া মনুষ্য-জীবনের দুরপনেয় অসঙ্গতির ইঙ্গিত করে না। এ হাস্যরসের মধ্যে বিরাট বুদ্ধির দীপ্তিও কিছু ফুটিয়া ওঠে না। ইহা নিতান্ত তরল এবং বাহ্য-অসঙ্গতি-মূলক।

অন্যদিক দিয়াও গিরিশচন্দ্র নাটকে মনোমোহনের অনুসরণে যাত্রার প্রভাব স্বীকার করিয়াছেন। কঞ্চুকী, বিদূষক প্রভৃতি সরল বিশ্বাসী ভক্ত,

যাহাদিগকে সাধারণ দৃষ্টিতে বাস্তব-জ্ঞান বা সাংসারিক জ্ঞানবিরহিত মূর্খ বলিয়া মনে হয়, বিধাতার রাজ্যে তাহারাই অকারণ কৃপার অধিকারী। কিন্তু জটিল কর্মমূলক নাটকে এই ধরনের চরিত্র আমাদের ভক্তি, শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস যাহাই উৎপাদন করুক না কেন, তাহাদের চরিত্রের নাটকীয়তা নাই। কার্য-কারণ সম্পর্কের বাঁধনে কোনো প্রকার ক্রমবিকাশের ধারায় এই চরিত্রগুলি গড়িয়া ওঠে না। নাটকের মধ্যে ইহারা আধ্যাত্মিকতার সুর বহন করে মাত্র। কর্মহীন যাত্রায় বা রবীন্দ্রনাথের রূপকনাট্যে এই চরিত্রগুলি হয়ত বেমানান হইত না। কিন্তু কর্মমূলক নাটকের গতি ইহারা ব্যর্থ করে। আলোচ্য নাটকে বিদূষকের প্রভাবে পড়িয়া সুভদ্রাচরিত্র মাঝে মাঝে কর্মহীন ও উচ্ছ্বাসময় হইয়া উঠিয়াছে। তৃতীয় অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্কে বিদূষক-চরিত্র দার্শনিকতার এক ভাষ্যমূর্তি এবং সুভদ্রা ভক্তিমিশ্র সঙ্গীতের উচ্ছ্বাস মাত্র। ইহা উৎকৃষ্ট কাব্য হইয়াছে, কিন্তু নাটকীয় হয় নাই। যে কর্মময় পরিবেশে নাট্যকার সুভদ্রা-চরিত্র অঙ্কন করিতে শুরু করিয়াছিলেন ইহা তাহার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে না। তবে আমাদের ভাবুক বাঙ্গালী মনের নিকট সুভদ্রা-চরিত্রের এই কাব্যোচ্ছ্বাসময় দিকটারও একটা আবেদন আছে।

'পাণ্ডব-গৌরব' নাটকে চরিত্র-চিত্রণে নাট্যকার যে-দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই, তাহা অনেকখানি সুন্দরভাবে পারিয়াছেন তিনি 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকে। কিন্তু পাণ্ডব-গৌরবের কাহিনী নির্বাচনে যে দক্ষতার পরিচয় আছে, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে তাহা নাই। এখানে তিনি একেবারে চিরাচরিত যাত্রার ধারারই অনুবর্তন করিয়াছেন। ব্রজমোহন রায় যেমন অভিমন্যুবধ নাটক রচনা করিতে নাট্যোপযোগিতা থাকুক বা না থাকুক, গোটা দ্রোণপর্বকেই মোটামুটিভাবে আমদানি করিয়াছেন, গিরিশচন্দ্রও তেমনি পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস নাটকের ভিতর সমগ্র বিরাটপর্বের স্থান করিয়া দিয়াছেন। ফলে নাটকটি হইয়াছে অর্ধ-সার্থক। অর্ধ-সার্থক বলিতেছি এই জন্য যে, শেক্‌স্‌পীয়রীয় নাট্যরীতির সার্থক অনুসরণ বহুদূর পর্যন্ত ইহার ভিতর আছে। কিন্তু কাহিনীর গ্রহণ-বর্জনে নাট্যকার শিল্পবোধের সম্যক্ পরিচয় দিতে পারেন নাই। শেক্‌স্‌পীয়রীয় রীতি অনুসারে বিচার করিলে এই নাটকের নায়ক 'কীচক' এবং নায়িকা 'দ্রৌপদী'। কীচকের রূপ-মোহ এই নাটকের বীজ। কীচকের অন্তরে এই রূপমোহের বীজ অঙ্কুরিত হওয়ায়ই নিত্যনূতন ঘটনা সৃষ্টি হইয়াছে। আর এই মোহের অবলম্বন দ্রৌপদী। সুতরাং শেক্‌স্‌পীয়রীয়

দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করিলে দ্রৌপদীর সহিত কীচকের সাক্ষাতের দৃশ্য দিয়া নাটকটির আরম্ভ এবং কীচকের মৃত্যুতে শেষ হওয়া উচিত ছিল। দ্রৌপদীর আত্ম-মর্যাদা-বোধ, ভীমের প্রতিহিংসা প্রভৃতি কীচকের মৃত্যুকেই ঘনাইয়া তুলিত। সেদিক দিয়া যেটুকু হইয়াছে তাহা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু নাট্যকার আদ্যন্ত বিরাট পর্বকেই নাটকে স্থান দিয়াছেন। বিরাটসভায় পাণ্ডবদিগের আগমন, সুদেষ্ণার নিকট দ্রৌপদীর উপস্থিতি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত সুশর্মার বিরাটরাজ্য আক্রমণ, কৌরবদিগের দ্বারা মৎস্য-রাজ্যের গোধন হরণ, পাণ্ডবের রাজ্যাভিষেক, উত্তরা-অভিমন্যুর বিবাহ প্রভৃতি সমস্ত ঘটনাই নাটকের অঙ্গীভূত হইয়াছে। কিন্তু নাটকে ঘটনাবলীর গাঁথুনি নিতান্ত দুর্বল। কীচকের কাম-বাসনা ও দ্রৌপদীর সতী-মর্যাদার দ্বন্দ্বকে যদি এই নাটকের বীজ ধরি, তাহা হইলে, দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্কে যেখানে দ্রৌপদী ও কীচকের সাক্ষাৎ হইয়াছে, ঐখান থেকেই নাটকের আরম্ভ করা উচিত ছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে এই নাটকখানির মধ্যে একমাত্র দ্বিতীয় অঙ্কই যাহা কিছু নাটকীয়-গুণ-সম্পন্ন হইয়াছে। গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল' ভিন্ন অন্য কোনো নাটকেই এই অংশের মতো রচনায় এতখানি উৎকর্ষ দেখা যায় না।

নাটকের এই অঙ্ক ঘটনার সঙ্ঘাত ও চরিত্রগুলির তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ। একদিকে কামুক, চরিত্রহীন কীচকের চরিত্র যেমন বাস্তবতায় সমুজ্জল হইয়া উঠিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি অভিমানিনী ক্ষত্রিয়ানী দ্রৌপদীর প্রতিহিংসা ও ভীমের তীব্র অন্তর-জ্বালা নাটকীয় কর্মসঙ্ঘাতের মধ্য দিয়া সুন্দর রূপ লাভ করিয়াছে। দুশ্চরিত্র কীচক। নারীমাত্রকেই সে ভোগ্যবস্তু মনে করে। পুষ্পচয়নরতা দ্রৌপদীকে দেখিয়া তাহার কাম-বাসনা জাগ্রত হইয়াছে। কামুকের লজ্জা নাই, শালীন্য-বোধ নাই। আপন ভগিনীর নিকট সে অকপটে নিজের কাম-বাসনা ব্যক্ত করিতেছে। রানী সুদেষ্ণা পতিব্রতা নারী। সতীর মর্যাদা তিনি বোঝেন। তাই তিনি কীচককে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিতেছিলেন। কিন্তু ভ্রাতৃস্নেহ-রূপ দুর্বলতার নিকট রানীর নীতি-জ্ঞান পরাজিত হইল। মানুষের যুক্তি তাহার বাসনার অনুগামী হয়। স্নেহ-দুর্বল রানীর যুক্তির ধারাও পরিবর্তিত হইল। দ্রৌপদীর আচরণের ভিতর তিনি কামুকতার ব্যঞ্জনা খুঁজিতে শুরু করিলেন। নিরাশ্রয়া দ্রৌপদী। সুদেষ্ণার আদেশে তাঁহাকে কীচকের গৃহ হইতেই মধু আনিতে যাইতে হইবে। কামার্ত

কীচক। দ্রৌপদী তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। লম্পট পুরুষ সতীর এই অবজ্ঞা-সূচক প্রস্থানের মধ্যেও দুষ্টা নারীর কামোদ্দীপক নিতম্ব-হেলন অনুমান করিয়া ধীরে ধীরে আপন লালসা-বসে তাঁহারই রমণ-যোগ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ধ্যানে মত্ত হইল। কীচক কাম্যবস্তুর লোভনীয় কল্পনায় চঞ্চলেন্দ্রিয় হইয়া অবস্থান করিতেছিল। পুনরায় দ্রৌপদীর অবজ্ঞায় এই প্রবল কাম বাধাপ্রাপ্ত হইল। পরিণাম ক্রোধ। রাজসভা মধ্যে কেশাকর্ষিতা, পদাঘাত-জর্জরিতা দ্রৌপদী রাজার নিকট হইতে কোনো সুবিচারের ইঙ্গিত না পাইয়া ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহার আত্ম-প্রকাশের উপায় নাই। নাট্যকার এই অংশে তীব্র অন্তর-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, অথচ চরম সংযম দেখাইয়াছেন। একটি মাত্র 'হোঃ—ওঃ' বাক্যে ভীমের রোষ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়। যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ তাহাকে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। নহিলে ক্রোধবশে ভীম হয়ত আত্মপ্রকাশ করিতেন। দ্রৌপদীর উক্তিগুলি উত্তেজনাপূর্ণ হইলেও সংক্ষিপ্ত। এই অঙ্কের মধ্যে সপ্তম গর্ভাঙ্ক তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বপূর্ণ। দ্রৌপদীর অপমানকে কেন্দ্র করিয়া ভীমের অতীত জীবনের স্মৃতি মনে পড়িয়া যায়। নিজের এই অজ্ঞাতবাসে যে আত্মপ্রকাশের উপায় নাই। এই সমস্ত পরিস্থিতির জন্য দায়ী দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ। ভীম তাহাদিগের উপর অতি ভীষণ প্রতিশোধ লইবার কল্পনায় বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেছিলেন, এমন সময় দ্রৌপদী প্রবেশ করিলেন। দ্রৌপদীর বাক্যগুলি মর্মস্পর্শী। প্রতিটি কথার আঘাত অতি তীব্র। যে-অভিমান রাজ-সভায় অবরুদ্ধ ছিল, নির্জন নিশীথে তাহা আজ ভাষা পাইয়াছে। তাই দ্রৌপদীর উক্তিগুলি দীর্ঘ।

কীচক-বধের আয়োজন হইল। কামে অন্ধ কীচক। কালিদাসের ভাষায় কামার্ত পুরুষ চেতনাচেতন-জ্ঞানহীন। নাসিকাগারে শ্মশ্রু প্রবেশ করিবার পরও কীচক ছদ্মবেশী ভীমকে চিনিতে পারে না। কীচক মরিল, দ্রৌপদী ও ভীমের হৃদয়ের জ্বালা কিছুটা নিবারিত হইল। কিন্তু ইহার পর আর নাটকের কোনো কর্মগতি নাই, কোনো চরিত্রের ক্রমবিকাশ নাই। নাটকীয় চরিত্র বিকাশের একটা বিশেষ ধারা আছে। পাত্র বা পাত্রীর অন্তরে একটা বিশেষ সংস্কার অনুকূল-প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য দিয়া আপন প্রকাশ খুঁজিতে থাকে। ঐ প্রকারের চাহিদা অন্তরে ও বাহিরে যে সঙ্ঘাত তোলে তাহারই ফলে নিত্য নূতন ঘটনা সৃষ্টি হইতে থাকে; চরিত্রের গোপন সত্যও ধীরে ধীরে ঐ কর্ম-প্রবাহের আশ্রয়ে প্রকাশ পাইতে থাকে। ঐ বিশেষ সংস্কার

বা বাসনার পরিণতি যেখানে হয়, নাটকের ঘটনার সমাপ্তিও সেইখানেই হইবে। এই অর্থে কীচকের কাম-বাসনা ও তাহার পরিণতি, দ্রৌপদীর নারী-মর্যাদাবোধ এবং তজ্জনিত কর্মের পরিণাম নাটকে যেখানে শেষ হইয়াছে, সেইখানে স্বাভাবিকভাবে নাটকের শেষ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, নাটকখানির নাম 'কীচকবধ' নহে, 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'। নাট্যকার পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসকালীন ঘটনা-পুঞ্জকে নাটকীয় সার্থকতা দান করিতে পারিতেন। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা দ্রৌপদীর সঙ্গে বিরাটরাজ্যে অজ্ঞাতবাস করিতে আসিয়াছেন। রাজা দুর্যোধন তাঁহাদিগকে আবিষ্কার করিবার জন্য সুশর্মাকে পাঠাইতেন। সুশর্মা কীচকের ভয়ে বিরাটরাজ্যে প্রবেশ করিতেন না। তারপর দ্রৌপদীর অপমান করায় ভীমের হাতে কীচকের মৃত্যু হইলে সুশর্মা মৎস্যরাজ্য আক্রমণ করিতেন। তাহা হইলে অজ্ঞাতবাসকারী পাণ্ডবদের আবিষ্কার করার আয়োজন নাটকে প্রথম হইতে একটা মুখ্য ব্যাপার হইত এবং কীচকের মৃত্যুর পর সুশর্মার বিরাট রাজ্য আক্রমণ আকস্মিক হইত না। সুশর্মাব পরাজয়ে রুষ্ট দুর্যোধন সদলবলে মৎস্যরাজ্য আক্রমণ করিতেন। তাহাতে এক কাজে দুই কাজ হইত। কৌরব-সৈন্যকে পরাজিত করিয়া গোধন-রক্ষা এক অর্জুন ভিন্ন কেহই করিতে পারিতেন না। নাট্যকার কাহিনীর সকলই আমদানি করিয়াছেন, কিন্তু নাটকীয় করিয়া তুলিতে পারেন নাই।

'জনা' গিরিশচন্দ্রের অন্যতম জনপ্রিয় নাটক। গিরিশচন্দ্রের যুগের দর্শকদের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক বিদ্যমান ছিলেন। একদল প্রাচীনপন্থী। ইঁহারা সংখ্যায় বেশী। যাত্রা-কথকতা পাঁচালী গানের মধ্য দিয়া ইঁহারা ধর্মকথা শুনিয়া পুণ্য অর্জন করিতেন। তাঁহারা 'জনা' নাটকের মধ্যে ভক্তি ও ধর্মবোধের অনেক উপকরণ পাইয়া তুষ্ট হইলেন। অন্যেরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শিষ্টজন। ইংরেজী নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহারা শেক্‌স্‌পীয়রীয় রীতিতে চরিত্রসৃষ্টি এবং কাহিনীবিন্যাসের অনেকখানি অনুবর্তন এই 'জনা' নাটকের মধ্যে লক্ষ্য করিলেন। সুতরাং বিকাশমান বাংলা নাটকের মধ্যে কাহিনীবিন্যাস ও চরিত্রচিত্রণ যতটুকু পাওয়া যায় তাহা লইয়া তৃপ্ত হওয়ার একটা আনন্দ তাঁহারা এই নাটক অবলম্বনে পাইয়াছিলেন একথা বলা যায়। গিরিশচন্দ্র দেশীয় যাত্রাগানের রীতির সহিত শেক্‌স্‌পীয়রীয় রীতির সমাবেশ 'জনা' নাটকে করিলেন বটে; কিন্তু এই দুই রীতির সার্থক

সমন্বয় তিনি এই নাটকে করিতে পারেন নাই। উহা গিরিশচন্দ্রের ক্ষমতায় যতটুকু সম্ভব, তাহা হইয়াছে তাঁহার 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে। 'বিল্বমঙ্গল'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

গিরিশচন্দ্র 'জনা' নাটকে সমসাময়িক রুচির অনুবর্তন করিয়াছেন ঠিকই। কিন্তু যে অপূর্ব নির্মাণক্ষমতা থাকিলে সমকালীন রুচিকেও চিরন্তন সাহিত্যমূল্য দান করা যায় তাহার প্রমাণ গিরিশচন্দ্রের 'জনা' নাটকে নাই।

'জনা' পৌরাণিক নাটক। পুরাণের কাহিনী সুপরিচিত। উহার চরিত্রগুলিও সিদ্ধরসবিগ্রহ। দর্শকেরা আগে হইতেই উহাদের সম্বন্ধে সবকথা জানে। উহারা কি করিবে বা বলিবে, কেমন ধরনের চলনায় চলিবে তাহাও দর্শকদের জানা থাকে। তাই পুরাণ অবলম্বনে নাটক লিখিতে গিয়া নাট্যকারগণ একটা বিরাট অসুবিধায় পড়েন। তাঁহারা পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে নাটকীয় কৌতূহল প্রায়শঃ সৃষ্টি করিতে পারেন না বা নাটকের পাত্রপাত্রীদের চরিত্রের মধ্যেও এমন কোনো জটিল দ্বন্দ্বের অবতারণা করিতে পারেন না, যাহার সমাধানে শেষ পর্যন্ত 'কী হয়, কী হয়' ভাবিয়া দর্শকগণ নিরুদ্ধ-নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করিয়া থাকিবে। গিরিশচন্দ্রও সেই সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন। পুরাণ মহাকাব্যাদির জানা কাহিনী ও চরিত্রগুলি অবলম্বনেও দ্বন্দ্বীভূত নাটকীয় সংঘাত সৃষ্টি করা যায়। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ তাঁহার 'ভীষ্ম', 'উলূপী', 'নরনারায়ণ' প্রভৃতি নাটকে তাহা করিয়াছেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র তাঁহার পৌরাণিক নাটকে উহা বিশেষ করিতে পারেন নাই। বিশেষ করিয়া, তাঁহার 'জনা' নাটক এই দিক দিয়া ব্যর্থ। তবে 'জনা'র মধ্যে কাহিনীর জটিলতা, চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব যে একেবারে নাই তাহা নয়। যে-টুকু আছে সেইটুকু উহার গুণ। 'জনা'র মধ্যে গিরিশচন্দ্রের ক্ষমতা ও অক্ষমতা উভয়ের পরিচয়ই লিপিবদ্ধ আছে। আমরা আলোচনাপ্রসঙ্গে তাহা দেখিতে পাইব।

নাটকখানির 'আরম্ভ'টিই আমরা প্রথমে বিচার করিয়া দেখিব। 'দেব বৈশ্বানর' রাজা নীলধ্বজের জামাতা। তিনি 'কল্পতরু' সাজিয়া যে যাহা চাহে তাহাকে সেই বরই দিতেছেন। রাজা নীলধ্বজ বংশীধারী বনমালীর দর্শন পাইয়া ধন্য হইতে চান। তাঁহার পুত্র প্রবীর মহাবীর। তিনি 'ভুবনবিজয়ী' শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ কামনা করেন। মরেন বা মারেন, সেইটি বড়কথা নয়। রানী জনা চিরদিন গঙ্গাপূজা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার কামনা, তিনি

অন্তিমে গঙ্গাজলে তনুত্যাগ করিবেন। অগ্নিদেব সকলকেই আশীর্বাদ করিলেন। প্রত্যেকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত নাটকের কী পরিণাম হইবে, আরম্ভেই তাহা স্পষ্ট হইয়া গেল। কাহিনী তো দর্শকগণের জানাই আছে। তাহাদের বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে প্রবীর ও অর্জুনের যুদ্ধে প্রবীর পরাজিত ও নিহত হইবেন, রাজা নীলধ্বজ এই সময়ে নিজের রাজধানীতে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইবেন এবং রানী জনা পুত্রশোকে শেষ পর্যন্ত গঙ্গাজলে দেহত্যাগ করিবেন। সুতরাং নাটকের পরিণতি জানিবার জন্য দর্শকের কৌতূহল বড় একটা আর থাকিবার কথা নয়। শেক্‌স্‌পীয়র, কালিদাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণ নাটকের আরম্ভেই পরিণতির আভাস দিয়াছেন। কিন্তু পরিণতি কী হইবে এবং কেমন করিয়া ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে সেই পরিণতি ঘনাইয়া আসিবে, নাট্যারম্ভে সংক্ষেপে সে কথা বলিয়া ফেলেন নাই। অথচ ইঁহারা দুইজনেই কিন্তু মোটামুটি জানা কাহিনী লইয়াই নাটক রচনা করিয়াছেন। কেহই নূতন কাহিনী বড় একটা উদ্‌ভাবন করেন নাই। তাঁহারা আরম্ভেই নাটকের ঘটনা ও পাত্রপাত্রীর চরিত্রকে এমন একটা চমৎকার মিলনের বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়াছেন যে অতীতের জানা চরিত্রগুলিও নূতন করিয়া চিন্তা-কর্ম অনুভূতির আবেগে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। মহাভারতের দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রেম-কাহিনী যতই পরিচিত হউক না কেন, কালিদাস কয়েকটি নরনারীর আন্দোলিত হৃদয়বৃত্তির প্রকাশের মাধ্যমে প্রথম অঙ্কে তাহাদিগকে যেভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে দুষ্যন্ত-শকুন্তলাকে অবলম্বন করিয়া চিরকালের প্রেমিক-প্রেমিকাগণই ভীড় করিয়া বসে। সহৃদয় দর্শক নিজেরাই দুষ্যন্ত-শকুন্তলার স্থলাভিষিক্ত হইয়া আত্মরতি আস্বাদন করিতে থাকেন। জলসেচনশ্রান্তা তরুণীর প্রতি রাজার সমবেদনাব্যঞ্জক স্বগতোক্তি, মুগ্ধা নায়িকার মনোভাব গোপন করার প্রচেষ্টা, সখীগণের তাহা ধরিয়া ফেলিয়া মার্জিত, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ, সমস্ত মিলিয়া মানুষের জীবনলীলাকে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছে। প্রতিটি অঙ্কে বিশেষ সময়ের মানুষের জীবনই দর্শককে মুখ্যতঃ আকৃষ্ট করে। পরে কি হইবে বা না হইবে তাহার জন্য একটা অকারণ কুণ্ঠা জাগাইয়া রাখে না। অথচ কবি-নাট্যকার অতি কৌশলে প্রতি মুহূর্তেই নাটকের পরিণতির আভাস দিয়া যাইতেছেন। 'আশ্রমমৃগোঽয়ং, ন হন্তব্যং, ন হন্তব্যম্',—'হে মহারাজ, এইটি আশ্রমমৃগ, বধের যোগ্য নয়, বধের যোগ্য নয়।' ইহা নাগরবৃত্তিক, বহুবল্লভ রাজা দুষ্যন্তের

আশ্রমবালিকা মুগ্ধা শকুন্তলাকে মন্মথ-শরে বিদ্ধ না করিবার কাতর অনুরোধ নয় কি? কিন্তু ভবিতব্য যাহা, তাহা হইবেই। যাঁহারা এই নিষেধ করিলেন, তাঁহারাই রাজা দুষ্মন্তকে 'চক্রবর্তী'-সন্তান-লাভের আশীর্বাদ করিলেন। সুতরাং ঋষির নিষেধবাণী উপেক্ষা করিয়া রাজা দুষ্মন্ত এবং আশ্রম-পালিতা শকুন্তলা যে মন্মথের লীলায় মত্ত হইয়া উঠিবে তাহা বেশ বুঝা যায়। খুব সহজে, সরলভাবে, এই দুই প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন ঘটিবে না, তাহাও আভাসে বুঝা গেল। আশ্রমে হঠাৎ একটি মত্ত গজ প্রবেশ করিয়া সমস্ত আশ্রমেই যে ভীতি ও অশান্তির রাজত্ব সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা কি কামোন্মত্ত রাজা দুষ্মন্ত নিজে নন? সুতরাং শকুন্তলা নাটকের আরম্ভের মধ্যেই পরিণতি সুকৌশলে আভাসিত হইয়া উঠিলেও উহা স্পষ্ট নয়। উহা দেখিবার জন্য ভাবী ঘটনার গতি-প্রকৃতি ঔৎসুক্যের সঙ্গে লক্ষ্য করিতে হয়। শেক্‌স্‌পীয়রের জুলিয়াস্ সিজার নাটকেও আরম্ভের মধ্যে পরিণতির আভাস আছে। সিজারের বিজয়-উৎসবে যে রোমের আপামর জনসাধারণ সকলেই আনন্দিত নয়, তাহা বুঝা যায় দুইজন ম্যাজিস্ট্রেটের উক্তিতে ও চিন্তামগ্ন ব্রুটাসের সহিত ধূর্ত রাজনীতিবিদ্ ক্যাসিয়াসের আলাপে। একটা ঝড় উঠিবে তাহা বেশ বুঝা গেল। কিন্তু সেই ঝড়ের গতি-প্রকৃতি কি হইবে তাহার জন্য পরবর্তী ঘটনা পর্যবেক্ষণের ঔৎসুক্য লইয়া দর্শককে অপেক্ষা করিতে হয়। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নরনারায়ণ' নাটকের আরম্ভেও এই অবস্থা। সেখানেও আমরা পরিণতির আভাস পাই। কর্ণের অস্ত্রশিক্ষা যেদিন পূর্ণ হইল, সেইদিনই তিনি 'মৃত্যু-আশীর্বাদ' লাভ করিলেন। পরিণতি নিশ্চিত ও অবধারিত। তবুও কিন্তু এই নিশ্চিত, অবধারিত মৃত্যু কর্ণের জীবনে কিভাবে ঘনাইয়া আসে, আসে কিনা, তাহা জানিবার জন্য দর্শকের আগ্রহ আদ্যন্ত বজায় থাকে। কারণ, পুরুষকারের জীবন্ত মূর্তি কর্ণ নিয়তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে বদ্ধপরিকর হয়। শক্তিশালী মানুষের আত্মশক্তি-নির্ভরতা এবং প্রতিকূল দৈবের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা কর্ণচরিত্রে এমন একটা গতিবেগ করে যাহার জন্য আদ্যন্ত নাটকীয় কৌতূহল বজায় থাকে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের 'জনা' নাটকে এই ধরনের নাট্য-কৌতূহল বজায় থাকে না। ইহাই এই নাটকের প্রধান দুর্বলতা।

ইহার কারণ অনেক। প্রথম কারণ এই যে নাট্যকার নাটকের মধ্যে অলৌকিকতাকে এত প্রাধান্য দিয়াছেন যে মানব-জীবন উহার মধ্যে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবার অবকাশ পায় নাই। নরনারায়ণের কর্ণ জীবনের

ঘটনা-পরম্পরার মধ্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণের নরনারায়ণত্ব পরীক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। বুদ্ধি-বিবেচনাশীল মানুষের স্বাভাবিক কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে তিনি ঐ অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন মহামানবের জীবনকে জানিয়া-বুঝিয়া তবেই ধীরে ধীরে নিশ্চিত পরিণামের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। 'জনা' নাটকে মানুষের চরিত্র চলিতে চলিতে অলৌকিকতার প্রভাবে অনুচিত, অস্বাভাবিক কার্য করিয়া বসিয়াছে। মানুষের চরিত্র এবং দেবতার লীলা অনিবার্য কার্যকারণ সম্পর্কে 'জনা' নাটকে মিলিয়া-মিশিয়া এক হইয়া যাইতে পারে নাই। পারে নাই বলিয়াই নাটকখানি ব্যর্থ হইয়াছে।

এই নাটকে জনা, প্রবীর ও মদনমঞ্জরীর চরিত্রে আমরা মানুষের জীবন্ত হৃদয়ের স্পর্শ অনুভব করি। অন্যগুলি প্রায় সকলই গতানুগতিক, অবশ্য বিদূষক-চরিত্র বাদে। এই চরিত্রটি সম্বন্ধে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব। প্রবীর ক্ষত্রিয় কুমার। ক্ষাত্রতেজে উদ্বুদ্ধ হইয়াই সে পাণ্ডবের যজ্ঞাশ্ব বন্ধন করিয়াছে। মদনমঞ্জরী প্রবীরের পতিপ্রাণা স্ত্রী। তাঁহার মনে আগে হইতেই স্বামীর ভবিষ্যৎ-অমঙ্গলের ছায়া পড়িয়াছে। ইহা অস্বাভাবিক বা অলৌকিক নয়। প্রিয়জনের ভাবী অমঙ্গলের ছায়াপাত মানুষের উদ্বিগ্ন মনে এমনিভাবে হইতে দেখা যায়। কিন্তু প্রবীর প্রকৃত বীর। তাই সে স্ত্রীর অনুনয় অগ্রাহ্য করিয়া অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ইহাতে সে শ্রীকৃষ্ণের বিরাগভাজন হইবে জানিয়াও নিরস্ত হয় না। কারণ, প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধে আহ্বান করা যে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। প্রবীর সেই ধর্ম পালন করিবে। কৃষ্ণভক্ত রাজা নীলধ্বজ পুত্রকে এই যুদ্ধে উৎসাহ দিবেন না জানিয়া প্রবীর তেজস্বিনী জননী জনার শরণাপন্ন হইয়াছে। রাজা নীলধ্বজও মানুষ। তিনি একদিকে যেমন পুত্রের মঙ্গল কামনা করেন, অন্যদিকে তেমনি একথাও জানেন যে শ্রীকৃষ্ণ-সহায় অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া কেহ জয়লাভ করিতে পারিবে না। তাই তিনি পুত্রের ও রানীর 'মরণের অনুগামী হেন বুদ্ধি' সমর্থন করিতে পারেন নাই। তাঁহার পিতৃস্নেহ ও কৃষ্ণভক্তি উভয়ই প্রবীরকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছে, কিন্তু বীর-পুত্র ও বীরাঙ্গনা স্ত্রীকে তিনি বুঝাইতে না পারিয়া শেষ পর্যন্ত তাহাদিগকেই সমর্থন করিয়াছেন। বুদ্ধিমান, প্রবীণ মানুষের পক্ষে যাহা করা সম্ভব, রাজা নীলধ্বজ তাহা করিয়াছেন। নীলধ্বজকে ভীরু বলা যায় না। তিনি ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা, বুদ্ধিমান ব্যক্তি। কৃষ্ণের প্রতি অবিচল ভক্তির বশেই তিনি পুত্রশোক সহ্য করিতে পারিয়াছেন; জনার ন্যায় মৃত্যু বরণ

করেন নাই। ইহা কাপুরুষতা নয়; আধ্যাত্মিক চেতনার ফল। নীলধ্বজ, জনা ও প্রবীরের চরিত্র এই নাটকে যে পর্যন্ত মানবীয় স্বাভাবিকতায় রূপায়িত হইয়াছে, সে পর্যন্ত উহারা আকর্ষণীয়, সুন্দর ও নাটকীয় হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু যখনই এই চরিত্রগুলি কর্মহীন নীতিবাদের বাহন হইয়াছে অথবা কার্য-কারণ-সম্পর্কের স্বাভাবিকতা বিসর্জন দিয়া অলৌকিকতার প্রভাবে অভিভূত হইয়াছে, তখনই ইহারা নাটকীয় তাৎপর্য হারাইয়া ফেলিয়াছে। চরিত্রগুলি তখনই অস্বাভাবিক এবং অসার্থক হইয়া উঠিয়াছে। তাই নাটকখানিও দুর্বল হইয়া গিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ ও মহাদেব উভয় চরিত্রই এই নাটকে দেবমহিমা হারাইয়া ফেলিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ পক্ষপাতী। তিনি নিরঞ্জন নন। পাণ্ডবপ্রীতির দ্বারা তাঁহার চরিত্র রঞ্জিত। তাই তিনি নায়িকার ছলনায় প্রবীরকে শক্তিহীন করিয়া অর্জুনকে বিজয়দান করিতে কুণ্ঠিত হন না। ইহা শ্রীভগবানের চরিত্র নয়—স্বার্থপর, মানুষের কাজ। প্রবীরকে না মারিলে জগতের মহান্ অকল্যাণ কিছুই হয় না। তবুও এই ধরনের ষড়যন্ত্র করিলেন ভগবান নিজে! দেবাদিদেব মহেশ্বরও শুধু কৃষ্ণভক্তির জন্য এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন। অনেকে বলিতে পারেন, মাতৃভক্তির মাহাত্ম্য এবং কামের ছলনা-শক্তির প্রাবল্য বুঝাইবার জন্যই নাট্যকার এই অংশের অবতারণা করিয়াছেন। সেখানেও আমাদের আপত্তি আছে। মাতৃভক্তি-মহামন্ত্র সম্বল করিয়া অনেক ভাগ্যবান সন্তান এই জগতে অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। সুতরাং মায়ের প্রতি অটুট নিষ্ঠা-ভক্তি থাকিলেও যে মহাবিপদের সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া যায় ইহা নিছক কবি-কল্পনা নয়। প্রবীরও মহামাতৃভক্ত। কিন্তু কাম ও রতির সামান্য সঙ্গীত এবং ছদ্মবেশিনী নায়িকার এতটুকু প্রণয়-সম্ভাষণে বুদ্ধিমান, শক্তিমান, চরিত্রবান প্রবীর মুহূর্ত মধ্যে মুগ্ধ হইয়া গেল, দেবতার ও মায়ের নিষেধ উপেক্ষা করিয়া জাহ্নবীপ্রদত্ত রণসাজ পরিত্যাগ করিল, তাহার জন্য তাহার মনে কর্তব্যাকর্তব্যের এতটুকুও দ্বন্দ্ব বা আলোড়ন দেখা দিল না, ইহা সম্ভব নয় ও স্বাভাবিকও নয়। এই অস্বাভাবিকতার জন্যই চরিত্রটির মানবিক আবেদন ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। লেখক যথোপযুক্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং কার্যকারণ সম্পর্কের মাধ্যমে তাঁহার নীতির বাণী নাটকের চরিত্রে মূর্ত করিয়া তুলিতে পারেন নাই।

যাত্রার সস্তা নীতিপ্রচার এই নাটকের নাট্যগুণ আরো বহুস্থলে ক্ষুণ্ণ

করিয়াছে। প্রবীরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নাটকখানির নাট্যকৌতূহল নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং নাটকের আকর্ষণহীণ কাহিনীকে আর অযথা বেশী দূর টানিয়া লইবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু নাট্যকার একদিকে যেমন মাতৃভক্তি ও কৃষ্ণভক্তির মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য ব্যাকুল, অন্যদিকে তেমনি নাটকের দুঃখময় পরিণতি অতিক্রম করিতেও যত্নবান। সেজন্য ঘটনার বাস্তবতা একেবারে বিসর্জন দিয়া তিনি রূপকথার কল্পলোকে চলিয়া গিয়াছেন। জনার পুত্রস্নেহ এবং ক্ষাত্রতেজ ভিন্ন কোনো দৈবীশক্তি ছিল না ইহা সত্যকথা। কিন্তু তাহার দীর্ঘনিঃশ্বাসের তেজে বটবৃক্ষ ভস্মীভূত হয়। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই বটবৃক্ষরূপে ঐ তেজ নিজদেহে ধারণ করেন। হরিভক্ত বিদূষকের স্পর্শে সেই দগ্ধ বৃক্ষও নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া পত্রেপুষ্পে সুশোভিত হইয়া ওঠে। ভক্তও ভগবানের অলৌকিক মাহাত্ম্যে বিশ্বাসী ব্যক্তি এই সকল ঘটনায় ঈশ্বরের অপূর্ব লীলার সন্ধান পাইয়া মুগ্ধ হইতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা নাটকে মানুষের জীবনকেই স্বমহিমায় মূর্ত দেখিতে চান, তাঁহারা কিন্তু সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না। ভূত এরিয়েল্ এবং অর্ধ দৈত্য কালিব্যান্‌কে লইয়া মনোজ্ঞ নাটক রচিত হইতে পারে। কারণ উহারা মানুষ নয় জানিয়াই মানুষ উহাদের চরিত্র আস্বাদন করে। শ্রীকৃষ্ণ কখনও সাধারণ মানুষের মতো চলিবেন, কখনো তিনি মানববোধের অতীত কোনো কাজ করিবেন, ইহাও না-হয় মানিয়া লওয়া যায়। কারণ, ভগবান যাহা করেন, তাহার মধ্যে লীলা, অর্থাৎ মানবের দুর্বোধ্য কাজ অনেক থাকে। কিন্তু মানবী 'জনা' তো কাহারও অবতার নয়। তাহার চরিত্রচিত্রণে মানবজীবনের সম্ভাব্য বাস্তবতাকে অস্বীকার করিলে চরিত্রটিই অবিশ্বাস্য হইয়া পড়ে। মানবচরিত্রে লৌকিক ও অলৌকিক কাহিনীর সমাবেশ ঘটাইতে গেলেও উভয়ের মধ্যে একটা সম্ভাব্য বাস্তবতার সীমারেখা থাকা ভাল। নাট্যকার এই সীমা একেবারেই অতিক্রম করিয়া নিতান্ত রূপকথার কল্পলোকে চলিয়া গিয়াছেন। ইহা শুধু যাত্রার প্রভাব নয়। বাংলা মঙ্গলকাব্য এবং অনুবাদসাহিত্যের প্রভাবও বটে।

'জনা' নাটকখানি যে অনেকাংশে নাট্যকৃত যাত্রা, তাহার আরো অনেক প্রমাণ আমরা এই নাটকে পাই। শুধু কাহিনী-বিন্যাস এবং চরিত্রচিত্রণেই যে এই প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তাহা নয়। এই নাটকের অনেকগুলি সঙ্গীতে এবং কোনো কোনো চরিত্রের সংলাপে নাট্যকার হুবহু যাত্রার অনুকরণ করিয়াছেন। এই অনুকরণের দ্বারা তিনি সমসাময়িক লোকরুচির সমর্থন

করিয়াছেন। তাঁহার যুগের দর্শকেরা এইগুলির জন্যই তাঁহাকে সেই যুগের মহাকবি ও শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের সম্মান দিয়াছিল সত্য, কিন্তু যুগের পরিবর্তনে মহাকালের বিচারে এইগুলিই গিরিশচন্দ্রের নাটকের প্রধান ত্রুটি বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। 'জনা' নাটকের প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কটি প্রায় আদ্যন্ত যাত্রার আদর্শে পরিকল্পিত। সঙ্গীত যাত্রার প্রাণ। এই সঙ্গীতের সূত্রে যাত্রায় গদ্য সংলাপ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল সেকথা আমরা আগেই বলিয়াছি। যাত্রাকে সংস্কৃত করিয়া লইয়া মনোমোহন বসু প্রভৃতি গীতাভিনয়-রচয়িতৃগণ সঙ্গীতের ব্যবহার কমাইয়া দিয়া সংলাপের ব্যবহার বেশি করিলেন বটে, তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে সঙ্গীতের আবশ্যিক ব্যবহার রহিয়া গেল। নাটকের আরম্ভে বা দৃশ্যের প্রারম্ভে একটু অবকাশ পাইলেই গীতাভিনয়-রচনাকারগণ সঙ্গীত পরিবেশন করিতেন। বিশেষ করিয়া সখীগণ, সখাগণ মিলিতভাবে গান করিয়া সখী বা সখার মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা করিত। প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে সখীগণের গান সেই গীতাভিনয়-শৈলীর অনুবর্তনেই রচিত হইয়াছে। মদনমঞ্জরীর সখী বসন্তকুমারীর সংলাপটি লক্ষণীয়। যাত্রায় ঘটনার বা পরিস্থিতির লঘুত্ব বা গুরুত্ব কিছুই বিচার না করিয়া গুরুগম্ভীর পরিস্থিতিতেও দাস দাসী, সখী, দূত প্রভৃতির মুখে ছড়ার ছন্দের লঘুকথা দেওয়া হইত। যাত্রার লেখক ভুলিয়া যাইতেন যে ঐ গুরু-গম্ভীর পরিস্থিতি ও পরিবেশে ঐ হালকা কথাগুলি ঠিক মানাইতেছে না। তিনি জানিতেন, সাধারণ দর্শকদের জন্য হাস্যরস পরিবেশন এই সমস্ত চরিত্রের মাধ্যমেই করিতে হয়। কিন্তু তিনি জানিতেন না যে এই পরিবেশনেরও একটা যথাযোগ্যতা আছে। মদনমঞ্জরীর মনে স্বামীর ভাবী অমঙ্গলের ছায়া পড়িয়াছে, তাই সে চিন্তান্বিত। বসন্তকুমারী ভাবিল, স্বামীর সাময়িক অদর্শনেই বুঝি মদনমঞ্জরী বিরহে এমন ব্যাকুলা হইয়াছে। তাই সে ছড়ার হাল্‌কা কথায় সখীকে ব্যঙ্গ করিতেছে, কিন্তু মদনমঞ্জরী যখন সত্য-সত্যই ঘোর অমঙ্গলের লক্ষণ দেখিতেছে,—'যেন কঙ্কন খসিয়ে পড়ে, সিন্দুর মলিন যেন শিরে,'—তখনও বসন্তকুমারী এই হালকা চালের ছড়ার ছন্দ পরিত্যাগ করিয়া গুরু-গম্ভীর ভাবে কথা বলিতেছে না কেন, তাহাই ভাবিবার বিষয়। তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক, মায়াকাননে ছলনাময়ী নায়িকা প্রবীরের সঙ্গে এই চটুল ছড়ার ছন্দে প্রেমালাপ করিতেছে। প্রেমের ব্যাপারে হালকা চালের ছড়ার ছন্দ চলিতে পারে। কিন্তু এখানেও যদি গিরিশচন্দ্র তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গৈরিশ ছন্দই ব্যবহার করিতেন, তাহা

হইলে প্রেমাভিনয় প্রকাশের প্রগাঢ়তা অনেকখানি বাড়িয়া যাইত, সন্দেহ নাই। যাত্রার প্রভাব মানিতে গিয়া নাট্যকার এখানেও তাহা করিতে পারেন নাই।

ভাবের উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তি যেখানে প্রয়োজন, যাত্রায় সেখানে শুধু সংলাপে চলে না। সঙ্গে সঙ্গে একখানি সঙ্গীতও জুড়িয়া দিতে হয়। প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে বসন্তকুমারীর সংলাপের অনুগামী সঙ্গীতে সেই শৈলীর অনুবর্তন দেখিতে পাই। ইহার আরও উদাহরণ মিলিয়াছে দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে। জনার শঙ্কাকুল মাতৃহৃদয় এখানে শুধু গঙ্গার স্তব করিয়াই শান্ত হইতে পারিতেছে না। জনা সঙ্গে সঙ্গে গানও করিয়া বসে। বৃদ্ধা রাজমাতার মুখে এই সঙ্গীত শুধু যাত্রায়ই মানায়। যাত্রার রচয়িতৃগণ অবর জনের চরিত্রের মাধ্যমে শুধু হাস্যরস পরিবেশন করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না। এই সকল চরিত্রের মাধ্যমে সমাজ ও ধর্মনীতির কদর্যতার সমালোচনা করিয়া এবং প্রকৃত ধর্মনীতি সমাজনীতির মর্মকথা উদ্‌ঘাটন করিয়া তাহারা সমাজসেবার গুরুদায়িত্বও পালন করিতেন। হয়তো এই চরিত্রগুলি নায়ক-নায়িকার চরিত্র-বিকাশে বা নাট্যকাহিনীর আবর্তন-বিবর্তনে খুব একটা সহায়তা করিত না। তবুও নাট্যকার হাস্যরস ও নীতিবাক্য পরিবেশনের জন্য যাত্রার মধ্যে ইহাদিগের আমদানি করিতেন। 'জনা' নাটকের গঙ্গারক্ষকগণ এই ধরনের চরিত্র। তাহারা দেবীর আদেশে শুধু ঘোড়া-চুরি করিতেই আসে না বা উন্মাদিনী জনাকে রক্ষা করিতে তাহার পিছনে পিছনেই ছোটে না। কোথায় কোন ছাপকাটা, তুলসীর-মালা আঁটা, বকধার্মিক গঙ্গালাভ করিতে যাইতেছিল, তাহাকে 'তেশূন্যে' মারিয়া ভূত করিয়া রাখে। দিনের বেলায় যোগী সাজিয়া কোন কপটধার্মিক রাত্রে সেবাদাসীর সঙ্গ করে. তাহাকে ঘাড় বাঁকাইয়া ধরিয়া মারিয়া ইহারা ব্রহ্মদৈত্য করিয়া রাখে। এই সব প্রসঙ্গ শুধু হাসির উদ্রেক করে না। মানুষকে ফাঁকি দিতে পারিলেও যে অন্তিমে বিধাতাকে ফাঁকি দিয়া স্বর্গে যাওয়া যায় না, এই সকল বর্ণনার মাধ্যমে নাট্যকার তাঁহার শ্রোতাদের সেই কথা বুঝাইয়া পরোক্ষে ধর্মে মতি আনিতে এবং অসৎকর্ম পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দেন। নাটকের মূল কাহিনীর সঙ্গে এই উপদেশাবলীর যোগ সামান্য হইলেও সমাজে ধর্মনীতি ও ধর্মবোধ জাগাইবার জন্য এই সকল ঘটনা ও উক্তি একদিন প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইত। যাত্রা গান তখন শুধু আমোদ উপভোগের উপকরণ রূপে বিবেচিত হইত না। উহা ধর্মের অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইত। আজ নাটককে

শুধু নিছক 'আনন্দনিষ্যন্দী রূপক'রূপে দেখিতে গিয়া উহার ঐ অংশগুলিকে অসার্থক, অবান্তর এবং প্রচারকার্যপূর্ণ বিষয় বলিয়া মনে হইতেছে। নাট্যকারের রচনাকেও তাই সাহিত্যাদর্শে হীন বলিয়া ধরিয়া লইতে হইতেছে।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে যাহাকে ট্রাজেডি বলে, 'জনা' নাটক তাহা নয়। কারণ, কোনো শক্তিমান ব্যক্তি নিজের জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে কৃত-অপরাধের জন্য নিয়তির রোষে পতিত হইয়া এই নাটকে সৌভাগ্যের উচ্চ শিখর হইতে দুর্ভাগ্যের নিম্নতম গহ্বরে পতিত হন নাই। কোনো শক্তিমান, প্রতিষ্ঠাবান, গুণী, জ্ঞানী ব্যক্তি আপন চরিত্রের অন্তর্নিহিত কোনো মারাত্মক ভুল-ত্রুটি-দুর্বলতার জন্য শোচনীয় পরিণাম বরণ করেন নাই। প্রবীর ও জনার মৃত্যুতে নাটকখানি বেদনাপ্লুত হয় মাত্র। কিন্তু শক্তিমান মানুষের কর্মময় জীবন যে শেষ পর্যন্ত জীবনীয় নয়, এমন কোনো বিষাদ-গম্ভীর সত্যের উপলব্ধি এই নাটকের মধ্যে নাই। তাই এই নাটকখানি বিয়োগান্ত; কিন্তু ট্রাজেডি নয়। ট্রাজিক চরিত্রের মধ্যে চাওয়া-না-চাওয়া, পাওয়া-না-পাওয়ার যে তীব্র দ্বন্দ্ব থাকে, এই নাটকের কোনো চরিত্রের মধ্যে তাহা নাই। নিজ জীবনের কোনো দুর্দমনীয় প্রবৃত্তির তাড়নায় আকুল হইয়া এই নাটকে কোনো চরিত্র প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া অদৃষ্টের হাতে গৌরবময় পরাজয় বরণ করে নাই। সুতরাং সার্থক ট্রাজিক চরিত্র এই নাটকে নাই। 'জনা' বা প্রবীর ক্ষত্রিয়ের আদর্শ রক্ষা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণসহায় অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু এই যুদ্ধ অবলম্বন করিয়া বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তীব্র দ্বন্দ্বে যেমন তাহাদিগকে লিপ্ত হইতে হয় নাই, তেমনি নিজেরাও কোনো গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বে পতিত হয় নাই। এই নাটকের চরিত্র বা কাহিনী কোনোটির মধ্যেই ট্রাজেডীর গাম্ভীর্য, ভয় ও বিস্ময় দেখা যায় না।

'জনা', 'নীলধ্বজ', 'প্রবীর', 'মদনমঞ্জরী' ও 'বিদূষক'—এই কয়টি চরিত্রই এই নাটকখানিতে মোটামুটি আলোচনার যোগ্য। বাকি চরিত্রগুলি নাটকে অপ্রধান। অর্জুন ব্যক্তিত্বহীন। শ্রীকৃষ্ণ একান্ত সাধারণ মানুষ। তাঁহার ভগবত্তা সম্বন্ধে নাটকের অন্য পাত্রপাত্রীগণ যাহাই বলুক না কেন, চরিত্রে সেই ভগবত্তার কোনো বিকাশ এই নাটকে দেখা যায় না। অগ্নির দেবত্ব শুধু কয়েকটি আশীর্বাদেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। নীলধ্বজের মহাবিপদের দিনে তাঁহার দেবদৃষ্টি বৈষ্ণবী মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। সাধারণ মানুষের মতো তিনি বিপদে বিচলিত হন। রাজা নীলধ্বজের বিপদের দিনে তিনি

দৈবশক্তির দ্বারা এই বিপন্ন পরিবারের কোনো উপকারই করিতে পারেন নাই। নাটকীয় ঘটনার নিয়মনে তাঁহার কোনো ভূমিকা নাই। সুতরাং নাটকে তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী উপস্থিতি অপ্রয়োজনীয়। প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কেই তাঁহার কাজ শেষ হইয়া যায়। তারপর তিনি নাটক হইতে বিদায়-গ্রহণ করিলেই তাঁহার দৈব মর্যাদা রক্ষিত হইত। এই নাটকে দেবতার চেয়ে বরং মানবের মহিমা অধিক প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

'জনা' নাটকের নামভূমিকা। 'জনা'ই নাটকের নায়িকা। তিনিই আপন চরিত্র ও ধারণা-ভাবনা-কর্মের আঘাত-সঙ্ঘাতে নাটকের কাহিনীকে গতিদান করিয়াছেন। তাঁহারই প্রত্যক্ষ অভিঘাতে নাটকীয় ঘটনা বিকশিত হইয়া দ্রুত পরিণামের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। তিনি বীরপত্নী না হইলেও বীরমাতা, বীরাঙ্গনা। কিন্তু সর্বোপরি তিনি জননী। প্রবীর পাণ্ডবের যজ্ঞাশ্ব বাঁধিয়া আনিয়াছে জানিয়া কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিতে এবং অর্জুনের অস্ত্রের ভয়ে, (যুদ্ধ করিলে আসন্ন পরাজয় জানিয়া) বুদ্ধিমান বৃদ্ধ রাজা নীলধ্বজ পুত্রকে যজ্ঞাশ্ব মুক্ত করিতে আদেশ করিয়াছেন। রানী জনাও পুত্রকে সেই আদেশই করেন। শক্তিমান তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন মহাবীর। তাঁহার নিকট বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করা ভীরুতা নয়। কিন্তু প্রবীরও যুবক। সে ক্ষত্রীয়বীর। প্রাণভয়ে পরাজয় স্বীকার সে করিবে না। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সে রণমৃত্যু বরণ করিতে চায়। পুত্রের তেজস্বিতায় পুত্রবৎসলা মাতার মধ্যে স্নেহ-দৌর্বল্য অতিক্রম করিয়া ক্ষত্রিয়ানীর তেজ জাগিয়া উঠিল। তিনি পুত্রকে সমর্থন করিলেন। নাটকের আরম্ভাংশে মাতৃস্নেহের সঙ্গে ক্ষাত্রতেজের স্বাভাবিক মিলন হইয়াছে জনার চরিত্রে। জনার অনমনীয় ব্যক্তিত্বের নিকট তাঁহার স্বামী রাজা নীলধ্বজও শেষ পর্যন্ত বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। নীলধ্বজ রণবিমুখ, ভীরু, দুর্বল, কাপুরুষ নন। তিনি বিচক্ষণ, সুবিবেচক, বুদ্ধিমান রাজা। পাণ্ডবদিগের বিক্রম এবং শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধি ও কূট-কৌশলের কথা তিনি জানেন। তিনি আরো জানেন যে শ্রীকৃষ্ণনাথ পাণ্ডবের সঙ্গে যুদ্ধ করিলে পরাজয় অনিবার্য। তাই তিনি স্ত্রী ও পুত্রকে এই যুদ্ধে লিপ্ত না হইতে বারে বারে অনুরোধ করেন।' 'মূঢ়ের মতন' রণ-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মৃত্যু আলিঙ্গনই ক্ষাত্রতেজের পরিচয় নয় ইহা তিনি জানেন। তাই তিনি প্রবল শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করিতে চান। কিন্তু যুবক পুত্র প্রবীর জয়-পরাজয় বিচার করিয়া যোগ্য শত্রুর সঙ্গে সম্মুখ-যুদ্ধে লিপ্ত হইতে চায়। অদৃষ্ট

বিরূপ হইলে সে বীরের যোগ্য রণমৃত্যুই বরণ করিবে। জনা নারী এবং মাতা। পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়াই তিনি তাহাকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু পুত্রের অত্যধিক উৎসাহ দেখিয়া তিনি তাহাকে যুদ্ধে অনুমতিই দিলেন। নীলধ্বজের হরিভক্তির মধ্যে তিনি ভীরুতা ও দুর্বলতা আবিষ্কার করিয়া বলিলেন, "হরিভক্তি নহে রাজা হীনতা-স্বীকার।" শান্তনুনন্দন ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকে 'সাক্ষাৎ নারায়ণ' জানিয়াও তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বীরের মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। মহাবীর পুত্র এবং তেজস্বিনী স্ত্রীকে নিজের যুক্তির পথে আনিতে না পারিয়া রাজা নীলধ্বজ তাহাদের মতে মত দিয়াছেন। প্রশ্ন উঠিতে পারে, প্রবীরের মৃত্যুর পর রাজা নীলধ্বজ যুদ্ধ করিয়া আত্মবিসর্জন করিলেন না কেন? ইহা কি কাপুরুষের লক্ষণ নয়? এখানে আমাদের বক্তব্য এই যে, রাজা নীলধ্বজের মধ্যে ভারতীয় ভগবদ্‌ভক্তিই জয়যুক্ত হইয়াছে। ভগবানের অবতারবাদে ভারতবর্ষ বিশ্বাস করে, রাজা নীলধ্বজও করিয়াছেন। তিনি জানেন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। নিজ জীবনের সমস্ত বৃত্তি-প্রবৃত্তির বন্ধন ছিন্ন করিয়া এই নরবিগ্রহ শ্রীভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করাই ভারতীয় ভক্তিধর্মের বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে স্ত্রী-পুত্র, ধন-সম্পদ বা আত্মমর্যাদাবোধরূপ অহঙ্কার পথের বাধা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। নিজ জীবনের শোক-দুঃখ, হাসি-কান্নার সমস্ত কিছুই তাঁহার চরণে নিবেদন করিয়া ভক্ত রিক্ত ও মুক্ত হইতে চায়। এই নাটক শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা তেমন প্রকাশিত হয় নাই বটে; কিন্তু নীলধ্বজের কৃষ্ণভক্তি স্বমহিমায় প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি শোক-দুঃখের চরম সান্ত্বনা শ্রীভগবানের রাতুল চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। এই নাটকের মধ্যে কোনোও চরিত্রে যদি সঙ্গতি ও স্বাভাবিকতা রক্ষিত হইয়া থাকে তবে তাহা এই নীলধ্বজ-চরিত্রে।

প্রবীরের মৃত্যু পর্যন্ত 'জনা'র চরিত্রে স্বাভাবিক ও সঙ্গত বিকাশ দেখা যায়। বীরপুত্রের বীরমাতা জনা সমস্ত রাজপুরীর বিরোধিতা এবং যুদ্ধে অনিচ্ছার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। সৈন্য-সেনাপতি, রাজা-মন্ত্রী সকলেই যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিতে এবং পাণ্ডবশক্তির ভয়ে যুদ্ধ করিতে অসম্মত হইয়া পলায়ন করিতে চাহিতেছে, রানী 'জনা' তাহাদের মধ্যে মূর্তিমতী প্রেরণা এবং শক্তির মতো আবির্ভূত হইয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছেন। রণজয়ী পুত্রের গৌরবে মাতা-পিতা উভয়েই আনন্দিত ও গৌরবান্বিত হইয়াছেন। অর্জুনের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর প্রবীর

হঠাৎ অন্তর্হিত হওয়ায় জনার মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে এই চরিত্রটির স্বাভাবিকতাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু প্রবীরের মৃত্যুর পর চরিত্রটিতে এই স্বাভাবিকতা রক্ষিত হয় নাই। পুত্রশোকে অভিভূত হইয়াই জনা হইয়া উঠিলেন প্রচণ্ড প্রতিহিংসাময়ী। তিনি পুত্রহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য 'ক্রুদ্ধা ফণিনীর মতো মস্তক উত্তোলন করিয়া ছুটিলেন। জনার ন্যায় তেজস্বিনী নারীর পক্ষে পুত্রহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের প্রচণ্ড বাসনা জাগা স্বাভাবিক। কিন্তু 'মমতা এসো না বক্ষে মম' বলিলেই কি মাতৃহৃদয়ের পুত্রশোক দূরীভূত হইয়া যায়? পুত্রের জন্য মাতার স্নেহ এই নাটকে যতখানি দেখানো হইয়াছে, ততখানি শোক ঠিক প্রকাশিত হয় নাই। বলা যাইতে পারে যে, প্রচণ্ড শোক প্রবল প্রতিহিংসায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু পরিণতির যোগসূত্রটি বড় ক্ষীণ। শোকের প্রতিহিংসায় পরিণতিটি বড় আকস্মিক। যুক্তিবাদিনী, ধীরা-স্থিরা বীরনারী 'জনা'র পক্ষে এই পরিণতি কার্যকারণসূত্রের মধ্য দিয়া আর একটু ধীরে-সুস্থে আসা উচিত ছিল। এই চরিত্রটির শেষের দিকের অস্বাভাবিকতার জন্য নাটকখানি অতিনাটক (melodrama) হইয়া উঠিয়াছে। 'জনা'-চরিত্রের এই শেষের দিকে মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' পত্রিকার জনা-চরিত্রের প্রভাব পড়িয়াছে। এমন কি অনেক জায়গায় বাক্যে-বাক্যেও হুবহু মিল রহিয়াছে। মধুসূদনের 'বাজিছে রাজতোরণে রণবাদ্য আজি' হইতে আরম্ভ করিয়া 'সাজিছ কি, নররাজ যুঝিতে সদলে প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে?' পর্যন্ত উক্তির প্রতিধ্বনি শুনা যায় চতুর্থ অঙ্ক তৃতীয় গর্ভাঙ্কে জনার 'আনন্দ-উৎসব দেখিলাম নগরে রাজন্!' হইতে 'পুত্রনাশ প্রতিবিধিৎসিতে?' পর্যন্ত বাক্যগুলির মধ্যে। মধুসূদনের কল্পিত জনা-চরিত্র যে গিরিশচন্দ্রের ভাবনাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল ইহা সত্য। জৈমিনী ভারতের 'জ্বালা' কাশীদাসী মহাভারতে 'জনা' হইয়া আসিয়াছে কিনা অর্থাৎ সেই জনার তেজস্বিতা, পুত্রস্নেহ এবং প্রতিহিংসাপরায়ণতা কত তীব্র, গিরিশচন্দ্র তাহা দেখিতে যান নাই। তিনি মধুসূদনের বীরাঙ্গনা জনাকেই দেখিয়াছেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র একটি কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। গীতিকাব্যে যে চরিত্র সুরের উচ্ছ্বসিত আবেগে পরিপ্লুত হইয়াও শোভমান হয়, নাটকে তাহাই অতি-উচ্ছ্বাসের জন্য অশোভন হইয়া পড়ে। জনার দীর্ঘ-দীর্ঘ উক্তি ও স্বগতোক্তির বাহুল্য নাটকখানির কর্মময়তা কমাইয়া দিয়াছে। শুধু

তাহাই নয়, জনার ভূমিকাকে নাট্যকার যেমন অতিপ্রাধান্য দিয়াছেন, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমানুপাতিকভাবে অন্য চরিত্রগুলিকে যথাযোগ্য প্রাধান্য দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। নাটকে অন্যান্য চরিত্রের সমানুপাতিক কর্ম-সংঘাতজনিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সহায়তা না পাইলে একক কোনো চরিত্র, তাহা যত মনোরমই হউক না কেন, নাট্য-কাহিনীর গতিবেগ ও ভারসাম্য রক্ষা করিয়া নাটককে সার্থক পরিণতির দিকে লইয়া যাইতে পারে না। জনার দীর্ঘ ভূমিকা নাটকখানিকে ব্যর্থ করিয়াছে বলিয়া সমালোচক-মহলে যে অভিযোগ আছে তাহা অমূলক নয়।

নাটকখানির একটি স্বাভাবিক ও সুন্দর চরিত্র মদনমঞ্জরী। সে জনার ন্যায় ক্ষত্রিয়কন্যা, ক্ষত্রিয়পত্নী হইয়াও তেজস্বিনী, কঠোরা ক্ষত্রিয়ানী নয়। সে কোমলা গৃহবালিকা এবং কুলবধূ। স্বামী ভিন্ন সে অন্য কিছুই জানে না। স্বামীর ভাবী অমঙ্গলের ছায়া পূর্ব হইতেই তাহার মনের মুকুরে প্রতিভাত হয়। সখীগণ তাহার এই অনাগত ভয়ের অভিভূতিকে বিরহবেদনাজনিত উৎকণ্ঠা বলিয়া ব্যঙ্গ করে। কিন্তু পতিপ্রাণা সতীর অন্তরে সত্য সত্যই ভবিষ্যৎ অকল্যাণের ছায়াপাত হইয়াছে। সে শাশুড়ী-ননদীকে অনুরোধ করে তাগার স্বামীকে বুঝাইয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য। ফলে সে শাশুড়ীর নিকট কঠোর তিরস্কার লাভ করিয়াছে। কিন্তু তবুও সে নিরস্ত থাকে নাই। স্বামীর কল্যাণ-কামনায় সে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া পাণ্ডব-শিবিরে গিয়া অর্জুনের নিকট হইতে স্বামীর প্রাণভিক্ষা লইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে। ইহা হইতে বেশী কিছু করা তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ছলনায় তাহাকে ভুলিতে হইল। প্রবীর যুদ্ধে নিহত হইল। পতিপ্রাণা মদনমঞ্জরীও স্বামিশোকে প্রাণত্যাগ করিল। চরিত্রটির মধ্যে কোনোপ্রকার আতিশয্য নাই। তাই এই চরিত্রটি সুন্দর হইয়াছে এবং দর্শকের সমবেদনা আকর্ষণ করে। মদনমঞ্জরীর মৃত্যু প্রবীরের মৃত্যুর বেদনাকে আরো ঘনীভূত করিয়া তোলে।

'জনা' নাটকের আর একটি বিশেষভাবে আলোচ্য চরিত্র হইতেছে 'বিদূষক'। এই নাটকের বিদূষক-চরিত্র বাংলা সাহিত্যের অমূল্য রত্ন। বিদূষক-চরিত্র অবশ্য বাংলা নাটকে মৌলিক সৃষ্টি নয়। এই চরিত্রটি সংস্কৃত সাহিত্য হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের হাতে তাহার পরিবর্তন হইয়াছে অনেকখানি। সংস্কৃত নাটকের

নাটকের ধারা

বিদূষক প্রায়শঃ মূর্খ, উদরপরায়ণ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ বংশের 'ভুণ্ডভ'। তাহার রসিকতা প্রধানতঃ ভোজনবিষয়ক। বড় জোর এই ব্রাহ্মণটি দাসী-চাকরানীদের সঙ্গে রহস্য করিয়া প্রাকৃতজনোচিতভাবে, প্রাকৃত ভাষায় দুই-একটি গালাগালি করিয়াছে। 'কর্পূরমঞ্জরী' প্রভৃতি নাটকে ইহার নিদর্শন মিলিবে। কোনো কোনো নাটকে ভুলের মধ্য দিয়া গোপন রহস্য প্রকাশ করিয়া এই মূর্খটি নাট্যকাহিনী জটিল করিয়া তোলে। তবে বিদূষক-চরিত্রের মহৎ গুণ আমরা দেখিয়াছি। কৃতজ্ঞতা, বন্ধুপ্রীতি এবং আশ্রয়দাতার উপকার করিবার বাসনা বিদূষকের সহজাত ধর্ম। রাজার উৎসবে, ব্যসনে, সে বিশ্বস্ত বন্ধু। রাজাকে আনন্দিত রাখিবার, তাঁহার অন্তরের বিষণ্ণতা দূর করিবার সমস্ত চেষ্টা সে করে। বিদূষক-চরিত্রের এই গুণের চরম বিকাশ হইয়াছে 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে।

মৃচ্ছকটিকের বিদূষক-চরিত্র সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে অভিনব। এই চরিত্রটি বাস্তবতা ও মানবিক আবেদনের দিক দিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের গতানুগতিকতা ভঙ্গ করিয়াছে। বিদূষক এখানে হাস্যরসের অবতারণা করে না। নায়ক চারুদত্তের বন্ধু সে। 'অত্যাগসহনো বন্ধুঃ'। চারুদত্তের বিপদের দিনে সে তাহাকে ত্যাগ করিয়া যায় না। অন্যের বাড়িতে ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেও তাহার আপত্তি। কেহ কিছু না বলিলেও সে মনে মনে জানে, প্রভুর অন্ন নাই বলিয়াই সে আজ অন্যের অন্নে ক্ষুন্নিবারণ করিতে চলিয়াছে। রদনিকার অপমানকে সে প্রভুর অপমান বলিয়াই গণ্য করে। সংস্কৃত নাটকের নায়কগণ বিদূষককে প্রায়ই 'সখা' বলিয়া সম্বোধন করে। প্রায়শঃ এই সম্বোধন নিতান্ত দয়াপ্রসূত। মৃচ্ছকটিকের বিদূষক কিন্তু চারুদত্তের সত্যকারের 'সখা'—'সমপ্রাণঃ সখা মতঃ'। চারুদত্তের প্রাণের সহিত এই ব্রাহ্মণের প্রাণের সম্বন্ধ। তাই চারুদত্তের বিপদের দিনে সে হাসিতে পারে না। বিভিন্ন ভোজ্যবস্তু সম্বন্ধে সঙ্গত-অসঙ্গত কল্পনা করিয়া বাক্য, কার্য ও চিন্তা দূষিত অর্থাৎ বিকৃত করিয়া সে অসঙ্গতিজনিত হাস্যরস সৃষ্টি করে না। সুতরাং 'মৈত্রেয়'-নামা বিদূষক কিন্তু কার্যেও 'মৈত্রেয়' বা 'মিত্রবংশসম্ভূত'। নাটকে সে তাই একটি গৌণ পার্শ্বচরিত্র নহে। তাহাকে বাদ দিয়া চারুদত্তের কল্পনা অসম্ভব। এই নিত্যসঙ্গী, সমপ্রাণ, কারুণ্যপূর্ণ, দৃঢ়চরিত্র, প্রভুভক্ত, আত্মমর্যাদাসচেতন ব্রাহ্মণটি আদৌ মহাব্রাহ্মণ নহেন,—মহান্ ব্রাহ্মণ। বিদূষক-চরিত্রের বিবর্তনে মৃচ্ছকটিক-রচয়িতা যে উচ্চ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই।

গিরিশচন্দ্র মৃচ্ছকটিকের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছেন কিনা জানি না। হয়তো হন নাই। কারণ, কোনো শক্তিমান সাহিত্যিকই অন্যের রচনাকে আদর্শরূপে সম্মুখে উপস্থাপিত রাখিয়া অবিকল তাহার অনুকরণ করেন না। তবে গিরিশচন্দ্রের 'জনা' নাটকের বিদূষক এই মৈত্রেয় জাতীয় চরিত্র। জনার বিদূষক-চরিত্র রূপায়ণে গিরিশচন্দ্র নিজের ধারণা-ভাবনা ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া আরো অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার দীক্ষাগুরু পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনাদর্শ শুধু যে গিরিশচন্দ্রের অশান্ত জীবনে শান্তির মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত করিয়াছিল তাহাই নহে, গিরিশচন্দ্রের সাহিত্যের উপরও অমোঘ প্রভাব রাখিয়া গিয়াছে। 'বিল্বমঙ্গল' প্রভৃতি নাটক তাহার ফল। জনার বিদূষক-চরিত্রে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাব পড়িয়াছে।

চরিত্রটির বিস্তৃত আলোচনা করিয়া আমার বক্তব্য পরিষ্কার করিতেছি।

নাটকের প্রথম অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কেই আমরা বিদূষকের সাক্ষাৎ পাইতেছি। মাহিষ্মতীপুরী আজ আনন্দে পরিপূর্ণ। অগ্নিদেব প্রসন্ন হইয়া রাজা, রানী, রাজপুত্র সকলকেই মনোমত বরদান করিয়াছেন। অদূর ভবিষ্যতে সকলের অভীষ্ট পূর্ণ হইবে। তাই বর পাইয়া সকলেই আনন্দে প্রস্থান করিল। কিন্তু বিদূষক নড়িল না। কারণ, মুনির মতো দূরদর্শী এই ব্রাহ্মণ। রাজপুরীতে 'হরি নিয়ে ছড়াছড়ি' তাহার মোটেই ভাল লাগে নাই। হরি কল্পতরু। তিনি ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী। তাঁহার শরণ লইলে মানুষ সর্বপ্রকার বিপদ-আপদ হইতে ত্রাণ পায়। কিন্তু এই ব্রাহ্মণ হরিকে অন্যভাবে চিনিয়াছে। 'হরি' প্রকৃতভাবে 'হরণকারী'। তিনি ভক্তের জীবন, মান, ধন সমস্তই হরণ করেন। সর্বনাশ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। পুরাণ-ইতিহাসে ইহার উদাহরণের অভাব নাই। "পাথর চাপালেন মা-বাপের বুকে, তারপর বৃন্দাবনে ঝুঁকে—গোপ-গোপিনীর হাড়ির হাল, যশোদা মাগী নাকাল, অবোধ রাখাল কেঁদে সারা, নন্দ মিন্‌সে দিশেহারা! আর রাধা? তাঁর কাঁদা সার, একশ' বছর দেখ্‌লেন আঁধার, এদিকে দয়াময় হরি যমুনাপার, কান দেন না কথায় কার, যেন কারুর কখনও ধারেন না ধার।" হরি শুধু সর্বনাশই করেন না। তিনি নির্মম, নিষ্ঠুর। বিপদের সময় তাঁহাকে খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না।

বিদূষকের চরিত্রে হাস্যরসের উপাদান কোথায়? যখন পরিস্থিতি ও পরিবেশের মধ্যে অমঙ্গল বা বিপদ-আপদের কোনো লক্ষণই দেখা যাইতেছে না, তখন এই ব্রাহ্মণটি অকারণ একটা ভীতির কল্পনা করিতেছে। সুতরাং

তাহার এই অসঙ্গত কল্পনার জন্য আমরা না হাসিয়া পারি না। যাহার পবিত্র নাম স্মরণে মহাবিপদ দূরীভূত হয়। সেই শ্রীহরির নামমাত্রেই বিদূষক সর্বনাশ কল্পনা করিতেছে। কিন্তু বিদূষক মূর্খ নয়,—বরং দূরদ্রষ্টা মনীষী। শ্রীমধুসূদনের চরম কৃপার পরম ফলপ্রাপ্তির পূর্বে যেটুকু দুঃখ-কষ্ট-বেদনা-যন্ত্রণা উপভোগ করিতে হয়, সেটুকু তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 'যে হয় তোমার অনুগত, তারে কাঁদাও অবিরত'। শ্রীহরি সম্বন্ধে এই উক্তি যে বর্ণে-বর্ণে সত্য। তাই বিদূষকের হাস্যকর অসঙ্গত উক্তির পশ্চাতে গভীর, গম্ভীর জীবনবোধ বিদ্যমান। তাহার উক্তিগুলি humour-এর উদাহরণ; তরল হাসির নয়। চরিত্রটিই humour-এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। অসঙ্গতি শুধু বিদূষকের বাক্যে নয়। অন্যকে ভুলাইবার জন্য বুদ্ধি করিয়া সে এই বাক্যগুলি উচ্চারণ করিতেছে না। সে যাহা বলে, তাহা বিশ্বাস করে। তাই নিজে সে ভুলক্রমে শ্রীহরির নাম মুখে আনে না। কারণ, তাহার বিশ্বাস, ডাকিলে শ্রীকৃষ্ণ মুক্তিদান করিবার জন্য উপস্থিত হইবেন। 'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ' বাক্যটি এই বিদূষকের চরিত্রে প্রমাণিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিয়া গিরিশচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে, মহামানবগণ 'normally abnormal' এবং 'abnormally normal'। সাধারণ মানুষের সঙ্গে আচারে-ব্যবহারে, কথা-বার্তায়, চাল-চলনে তাঁহাদের এতটুকুও মিল নাই। কিন্তু সাধারণ সংসারী মানুষ বুদ্ধিমান সাজিতে গিয়া জগৎ ও জীবন-ব্যাপারে প্রায়ই ভুল করিয়া বসে। সে যাহা চায় তাহা ভুল করিয়া চায়। বিধাতার স্বতঃস্ফূর্ত করুণার দান হিসাবে সে যাহা পায় তাহা চায় না। মহাকবি শেলীর কথায় বলিতে গেলে "We look before and after and pine for what is not"। মহামানবগণ এইরূপ বুদ্ধিমান-বোকা সাজেন না। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁহাদের চলা-বলার মিল না থাকিলেও চরমে কিন্তু তাঁহারাই পরম সত্যের অধিকারী হন। দক্ষিণেশ্বরের যে পূজারী ব্রাহ্মণকে লোকে পাগল বলিয়া উপহাস করিয়াছে, তিনি শিশুর মতো সরল। সাধারণের চক্ষে চলন যাঁহার বোকার মতো, গিরিশচন্দ্র তাঁহার মধ্যে ভগবানের আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-দর্শন অবিশ্বাস ও সন্দেহ আনিয়া একদিকে যেমন তরুণ বাঙালী যুবকদের মনে সত্যকারের জিজ্ঞাসা জাগাইয়াছে এবং তাহাদিগকে কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া জ্ঞানের সন্ধানে অভিযাত্রী করিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি তাহাদিগকে জ্ঞানান্বেষণের অসমাহিত অন্ধকারের গোলোকধাঁধার মধ্যে ঠেলিয়া দিয়া অশান্ত, বিভ্রান্ত ও বিক্ষিপ্তচিত্ত

করিয়াছে অনেকখানি। এই জিজ্ঞাসা জ্ঞানের পিপাসা বাড়াইয়াছে, কিন্তু পূর্ণপ্রাপ্তি বা তৃপ্তির সুধা পান করাইতে পারে নাই এতটুকুও। এই সর্বেন্দ্রিয়দাহকর অশান্ত জ্ঞানপিপাসা এবং সত্যানুসন্ধানের উদগ্র কামনা মূর্ত দেখি উনবিংশ শতকের একটি যুবকের মধ্যে, তিনি নরেন্দ্রনাথ দত্ত। হনূমানকে দেখিবার জন্য তিনি বাল্যে সারারাত্রি জাগিয়া কলাবাগানে ঘুরিয়াছেন। যৌবনে তীব্র জ্ঞানপিপাসা তাঁহাকে উন্মাদ করিয়াছে। প্রাচ্যপাশ্চাত্য দর্শনের সমুদ্র মন্থন করিয়াও তিনি ব্রহ্মের 'ব' পর্যন্ত খুঁজিয়া পাইলেন না। একটি মাত্র মহামানবের সংস্পর্শে গিয়া তাঁহার পিপাসার চরম নিবৃত্তি হইল। ইনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ উনবিংশ শতকের পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানানুশীলনের মূর্ত প্রতিবাদ। অথচ তাঁহার মতো জ্ঞানী-বিজ্ঞানী কে? মহামতি ক্যাণ্ট্ হইতে আরম্ভ করিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে একটা কথা বড় মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কোনো কিছুকে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিও না। যুক্তি-তর্ক জ্ঞানের দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিও। এমন কি, ভগবানকেও সরল বিশ্বাসে মানিয়া লইও না। যদি সারাজীবনে তাঁহাকে জানিতে না পার তাহা হইলে জন্ স্টুয়ার্ট মিলের মতো বলিও,—"I believe in God if there be God for the salvation of my soul if there be soul." (যদি আত্মা থাকে তবে তাহার মুক্তির জন্য যদি ভগবান থাকেন তাঁহাকে বিশ্বাস করি।) সন্দেহ কতখানি তীব্র হইলে মনীষী মানব মৃত্যুর মুহূর্তে এই ধরনের উক্তি করিতে পারেন! বাঙালী যখন গীতা-ভাগবত ছাড়িয়া মিল্-বেন্থাম্ পড়িতেছে, সেই সময়ে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ একটি ক্ষ্যাপাটে ব্রাহ্মণ পূজার-নৈবেদ্য লইয়া মাকে নিজহাতে খাওয়াইতেছেন, মাটির দেবতাকে জীবন্ত জ্ঞান করিয়া তাঁহার সহিত মান-অভিমান করিতেছেন। অসীম, নিরাকার, বিশ্বব্যাপী ঈশ্বরকে মানুষের মতো সাকাররূপে দর্শন করিতেছেন এবং অন্যকেও দেখাইতে চাহিতেছেন। এই ব্যক্তিটি উনবিংশ শতকের বাংলার তীব্র প্রতিবাদ নন কি? ইনিইতো "normally abnormal"। পাশ্চাত্য দর্শনের পরিপূর্ণ জ্ঞান লইয়া পণ্ডিত নরেন্দ্রনাথ যখন তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, তখন রামকৃষ্ণ তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন, "বিশ্বাস কর।" এই অলৌকিক সরল বিশ্বাসই তাঁহার বিশ্ববিজয়-মন্ত্র, সুতরাং তিনি "abnormally normal।" 'আঁধারে আবৃত ঘন সংশয়' যখন বিশ্ব গ্রাস করে, তখনি 'তারি মাঝখানে সংশয়াতীত প্রত্যয়'ও বাস করিতে থাকে, 'তর্কের ঝড় বাক্যের ধূলি' তাহাকে এতটুকুও

ম্লান করিতে পারে না। গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণদেবের মধ্যে এই সরল দিব্যবিশ্বাসের যে মূর্তি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহাই তিনি বিদূষক-জাতীয় চরিত্রে আরোপ করিয়াছেন। বিদূষকের সরল বিশ্বাস রামকৃষ্ণদেবের বিশ্বাস। ইহাকে যুক্তি দিয়া বিশ্লেষণ করা যাইবে না।

বিদূষকের চরিত্রে হাস্যরসের যোগানও যথেষ্টই আছে। 'জনা'র বিদূষক এতটুকুও বোকা বা মূর্খ নয়। তাহার প্রত্যেকটি কথা পরম বুদ্ধিমানের উক্তি। বোকা সে শুধু তাহার সরল বিশ্বাসে। যুক্তিহীন ভগবদ্‌বিশ্বাস আমাদের ব্যবহারিক বুদ্ধিতে যদি বোকামির পরিচায়ক হয়, তবেই এই বিদূষক বোকা। নহিলে তাহার মতো বুদ্ধিমান কে? অগ্নিদেবের আশীর্বাদরূপ অভিশাপের ভয়াবহ পরিণাম সে বুঝিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু সে অকৃতজ্ঞ নয়। রাজার কল্যাণ-কামনা সে করে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই ব্রাহ্মণ মুক্তি চায় না। তবে কি সে দেহাত্মবাদী? সে কি চার্বাকপন্থী? তাহাও নয়। তাহার সরল বিশ্বাস, ভগবানকে একবার ডাকিলেই তিনি দয়া করিয়া আসিবেন। সুতরাং মুক্তি তো তাহার করায়ত্ত। তাই যতদিন পারা যায়, জীবনটাকে ভোগ করিয়া লওয়া যাক্। রাজা নীলধ্বজও যাহাতে কিছুদিন মর্ত্যভূমিতে বাস করিয়া ঐহিক সুখ ভোগ কবিতে পারেন, বিদূষক তাহাই চায়। কিন্তু জামাতা অগ্নিদেব বরদান করিয়া রাজপরিবারের ভবলীলা সাঙ্গ করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ইহা বিদূষক সহ্য কবিতে পারে না। ভক্ত রামপ্রসাদ যখন মায়ের প্রতি অভিমানবশে তাঁহাকে গালাগালি করেন, তখনও অভিমানের রূঢ় বাক্যগুলির মধ্য দিয়া ভক্তহৃদয়ের অসীম শ্রদ্ধা উৎসারিত হয়। তাই গালাগালগুলিও ব্যাজস্তুতির মতো শুনায়। বিদূষকের উক্তিগুলিও তদ্রূপ। বিদূষকও যখন বলে, "যে ফেরে তাঁর আশে, দয়াময় হরি তার নাকে আগে ঝামা ঘষে" তখন মনে হয়, কোনো ব্যক্তি নিতান্ত আপনজনের নিকট অভিমান করিয়া তাহার ভালবাসা আরো বেশি পাইবার জন্য আঘাত করিতেছে। আবার ব্যঙ্গোক্তি ও শ্লেষবাক্য প্রয়োগে বিদূষক অদ্বিতীয়। অগ্নিদেবকে বিদূষক বলিতেছে, "তোমার সাতগুষ্টিতো স্থান পাক, তোমার দেবলোক উদ্ধার হয়ে যাক্। হুতাশন, নির্বাণ হয়ে পরম শান্তিলাভ কর,—আমাদের উপর জুলুম কেন?" কয়েকটি দিক দিয়া এই উক্তিটির গুরুত্ব বিচার করিতে হইবে। প্রথম কথা ইহা ব্যঙ্গোক্তি। স্বর্গলাভের বাসনা দেবতার নয়,—মানবের। দেবতাকে উদ্ধার পাইতে বলা আর না-বলা

একই কথা। হুতাশন অগ্নির জ্বলনই ধর্ম বা অস্তিত্ব। তাঁহাকে নির্বাণ লাভ করিতে বলার অর্থ তীব্র ব্যঙ্গ করা। কিন্তু উক্তিটিকে সাধারণ ব্যঙ্গরূপে গ্রহণ করা চলিবে না। ইহার মধ্যে একটা গভীর humour প্রচ্ছন্ন আছে। এই উক্তিটির মধ্যে ধূলির ধরণীর সন্তান বিদূষকের মর্ত্যপ্রীতির গভীর অভিব্যক্তি হইয়াছে। পৃথিবীর মমতা এমন যে, স্বর্গের লোভে, মুক্তির লোভেও মানুষ ইহাকে ত্যাগ করিতে চায় না। যাহারা চায় তাহারা দেবতা। মর্ত্যমানবের সঙ্গে তাহাদের অন্তরের যোগাযোগ নাই। তাই দেবলোক উদ্ধার পায় পাক; মর্ত্যের মানুষ বিদূষক উদ্ধার পাইতে চায় না। 'নির্বাণ' শব্দের মধ্যেও তাই শ্লেষ রহিয়াছে মনে হয়। 'নির্বাণ' অর্থে এখানে শুধু 'নিবিয়া যাওয়া' নয়। বাসনা-বিনির্মুক্ত কৈবল্য অবস্থার প্রতি শ্লেষ করিয়া বলা হইয়াছে, সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা নির্বাণ নয়। সাধারণ মানুষের উপর জুলুম করিয়া উহা চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে।

নিছক হাল্‌কা তামাশার ভাষাও এই বিদূষকের আছে। অগ্নিকে সে বলিতেছে, "আমি বামুনের ছেলে, হোম করতে তোমায় আহ্বান করতে ঘিয়ের বদলে জল ঢেলে দেবো।"

বিদূষক অনেকের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান। প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক। প্রবীর মায়ের নিকট আসিয়াছে যাহাতে মাতা পাণ্ডবের যজ্ঞের অশ্ব ফিরাইয়া দিতে না বলেন। বিদূষক রাজাকে সতর্ক করিতেছে, "এই যে মায়ে-পোয়ে একত্র হয়েছেন। নিশ্চয় দামোদর আসছেন, সন্দেহ নাই; অগ্নিদেবতার বর কি আর বিফল হয়? মনে কর্‌ছ রাজা, রাণী ঠাকরুণ বোঝাবেন; উনি না ঢালা খাড়া ধ'রে রণাঙ্গনা হ'য়ে দাঁড়ান।" কিন্তু রানীর সামনে রাজাকে নিষেধ করিলে তাহারা বেশি অনর্থ হইবে মনে করিয়া বুদ্ধিমান বিদূষক ভাবিতেছে, "থাকি চেপে বরং নিস্তার আছে রাজার কোপে।" কিন্তু রাজার কল্যাণকামী বিদূষক যথা সময়ে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। জনা ও প্রবীর চলিয়া গেলে রাজাকে একাকী পাইয়া বিদূষক বলিল, "আর কি মন্ত্রণা? যদি ভালই চাও, ঘোড়া নিয়ে ফিরিয়ে দাও।"

রাজা নীলধ্বজ বিপদে কাণ্ডারী শ্রীহরির স্মরণ করিবার কথা ভাবিলেন। কিন্তু বিদূষক তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিল, "অমন কাজ কদাচ কর্‌বেন না, মহারাজ।......কৃপাময় হরিকে ডেকে ঐহিকের ভাল কারুর কখনো হয়নি।" বিদূষকের জীবনদর্শন হইল এই যে, যতদিন পারা যায় ইহজীবনের আনন্দ

ভোগ করিয়া লওয়া যাক। মৃত্যু মাথার চুল ধরিয়া বসিয়া আছে মনে করিয়া ধর্মাচরণের যে উপদেশ মহামানবেরা দিয়াছেন, বিদূষক তাঁহাদের মতো হিসাবী বা সাবধানী ভক্তের দলভুক্ত নয়। পরকাল সম্বন্ধে তাঁহার ভীতি বা কৌতূহল কোনোদিনই নাই। থাকিলে সে পরকাল সম্বন্ধে ব্যঙ্গ করিয়া বলিতে পারিত না, "কি জানি বাবা, কে কখন বৈকুণ্ঠ থেকে রথ আনছে, চতুর্ভুজ হ'লে পাশ ফিরে শুতে পারব না।" উক্তিটি বিদূষকের সহজ, সমুজ্জ্বল, কৌতুকহাস্যের উদাহরণ।

রাজপুরীর সর্বনাশ রোধ করিবার সক্রিয় চেষ্টাও এই বিদূষক করিয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে গঙ্গারক্ষকদের দিয়া ঘোড়া চুরি করানোর চেষ্টা যতই হাস্যোদ্দীপক হউক না কেন, প্রতিপালকের প্রতি বিদূষকের হিতাকাঙ্ক্ষা এই প্রচেষ্টার মূলে থাকায় বিদূষকের এই আচরণ তাহার চরিত্রের মাধুর্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছে।

চতুর্থ অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে বিদূষককে আমরা যে মূর্তিতে দেখিতে পাই, তাহাতে আমরা শুধু হাসিতে পারি না; ইহার আচরণ আমাদিগকে একটু গম্ভীরভাবে ভাবাইয়া তোলে। এই ব্রাহ্মণ সত্যই বিশ্বাস করে যে, শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ঐহিক অনর্থের মূল। তাই ইতুভাঁড় হইতে আরম্ভ করিয়া শালগ্রাম শিলা পর্যন্ত সে পুকুরের জলে নিক্ষেপ করিতেছে। পঞ্চম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কে বিদূষক চোখে কাপড় বাঁধিয়া বসিয়া আছে, পাছে শ্রীকৃষ্ণ কখনও তাহার সামনে আসিয়া উপস্থিত হন। তাহার এই বিশ্বাসের পুরস্কারস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাসহ তাহাকে দেখা দিলেন। সরল বিশ্বাসের জয় হইল।

বিদূষক বা বিদূষকজাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে একটা বড় প্রশ্ন আমাদের মনে রহিয়া যায়। এই চরিত্রগুলির নাট্যোপযোগিতা কতখানি? 'জনা' নাটকের ঘটনার ক্রমবিকাশে বিদূষক-চরিত্রের অপরিহার্যতা আমরা অবশ্যই স্বীকার করিব। প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কেই নাটকের পরিণতির আভাস এই চরিত্রটিই বহন করিয়া আনে। নাটকের ঘটনায় মোড় ঘুরাইবার জন্য ঘোড়াচুরির চেষ্টা করিয়া চরিত্রটি কাহিনীবিন্যাসে সত্যকারের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু ইহার পর এই চরিত্রের নাটকীয় প্রয়োজনীয়তা আর বিশেষ কিছুই নাই। নাট্যকার নাটকে বিদূষক চরিত্রের যে পরিণতি দেখাইয়াছেন তাহার সহিত মূলকাহিনীর ক্রমবিকাশের কোনো সম্বন্ধ নাই। মহাপুরুষ-চরিত্রের একটি বিশেষ আদর্শ প্রচারের জন্যই যে তিনি নাটকে এই ধরনের চরিত্রের অবতারণা

করিয়াছেন তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। সুতরাং এইজাতীয় চরিত্র যতই আকর্ষণীয় হউক না কেন, নাটকীয় চরিত্র হিসাবে উহারা যে অনেকখানি অসার্থক, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

সব দিক দিয়া বিচার করিলে 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' গিরিশচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। নাটকটির মধ্যে বহুদূর পর্যন্ত শেক্‌স্‌পীয়রীয় নাট্যরীতি সার্থকভাবে অনুসৃত হইয়াছে। চরিত্রগুলির বিকাশ বহুলাংশে মনস্তত্ত্ব-সম্মত। যাত্রা-শৈলীর, বিশেষ করিয়া সঙ্গীতের সার্থক রূপায়ণ এই নাটকে হইয়াছে। দেশী ও বিদেশী রীতি মিলাইয়া যে অভিনব নাট্য-শৈলী রচনার চেষ্টা মনোমোহন বসু শুরু করিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্রের বিল্বমঙ্গলে তাহা সর্বপ্রথম একটা মোটামুটি সঙ্গত রূপ পাইল।

বিল্বমঙ্গলের আরম্ভটি অতি সুন্দর। 'প্রফুল্ল' নাটকের আরম্ভের প্রশংসা আমরা করিয়াছি। কিন্তু সেখানে আরম্ভের বৈশিষ্ট্য ঘটনা-সংস্থানে। যোগেশ কেমন করিয়া দুর্ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সৌভাগ্যের উচ্চ শিখরে উঠিয়াছিল, এবং কেমন করিয়া ব্যাঙ্ক ফেল পড়ায় নিষ্ঠুর নিয়তি সর্বনাশী মূর্তিতে তাহাকে আক্রমণ করিল, সংলাপে ও ঘটনা-বিন্যাসে তাহাই আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু এখানে দেখিতেছি, নায়কের অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া নাটকের আরম্ভ হইল। প্রণয়িনী-কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত বিল্বমঙ্গল পথে চলিতে চলিতে ভাবিতেছে, আর সে চিন্তামণির বাড়ি ফিরিবে না। কিন্তু এই অভিমান যে কত দুর্বল তাহাও এই স্বগতোক্তির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভালবাসায় বিল্বমঙ্গল ডুবিয়া গিয়াছে। তাহার আর উঠিবার উপায় নাই। এই অভিমান অনুরাগেরই রূপান্তর। মনে মনে বিল্বমঙ্গল আলোচনা করিতেছে, "না-বলে আসাটা ভাল হয় নি—মিষ্টি মুখে বিদায় নিয়ে এলেই হত। বল্লেই হত,—ভাই,—তোমারও পোষাল না, আমারও পোষাল না, আজ থেকে খতম্‌—ব্যস্‌।" এই কথা ভাবিতে ভাবিতে ইচ্ছা হইতেছে একবার ফিরিয়া যাইবার। কথাগুলি শুনাইয়া ফিরিয়া আসা আসল উদ্দেশ্য নহে,—আবার ছুটিয়া যাইবার ব্যাকুল বাসনা রহিয়াছে মনে। চিন্তামণিকে ছাড়া হইয়া বিল্বমঙ্গল এক মুহূর্তও টিকিতে পারে না। কিন্তু আবার অভিমান আসিয়া বাধা দিতেছে। তাই মনে মনে বিল্বমঙ্গল আলোচনা করিতেছে, "যখন এসেছি, তখন আর যাচ্ছিনি।" কিন্তু চিন্তামণির আকর্ষণ যে কিছুতেই বিল্বমঙ্গলকে ত্যাগ করিতেছে না, অতি কৌশলে নাট্যকার তাহা প্রকাশ করিতেছেন। বিল্বমঙ্গল যখন এইরূপ অন্তর-দ্বন্দ্বে

আকুল, ঠিক তখনই গান করিতে করিতে একজন ভিক্ষুক প্রবেশ করিল, —"ওঠা নাবা প্রেমের তুফানে। টানে প্রাণ যায়রে ভেসে, কোথায় নে যায়, কে জানে।" গানটি বিল্বমঙ্গলের মানসিক অবস্থা অতি অপূর্বভাবে প্রকাশ করিতেছে। ইহা ত ভিক্ষুকের গান নয়,—বিল্বমঙ্গলের প্রাণের গান। চিন্তামণির প্রেমের স্রোতের টানে বিল্বমঙ্গল তৃণের মতো ভাসিয়া চলিয়াছে। ফিরিবার উপায় নাই। এই প্রবল আকর্ষণ তাহাকে কোথায় কোন্ অজানা রাজ্যে পৌছাইয়া দিবে বিল্বমঙ্গল তাহা কি করিয়া জানিবে? নিজের অন্তরের রূপ বাহিরে গানে প্রতিফলিত দেখিয়া বিল্বমঙ্গল ভিক্ষুককে গানটির প্রতি পদ গাহিতে বলিতেছে এবং উহার অর্থের আলোকে নিজের হৃদয়ের প্রতিটি অন্ধকার গুহা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতেছে। অপরের সঙ্গীতাশ্রয়ে নিজের উদ্বেলিত অন্তরের এমন ব্যাকুল বিশ্লেষণ সমগ্র বাঙ্গালা নাট্য সাহিত্যে বিরল। ঠিক আর একবার মাত্র দ্বিজেন্দ্রলাল-রচিত 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে এই শৈলীর সার্থক অনুবর্তন দেখিতেছি ভিক্ষুকের সঙ্গীতাবলম্বনে ব্যথিত চাণক্যের মথিত হৃদয়ের ভাব বিশ্লেষণে। যাহা হউক, চিন্তামণির আকর্ষণ ভিক্ষুককে দূত-নিয়োজনে বিল্বমঙ্গলকে বাধ্য করিল। ভিক্ষুক চিন্তামণিকে ঠিক এই গানটি শুনাইবে। বিল্বমঙ্গলেব ধারণা, এই গান শুনিয়া চিন্তামণিরও ঠিক তাহারই মতো অবস্থা হইবে। ভালবাসা তাহাকে কিছুতেই মনে করিতে দেয় না যে চিন্তামণি তাহাকে এতখানি ভালবাসে না। বিল্বমঙ্গলের ধারণা, সে যেমন চিন্তামণির উপর অভিমান করিয়াছে, চিন্তামণিও করিয়াছে ঠিক ততখানি অভিমান। তাই বিল্বমঙ্গল ভাবিল, ভিক্ষুক যদি বলিয়া আসে যে বিল্বমঙ্গল আর আসিবে না, চিন্তামণি তাহা হইলে প্রেম-যাতনায় ছট্‌ফট্ করিবে। ভিক্ষুক বিদায় হইল। কিন্তু বিল্বমঙ্গল ঘরে ফিরিল না। প্রেম তাহাকে গলায় গামছা দিয়া টানিয়া লইয়া, পাক খাওয়াইয়া চিন্তামণির বাড়ির নিকট ঝোপের দিকে লইয়া গেল।

এদিকে এই প্রথম দৃশ্যেই সঙ্গে সঙ্গে আর একটি গৌণ কাহিনীর সূচনা হইতেছে। বিল্বমঙ্গল সদ্‌বংশজ ব্রাহ্মণ-সন্তান। প্রেমের সন্ধানে কামের মধ্য দিয়া তাহার জয়যাত্রা শুরু হইয়াছে। স্থূল আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা নারী-সৌন্দর্যের অসারতা-জ্ঞান-সঞ্জাত বিরাগে দগ্ধ হইয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছারূপ পরম প্রেমে পরিণত হইতে চলিয়াছে। চিন্তামণি রূপের ডালি দিয়া প্রেমিকের

সান্নিধ্য পাইয়াছিল। কিন্তু সে-প্রেম সম্বন্ধে সে ছিল অজ্ঞ। তাই বিল্বমঙ্গলের অন্তর্ধানে রূপের গর্ব, অর্থের নেশা অবহেলায় বিসর্জন দিয়া সে তাহার প্রেমময়ের সন্ধানে সন্ন্যাসিনী সাজিতে পারিয়াছিল। এই পরম-প্রেমের চিত্রের পাশে ব্রজ-প্রেমের অপব্যাখ্যাকারী ও অর্থ-লোলুপ একটি কপট সাধু এবং একটি প্রেমহীনা অর্থাকাঙ্ক্ষিণী বারাঙ্গনার চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাদের চরিত্রের বৈপরীত্যে নাট্যকার বিল্বমঙ্গল-চিন্তামণির প্রেমকে আরো উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন। তাই এখন হইতে থাকমণি ও সাধকপ্রসঙ্গ পাশাপাশি চলিল। সাধকটি প্রভুর তহবিল-চুরির দায়ে পড়িয়া গেরুয়া ধারণ করিয়াছে। কিন্তু মহান্ প্রেম বা বৃহত্তর আদর্শের আকর্ষণে যে সন্ন্যাসী হয় না, সেই কপটাচারী বাসনাকে জয় করিবে কি করিয়া? তাই কাম ও কাঞ্চনের আকাঙ্ক্ষা তাহাকে ঘুরাইয়া মারিতেছে। কৃষ্ণপ্রেমের ব্যাখ্যা তাহার নিকট নারীর সঙ্গে অবাধ-লাম্পট্য। সেই জন্যই সে থাকমণিকে কৃষ্ণপ্রেম শিখাইতে চাহে। তাহার সঙ্গে যে ভিক্ষুকটি জুটিল সেটিও চুরি করিয়া ধরা পড়ার দায়ে ভিক্ষুক সাজিয়াছে। নাট্যকার এখানে অতি সংক্ষেপে ছোট-খাটো একটি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই জগৎটি দুই ভাগে বিভক্ত। একদিকে কামের মধ্য দিয়া প্রেমের সাধনা, অন্যদিকে প্রেমের নামে কামের পিপাসা। কিন্তু আগু যে দিক দিয়া যে ভাবেই হউক না কেন কাম জ্ঞানের আগুনে পুড়িয়া বিশুদ্ধ হইলেই যে প্রেমে পরিণত হয়, পরিণামে আমরা ইহাই দেখিব।

আবার এই তত্ত্ব শুধু তত্ত্বেই নিহিত থাকে নাই। শক্তিমান নাট্যকার উপযুক্ত পাত্রের উপযুক্ত আচরণে ও যথাযোগ্য সংলাপে এই সত্যকে জীবন্ত বস্তুরূপ দান করিয়াছেন, চরিত্রের মধ্য দিয়া সত্যকে রূপ দিয়াছেন। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে সাধক ও ভিক্ষুকের আলাপ বা দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে থাকমণির সহিত সাধকের কথোপকথন বিশ্লেষণ করিলেই আমরা ইহা বুঝিব। সাধক ও ভিক্ষুক উভয়ই উভয়ের সত্যকার অপরাধ ঢাকিতে বাক্য-জাল বিস্তার করিতেছে। কিন্তু সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। উভয়ই উভয়কে বুঝিয়া ফেলিয়াছে। সাধক যতই বলিতেছে, ধর্মভীরু সে, তহবিল ভাঙ্গে নাই, দুষ্টলোকেরা তাহার নামে দুর্নাম রটাইয়াছিল, ভিক্ষুক কিন্তু ততই সেকথা গ্রাহ্য করিতেছে না,—

"ভিক্ষুক। হ্যাঁ গা, তা, তবিল ভেঙ্গেছিলে, ফাঁড়িদার ধল্লে না?

সাধক। শিব, শিব, শিব! আমি তহবিল ভাঙ্‌ব কেন? দুর্জনেরা এইটে রটিয়েছিল!

ভিক্ষুক। বলি, যা হোক্ ফাঁড়িদার কিছু বলে নি?"

ভিক্ষুক শেষ পর্যন্ত নিজের কথা বলিয়া ফেলিল,—"তোমার ভারি কপাল। আমি পায়খানায় লুকিয়েছিলাম, আমায় টেনে বার কল্লে।"

শুধু কথায় নয়,—সাধক যে ভণ্ড তাহার পরিচয় তাহার আচরণে। যে ব্যক্তি মানুষের অসাধুতায় বিরক্ত হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছে, বেশ্যার সঙ্গে তাহার ধর্মালোচনার শ্রীতেই তাহার অন্তরের কদর্যতা বাহির হইয়া পড়ে।

"সাধক। দেখ, তুমি রাসরসময়ী রাধা হও। তুমি মান করবে আমি পায়ে ধরে ভাঙ্‌ব। আমি বাঁশী বাজাব—তুমি কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কই বলে অধৈর্য হবে।"

রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের এই বিকৃত সাধনায় সাধকের চরিত্রটি ধরাইয়া দেয়। কিন্তু সে যাহার খপ্পরে পড়িয়াছে, সে পাত্রীটিও কম নয়। সর্বপ্রকার চতুরকে ভুলাইয়া যে বারাঙ্গনা নিজের অর্থের প্রয়োজন সাধন করিয়া লয়, থাকমণি তাহাদের একটি। সাধককে উত্তরে বলিতেছে, "তা আমি সব পারব। আপনি যদি আমার ভার নেন্ ত,- আমার একটা পেট আর একখানা কাপড়, বিছানা মাদুর করে দাও তুমিই বসবে, গয়না গাঁটি তোমার মনে হয় দিও না হয় দিও না।"······সর্বপ্রকার চরিত্রের মুখে তাহার নিজস্ব ভাষা (যে ভাষা তাহার অন্তরের কথা টানিয়া বাহির করিয়া চরিত্রকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করে) গিরিশচন্দ্রের পূর্বে অন্য কোনো নাট্যকারের রচনায় এমন করিয়া মেলে নাই। গিরিশচন্দ্রের অন্যান্য নাটকেও তাহা এতখানি মেলে না। এদিক দিয়া বিল্বমঙ্গল ঠাকুর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আবার বিল্বমঙ্গল চরিত্রে ফিরিয়া আসা যাক। বিল্বমঙ্গলকে আমরা চিন্তামণির বাড়ির নিকট ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলাম। থাকমণি, ভিক্ষুক ও চিন্তামণি যখন কথা বলিতেছিল, ঠিক তখন বিল্বমঙ্গল চুপে চুপে ঝোপের মধ্যে আত্মগোপন করিতে অগ্রসর হইতেছিল। এখানে থাকমণি ও ভিক্ষুকের সঙ্গে চিন্তামণির আলাপে গিরিশচন্দ্রের মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় পাই। থাকমণি বিল্বমঙ্গলকে ফিরাইতে আসিয়াছে। চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলকে সত্যই ভালবাসে। তাই সেও আর দেরী করিতে পারিতেছে না। যদিও চিন্তামণির ভালবাসা বিল্বমঙ্গলের প্রেমের উদ্দামতা ও একাগ্রতা পায় নাই, তবুও তাহার

মূল যে চিন্তামণির হৃদয়ে দৃঢ় হইতেছে তাহা বুঝা যাইতেছে। থাকমণি বারাঙ্গনা হইলেও নারী। চিন্তামণির স্বাভাবিক দুর্বলতা সে ধরিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু কাহাকেও ভালবাসিলে বারাঙ্গনার আভিজাত্য নষ্ট হয়। তাহার সন্ধানে রাস্তায় নামিয়া আসার ত কথাই নাই। তাই থাকমণি যখন বলিতেছে, "বলি, হঁ্যাগা মাসি! তোমার একটু তর সয় না? বাড়ী থেকে ফর্‌ফরিয়ে বেরিয়ে এলে? লোকে কি বলবে বলত?" তখন নিজের দুর্বলতা ঢাকিবার জন্যই চিন্তামণি বলে,—"আর বলুক গে, বাছা! আমার আর সয় না। ডুবটা দিয়ে আসি।" সে যেন স্নান করিতে আসিয়াছে, বিল্বমঙ্গলের খোঁজে নয়। কিন্তু একটু পরেই তাহার দুর্বলতা ধরা পড়িল। ভিক্ষুক যখন বলিতেছে, "সে আর আসবে না," তখন চিন্তামণি উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে,— "সে কোথায় গেল?" যদি সত্যই বিল্বমঙ্গলের উপর বিরক্তি আসিবে, তাহা হইলে এই জিজ্ঞাসা কেন? ঠিক এমন সময়েই বিল্বমঙ্গল আসিয়া যখন ঝোপের মধ্যে আত্ম-গোপন করিতেছে, তখনই চিন্তামণি তাহাকে দেখিয়া ফেলিয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, ভিক্ষুক যখনই বলিল, 'সে আর আস্‌বে না' ঠিক তখনই কিন্তু বিল্বমঙ্গল আসিয়া পড়িল। বিল্বমঙ্গলের উক্তির অর্থ ছিল যে, সে আসিবেই, তাহা হাতে হাতে প্রমাণ হইয়া গেল। বিল্বমঙ্গল চলিয়া যাওয়ায় চিন্তামণির মনে যে উদ্বেগ ছিল তাহা তাহার আগমনে দূর হইয়া যাইতেছে। কিন্তু চিন্তামণির আনন্দ প্রকাশ করিতে নাই। তাই আনন্দটা গালাগালির ভানে প্রকাশিত হইল, "ওলো থাকি, দেখ পেছনের ঐ ঝোপের ভেতর এসে মড়া লুকুচ্ছে।" বিল্বমঙ্গল চিন্তামণির হাসির বিপরীত অর্থ করিল। অথচ নিজে যে তাহার আকর্ষণে এতদূর আসিয়াছে ইহা ত লজ্জার কথা। তাই নিজেকে বাঁচাইবার জন্য সে বলিল, "দেখ, আমি এপারে কাঠ কিনতে এসেছিলুম, দেখা হল, তা একটা কথা বলে যাই—যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রামশর্মা।" কিন্তু চিন্তামণি যখন, তাহাকে আবার গালাগালি করিল, তখন বিল্বমঙ্গল বলিল সে আর আসিবে না। এবার মুহূর্তে চিন্তামণির গালাগালি থামিল। এবার তাহার কথায় অনুরোধের স্বর,—"কেন আমি তোমায় কি বলেছি? থাক বাড়ী ছিল না, আমি খেতে বসেছিলুম, তাইতে দোর খুলে দেবার দেরি হল! তোমার আর সমস্ত রাত্রি রাগ পড়ল না!" ইত্যাদি। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত শান্তবাক্যে চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলকে বাড়ি লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বিল্বমঙ্গল বলিল, আজ তাহার বাপের

শ্রাদ্ধ। চিন্তামণি জুলুম করিল না। কিন্তু পরের দিন আসিতে বলিল। সকালে না আসিলে দুপুরে। না হয় চিন্তামণি গিয়া বিল্বমঙ্গলের বাড়ি উঠিবে। এই বাক্যে বিল্বমঙ্গলের প্রতি চিন্তামণির প্রেম সূচিত হইতেছে। অন্যদিকে থাকমণি ভাবিতে পাবে, ইহা স্তোকবাক্যে পুরুষ ভুলাইতে বারাঙ্গনার ছল মাত্র। সুতরাং গিরিশচন্দ্র সুকৌশলে দুই-কুল রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্যই প্রেম তাহা বুঝিতেছি চিন্তামণির পরেব উক্তিতে,—"না, করুক গে—বাপের শ্রাদ্ধ করুক গে। বাড়ি নিয়ে গেলে কি আর যেত?" যে নারী সত্যই ভালবাসে, সে পুরুষের অকল্যাণ কামনা করিতে পারে না।

কিন্তু বিল্বমঙ্গল যাইতে যাইতে আবার ফিরিয়া আসিল। যে কোনো প্রকারে ছল করিযা আর দুইটি কথা বলিয়া সে চিন্তামণির সঙ্গ আরো একটু পাইতে চায়। বাপের শ্রাদ্ধের চেয়েও চিন্তামণি তাহার নিকট বড, তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। ওদিকে চিন্তামণিব অবস্থা শোচনীয়। সে-ও বিল্বমঙ্গলকে সহসা ছাড়িতে চাহে না। বিল্বমঙ্গল নদী পার হইয়া যাইবে। সুতরাং নদী পর্যন্ত দুইজনে একসঙ্গে যাইতে পারে—"দাঁড়াও না, আমি নদীতে যাব। কাল সকালে আসবে ত?"

প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক। বিল্বমঙ্গল পিতৃশ্রাদ্ধ করিতেছে। এই দৃশ্যে বিল্বমঙ্গলের মোহমুগ্ধতার চরম প্রকাশ পাইয়াছে। পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে বেলা অনেক হইয়াছে। তাহাও বিল্বমঙ্গলেরই দোষে। বাড়িতে ব্রাহ্মণ-ভোজন। সেদিকে খেয়াল নাই। পাঁচ চেঙারী খাবার লইয়া কি করিয়া সে চিন্তামণির বাড়ি যাইবে তাহাই ভাবিতেছে। ঝড়ে ব্রাহ্মণদের পাতা উড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু বিল্বমঙ্গলের মন ঝড়েরই মতো উড়িয়াছে চিন্তামণির দিকে। দেওয়ানের নিকট পরশুর জন্য একশ টাকা চাহিলে দেওয়ান জানাইল, এবারে তাহা হইলে বাড়ি বন্ধক দিতে হইবে। ধন-মান-প্রাণ সবই যে বিল্বমঙ্গল চিন্তামণির নামে উৎসর্গ করিয়াছে তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। এই যে সর্ববিলোপী মোহের প্রবল গতিবেগ, ইহার জন্য একটি বিরাট সঙ্ঘাতের প্রয়োজন। তাহারই আয়োজন হইল। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রজনীতে বিল্বমঙ্গল চিন্তামণির খোঁজে চলিল।

প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক। নদীতীর—শ্মশান। নৌকার খোঁজে বিল্বমঙ্গল এখানে আসিয়া একটি পাগলিনীর সাক্ষাৎ পাইল। এই দৃশ্যে বিল্বমঙ্গলের অন্তরের দ্বন্দ্ব চরমে উঠিয়াছে। আর তাহাতে সাহায্য করিয়াছে পাগলিনী। পাগলিনী রাধাভাবের মূর্ত প্রতীক। এই রাধাভাব বিল্বমঙ্গলকেও পাইয়া

বসিবে। তাই প্রেমের দুই মেরুর সংক্রান্তি এই দৃশ্যে অপূর্ব নাট্য-কৌশলে যোজিত হইয়াছে। কি করিয়া? কি করিয়া, সেই আলোচনার পূর্বে আমরা পাগলিনী-চরিত্র-সৃষ্টিতে গিরিশচন্দ্র যে শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন তাহার একটু আলোচনা করিব। গিরিশচন্দ্রের অন্যান্য নাটকের পাগল ও পাগলিনী-জাতীয় চরিত্রের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা ঐসব চরিত্রের আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এখানে দেখিব, বাক্যের ও কার্যের সঙ্গতিতে এই পাগলিনী-চরিত্র মনোরম হইয়াছে। গিরিশচন্দ্রের অন্যান্য নাটকের পাগল-চরিত্র সর্বদা শ্মশানবাসী নয়। একদিকে তাহারা ছন্নছাড়া উন্মাদ. সংসারের আবিলসংস্পর্শ হইতে একেবারে মুক্ত, অন্যদিকে তাহারা পরোপকারাদি কার্য করিতে সংসারের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিয়া সুস্থমস্তিষ্ক মানুষগুলির কাজের মধ্যে এমন করিয়া লিপ্ত হইয়া পড়ে, যে আর তাহাদের পাগলবেশ রক্ষা করা সম্ভব হয় না। সেই প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষের দল হঠাৎ জ্ঞানী ও কর্মীর সেরা রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে বাধ্য হয়। তাহাদের অনেকেরই পাগলামির মুখোস তখন খসিয়া পড়ে। পাগলের এই হঠাৎ সুস্থতার রাজ্যে সংক্রমণের সময় নাট্যকারের শিল্পের ব্যর্থতা ধরা পড়ে। কিন্তু এই পাগলিনী-চরিত্রটি বিচার করিলে দেখিব, ইহার চরিত্রের নিজস্ব সঙ্গতি কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই; পাগলিনী সুস্থের, লোকালয়ের সংস্পর্শে আসিয়াও তাহার সঙ্গে নিঃশেষে মিলাইয়া যায় নাই। অথচ নাট্যকারের এই চরিত্র-সৃষ্টির মূলীভূত উদ্দেশ্যটিও যথাযথ সিদ্ধ হইয়াছে।

এই চরিত্র-সৃষ্টির নাটকীয় উদ্দেশ্য কি? যাত্রার বিবেক-মোহান্তাদি চরিত্রের কাজ ছিল প্রধানতঃ দুইটি। এক দিকে উহারা কাহিনীকে পরবর্তী কাহিনীর সঙ্গে জুড়িয়া দিত, ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্ঘাতে যে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইত ব্যাখ্যার মধ্য দিয়া তাহা বিবৃত করিত। সেই পরিস্থিতি অবলম্বনে পাত্র-পাত্রীর অন্তরে ভাবের যে আন্দোলন হইত, এই চরিত্রগুলি তাহারও ব্যাখ্যা করিত। অন্য দিকে কাহিনী ও চরিত্রের মধ্যে অনুস্যূত দার্শনিকতা সরল ভাষায় ও মধুর গানে বুঝাইয়া সহজ করিত এই চরিত্রগুলি। ভাবের গাম্ভীর্য গভীরতা ও প্রসার যেখানে বেশী, সেখানে আশ্রয় ছিল মনমাতানো সঙ্গীত! মনোমোহন প্রথমে যাত্রার এই বিশেষ দিকটি নাটকে প্রবিষ্ট করান। গিরিশচন্দ্র তাহারই অনুবর্তন করেন। এই নাটকে দেখিতেছি, শেক্‌স্‌পীয়রীয় সংলাপ-সর্বস্ব, চরিত্র-বিকাশী নাট্য-শৈলীর সঙ্গে বাঙালীর সঙ্গীত-ধর্মী,

উচ্ছ্বাস-মুখর দার্শনিকতা-প্রবণ যাত্রা-শৈলীর সম্যক্ মিশ্রণ হইয়াছে। এই দিক দিয়া 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটকের ঐতিহাসিক মূল্য ও নাট্য-মূল্য লক্ষণীয়। যাহা হউক এক দিকে যেমন পাগলিনী নিজের দার্শনিকতা-পূর্ণ বাক্যাবলীতে কাহিনীর ভাবগাম্ভীর্য বাড়াইয়া দিতেছে, গানে-গানে পাত্র-পাত্রীর মনের ও পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করিতেছে, বিভ্রান্তকে জ্ঞানের আলোকে গানের সুরে পথ দেখাইতেছে, অন্য দিকে তেমনি নিজের স্বভাব-সিদ্ধ পাগলামীর মধ্যে রাধাভাব-তন্ময়ত্ব বজায় রাখিয়াছে। বিল্বমঙ্গলের মোহের জীবন অতিক্রান্ত হইয়া যখন প্রেমের জীবন আরম্ভ হইতেছে, তখন সেই সংক্রান্তিতে শুভগ্রহের সঞ্চারের মতো আসিয়া জুটিয়াছে পাগলিনী। নিজের চরিত্র দিয়া সে বিল্বমঙ্গলকে অগ্রসর করাইতেছে। তাহার প্রেম-তন্ময়ত্বের আলোকে আমরা মোহগ্রস্ত বিল্বমঙ্গলকে চিনিতেছি। বিল্বমঙ্গলের প্রেম-পরিণতির দূতীরূপে পাইতেছি আমরা এই পাগলিনীকে। তাই চিন্তামণি যখন বিল্বমঙ্গল-বিহনে একাকিনী, এই পাগলিনী বৃন্দার মতো তাহাকে ভালবাসিয়া পথ দেখাইয়া, বৃন্দাবনে প্রেম-সম্মিলনে লইয়া চলিয়াছে। কিন্তু তবুও সে প্রহেলিকা। কেন না, সে সংসারের কাছে আসিয়াও কাছে আসে নাই ; ছুটিয়া আসিয়াছে, অপেক্ষা করে নাই ; সুস্থভাবে পরিষ্কার কথা বলে নাই। প্রলাপের অর্ধ-প্রকাশিত বাক্যে, অর্ধেক স্পষ্ট আর অর্ধেক অস্পষ্ট ভাব-ব্যঞ্জক সঙ্গীতে, তাহার দিব্য দৃষ্টি ফুটিয়া ওঠে ; তাই তাহার দার্শনিকতাও পাগলামির মুখোস ত্যাগ করে না। নাটকে পাগলিনীর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণির। পাগলিনীর সঙ্গে বিল্বমঙ্গলের প্রথম সাক্ষাৎ শ্মশানে। ঝড়ের প্রলয়ঙ্কর নিশায় দিব্যোন্মাদিনী পাগলিনী শ্মশানের অগ্নি জ্বালাইয়া হৃদয়মণি চিন্তামণির সন্ধান করিতেছে। অন্যদিকে মানবী চিন্তামণির প্রেমে সমান পাগল হইয়া বিল্বমঙ্গল এই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রজনীতে অভিসারে বাহির হইয়াছে। একজন কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছায় পাগল, অন্যজন আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছায়, রূপ-তৃষ্ণায় উন্মাদ। দুই জনেরই অবলম্বন চিন্তামণি। দুইজনেই তাই সংসার ত্যাগ করিয়া শ্মশানে আসিয়াছে। তাই বিল্বমঙ্গলের মুখে চিন্তামণির নাম শুনিয়া পাগলিনী বলিয়া উঠিল, "কই, সই, কই চিন্তামণি…" ইত্যাদি। বিল্বমঙ্গল ও পাগলিনী আজ সত্যই দুইজন সখী। যে সাধনায় পাগলিনী অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, সমপ্রাণ সখার মতো বিল্বমঙ্গল এখন হইতে তাহারই আরম্ভ করিবে। দুই চিন্তামণির প্রেমের চরম পরিণতি যে এক, তাই অগ্রজা সখী এই পথভ্রান্ত বিল্বমঙ্গলকে পথ দেখাইতেছে। নারীর

জ্ঞানের পরিচয় পাইয়াছি; তাহার মধ্যে উন্মত্ততা-মিশ্রিত মহামানবতার রূপ দেখিয়াছি। চিন্তামণির বাটীর বহির্ভাগে দুইবার এই পাগলিনীর সাক্ষাৎ আমরা পাইয়াছি। একবার যখন (তৃতীয় অঙ্ক—দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক) বিল্বমঙ্গলের গৃহত্যাগের পর চিন্তামণি নিজের নিঃসহায় একাকিত্ব বুঝিতে পারিয়া চিন্তা করিতেছে, ঠিক সেই সময়, পাগলিনীর আবির্ভাব হইল। পাগলিনী বলিয়া উঠিল,—"মা তুই ভাবিস্ নি, তোকে হরি কৃপা করবেন। সে সকলকে কৃপা করে, আমার উপর বড় নির্দয়। ওমা, লজ্জা করে মা—লজ্জা করে, সে আমায় দেখতে পারে না।"

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়, চিন্তামণি কিছুক্ষণ আগেই ভাবিয়াছে, হরি কি তাহার মতো পাপীকে কৃপা করিবেন। পাগলিনীর উক্তির মধ্য দিয়া ভাবিতে পারিতাম, নাট্যকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দৈববাণী করিতেছেন। কেন না, পাগলকে অন্তর্যামী সাজাইয়া তাহার মুখে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী দিতেছেন। কিন্তু তাহা ভাবিবার উপায় নাই। পাগলিনীর এই আকস্মিক উক্তিটি দৈববাণীর ইঙ্গিতরূপে নিলেও ইহার প্রলাপাত্মক রূপটি অবিকল বজায় থাকে। "তোকে হরি দয়া করবেন।" এর সঙ্গে "সে সকলকে কৃপা করে" এই বাক্যাংশের তর্কশাস্ত্র-সম্মত অবিচ্ছেদ্যতা রহিয়াছে। কিন্তু "আমার উপর বড় নির্দয়।" এই অভিমানাত্মক বাক্যের কোনো সঙ্গতি নাই। এবং ইহার পরই "ওমা, লজ্জা করে মা,—লজ্জা করে," বাক্যাংশের মধ্যে নবোঢ়া মুগ্ধাবধূর যে লজ্জাশীলতা প্রকাশ পায় পূর্বোক্ত বাক্যাবলীর মধ্যে তাহার দেশ-কাল-পাত্র বা প্রসঙ্গগত কোনো সঙ্গতি নাই। পাগলের মনের মধ্যে অবিরত যে স্মৃতি-প্রবাহ চলিতে থাকে, তাহার পারম্পর্যকে ঐক্যসূত্রে গাঁথিতে পারে না বলিয়াই সে উন্মাদ; তাই ত তাহার কার্য-কারণে অসঙ্গতি। যদি ধরি, চিন্তামণির মনের কথা জানিয়া সে দৈববাণী করিতেছে, তখনই আবার আমরা ভাবিতে বাধ্য হইব, বিবাহের রাত্রিতে স্বামীহারা পাগলিনীর মনে অকাল-বৈধব্যের যে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা সহ্য করিতে পারে নাই বলিয়াই সে হইয়াছে উন্মাদিনী; কিন্তু পাগল হইবার পূর্বে ভাবিয়াছিল সবার উপর বিধাতা প্রসন্ন, শুধু তাহার উপর নির্দয়, তাই প্রলাপের মধ্য দিয়া হইতেছে স্মৃতির রোমন্থন। সেই ইতস্ততঃ ভাসিয়া আসা, খেইহারা স্মৃতির আর একটা সূত্র ধরিয়া তাহার মনে ভাসিয়া উঠিল নবোঢ়া বধূর লজ্জা, "ও মা লজ্জা করে মা—লজ্জা করে, সে আমায় দেখতে পারে না।"

সুতরাং ভবিষ্যদ্দর্শিনী মহামানবীর উক্তির মধ্যে অপূর্ব কৌশলে জড়িত রহিয়াছে প্রলাপের বাস্তব রূপ। পাগলিনী চরিত্রের আদ্যন্ত বিশ্লেষণ করিলে আমরা ইহাই দেখিব। বাহুল্য ভয়ে অতিবিস্তৃতিতে বিরত রহিয়া আমরা পূর্ব-প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসিব। বিল্বমঙ্গল ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নদীতে চিন্তামণির জন্য ঝাঁপাইয়া পড়িল। প্রথমাঙ্কের এইখানেই শেষ। বিল্বমঙ্গলের জীবনের মোহের অঙ্ক শেষ হইতে চলিয়াছে। এবারে অনুশোচনার মধ্য দিয়া প্রায়শ্চিত্তের, দ্বিতীয় অঙ্কের আরম্ভ হইবে। দ্বিতীয় অঙ্কের ·তিনটি দৃশ্য ধরিয়াই চলিয়াছে মোহভঙ্গের পালা। প্রথম দৃশ্যে কৃষ্ণ-প্রেমের ছলনায় সাধক যখন কাম-বাসনার চরিতার্থতা খুঁজিতেছে, ঠিক তখনই সত্যকার তন্ময় প্রেমিক ঝড়-ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করিয়া উন্মত্ত অভিসারে আসিয়াছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে মৃত সর্প দেখিয়া তাহার জ্ঞান হইল, তাহার ধারণা ভুল। চিন্তামণি তাহার জন্য দড়ি ফেলিয়া রাখে নাই। ঝড়ের রাত্রিতে তাহার অপেক্ষায় বাহিরে দাঁড়াইয়া ভিজে নাই, বরং নিশ্চিন্ত আরামে কোমল শয্যায় নিদ্রা গিয়াছে। তখন বিল্বমঙ্গলের মনে প্রথম সন্দেহ জাগিল, চিন্তামণি সুন্দর বটে, সত্যই সুন্দর, কিন্তু তাহার মধ্যে প্রেম নাই। কেন না প্রেম যে মানুষকে উন্মাদ করে, বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত করে, চিন্তামণি তাহা বুঝে নাই। বুঝে নাই বলিয়াই সে চিন্তামণিকে বলে, "যদি আজও না বুঝে থাক, নিশ্চয় তুমি প্রেমিকা নও, কিন্তু তুমি অতি সুন্দর—অতি সুন্দর।" এইবার বিল্বমঙ্গল রূপের নেশা ত্যাগ করিয়া রূপাতীতের সন্ধানে চলিবে। দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের শেষে তাই টহলদারদের গানে, যাত্রার বিবেকের সঙ্গীতের মতো, মহাজীবনের আহ্বান ছুটিয়া আসে,—

> "কি ছার আর কেন মায়া, কাঞ্চন-কায়া ত রবে না।
>
> * * * * * * * *
>
> কেউ কারো নয় দেখনা চেয়ে, কবে ফুটবে আঁখি।
>
> আপন রতন বেছে নে চল, হরি বলে ডাকি।"

এই আহ্বানে সাড়া দিবার জন্য ধীরে ধীরে বিল্বমঙ্গল প্রস্তুত হইতেছে। নদীকূলে গলিত শব দেখিয়া নরদেহের পরিণাম ও নারীর রূপের নশ্বরত্ব বিল্বমঙ্গল স্পষ্ট দেখিতে পাইল। কিন্তু ভালবাসার কাঙাল সে। নারীর রূপ হইতে চক্ষুকে ফিরাইয়া সে লইতেছে, কিন্তু হৃদয়ের প্রেম কাহাকে নিবেদন করিবে? দুনিয়ায় কে তাহার আপন আছে? ঠিক এমনি সময়ে

পাগলিনীর গান তাহাকে পথ দেখায়। তাই ত বিল্বমঙ্গল বলে,—"আমার কি কেউ নাই? অবশ্যই আছে—আমিই অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছিনি,··· ···কে তুমি? তোমার কি রূপ? তুমি পরম সুন্দর। দেখা দাও, কথা কও, আমার প্রাণ জুড়াও।"

প্রথম অঙ্কে মোহ যতখানি প্রবল ছিল, দ্বিতীয় অঙ্কে মোহভঙ্গের বেগ ও বেদনা ঠিক ততখানি প্রবল হইল। হৃদয়বৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাতে ঘটনার স্রোত কী আশ্চর্যভাবে বিবর্তিত হইতেছে। চরিত্রের ক্রমবিকাশও অনবদ্য। প্রথম অঙ্কে অন্তর্দ্বন্দ্বের আভাস দ্বিতীয় অঙ্কে তাহার পরিপক্ক রূপ-গ্রহণ এবং তৃতীয় অঙ্কে তাহার চরমোত্থান। বিল্বমঙ্গলের মন এখন রাধাভাবে পরিপূর্ণ। সন্ন্যাসী সোমগিরি তাহাকে দীক্ষার মধ্য দিয়া কৃষ্ণ-প্রাপ্তির পথ ধরাইয়া দিলেন। ওদিকে বিল্বমঙ্গলহারা চিন্তামণিরও বিরহ-বিষাদ শুরু হইয়া গিয়াছে। সেও এখন পাগলিনী। ইহার সঙ্গে সাধক ও থাকমণির আচরণ তুলনীয়। যে নারী-সৌন্দর্যকে অসার জানিয়া বিল্বমঙ্গল সন্ন্যাস-গ্রহণ করিতে ছুটিয়াছে, এই সাধকটি সেই মোহে ঘুরপাক খাইতে চাহে। আবার চিন্তামণি যে 'বিষয়' ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইতেছে, থাকমণি সেই অর্থ-লোলুপতার জন্য কত কৌশলের অবতারণা করিবে ভাবিতেছে। বিল্বমঙ্গল-চিন্তামণির সত্যকার প্রেমের জন্য কাম-কাঞ্চন-ত্যাগের দৃষ্টান্তের পাশাপাশি চলিতেছে অর্থ ও নারী প্রাপ্তির কদর্য ষড়যন্ত্র। শেষপর্যন্ত থাক-মণি ও সাধক পরামর্শ করিল, চিন্তামণিকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করিবে। পাগলিনী প্রলাপোক্তির মধ্য দিয়া চিন্তামণিকে সাবধান করিল। ভিক্ষুকের সাক্ষ্যে চিন্তামণির বিশ্বাস হইল। বিল্বমঙ্গলের অন্তর্ধানে বিষয় ও রূপ-যৌবন আগে হইতেই তাহার নিকট বিষবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল। এই ষড়যন্ত্রের কদর্যতা তাহার বৈরাগ্যের মাত্রা বাড়াইয়া দিল। চিন্তামণি একমুহূর্তে সমস্ত ত্যাগ করিয়া বাহির হইল অনন্ত পথে। এইখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, বিল্বমঙ্গলের চরিত্র-বিকাশ বিচিত্র কর্ম-সঞ্জাত ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়া যতখানি স্বাভাবিকভাবে সঙ্ঘটিত হইয়াছে, চিন্তামণির চরিত্রবিবর্তনে ততখানি স্বাভাবিকত্ব ও সঙ্গতি নাই। বিল্বমঙ্গলের সন্ন্যাস-গ্রহণের পর চিন্তামণির গৃহত্যাগ আকস্মিক। উহার জন্য নাটকে যথোপযুক্ত পূর্বপ্রস্তুতি নাই। ভিক্ষুকের মনে এতদিন পর্যন্ত অর্থ-লিপ্সা ছিল। চিন্তামণির বিষয়-ত্যাগের দৃষ্টান্তে তাহারও চৈতন্যোদয় হইল। সেও চলিল ঐ একই পথে। এখানে অবশ্য

ভিক্ষুকের এই মতি-পরিবর্তন আকস্মিক। এই পরিবর্তনের জন্য যথাযোগ্য প্রস্তুতি না থাকায় চরিত্রটিতে দুর্বলতা রহিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এদিকে বিল্বমঙ্গলের অবস্থা একবার লক্ষ্য করা যাক। বিল্বমঙ্গল নদীতীরে বসিয়া ধ্যান করিতেছিল। হঠাৎ কঙ্কণ-ঝঙ্কারে চক্ষু মেলিয়া দেখিল এক অপূর্ব সুন্দরী নারীকে। তারপর তাহারই রূপ-পিপাসায় আকুল হইয়া বণিকের নিকটে সে এক আশ্চর্য প্রস্তাব করিল। এখানে এই বিষয়ে শুধু একটি কথা বলিব। আমরা দেখিয়াছি, চিন্তামণির রূপে বিল্বমঙ্গল যতখানি মুগ্ধ ছিল, ঠিক ততখানি বিরাগ ও কৃষ্ণপ্রেম লইয়া সে সংসার ত্যাগ করিয়াছে। তাহার পরও যদি সে সামান্য কঙ্কণ-ঝঙ্কারে জাগ্রত হইয়া কোনো সুন্দরীর রূপে এমন করিয়া মুগ্ধ হয়, তাহা কি স্বাভাবিক হইবে? তাহা হইলে অত বড় বিরাগেরই বা কি প্রয়োজন ছিল এবং কৃষ্ণপ্রেমে দিব্যোন্মাদ হওয়ারই বা কি কারণ ঘটিয়াছিল? শুধু তাহাই নহে, সোমগিরি তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—

"এই মহাজন, নাহি আকিঞ্চন—
কৃষ্ণপদে অর্পিয়াছে প্রাণ,
মান অপমান সুখদুঃখ নাহি জ্ঞান,
কৃষ্ণে চায়, কিবা হেতু—
কিছু নাহি নাহি জানে।
ব্রজের এ প্রেম,
তুলনা নাহিক আর তার।"

যাহার এতখানি অহেতুক কৃষ্ণ-প্রেম জন্মিয়াছে, নারী-দর্শন মাত্র তাহার মনশ্চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে পূর্বের অতখানি আয়োজন কি ব্যর্থ হইয়া যায় না? আর মুগ্ধ না হয় হইলেনই। কোনো সুস্থ-মস্তিষ্ক ভদ্রলোক কোনো স্বামীর নিকট গিয়া এই ভাষায় কি প্রার্থনা করিতে পারে—

"অলঙ্কারে ভূষিতা সুন্দরী,
আজি নিশা হবে মম আজ্ঞাকারী।
পাপ-ব্যক্ত করিনু তোমারে,
যেবা হয়, কর মতিমান!"

মতিমানের তখন কি প্রার্থনাকারীকে অর্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় করা উচিত ছিল না? স্ত্রীর সতীত্ব বিসর্জন দিয়া অতিথি-সেবা ভারতীয় নীতিধর্ম-

বিরোধী; ভারতীয় মহাকাব্য এবং পুরাণের মধ্যে পুত্রবল দিয়া অতিথি সেবার উদাহরণ থাকিলেও এইরূপ হীনত্বব্যঞ্জক অদ্ভুত উদাহরণ একটিও নাই। সুতরাং ইহা পুরাণ-বিরোধী কল্পনা। কাহিনীকে নাট্য-শৈলী বা পুরাণ প্রসিদ্ধি, কোন দিক দিয়াই সমর্থন করা যায় না। ভক্তমাল গ্রন্থেও বিল্বমঙ্গল বণিক-পত্নীকে শুধু দেখিতে চাহিয়াছিল, শয্যাসঙ্গিনী করিতে চাহে নাই। যাহা হউক, অন্ধ হইবার পূর্বে বিল্বমঙ্গলের স্বগতোক্তিটি চমৎকার হইয়াছে।

বিল্বমঙ্গল অন্ধ হইল, নাটকের কর্মগতিও বন্ধ হইল। এযাবৎ আমরা দেখিয়াছি, সেক্‌সপীয়রীয় রীতির সহিত যাত্রার রীতির সার্থক সমন্বয়ে নাটক-খানি ক্রমবিকাশের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। নায়ক বিল্বমঙ্গলের অন্তর্দ্বন্দ্ব জাত কর্ম-প্রচেষ্টা হইতেই নাট্য ঘটনার সৃষ্টি হইয়াছে এবং প্রত্যেক পূর্ববর্তী ঘটনা পরবর্তী ঘটনায় পর্যবসিত হইয়া নায়ক-চরিত্রকে স্তরে স্তরে বিকশিত করিয়াছে। পার্শ্বচরিত্রগুলিও আসিয়াছে এই নায়ক-চরিত্রকে ফুটাইবার জন্য এবং বুঝাইবার জন্য। ওদিকে আবার অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্র সঙ্ঘাতে সমস্যা যখন জটিলীকৃত হইয়াছে, তখন হয় কাহারও বা কাহাদেরও আপন-মনে গাহিয়া যাওয়া উপদেশবর্ষী সঙ্গীত, না হয় গূঢ়ার্থব্যঞ্জক দ্ব্যর্থক প্রলাপোক্তি সেই সমস্যার পর আলোকপাত করিয়াছে। তাহা অবলম্বন করিয়া নায়ক-নায়িকা পাইয়াছে সমস্যা হইতে মুক্তির পথ। নূতন উদ্যমে, নবীন আশায় আবার আরম্ভ হইয়াছে তাহাদের কর্ম-প্রচেষ্টা। যাত্রার এই নাট্যীকৃত প্রভাব অতি অপূর্ব। গিরিশচন্দ্রের পূর্বে যাত্রার ভক্তি-প্রবণতা, দার্শনিকতা ও ভবিষ্যদ্‌ভাষণ-গুণকে এমন করিয়া কেহ কাজে লাগাইতে পারেন নাই। সুতরাং এদিক দিয়া মনোমোহনের উদ্দেশ্য গিরিশচন্দ্রে আসিয়া সফল হইল। দেশী ও বিদেশী শৈলীর সার্থক মিলন হইল। কিন্তু বিল্বমঙ্গলের অন্ধত্বের পর নাট্যকারের আর এই শক্তির পরিচয় দেখি না। ইহার পরবর্তী ভাবটি আমরা আগেই কিছুটা বিশ্লেষণ করিয়াছি। অবশ্য গিরিশচন্দ্রের দিক দিয়া কৈফিয়ৎ দিতে গেলে আমরা বলিব, যেভাবে বিল্বমঙ্গল-চরিত্র অঙ্কন করা হইয়াছে তাহাতে অন্ধ হওয়ার পর আর তাহার কোনো কর্ম থাকিতেও পারে না। কেন না, কামকে প্রেমে পরিণত করাই বিল্বমঙ্গলের চরিত্র-বিকাশের প্রথম কথা। অভিজ্ঞতার ঘাত-প্রতিঘাতে চৈতন্যোদয়ের মধ্য দিয়া বিল্বমঙ্গল রূপের নেশা ত্যাগ করিয়াছে। তবুও মনের অবচেতন স্তরে সংস্কাররূপে নিজেরও অজ্ঞাতে সে নেশার যেটুকু থাকিতে পারিত, চক্ষু উৎপাটন

করিয়া বিল্বমঙ্গল হৃদয় হইতে তাহাও উৎপাটিত করিয়াছে। সুতরাং রাধা-ভাবের অনন্যাসক্ত প্রেমার্তির পূর্ণ জাগরণ তাহার মধ্যে হইয়াছে। তাই আর চরিত্র-বিকাশের কোনো দিক তাহার বাকী নাই। যে আদর্শে তাহাকে গড়া হইতেছিল, তাহার পরিপূর্ণতায় সে আসিয়াছে। এখন বাকী শুধু কৃষ্ণ-দর্শন। এই কৃষ্ণ-দর্শনের জন্য শ্রীচৈতন্যের ন্যায় সে দিব্যোন্মাদ। বিল্বমঙ্গল-চরিত্রে নাটকের তৃতীয় অঙ্কের পর আর গতি নাই বটে, কিন্তু এই দিব্যোন্মাদের ভাবাকুলতার মধ্য দিয়া স্থিতিকেও ব্যাকুল, চঞ্চল করিয়া তোলা হইয়াছে। এই স্থিতি কর্মের, গতি ভাবের। না-পাওয়ার ব্যাকুলতা যে প্রবল বেদনা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তির অশান্তি কর্মের দৈন্য পূরণ করিয়া দিয়াছে। তাই এখানে বিল্বমঙ্গল-চরিত্রে গতি একেবারে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে একথা বলিতে পারি না। অবশ্য চতুর্থ অঙ্ক হইতে যাত্রার প্রভাব নাটককে অভিভূত করিয়াছে। বৃন্দাবনে বিল্বমঙ্গল, চিন্তামণি, বণিক, বণিক পত্নী, ভিক্ষুক, পাগলিনী, সোমগিরি, সকলেই কৃষ্ণ-দর্শনে আসিয়া মিলিয়াছে। নাটকের শেষে তাই যাত্রার দর্শক একবার 'বিল্বমঙ্গল-প্রেমানন্দে হরি হরি' বলিয়া উঠিতে পারেন। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়ারের নাট্য-ভক্ত বলিয়া উঠিবেন, এত-খানি দেখাইবার কি দরকার ছিল? কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মাদ সন্ন্যাসী বিল্বমঙ্গলের অন্ধত্বের পর আমাদের চক্ষুপথ হইতে তাহার অন্তর্ধান হইলেই ত আমরা জীবনের দুর্বিজ্ঞেয় রহস্যে অভিভূত হইয়া ভাবিতে পারিতাম, যে মোহের জীবন আমরা যাপন করি, বিচার করিলে দেখা যায়, সেই "Life is not worth-living". কিন্তু ভারতীয় মন তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে চাহে না। সে চাহে শান্তি ও সমাধান। 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে সেই শান্তিময় সমাধান মিলিতেছে। ভারতীয় অধ্যাত্ম-চেতনা, বাংলার ভক্তিধর্মী সাধনা, শেক্‌স্‌পীয়রীয় নাট্যরীতির অনেকখানি সার্থক অনুসরণ ও বাংলার দেশীয় যাত্রা-শৈলীর সমন্বয়ে বিল্বমঙ্গল নাটক বাংলা সাহিত্যে তুলনা-রহিত সৃষ্টি। মহাকবি গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে মোহিতলাল মজুমদার যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা একমাত্র বিল্বমঙ্গল নাটক সম্বন্ধেই সম্যক প্রযোজ্য। তিনি বলেন—

> "গিরিশচন্দ্রই শেষ খাঁটি বাঙ্গালী প্রতিভা, বাঙ্গালীর জাতীয়-নাটক ও নাট্যাভিনয়ের আদর্শ, এমন কি, একটা নাটকীয় ছন্দও সেই প্রতিভার সৃষ্টি, বাঙ্গালী-যাত্রা ও বিলাতী নাটকের এমন সমন্বয় আর কেহ করিতে পারেন নাই,—ঠিক ঐ বস্তুই বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করিয়াছিল।"—বাংলা প্রবন্ধ ও রচনা রীতি, ৩৫৮ পৃষ্ঠা।

সপ্তম অধ্যায়

ঐতিহাসিক নাটক

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল

[ঊনবিংশ শতকের বাঙালীর জাতীয়তাবোধ ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবে জাগ্রত হইয়াছিল; ইহা প্রথমে 'হিন্দুর' জাতীয় আন্দোলনরূপে দেখা দেয়; মুসলমান বহিঃশত্রু বিদেশী 'ইংরাজের' প্রতীক; রাজস্থানের ইতিহাসে আধুনিক স্বাদেশিকতার আরোপ; ঐতিহাসিক নাটকে প্রচারবাদ ও কালানৌচিত্য দোষ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জাতীয়তাবোধোদ্দীপ্ত ঐতিহাসিক নাটকের জনক; জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের নাটকে ইতিহাস রোমান্সের দ্বারা অভিভূত; জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাহিনী কল্পনায় ও চরিত্রচিত্রণে অসঙ্গতি; 'পুরুবিক্রম', 'সরোজিনী', 'অশ্রুমতী' ও 'স্বপ্নময়ী' নাটকের আলোচনা।

√গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজউদ্দৌলা' খাঁটি ইতিহাস অবলম্বনে রচিত হইলেও উহা নাটক হয় নাই; ঐতিহাসিক নাটকে অন্তর্দ্বন্দ্বে ও বহির্দ্বন্দ্বের সমাবেশ করিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স; ক্ষীরোদপ্রসাদে এই শৈলীর অনুসরণ; Blank vs. সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের গদ্য সংলাপের ভাষা: 'সোরাব-রুস্তম', 'সিংহল-বিজয়', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'রাণাপ্রতাপ', শাজাহান', 'মেবার পতন' ও 'নুরজাহান' নাটকের আলোচনা।]

গিরিশচন্দ্র বাংলা নাট্য-সাহিত্যের 'গিরীশ'—'হিমালয়'ই বটেন। তাঁহার পরবর্তী অনেকে নাট্য-সাহিত্যে তাঁহার অনুবর্তন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার ভাব-শিষ্য অমৃতলালের নাটকগুলির (প্রহসনের নহে) মধ্যে কোনো লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় নাই বলিয়া ঐগুলির আলোচনা করিলাম না। ক্ষীরোদ-প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের পৌরাণিক নাটক এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদের পরিচয় শুধু পৌরাণিক নাট্যকার হিসাবে নয়। তিনি ঐতিহাসিক ও রোমান্টিক বহু নাটক রচনা করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক বা রোমান্টিক অথবা রোমান্স-ধর্মী ইতিহাসাশ্রিত নাটক বাংলা নাট্য-সাহিত্যের এক বিশেষ ধারাবাহিকতার ঐতিহ্য বহন করে। সুতরাং ক্ষীরোদপ্রসাদের আলোচনা করিবার পূর্বে এই ধারার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের আলোচনা করা প্রয়োজন।

বাংলার দেশাত্মবোধ বা জাতীয়তা ঊনবিংশ শতকের ইংরেজী সভ্যতার সংস্পর্শের ফল। ইংরাজের স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রীতি বাঙালীকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, বাঙালীর জাতীয় ইতিহাস নাই। জাতীয় ইতিহাস রচনা করিতে হইবে। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের জাতীয়তার চারণ-গাথা রচনা করিলেন। নবীনচন্দ্রের প্রতিভা নিযুক্ত হইল ঊনবিংশ শতকের মহাভারত রচনা করিতে। 'স্বাধীনতা-হীনতায়' জীবন ধারণের প্রতি ধিক্কার-বাণী শোনা গেল রঙ্গলালের কাব্যে। কাব্যে যাহার আরম্ভ কালক্রমে কর্মে তাহা রূপায়িত হইতে শুরু হইল। হিন্দু মেলাকে অবলম্বন করিয়া দেশ-প্রীতির যে উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইল, বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনে তাহাই কর্মপন্থা খুঁজিয়া পাইল।

কিন্তু সাহিত্যে প্রথমতঃ এই জাতীয়তা-বোধের যে উদ্দীপনা, তাহার প্রকাশ একপ্রকার 'হিন্দুর জাতীয় জাগরণ' রূপে,—মুসলমান শাসকের বিরুদ্ধে হিন্দুর জাগরণ চেষ্টায় বা বৈদেশিক আক্রমণে হিন্দু-শক্তির প্রতিক্রিয়ায়। তাই টডের রাজস্থান-কাহিনী বাঙালী ঐতিহাসিক-নাট্যকারদের অতি প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। রাজপুতগণ মোগল-পাঠানকে প্রতিরোধ করিবার জন্য যে প্রাণপাতী সংগ্রাম করিয়াছে, (আধুনিক জাতীয়তা-বোধের দ্বারা তাহাকেই মণ্ডিত করিয়া) বর্তমান যুগের বাঙালী তাহার মধ্যেই দেশ-হিতৈষণার অনেক নির্দেশ পাইয়াছে। বিদেশী ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে যে অভিযান, রাজভয়-ব্যাকুলতা তাহা প্রকাশে বাধা দিয়াছে। তাই বাঙালী নাট্যকার দুধের পিপাসা ঘোলে মিটাইয়াছেন। তাঁহার নাটকে বিদেশী আছে, ইংরাজ নাই; দেশদ্রোহী আছে, তাহার ঐতিহাসিক পরিচয় নাই। দেশপ্রেমিক রহিয়াছে, কিন্তু হয়ত সে কোনদিন ছিলই না; কল্পনার দ্বারা তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাই আমাদের ঐতিহাসিক নাটকের বিচার করিতে গেলে দেখা যায়, উহার মধ্যে আছে একদিকে প্রচারবাদ, অন্যদিকে কালানৌচিত্য দোষ বা anachronism। পাত্রা-নৌচিত্য-দোষ ত আছেই। ঠিক ঠিক ঐতিহাসিক পাত্র-পাত্রীকে তাহাদের নিজস্ব যুগ ও চরিত্র-মহিমায় দেখানো হইয়াছে যে নাটকে, তাহার সংখ্যা নিতান্ত কম; নাই বলিলেও চলে। তাই, বাঙালীর ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাস অনেকখানি কবি-মনের সৃষ্টি, এইকথা মনে রাখিয়াই আমাদের আলোচনা শুরু করিতে হইবে। এখানে শুধু লক্ষ্য রাখিতে

হইবে, সৃষ্টি করিতে গিয়া নাট্যকার যেন ইতিহাসের অপমান না করিয়া থাকেন। আর তাহার সঙ্গে দেখিতে হইবে, এই সকল নাটকের সাহিত্যিক মূল্য কতখানি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ—ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে নাটক রচনা মধুসূদনই শুরু করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা দেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া নহে। ট্রাজেডী রচনার ঝোঁক সেখানে প্রবল ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকেই সর্বপ্রথম এই আধুনিক দেশপ্রেমের বাণী স্পষ্টভাবে শোনা গেল। অবশ্য সে দেশ-প্রেমে কালানৌচিত্য দোষ ঘটিয়াছে। রাজা পুরুর মধ্যে যে স্বদেশ-প্রীতি দেখানো হইয়াছে তাহার মধ্যে আধুনিক ইংরেজ শাসনে নিপীড়িত ভারতবাসীর মুক্তির বাণীই ধ্বনিত হইয়াছে। অবশ্য রাজা পুরু ক্ষাত্র-গর্বে বীর রাজার মতোই সেকেন্দর শাহের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, পরাজিত হইয়াও 'রাজার প্রতি রাজার ন্যায়' আচরণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তক্ষশীলার রাজা অম্ভি ভয়াভিভূত হইয়া আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পিছনে কোনো বিশেষ রাজকন্যার প্রেম-কাহিনী ছিল কিনা জানি না। আবার সেকেন্দর শাহকে বাধা দিবার জন্য ভারতের রাজন্যবর্গ সম্মিলিত হইয়াছিলেন এমন প্রমাণ ইতিহাস দেয় না। অবশ্য ভারতের সামাগ্রিক জাতীয়তাবোধ উদ্দীপ্ত হইয়া বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে যে প্রাচীন ভারতে সঙ্ঘবদ্ধ হয় নাই তাহা নহে। পরাজিত জয়পালের পুত্র আনন্দপাল বা অনঙ্গপালের নেতৃত্বে সমস্ত হিন্দু-শক্তি গজনী-সম্রাটের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হইয়াছিল ইহা তো ঐতিহাসিক ঘটনা। তবুও আমরা বলিব, উনবিংশ শতকের ভারতবাসীর স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবোধই 'পুরু-বিক্রমে' স্থান লাভ করিয়াছে। 'স্বপ্নময়ী' নাটকে মোগলের বিরুদ্ধে শোভাসিংহের যে বিদ্রোহ তাহাতেও দেশ-প্রেমের রং ফলানো হইয়াছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য মহৎ ছিল। দেশ ও জাতি-প্রেমের উচ্ছ্বসিত আদর্শ নাটকের মধ্যে তুলিয়া ধরিয়া তিনি ভারতবাসীকে, বিশেষতঃ বাঙালীকে, সজাগ করিতে চাহিয়াছিলেন। সেইজন্য তৎকালীন বঙ্গ-সমাজে তাঁহার নাটক যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিল। কিন্তু যুগমনের বিশেষ প্রবণতার জন্য সাহিত্যিক যে সমাদর পান, নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বী শেষ পর্যন্ত সেই সম্মান তাঁহাদের অনেককে দেন না। আজ আমরা যখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকের চিরন্তন সাহিত্যিক মূল্য বিচার করি, তখন

তাঁহার উদ্দেশ্যকে ধন্যবাদ দিই, কিন্তু রচনাকে সর্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

যে ঐতিহাসিক উপাদান লইয়া তিনি নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহার যাথার্থ্য ও সঙ্গতি লইয়া আমরা প্রথম আলোচনা করিতে বসি। দ্বিতীয়তঃ, আমরা দেখিতে চেষ্টা করি, সাহিত্যের মানদণ্ডে তাঁহার নাটক কতখানি গুরুত্ব বহন করে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইতিহাসকে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু সব ক্ষেত্রেই বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া। ঐতিহাসিক কাহিনীর মধ্যে তিনি কাল্পনিক চরিত্র ও ঘটনা সৃষ্টি কম করেন নাই। আমরা জানি যে, নাটক ইতিহাস নহে; ঐতিহাসিক কাহিনীর মধ্যে কল্পনার স্ফুরণে নাট্যকারের অধিকার রহিয়াছে; তবে সেই অধিকারও অবাধ নহে। নাট্যকারের কল্পনা যদি যুগ-সম্ভাবনাকে অতিক্রম করে, ইতিহাস তাহা স্বীকার করিবে না। অর্থাৎ যেরূপ ঘটনা যে যুগে সম্ভব, ঐতিহাসিক নাট্যকারের কল্পনা তাহা হইতে অধিক দূর অগ্রসর হইবে না। আবার ঘটনা ও পাত্রপাত্রীর চরিত্র-সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধিও নাট্যকার অস্বীকার করিবেন না।

এইদিক দিয়া বিচার করিলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পক্ষে ও বিপক্ষে আমাদের অনেক বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ, তাঁহার 'পুরু-বিক্রম' নাটকখানা ধরা যাক। রানী ঐলবিলার অস্তিত্ব ঐতিহাসিক না হইলেও ঐ চরিত্রটি ইতিহাসের মর্যাদা নষ্ট করে না। বহিঃশত্রুর আক্রমণে একটি স্বাধীন রাজ্যের রানী দেশীয় সমস্ত নৃপতিকে একত্রে মিলিত হইতে আহ্বান করিতে পারেন। ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। আবার যে বিজয়ী বীর এই দুর্বার শত্রুকে পরাজিত করিতে পারিবেন, তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করার প্রতিজ্ঞা করাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব। কিন্তু তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্ত পুরু ও তক্ষশীলের দ্বন্দ্ব যেমন ঐতিহাসিক নয়, তেমনি এই প্রসঙ্গ পুরুর মহনীয়তাকেও খর্ব করিয়াছে। পুরুরাজ আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন রাজ-মর্যাদার জন্য, নারীর জন্য নহে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে পুরুর দেশ-প্রেম আছে, রাজগর্ব আছে, কিন্তু সব চেয়ে বেশী রহিয়াছে রানী ঐলবিলা-লাভের বাসনা। অন্য সব তাহারই অনুগ হিসাবে আসিয়াছে মাত্র। রাজা তক্ষশীলের একটি ভগিনী থাকা অসম্ভব নয়। অপহৃতা নারী বীরপুরুষের শৌর্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে মনে-প্রাণে বরণ করিতে পারে। আবার ভাবী স্বামীর শুভ কামনায়

নিজের ভাইকে তাঁহার সহিত যুদ্ধ না করিতে অনুরোধ করিতেও পারে। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য, রাজা তক্ষশীলের বাড়ি হইতে আলেকজাণ্ডার অম্বালিকাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন, তৎকালীন হিন্দু রাজা তক্ষশীল তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া মৃত্যু-বরণ করিলেন না কেন? আরো আশ্চর্য, সেই লাঞ্ছিতা, অপহৃতা ভগিনী যখন ম্লেচ্ছ-শিবির হইতে ফিরিল, তক্ষশীলার রাজ-অন্তঃপুরে সেই কুলকন্যাকে মাল্যভূষিত করিয়া শঙ্খ বাজাইয়া বরণ করিয়া লইল! প্রাচীন হিন্দুরাজ-অন্তঃপুরের মর্যাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কি করিয়া ভুলিয়া গেলেন?

আবার 'সরোজিনী' নাটকেও ঐ একই কাণ্ড। লক্ষ্মণ সিংহের কন্যা সরোজিনীকে বলি দেওয়ার ব্যাপারে ভৈরবাচার্য যে ষড়যন্ত্র করিয়াছে, তাহা ঘটনাকে গম্ভীর ও লোমহর্ষক করিয়াছে। ইহাকে অবলম্বন করিয়াই রাণা লক্ষ্মণ সিংহের রাজকর্তব্য ও পিতৃস্নেহের দ্বন্দ্ব বাধিয়াছে। কিন্তু গোড়াতেই আমাদের জিজ্ঞাস্য, ভৈরবানন্দ-চরিত্র সৃষ্টির অবকাশ কোথায়? চিতোরের রাজ-পৌরোহিত্য বংশানুক্রমিক নয় কি? আলাউদ্দিনের প্রেরিত জনৈক মুসলমান নিশ্চয়ই চিতোরের রাজ-পুরোহিতের বংশে জন্মে নাই। যদি ধরিয়াও লই যে গুণ-কর্মানুসারে শিষ্যের হস্তে পৌরোহিত্যের ভার অর্পণ করা যায়, তবুও প্রশ্ন রহিয়া যাইবে, মৌলভী সাহেবের ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে আগমনটি ধরিয়া ফেলিবার মতো কাণাকড়ির বুদ্ধি কি চিতোরে কাহারও ছিল না? যদি আরও ধরিয়া লওয়া যায় যে, পলাণ্ডু-রস-সেবী, সরাব-পিপাসু, কোপ্তাকাবাবে রসনা-তৃপ্তিকারী পাঠান-নন্দন না হয় নিত্যস্নায়ী, নিরামিষাশী হইয়া আতপ তণ্ডুল ও কাঁচকলা ভক্ষণে অভ্যস্ত হইলেন, রংমহলের নৃত্যগীত ভুলিয়া না হয় ত্রিসন্ধ্যা ভজন-সাধনে রত হইলেন, কিন্তু কবে কোন্ টোলে তিনি বেদমন্ত্রাদি শিখিয়াছিলেন? সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিতে তাঁহার কতদিন লাগিয়াছিল? শুনা যায় দাঙ্গার সময়ে অনেক আবদুস্ ছত্তার সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু গোত্র জিজ্ঞাসা করায় আর শাণ্ডিল্যাদি ঋষির দোহাই দিতে পারেন নাই, একেবারে সরকার-গোত্র বলিয়া ফেলিয়াছেন। ভৈরবাচার্য কি সেরকম ভুল দুই একবার করিয়া উত্তম-মধ্যম প্রাপ্ত হন নাই? অবশ্য বর্তমানের নাম-গোত্র-বংশ-প্রবর-ভোলা বাঙালী হিন্দুর কথা বলিতেছি না। রাণা

প্রতাপ সিংহের পূর্বপুরুষ মেবারী রাজপুতের রাজকুল-পুরোহিতের কথাই হইতেছে।

'স্বপ্নময়ী' নাটক শুধু অনৈতিহাসিক নয়। রোমাণ্টিকতার যে ফানুস্ তিনি সেখানে উড়াইয়াছেন, তাহার মধ্যে বাস্তবতার বা সম্ভাব্য-বাস্তবতার বালাইও নাই। কিন্তু ঐতিহাসিক শুভ সিংহ যে মোগলের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে মহত্তর দেশ-প্রেম কোথায়? এক লম্পট জমিদার বর্ধমান-রাজ কৃষ্ণরাজ রায়কে হত্যা করিয়া তাঁহার কন্যার উপর অত্যাচার করিতে গিয়া সেই কন্যারই হস্তে নিহত হন; সস্তা দেশ-প্রেমের দোহাই দিয়া সেই লাম্পট্যের কদর্যতাকে ঢাকা যায় কি? ইহার সহিত সেই রাজকন্যাকে আবার প্রেমেও ফেলানো হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা কল্পনার উচ্ছৃঙ্খলতা আর কি হইতে পারে?

সব চেয়ে মারাত্মক কাণ্ড করিয়াছেন তিনি 'অশ্রুমতী' নাটকে। এখানে নাট্যকারের অপরাধ অমার্জনীয়। অশ্রুমতী রাণা প্রতাপ সিংহের কন্যা। শৈশবে দস্যু কর্তৃক অপহৃতা এবং ভীল-কর্তৃক পালিতা হইলেও তাহার পিতা রাণা প্রতাপই ত বটে। তুর্কীর ঘরে কন্যাদানের জন্য যে রাণা প্রতাপ মান সিংহের সঙ্গে একত্রে ভোজন করিলেন না, হল্‌দিঘাটের যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও যিনি নিজের স্বাধীন রাজ-মর্যাদা রক্ষার জন্য জীবনব্যাপী দারিদ্র্য বরণ করিলেন, সেই মহনীয় হিন্দু রাণা প্রতাপ সিংহের কন্যাকে কি না প্রেমে ফেলানো হইল আকবর-পুত্র সেলিমের সঙ্গে! ঐতিহাসিক রাণা প্রতাপের এতখানি অপমান করিবার অধিকার নাট্যকার পাইলেন কোথা হইতে?

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্য-শৈলীর বিচার করিলে দেখা যাইবে, তাঁহার রচনা বাংলা ঐতিহাসিক নাট্য-ধারার একটি বিশেষ স্তর নির্দেশ করে। বাংলার ঐতিহাসিক নাটক প্রধানতঃ দেশপ্রেম-মূলক। গিরিশচন্দ্র ও ক্ষীরোদপ্রসাদের কয়েকখানি রচনা ভিন্ন দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি নাট্যকারের বেশীর ভাগ রচনা হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের ইতিহাস। টডের রাজস্থানই তাঁহাদের গ্রন্থের ঐতিহাসিক ভিত্তি। মধুসূদন টড্-বর্ণিত কাহিনী-অবলম্বনেই তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক রচনা করেন। কিন্তু মধুসূদনের নাট্য রচনা দেশপ্রেমে পরিপূর্ণ নহে। স্নুতরাং বাংলা সাহিত্যে দেশপ্রেম-মূলক ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স-নাট্যের প্রবর্তক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। এই প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দুইখানি নাটক বিশেষ আলোচ্য। তাঁহার শেষ মৌলিক

রচনা 'স্বপ্নময়ী'র মধ্যে ইতিহাস সম্পূর্ণ বিকৃত হইলেও দেশপ্রেম উহার মূল প্রেরণা। ভারতীয় স্বাধীনতার ইতিহাসে যাহাকে সন্ত্রাসবাদের যুগ বা অগ্নিযুগ বলা যাইতে পারে, গুপ্ত ষড়যন্ত্র, লুণ্ঠন প্রভৃতির মধ্য দিয়া যে-যুগে বিদেশী শত্রু ইংরাজকে তাড়ানোর চেষ্টা হইয়াছিল, তাহারই ছায়া পড়িয়াছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী'তে। 'অশ্রুমতী' নাটকের মধ্যে ইতিহাস অনেক দূর পর্যন্ত অবিকৃতভাবে চলিয়াছে। বাকী সবটুকুই কল্পনা। 'অশ্রুমতী'কে ইতিহাসাশ্রিত নাটক বলি আর নাই বলি, ইতিহাস অবিকৃত অবস্থায় সত্য যেটুকু আছে, তাহা আছে এই নাটকেই। পরবর্তী কালে নাট্যকারগণ যে ইতিহাসের ভিতর স্বকপোলসঞ্জাত কল্পনা মিশাইয়া এক মিশ্র-উপাদানের নাটক রচনা করিতে লাগিলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেই রচনার পথ প্রদর্শক। অবশ্য মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী'তে ইহার সূচনা। কিন্তু 'কৃষ্ণকুমারী' ও 'অশ্রুমতী'র উপাদান-বিন্যাসের মধ্যে পার্থক্য আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও মধুসূদন উভয়ের রচনায় কল্পিত গৌণকাহিনীই প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। 'কৃষ্ণকুমারী'তে কৃষ্ণা-কাহিনীর চেয়ে ধনদাস-বিলাসবতী-মদনিকা প্রসঙ্গ বেশী স্থান অধিকার করিয়াছে, এবং অশ্রুমতীতেও নাট্যকাহিনীর প্রধান অংশ জুড়িয়া বসিয়াছে সেলিম-অশ্রুমতীর প্রেমের প্রসঙ্গ। নাট্যকারের উদ্দেশ্যও তাহাই ছিল।—"স্থল বিশেষে ও অবস্থা বিশেষ মানব-প্রকৃতির কিরূপ বিকাশ ও পরিণাম ঘটে, তাহা প্রদর্শন করাই নাটকের মুখ্য তাৎপর্য।" [গ্রন্থকারের কৈফিয়ৎ, ১ম পৃষ্ঠা।] আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিতে পাইব, অশ্রুমতীর মধ্যে যে অংশ খানিকটা নাটকীয় তাহা ঐ সেলিম-অশ্রুমতীর প্রেম-কাহিনী। তবুও রাণা প্রতাপ সিংহের অপূর্ব আত্মমর্যাদাজ্ঞান, বংশগরিমা এবং দেশ-প্রেম নাটকে ঐতিহাসিক বাস্তবতা লইয়া স্থানলাভ করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইতিহাস নাট্য হয় নাই। নাটকটির যেভাবে আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে আমরা উহাকে পূর্ণমাত্রায় ঐতিহাসিক নাটক বলিতে পারিতাম। সোলাপুর হইতে ফিরিবার পথে মানসিংহ রাণা প্রতাপের গৃহে অতিথি হন। তখন অতিথি-সৎকার-প্রসঙ্গে রাণা মানসিংহের যে অপমান করেন, তাহা হইতেই মোগলের সহিত রাণার দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। পরাজিত পলায়নপর রাণা কঠোর দারিদ্র্য বরণ করিয়া লইলেন, তবুও মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিলেন না। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও শত্রু-কবলিত চিতোর দুর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সামন্তদের মোগল-পদানত না হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া এই

স্বদেশ-ভক্ত মহাবীর প্রাণত্যাগ করেন। মান সিংহের আতিথ্য হইতে রাণার দেহত্যাগ পর্যন্ত সমস্ত কাহিনী নাটকে উল্লিখিত হইয়াছে। মান সিংহ যে ফরিদকে দিয়া অশ্রুমতীকে হরণ করাইলেন, অনৈতিহাসিক ঘটনা হইলেও তাহাকে সম্ভাব্য নাট্য-ঘটনা হিসাবে ধরিতে পারিতাম। কারণ রাণা কর্তৃক অপমানিত মান সিংহের প্রতিশোধ-বাসনা হইত এই নাটকের বীজ। মান সিংহ মোগলের সহিত ভগিনীর বিবাহ দিয়াছেন বলিয়া যে রাণা তাঁহাকে অপমানিত করিয়াছেন, সেই রাণার চরম অপমান হয় যদি তাঁহার কন্যাকে একজন অতি সামান্য মুসলমান সৈনিকের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া যায়। শক্ত সিংহ ও পৃথ্বীরাজ অশ্রুমতীর বিবাহের যে ব্যবস্থা করিতেছে তাহাও রাণার মর্যাদা রক্ষার জন্য। রাণা প্রতাপ সিংহের জীবন-কাহিনী যথাযোগ্য নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়া নাটকখানির ভিতর যদি রূপায়িত হইত তাহা হইলে তাহারই প্রয়োজনে সেলিম-অশ্রুমতী প্রেম-কাহিনীর এই কল্পিত উপাখ্যান নাটকের মধ্যে যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিতে পারিত। আর সেই নাট্যের নায়ক হইতেন রাণা প্রতাপ সিংহ। মান সিংহের অপমান দিয়া নাটকের আরম্ভ হইত, আর মৃত্যুর অব্যবহিতপূর্ব মুহূর্তে অশ্রুমতীকে সন্ন্যাস গ্রহণ করাইয়া রাণা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেন। নাটকে গল্পটি সেইভাবে সাজানো হইলেও কাহিনীর যে অংশ নাটকীয় হইয়াছে তাহা ইতিহাস নহে —প্রেম-রোমান্স। রাণার চরিত্রের ঘটনাগুলি সকলই নাটকে স্থান লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহার বেশীর ভাগই কর্মহীন বিবৃতি মাত্র। পরিস্থিতির সহিত অন্তর্নিহিত বৃত্তি-প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া ঘটনাগুলির সৃষ্টি হয় নাই। প্রমাণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, নাটকের প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কে, রাণার চরিত্রের নাটকীয় বিকাশ হইয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে টড্‌-বর্ণিত কাহিনীটিকেই পাত্র-পাত্রীর মুখ দিয়া বলানো হইয়াছে মাত্র। রাণা প্রতাপ হিন্দু। শ্রীরামচন্দ্রের বংশধর। যে হিন্দু রাজপুত মোগলের ঘরে ভগিনী দান করিয়াছে, তাহার ভোজনের সময় রাণা উপস্থিত থাকিবেন না। কিন্তু তিনি গৃহী। অতিথির যথাযোগ্য সৎকারের জন্য নিজের পুত্রকে তিনি নিযুক্ত করিলেন। মন্ত্রীর সহিত আলাপ প্রসঙ্গে মান সিংহ যে উক্তি করিলেন, তাহার মধ্য দিয়া মান সিংহের অহঙ্কারই শুধু প্রকাশ পায় না; মোগল-শক্তির উপর রাজার নিশ্চিত বিশ্বাসটিও ঐ উক্তির মধ্যে রহিয়াছে।—"যে পক্ষে মোগল-সম্রাট, সে পক্ষ ভিন্ন আর কোন্‌ পক্ষের জয়ের সম্ভাবনা?"

নেপথ্য হইতে রাণা প্রতাপ ইহা শুনিয়াছেন। পূর্ব হইতেই তিনি মান সিংহের উপর বিরক্ত। এই দম্ভোক্তি তাঁহাকে আরও উত্তেজিত করিয়া তুলিল। তিনি আত্মপ্রকাশ করিলেন। মানসিংহের সহিত আর কোনোরূপ ভদ্রতার ছল পর্যন্ত তিনি করিতে চাহিলেন না। তিনি আসিয়া বলিলেন,—"মিথ্যা ছলের প্রয়োজন নাই—মহারাজ মান সিংহ। মার্জনা করবেন। যে রাজপুত আপনার ভগিনীকে তুর্কের হস্তে সমর্পণ করেছে, যে বোধ হয় এমন কি তুর্কের সহিত একত্র ভোজন করেছে, তার সহিত সূর্য-বংশীয় রাণা একত্র কখনই আহার স্থানে উপবেশন করতে পারে না।" মানসিংহ এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রস্থান করিলেন। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে প্রতাপের উক্তির মধ্য দিয়া তাঁহার দেশপ্রেম, কঠোর প্রতিজ্ঞা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রকাশ হয় বটে, কিন্তু এই উক্তিগুলির পশ্চাতে অন্তরের বৃত্তি-প্রবৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাত স্পষ্ট নহে। প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্কে প্রতাপ-শক্তের বিরোধ এবং শক্তের মোগলের সহিত যোগদানের ব্যাপারটিকে দুইজন গ্রাম্য ভদ্রলোকের আলাপের মধ্য দিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই নীরস বর্ণনাটির নাটকীয় প্রয়োজন কিছুই নাই। ইহা মূল কাহিনীকে কোনোদিক দিয়াই সাহায্য করে না। মধু-দীনবন্ধুর নাটক আলোচনাকালে দেখিয়াছি, শোকের ভাষা, দুঃখের ভাষা, অনুতাপের ভাষা প্রভৃতিতে যাত্রার কর্মহীন উচ্ছ্বাস অবাধে প্রবাহিত হইয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের রচনা তাহা হইতে মুক্ত নহে। আর যাত্রার এই কর্মহীন দীর্ঘ বক্তৃতাগুলিই প্রতাপ-চরিত্র বিকাশে প্রধান বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথম অঙ্ক. পঞ্চম গর্ভাঙ্কে রাণা প্রতাপসিংহকে চিতোরের অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া দুঃখ করিতে দেখা যাইতেছে। কিন্তু সেই দুঃখ অতিক্রম করার জন্য শক্তিমান রাণার কর্মপ্রচেষ্টার কোনো ইঙ্গিতও আমরা নাটকে পাই না। এই দৃশ্যে নাটকের নাম-ভূমিকা অশ্রুমতীর উল্লেখ পাইলাম। রাণা-মহিষী নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই অশ্রুমতীর বিবাহের কথা উত্থাপন করেন। মহিষীর উক্তিতে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের ভীমসেন-মহিষীর উক্তির প্রতিধ্বনি মাত্র শুনা যায়। মহিষী কর্তৃক এই প্রসঙ্গে পৃথ্বীরাজের উল্লেখ লক্ষ্য করিবার মতো। পৃথ্বীরাজের নাম আমরা ইহার পূর্বে কখনও পাই নাই। পরবর্তী-কালে পৃথ্বীরাজের সহিত অশ্রুমতীর বিবাহের প্রস্তাব চলিবে। নাট্যকার পূর্ব হইতে তাহার জন্য পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিলেন মাত্র। নহিলে এই

উল্লেখের কোনো নাটকীয় প্রয়োজনীয়তা নাই। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ তাঁহার অনেক নাটকে এই শৈলীর অনুবর্তন করিয়াছেন। তারপর সপ্তম গর্ভাঙ্কে যখন হল্‌দিঘাটের যুদ্ধ আসিয়া পড়িল রাণা তখন হঠাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এই যুদ্ধব্যাপারে রাণার কোনো অন্তর্দ্বন্দ্ব বা বহির্দ্বন্দ্বের অবকাশ ঘটিল না, রাণার সমরায়োজনের কোনো উল্লেখ নাই। অতি সংক্ষেপে যুদ্ধ ঘটিয়া গেল। রাণা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। আবার কোনো কারণে শক্ত সিংহের মতি-পরিবর্তন হইল, কেন তিনি প্রতাপকে রক্ষা করিতে ছুটিলেন, তাহার কোনো কিছুই নাট্যকার উল্লেখ করিলেন না। প্রতাপ-শক্তের সাক্ষাৎকারে প্রতাপসিংহের বিস্ময়, হর্ষ প্রভৃতি কিছুই উপস্থিত হইল না। প্রতাপ বলিয়া উঠিলেন, "কৈ শক্ত, তোমার প্রতিশোধ কৈ ?" এই সংলাপ অবাস্তব। তারপর হঠাৎ প্রতাপসিংহ শক্তকে আলিঙ্গন করিলেন। ইহার মধ্যে বহুদিনের ভ্রাতৃ-বিরোধের অবসানজনিত হর্ষ-বিষাদের কোনো মানসিক আন্দোলনই নাই। টডের রাজস্থানে প্রতাপ-জীবনের যে কাহিনী আছে, নাট্যকার তাহারই উল্লেখ করিতেছেন মাত্র। ইহার ভিতর হৃদয়ের স্পন্দন এবং জীবনের উত্তাপ কিছুই নাই। ইতিহাসের মৃত কাহিনী তাই নাটকে জীবন্ত হয় নাই। দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কে রাণা ও রাণা-মহিষীর দুঃখপূর্ণ উক্তি ব্রজমোহনের যাত্রার সংলাপের মতো। উহা আমাদিগকে দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণের নবীনমাধব ও তাহার স্ত্রীর অলঙ্কার-বিক্রয়-বিষয়ক করুণ উক্তিগুলি স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহা যাত্রারই প্রভাব। এই দৃশ্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ফরিদ-কর্তৃক অশ্রুমতী হরণ। এখান হইতেই নাটকের কর্মপ্রবাহ অন্তধারায় প্রবাহিত হইল। কিন্তু রাণা প্রতাপসিংহের আশ্রয়স্থল হইতে দুই-চারিজন সৈনিক সমভিব্যাহারে ফরিদ খাঁ কর্তৃক খাটিয়ায় শায়িতা অশ্রুমতীকে হরণ শুধু অসম্ভব নয়,—অবাস্তব। নাট্য-ঘটনা এই অংশে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। ইতিহাস বলে, দুর্ভাগ্য, পরাজয়, অনাহার প্রভৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াও রাণা প্রতাপ হতোদ্যম হন নাই। কিন্তু একদিন রাণার কন্যার একখানা ঘাসের রুটি বন-বিড়ালী কাড়িয়া লইয়া গেলে কন্যাটি কাঁদিয়া আকুল হয়। দারিদ্র্য বা দুঃসহ কষ্ট রাণাকে অভিভূত করিতে পারে নাই। পিতৃস্নেহ সেইদিন রাণাকে দুর্বল করিয়া ফেলিল। রাণা আকবরের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিলেন। তখন বিকানীরের রাজপুত্র পৃথ্বীরাজ রাণার তন্দ্রিত উৎসাহকে জাগ্রত করিবার জন্য একখানা পত্র লিখিলেন। পত্র

পাঠ করিয়া রাণা উৎসাহ ফিরিয়া পাইলেন বটে, কিন্তু অর্থের জন্য চিন্তিত হইলেন। তখন মন্ত্রী ভামা শাহ (ভীম শাহ) তাঁহার পূর্বপুরুষের সঞ্চিত অর্থ দেশরক্ষার জন্য রাণাকে দান করিলেন। অশ্রুমতী তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কে পৃথ্বীরাজের পত্র আছে, ভীম শাহের অর্থদান আছে, কিন্তু পূর্বোল্লিখিত ঐতিহাসিক পটভূমিকা নাই। রাণার কর্মময় জীবনের কোনো পরিচয় নাটকের কোথাও আমরা পাইলাম না। হঠাৎ পঞ্চম অঙ্কে, প্রথম গর্ভাঙ্কে রাণাকে মৃত্যু-শয্যায় শায়িত দেখিলাম। সুতরাং অশ্রুমতী নাটকে ঐতিহাসিক কাহিনী থাকিলেও তাহা নাটকীয় হইয়া ওঠে নাই। সেইজন্য ইহাকে ঐতিহাসিক নাটক বলিতে পারি না।

'অশ্রুমতী' পুরাপুরি একখানা রোমান্‌স্। মান সিংহের ষড়যন্ত্রের ফলে অশ্রুমতীর প্রসঙ্গে নাটকের পাত্র-পাত্রী তিন অংশে বিভক্ত হইয়া নাট্য-কাহিনীকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। ফরিদ ও মান সিংহের ষড়যন্ত্র একদিকে যে ঘটনা ঘটাইয়া তুলিয়াছিল, তাহার মধ্যে নিতান্ত অবাঞ্ছিত ভাবেই যেন যুবরাজ সেলিমের আগমন হইল। এখন সেলিমের হাত হইতে অশ্রুমতীকে রক্ষা করিবার জন্য এবং তাহার দ্বারা প্রতাপের সম্মান বাড়াইবার জন্য পৃথ্বীরাজ ও সেলিম আসিয়া জুটিলেন। এই ত্রিধা বিভক্ত দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া নাট্যকাহিনী কর্ম-চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এই অংশে চরিত্র-চিত্রণও অনেক সুন্দর হইয়াছে। প্রথমেই ধরা যাক, মান সিংহের চরিত্র। মান সিংহই প্রকৃতপক্ষে এই নাট্যকাহিনীর স্রষ্টা। সোলাপুর হইতে ফিরিবার পথে মান সিংহ প্রতাপের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতে গিয়া অপমানিত হইয়া আসিয়াছেন। সেই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি বাদশাহকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়া মেবার-অভিযানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রতাপকে রাজ্যচ্যুত করিলেই তাহাকে অপমানিত করা হইল না। মান সিংহের অভিপ্রায়,—"আমাদের কন্যা ভগিনী তো দিল্লীর সম্রাটকে দিয়েছি—আমি যদি পারি তো ওর কন্যাকে একজন সামান্য মুসল-মানের হস্তে দিয়ে রাণার উন্নত মস্তক অবনত করব।" [প্রথম অঙ্ক, ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।] মান সিংহের কৌশলে অশ্রুমতী অপহৃতা হইল। কিন্তু এই অপহরণের কথা যদি গোপন থাকে, তাহা হইলে মান সিংহের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। মান সিংহ ফরিদকে বলিলেন,—"কিন্তু দ্যাখ রীতিমতো বিবাহ করতে হবে।" কিন্তু মান সিংহের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে বাধা পড়িল। নিদ্রোত্থিতা অশ্রুমতী আর্তনাদ

করিয়া উঠিলে হঠাৎ যুবরাজ সেলিম সেখানে আগমন করিলেন। ফরিদের মুখে শুনিলেন, মান সিংহের আদেশেই অশ্রুমতী অপহৃতা হইয়াছে। সেলিম মান সিংহকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মান সিংহ যে ভাষায় ইহার উত্তর দিলেন তাহা সঙ্গত হয় নাই। প্রথম উক্তিতেই সেলিমকে আক্রমণ করা এবং অকারণ অহঙ্কার-বশতঃ সাহজাদাকে নিজের মূল্য স্মরণ করাইয়া দেওয়া মান সিংহের ন্যায় বয়স্ক বিচক্ষণ সেনাপতির শোভা পায় নাই। নাট্যকার এইখানে মান সিংহ-চরিত্র দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছেন। তারপর আত্ম-দোষ ক্ষালনের জন্য মান সিংহ বলিতেছেন, বাদশাহের আদেশে তিনি অশ্রুমতীকে হরণ করিয়াছেন। সেলিম বুদ্ধিমানের মতো উত্তর করিলেন, "আচ্ছা তাঁর যদি এই আদেশ হয় তো আমি তাঁর বিরুদ্ধাচারী হতে চাইনে। আচ্ছা এঁর রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমি স্বয়ং নিলেম।" কিন্তু বাদশাহ আদৌ এমন আদেশ করিয়াছিলেন কিনা পরে কখনও তাহার অনুসন্ধান করা হয় নাই। বুদ্ধিমান মান সিংহ কিন্তু একেবারে হতাশ হইলেন না। "অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ"—মান সিংহ ভাবিলেন,—"ফরিদের সঙ্গে বিবাহটা ঘটিয়ে দিতে পারতেম তা হলেই চূড়ান্ত হত—কিন্তু তাও যদি না হয়—শাহাজাদা সেলিমের সঙ্গে বিবাহ ঘটিলেও আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে—শা'জাদা আপনি রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়েছেন সে ভালই হয়েছে—রূপাই প্রেমের পূর্বসূত্র।"

—[দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।]

অশ্রুমতী সেলিমের হাতে পড়িলে মান সিংহের কাজ ফুরাইল। নাটকে মান সিংহের স্থান অল্প। কিন্তু প্রয়োজনীয়তা কম নহে। এই সামান্য পরিসরে ষড়যন্ত্রী চরিত্র হিসাবে মান সিংহ-চরিত্র ভালই ফুটিয়াছে। অবশ্য এ-মান সিংহ ঐতিহাসিক চরিত্র নহেন।

এইবার নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের সূচনা—সেলিম-অশ্রুমতীর প্রেম। নাট্যকারের মূল বক্তব্য হইল এই যে, যে নারীর মনে পারিবারিক শিক্ষা-দীক্ষা বা কৌলিক সংস্কৃতির কোনো ছাপ পড়ে নাই, মুক্ত প্রকৃতির কোলে যে মানুষ হইয়াছে, যুবা-পুরুষের সহিত সংস্পর্শের ফলে সে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে। ইহা নর-নারীর স্বাভাবিক যৌন আকর্ষণেরই ফল। আর ইহা ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি সংস্কার-নিরপেক্ষ। নাট্যকার সেলিম-অশ্রুমতীর প্রেমের মধ্য দিয়া এই সত্যই রূপায়িত করিয়াছেন। অশ্রুমতীকে আমরা দেখিলাম ভীল-পালিতা অসংস্কৃতা কন্যারূপে। রাণা

প্রতাপ রাজ-মহিষীকে বলিতেছেন,—"মহিষী, তুমি ওকে ভাল করে শিখিও যে সব কবিদের গাথাতে রাজপুত বীরত্বের গুণকীর্তন ও মুসলমানদের নিন্দাবাদ আছে, সেই সব গাথা ওর কণ্ঠস্থ করিয়ে দিও।" পিতার এই কথা শুনিয়া অশ্রুমতী জিজ্ঞাসা করিল,—"মুসলমান কারা বাবা?" অর্থাৎ এই ভীল-পালিতা কন্যাটি মানুষকে শুধু মানুষ হিসাবেই জানে, হিন্দু-মুসলমান-ভেদে পৃথক করিয়া দেখিতে শিখে নাই। যুবতী-জনোচিত বয়োধর্ম মাঝে মাঝে তাহার মনকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। কিন্তু ইহা যে প্রেম অর্থাৎ অচেতন মনের পুরুষ-প্রার্থনা, তাহা সে বুঝিতে পারে না।—"মনটা এক এক সময়ে কি রকম হয় তা ভাই—তা ভাই তোমাকে বোঝাতে পাচ্চিনে"—। মলিনা যখন ইহাকে ভালবাসা বা মনের মানুষের অভাব বলিয়া পরিচয় দেয়, তখনও অশ্রুমতী কিন্তু ভালবাসা বা ভালবাসার পাত্র কিছুই চিনে না। এই অবস্থায় সেলিমের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। নিদ্রাভঙ্গের পর ফরিদকে দেখিয়া অশ্রুমতী যখন ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিয়াছে, তখন তাহাকে রক্ষা করিবার জন্যই সেলিম আসিলেন। নর-নারীর মধ্যে যে সম্ভ্রম বা সঙ্কোচের প্রশ্ন থাকে, অশ্রুমতী তাহা জানে না। সেলিমকে সে যে কাছে আসিয়া বসিতে বলিল তাহা প্রেমে নহে—ফরিদের নিকট হইতে আত্মরক্ষার জন্য। —"তুমি কাছে থাকিলে ও আমাকে আর কিছু বলতে পারবে না।" এই প্রথম সাক্ষাতে সেলিমের প্রতি অশ্রুমতীর নারী-হৃদয়ের আকর্ষণ-বিকর্ষণেরও কোনো পরিচয় নাই। সেলিমকে সে বলিতেছে—"আমাকে আমার বাপ-মায়ের কাছে নিয়ে যাও"। কিন্তু তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে দেখিতেছি, প্রেম জমিয়া উঠিয়াছে। কৃতজ্ঞতার সূত্র ধরিয়া প্রেমের আবির্ভাব হয় এই সত্য অশ্রুমতীর জীবনে রূপায়িত হইয়াছে। মলিনার প্রশ্নের উত্তরে অশ্রুমতী বলিতেছে—"তিনি আমাকে ভাই যত্ন করেন,—আমি তাঁকে একটু ভালবাসতেও পারব না?" এই প্রেম-রোমান্সের কাহিনীবিন্যাস মন্দ নয়। কিন্তু সংলাপে যাত্রার উচ্ছ্বাসময়ী দীর্ঘ উক্তি-প্রত্যুক্তির শৈলী অনুকৃত হওয়ায় উহা অস্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে।

সেলিমের সহিত অশ্রুমতীর বিবাহ হইলে প্রতাপের চরম অবমাননা হয়। তাই উহাদের মিলনের পথে আসিয়া পড়িলেন শক্ত সিংহ ও পৃথ্বীরাজ। পূর্বেই আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, শক্ত-চরিত্র অবিকশিত। কিন্তু এই অংশে শক্ত সিংহ কাজের লোক। তাই সে কম কথা কহে। তাহার উক্তিগুলির

মধ্যে অকারণ উচ্ছ্বাস নাই। শক্ত-চরিত্র-চিত্রণে নাট্যকার বাক্-সংযমের পরিচয় অনেকখানি দিয়াছেন। তাই ভাষা এখানে যাত্রার বিবৃতিমূলকত্ব পরিত্যাগ করিয়া নাটকীয় সংলাপের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। ইহা ছাড়া অন্যান্য প্রধান চরিত্র,—যথা সেলিম, অশ্রুমতী, পৃথ্বীরাজ ও মলিনা—যাত্রার প্রভাবে অভিভূত হইয়া রহিয়াছে। ইহাদের চরিত্রে যাত্রার প্রধান লক্ষণ হইল স্থূলভাবে, উচ্ছ্বাসের ভাষায়, সামান্য উত্তেজনায় ভাবাবেগের প্রকাশ। সেলিম-চরিত্রে শাহাজাদা-জনোচিত গাম্ভীর্যের অভাব। অশ্রুমতীর প্রতি প্রেম-প্রকাশে তাহার ভাষা সংযম হারাইয়া ফেলে। পৃথ্বীরাজের প্রতি সন্দেহ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার কারাদণ্ডের আদেশ করেন। এখানে হয় তো বলা যাইতে পারে যে, প্রেম মানুষকে মোহগ্রস্ত করে, প্রেম আহত হইলে ক্রোধের সৃষ্টি হয় এবং অবিমৃষ্যকারিতা ক্রোধের সহচরী। সুতরাং সেলিম-চরিত্র অস্বাভাবিক হয় নাই। কিন্তু প্রতিনায়ক পৃথ্বীরাজ-চরিত্রে পরিস্থিতি তাহাকে অশ্রুমতীকে বিবাহ করিতে বাধ্য করিতেছে। মলিনাকে সে কিছুতেই বিবাহ না করিয়া পারিবে না বলিয়াই শক্তের প্রভাবে পৃথ্বীরাজ সম্মত হইতে পারিতেছিল না। হঠাৎ অশ্রুমতীকে দর্শন করিবার পর সে মলিনাকে একেবারে ভুলিয়া গেল। দুই নায়িকার প্রেমের দ্বন্দ্বে পড়িয়া পৃথ্বীরাজের হৃদয় এতটুকুও আন্দোলিত হইল না। ইহা অসম্ভব। মলিনার চরিত্রে যাত্রার প্রভাব সবচেয়ে বেশী। যাত্রার বিরহিণী নায়িকার দীর্ঘ বিলাপোক্তি এবং বেদনা-বিধুর সঙ্গীতে মলিনার ভূমিকা পরিপূর্ণ।

একটি চরিত্র এই নাটকে সঙ্গতি ও বাস্তবতার দাবী করিতে পারে। ইহা ফরিদের চরিত্র। নাটকে ইহা একমাত্র চরিত্র যাহার ভিতর চলমানতা আছে, অর্থাৎ পরিস্থিতির ঘাত-প্রতিঘাতে চরিত্রটি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। শেক্‌স্পীয়ারের ওথেলো নাটকের ইয়াগোর অনুকরণে নাট্যকার এই চরিত্রটি সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন। ফরিদ নাটকে সবচেয়ে সক্রিয় চরিত্র। তাহার শয়তানি বুদ্ধিই নাটকের বিষাদান্ত পরিণতির সৃষ্টি করিয়াছে। এই কর্মময়, উচ্ছ্বাসহীন, কূট-চক্রী চরিত্রটির উপর যাত্রার প্রভাব একটুও নাই।

উপসংহারে আমরা বলিতে পারি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্য-শৈলী মধু-দীনবন্ধুর শৈলীকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। চরিত্র-চিত্রণে তিনি মধুসূদনের এবং সংলাপ সৃষ্টিতে যাত্রা ও মধু-দীনবন্ধুর প্রভাব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ইতিহাসাশ্রিত রোমান্‌সের মধ্যে দেশপ্রেমের স্থান করিয়া

দিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে দেশপ্রেম-মূলক সঙ্গীতগুলি একটা বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। তাহার সূচনা করিয়াছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। 'স্বপ্নময়ী' নাটকে স্বপ্নময়ীর দেশপ্রেমমূলক সঙ্গীত দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গানের পথ-প্রদর্শক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইতিহাসের কাহিনী অনুসরণ করিয়াও তাহা নাটকীয় করিয়া তুলিতে পারেন নাই। কল্পনার স্রোতে ইতিহাস ভাসিয়া গিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে কল্পনার অবাধ প্রবেশ মাঝে মাঝে হইয়াছে বটে, তবে ইতিহাসের মহিমা খর্ব হয় নাই। সংলাপের মধ্যে যাত্রার উচ্ছ্বাসময়তার সঙ্গে নাটকীয় কর্মসঙ্ঘাত ও চরিত্র-সৃষ্টির কৌশল মিলাইয়া ইতিহাস ও কল্পনার মিশ্রণে এক বিশেষ ধরনের নাট্য-সাহিত্যের সৃষ্টি করিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। ক্ষীরোদপ্রসাদ পর্যন্ত ঐতিহাসিক নাটকের বিবর্তনের ধারা চলিয়াছে।

বাংলা নাট্য-সাহিত্যে মোটামুটি ভাবে খাঁটি ইতিহাস অবলম্বনে নাটক সৃষ্টি করিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তাঁহার উপরও যাত্রার প্রভাব কম নহে। কল্পনার আশ্রয় তিনিও কম গ্রহণ করেন নাই। তবুও তাঁহার নাটকে ইতিহাস মোটামুটিভাবে ঠিক আছে। 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের আলোচনা করিয়া বক্তব্যটি পরিষ্কার করিতেছি।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের লিখিত 'সিরাজউদ্দৌলা' এই নাটকখানির অবলম্বন। নাট্যকার বিশ্বস্তভাবে ঐতিহাসিক কাহিনীর অনুসরণ করিয়াছেন। মীরজাফর, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ, জগৎশেঠের ষড়যন্ত্র, নন্দকুমার, মানিকচাঁদের বিশ্বাসঘাতকতা, ইংরেজদের ধূর্ততা, অসহায় নবাবের ধর্ম-বিশ্বাস এবং ক্ষমাগুণ প্রভৃতি মিলিয়া বাংলার ভাগ্যাকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। ফল—সিরাজউদ্দৌলার শোচনীয় অকালমৃত্যু। প্রতিটি ঘটনাই এই নাটকে ঐতিহাসিক বাস্তবতায় মূর্তি লাভ করিয়াছে। নাট্যকার কোথায়ও ইতিহাসকে অসংযতভাবে বিকৃত করে নাই। নাটকের দুইটি মাত্র চরিত্র করিম চাচা ও জহরা নাট্যকারের কল্পনা-প্রসূত। এই চরিত্র দুইটির ঐতিহাসিকতা লইয়া আলোচনা হইতে পারে, সে বিষয়ে নাট্যকার সচেতন ছিলেন। করিম চাচা জহরাকে বলিতেছেন—"ভ্যালা মোর চাচী, খুব কারখানা দেখালে! তোমার অতটা না করলেও চলতো। এই রাজা-রাজড়া আমির-ওমরাও আর ঘসেটী বেগম হতেই কাজ রফা হতো। এত করেও ইতিহাসে স্থান পেলে না চাচী, নাটক আর গল্পের কেতাবেই শোভা

পাবে!"—[পঞ্চম অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।] চরিত্র দুইটি যে অনৈতিহাসিক ও অপ্রয়োজনীয় তাহা নাট্যকারের নিজের উক্তি হইতেই প্রমাণিত হয়। করিম চাচার মধ্য দিয়া নাট্যকার নিজেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন এবং জহরার চরিত্র নাটকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব নষ্ট করিয়াছে। আর একটি চরিত্র ফকির দানশা। দানশা নামটি ঐতিহাসিক। এই চরিত্র চিত্রণে গিরিশচন্দ্র অক্ষয়কুমারকে অনুসরণ না করিলেও ইহা অনৈতিহাসিক নহে। "ইংরাজেরা বলেন, সিরাজউদ্দৌলা সম্পদের দিনে দানশা-নামক মুসলমান ফকিরের নাসা-কর্ণ ছেদন করিয়া দিয়াছিলেন, বিপদের দিনে প্রতিহিংসা-পরায়ণ দানশা তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়াছিলেন।.........আমাদের নিকট ইহার কোন সিদ্ধান্তই সত্য বলিয়া বোধ হয় না। সিরাজ যেরূপ মুসলমানধর্মানুরাগী ছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে দানশার ন্যায় একজন বিখ্যাত মুসলমান সাধুর নাসাকর্ণ ছেদ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমরা দানশার সমাধি-মন্দিরের ফলক-লিপির সাহায্যে এবং তাঁহার বংশধরদিগের নিকট প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া জ্ঞাত হইয়াছি যে, দানশা আদৌ সে সময়ে জীবিত ছিলেন না।"—[সিরাজউদ্দৌলা, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ৩৪৪ পৃষ্ঠা, দশম সংস্করণ।] গিরিশচন্দ্র ইংরাজ লিখিত ইতিহাস স্বীকার করিলেও দানশাকে মোটামুটি ঐতিহাসিক চরিত্র বলিয়া ধরিলে খুব অন্যায় হয় না। কিন্তু ফকিরটিকে পূর্ববঙ্গের বাঙ্গাল সাজাইয়া নাট্যকার চরিত্রটি লঘু করিয়া ফেলিয়াছেন।

'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে ইতিহাস যতখানি বাস্তবভাবে অনুসৃত হইয়াছে, মধুসূদন হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ পর্যন্ত আর কাহারও রচনায় এতখানি হয় নাই। কিন্তু ইতিহাস নাটক হয় নাই,—নীরস বিবৃতি মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। 'অশ্রুমতী' নাটকের ঐতিহাসিক অংশের রূপায়ণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যাহা করিয়াছেন, 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে গিরিশচন্দ্র তাহা হইতে বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। নাটকের নাম-ভূমিকা এবং নায়ক-চরিত্র সিরাজউদ্দৌলা মোটেই প্রস্ফুটিত নহে। মীরজাফর, জগৎশেঠ প্রভৃতির ষড়যন্ত্রের ঘটনাগুলির প্রায় সবই যবনিকার অন্তরালে রাখা হইয়াছে। সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া লম্পট মত্তপ সওকৎ জঙ্গকে নবাব করিয়া স্বার্থপর সামন্ত, বণিক, সেনাপতির দল যে নিশ্চিন্তচিত্তে নিজেদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিবে, এতবড় একটা ব্যাপার নামমাত্র উল্লেখের দ্বারা নাট্যকার সারিয়া দিয়াছেন। ফলে সওকৎ জঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে মীরজাফরাদির

অনিচ্ছা-প্রকাশ বা বিদ্রোহ নাটকে আকস্মিকভাবে আসিয়া যায়। ইংরেজদের সহিত নবাবের সঙ্ঘর্ষের ইতিহাসেও এই আকস্মিকতা নাটকে স্থানলাভ করিয়াছে। প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্কে বন্দী ওয়াট্‌সের মুক্তির প্রসঙ্গ পাইতেছি। কিন্তু কবে, কেন, কিভাবে ওয়াট্‌স্‌ বন্দী হইল, তাহার উল্লেখ নাই। এইরূপ ভাবে বহু ঘটনা যবনিকার অন্তরালে রাখিয়া শুধু উল্লেখের দ্বারা নাট্যকার সারিয়া দিয়াছেন। ফলে এই বিরাটকলেবর নাটকখানিতে ঘটনার স্রোত চলিলেও তাহা নাটকীয় সঙ্ঘাতের মধ্য দিয়া জমাট বাঁধিয়া ওঠে নাই। আর ইহার জন্য চরিত্রবিকাশে বাধা হইয়াছে। সিরাজ যেমন ক্রোধ-প্রবণ তেমনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। কিন্তু তিনি বিশ্বাসী মুসলমান, সাহসী সেনাপতি ও ধূর্ত রাজনীতিক। বিরুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে পড়িয়া তিনি বহুবার আত্ম-সংযমের পরিচয় দিয়াছেন, ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য ও কর্ম জানিতে পারিয়াও তাহার প্রতিকার করিতে পারেন নাই। ইংরেজদের ধ্বংস করিবার বা শাস্তি দিবার বহু অবকাশ জুটিলেও তিনি পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হইয়া তাহাদের সহিত সন্ধি করিয়াছেন। ইহা তাঁহার নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক নহে; সিরাজ বালক হইলেও ধূর্ত রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ; এই ঘটনাগুলি তাহারই প্রমাণ। নাটকের ঘটনার এই বহির্দ্বন্দ্ব অবলম্বন করিয়া সিরাজ-চরিত্রে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইতে পারিত। নাট্যকার সে সুযোগ একেবারেই গ্রহণ করেন নাই। আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত ঢিমে-তেতালা তালে কাহিনীগুলি ছুটিয়া চলিয়াছে মাত্র। সিরাজ-চরিত্রের যেমন কোনো বিকাশ নাই, তেমনি তাঁহার প্রতিপক্ষ মীরজাফর, জগৎশেঠ প্রভৃতির চরিত্রেরও কোনো ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য এই নাটকে ফুটিয়া ওঠে নাই। জহুরার মতো একটি অস্বাভাবিক, অসংযত চরিত্র সৃষ্টি করিয়া নাট্যকার ঐতিহাসিক কাহিনীকে রূপকথার পর্যায়ে নামাইয়া ফেলিয়াছেন। প্রতিহিংসাময়ী এই চরিত্রটি ঝড়ো হাওয়ার মতো উদ্দাম গতিবেগে যেখানে সেখানে যখন তখন প্রবেশ করিতেছে। যে নারীকে নিতান্ত আকস্মিকভাবে ঘসেটী-বেগমের অন্তঃপুরে দেখা গেল, সেই নারী যখন সিরাজের ভবনে তারার ছবি রাখিয়া আসে, তখন কেহ তাহাকে সন্দেহ করে না। সিরাজউদ্দৌলার অন্তঃপুরে সে বিনা বাধায় প্রবেশ করিতে পারে। ইংরেজ শিবিরে গুপ্ত ষড়যন্ত্রে আকস্মিকভাবে উপস্থিত হইয়া মন্ত্রণা দান করে একটি অপরিচিতা উন্মাদিনী। তাহার শিবির প্রবেশের

অসম্ভাব্যতাও নাট্যকার ভুলিয়া যান। যাত্রার প্রভাবে চমক সৃষ্টি করিতে গিয়া নাট্যকার নাটকের ঐতিহাসিক মর্যাদা একেবারে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। করিমচাচা চরিত্রটি সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার মতো নহে। দ্বিজেন্দ্রলালের বহু নাটকে এই ধরনের একটি চরিত্র দেখা যায়। হাস্যরসিকতার মধ্য দিয়া সে নাট্যকাহিনীর বা নাট্যোল্লিখিত পাত্র-পাত্রীর চরিত্রের ব্যাখ্যা করে। সে সমালোচকের প্রতিনিধি-স্থানীয়। সিরাজ-চরিত্রের উদারতার মধ্যেও যে দৌর্বল্য ছিল এবং ষড়যন্ত্রকারীদের চরিত্র যে মনুষ্যত্ববর্জিত, এসব কথা করিমচাচা বারে বারেই উল্লেখ করিয়াছে। কিন্তু চরিত্রটির সৃষ্টিতে আভ্যন্তরীণ সঙ্গতি নাই। তাহার রসিক্‌তা পরিবেশের যথাযোগ্যতা মানিয়া চলে না। সিনফ্রেঁর সহিত নবাবের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় করিমচাচা অংশ গ্রহণ করায় পরিস্থিতির গাম্ভীর্য নষ্ট হইয়াছে। তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে জগৎশেঠের বৈঠকখানায় ষড়যন্ত্র-কারীদের গোপন আলোচনায় নবাবভক্ত করিমচাচার উপস্থিতি কি করিয়া সম্ভব হইল? এবং তাহার উপস্থিতিতে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে এতটুকুও বাধা পড়িল না?

প্রতিপক্ষ ইংরেজ-গোষ্ঠীর চরিত্র-চিত্রণে নাট্যকার দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। ইংরাজের স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রীতি, ওয়াট্‌স্‌, ক্লাইভ প্রভৃতির ছলনাপূর্ণ আচরণ এবং বাক্যাবলী, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। তাহার প্রধান কারণ এই যে, নাটকের এই অংশেই শুধু নাট্যকার সার্থক সংলাপ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। সামরিক ইংরেজ মিতভাষী, মুখের কথা সম্পূর্ণ বাহির হইতে না হইতেই তাহারা তাহা কার্যে পরিণত করে। দেশী লোকের সঙ্গে ইংরেজী বাক্যবিন্যাসরীতিতে গুরু-চণ্ডালী বাংলায় কথা বলিতে বলিতে তাহারা বাক্যের আবেগপূর্ণ স্থলে নিজেদের মাতৃভাষা মিশাইয়া ফেলে। গালাগালির সময় উদ্দিষ্টব্যক্তি বুঝুক, আর না বুঝুক ইংরেজ মাতৃভাষার বিশেষণ প্রয়োগ করিবেই। বিপদের মুখে পড়িয়া কর্মব্যস্ত সাহসী ইংরেজের মুখের ভাষা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হইয়া যায়। সে সংক্ষেপে মনের আবেগ প্রকাশ করে; সংক্ষেপে করে ঘটনার বিবৃতি; যুদ্ধাদির আদেশটিও দেয় পরিষ্কার অথচ সংক্ষিপ্ত ভাষায়। গিরিশচন্দ্র সংলাপ সৃষ্টির মধ্য দিয়া ইংরেজ চরিত্রের এই দিকটি ভাল করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন।

ঐতিহাসিক নাটকে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের সমাবেশ করিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের ন্যায় সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক কাহিনী লইয়া তিনি নাটক রচনা করেন নাই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতো ইতিহাস ও কল্পনার মিশ্রণে তিনি নাটক রচনা করিয়াছেন। তবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হইতে তাঁহার পার্থক্য এই যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে ইতিহাসের স্থান গৌণ, নাট্যকারের কল্পিত কাহিনীই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে তাহার বিপরীতই দেখিতে পাই। মুখ্যস্থান ইতিহাসের, গৌণস্থান কাল্পনিক কাহিনীর। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনায় যে দেশ-প্রেম কেবলমাত্র আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে, দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে তাহা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। যে রাজপুত-ইতিহাস অবলম্বনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা অস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হইল, সেই রাজপুত-ইতিহাস দ্বিজেন্দ্রলালকেও প্রেরণা যোগাইল। সুতরাং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যাহা আরম্ভ করিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল তাহাই পুষ্ট করিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঃ—গিরিশচন্দ্রের ন্যায় বিশুদ্ধ ইতিহাস অবলম্বনে নাটক রচনা অনেক দিনের মধ্যে আর কেহ করিলেন না। দ্বিজেন্দ্রলালের সৃষ্টি ঐতিহাসিক নাটক নহে, ইতিহাসাশ্রিত নাট্য রোমান্‌স্। ক্ষীরোদপ্রসাদ এই ধারারই অনুসরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার রচনায় ইতিহাস সম্ভাব্য বাস্তবতাও হারাইয়া ফেলিল।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যপ্রতিভার আলোচনা করিতে হইলে তাঁহার নাটকের ভাষার আলোচনা করাও প্রয়োজন; ভাষার বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে যাহা বলিয়াছেন তাহা এই,—

> "প্রথমে Shakespeare-এর অনুসরণে blank verse-এ নাটক লিখিতে আরম্ভ করি। তারাবাঈ প্রকাশিত হইবার পরে স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেনকে তাঁহার অনুরোধে এক কপি পাঠাই। তিনি পড়িয়া এই মত প্রকাশ করেন যে এ নূতন ধরনের অমিত্রাক্ষর, মাইকেলের ছন্দোমাধুরী ইহাতে নাই,—এ অমিত্রাক্ষর চলিবে না। সেই সঙ্গে স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদনের দৈববাণী মনে হইল,—যে অমিত্রাক্ষর নাটক এখন চলিতে পারে না। দীর্ঘ বক্তৃতা অমিত্রাক্ষরে চলে। কিন্তু দ্রুত কথোপকথনের কথা ত গদ্যের মত হইতেই হইবে। তদুপরি নাটক অভিনয় করিবার জিনিস। অভিনয়ে ঘটনাগুলি

যত প্রত্যক্ষবৎ হয় ততই ভাল। সেই জন্য উক্তিগুলি যত স্বাভাবিক হয় (ভাষার মর্যাদা রক্ষা করিয়া অবশ্য) ততই শ্রেয়। লোকে কথাবার্তা পদ্যে করে না, গদ্যে করে। অতএব পদ্যে নাটক রচনা করিলে উক্তিগুলি অস্বাভাবিক ঠেকিবেই। এই সকল বিবেচনা করিয়া আমি তখন হইতে নাটকগুলি গদ্যে রচনা করিতে মনস্থ করিলাম।···কিন্তু কবিতায় আমার অত্যধিক আসক্তি থাকায় আমি গদ্যের ভাষাকে কবিতার আসনে বসাইবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারি নাই।"

["আমার নাট্য জীবনের আরম্ভ" (প্রবন্ধ), দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, নাট্য মন্দির, শ্রাবণ, ১৩১৭ সাল, ৫১-৫৩ পৃষ্ঠা।]

অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের অভিযোগ ভিত্তিহীন। শেক্‌স্‌পীয়ার ও গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলিই তাহার প্রমাণ। আসল কথা দ্বিজেন্দ্রলালের অমিত্রাক্ষর সার্থক হয় নাই। উহা প্রায়ই আড়ষ্ট। বাক্যগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং প্রায়ই বিষম মাত্রায় তাহাদের ছেদ পড়ে; তাহার ফলে ভাষার সাবলীলত্ব নষ্ট হইয়া যায়। শ্রুতিমাধুর্যের অভাবে বাক্যগুলি প্রায়ই রুক্ষ বা কর্কশ হয়। তাছাড়া অচ্ছেদ্য বন্ধনের মতো আট-ছয়ের যতিপ্রবণতা এই ছন্দে বিশেষভাবে বজায় থাকায় ইহা একঘেয়ে হইয়া ওঠে। যথা—

"হে বীর | জানিনা আমি | কে তুমি | জানিও···৩+৫+৩+৩
আমায় অন্যায় যুদ্ধে | বধিয়াছ তুমি...৩+৫+৬
জানিও—তুমিও রক্ষা | পাইবে না কভু···৩+৫+৬
রুস্তম আমার পিতা | শুনিবেন যবে···৩+৫+৬
এ হত্যা কাহিনী | "...৬

—'সোরাব রুস্তম' দ্বিতীয় অঙ্ক, অষ্টম দৃশ্য।

অবশ্য কখনও কখনও দ্বিজেন্দ্রলালের অমিত্রাক্ষর সুন্দর ও সাবলীল হইয়াছে। কিন্তু সমগ্র নাট্যের তুলনায় ঐ অংশগুলি নিতান্ত অল্প।—

"যা হবার হইয়াছে—ঘরে ফিরে চল
প্রভু। দীর্ঘ রাত্রিকাল আসিয়া নীরবে
প্রভাত হইয়া গেছে।—তথাপি নিশ্চল।
সে প্রভাত ক্রমে ক্রমে জ্বলিয়া জ্বলিয়া
আবার নিভিয়া গেছে গাঢ় অন্ধকারে।—

তথাপি নিশ্চল। সেই গাঢ় অন্ধকার
এখন ঘেরিয়া, বৃষ্টি, ঝঞ্ঝা ও বিদ্যুৎ
করে পৈশাচিক নৃত্য, সঙ্গে বাদ্য বাজে
ঘন ঘন বজ্রধ্বনি—তথাপি নিশ্চল—
নির্নিমেষে—চেয়ে আছো কেন ?—ফিরে চল।"

রোমাণ্টিক বীর রুস্তমের গভীর শোক ছন্দের ঝঙ্কারে এবং দুর্যোগময়ী প্রকৃতিবর্ণনার মধ্য দিয়া অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে। কিন্তু এই দক্ষতা দ্বিজেন্দ্রলালের অমিত্রাক্ষরে প্রায়শঃ দেখা যায় না।

দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষার যাহা কিছু গৌরব তাহা তাঁহার গদ্য সংলাপের। বিষয়বস্তুর অসঙ্গতি, চরিত্র-চিত্রণের দুর্বলতা, ঘটনাবিন্যাসে যাত্রার আকস্মিকতা প্রভৃতি দোষ দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও তাঁহার নাটক জনপ্রিয় হইয়াছিল।

মঞ্চ-সাফল্যে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের তুলনা হয় না। ইহার একটি কারণ দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা, অন্যটি তাঁহার চিত্তবৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টির ক্ষমতা। দ্বিজেন্দ্রলাল ভাবপ্রবণ বাঙালীর দুর্বলতা জানিতেন। তাই নাটকীয় উপায়ে তিনি আমাদের হৃদয়বৃত্তির আলোড়ন সৃষ্টি করিতেন। তৃতীয়তঃ সঙ্গীত যোজনায় তাঁহার পূর্ব দক্ষতা।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে কাহিনীর গ্রন্থনৈপুণ্যের দোষ আমরা ধরিতে পারি, চরিত্রের আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতিও দেখাইতে পারি। কিন্তু তাঁহার এই দোষগুলির জন্য যাহা তাঁহার নাটকে সত্যকার গুণ, এবং যাহার জন্য তাঁহার নাটক এখনও জনপ্রিয় হইয়া আছে, আর থাকিবেও, তাহার আলোচনা উপেক্ষা করিলে তাঁহার প্রতি সব চেয়ে বেশী অন্যায় করা হইবে।

বাংলা গদ্য সংলাপের ভাষা যে হৃদয়বৃত্তির আলোড়নে উচ্ছ্বসিত কবিতা হইয়া প্রকাশ পাইতে পারে, দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্বে তাহা কেহ দেখাইতে পারেন নাই। মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক ট্রাজেডী। সুতরাং তাহার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের অবকাশ আছে। কিন্তু ভীম সিংহ, কৃষ্ণকুমারী, অহল্যা, কাহারও ভাষায় বিষাদের সুর-নিবিড়তা ফুটিয়া ওঠে নাই। সংস্কৃত নাটকের উপমা-অলঙ্কারের দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়া সে ভাষা একদিকে যেমন বাংলা ভাষার স্বাভাবিকত্ব হারাইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি গতিহীন আবেগের তরল উচ্ছ্বাসে নিষ্প্রাণ হইয়া পড়িয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংলাপ সৃষ্টিতে

মধুসূদনকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। গিরিশচন্দ্রের গদ্য সংলাপ, সহজ-সরল, মনোবিকলনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। মিলনান্ত ও বিয়োগান্ত উভয় ধরনের নাটকে গিরিশচন্দ্রের ভাষা যৌক্তিকতা ও সংযম রক্ষা করে। সুতরাং এক-দিক দিয়া তাহা দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা হইতে নাটকীয়তায় সার্থক। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় অতিনাটকীয় ভঙ্গী যাহা থাকুক না কেন, এ-ভাষার হৃদয়-ভেদী সঙ্গীতোচ্ছ্বাস ইহার আগে কোথাও দেখা যায় নাই।

'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক অবলম্বনে দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা বিশ্লেষণ করা যাক।

দ্বিতীয় দৃশ্য। প্রত্যূষে শ্মশানপ্রান্তে একাকী চাণক্য দাঁড়াইয়া নিজের মনে বলিতেছেন—

> "ঐ জলার উপরে একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। পচা হাড়ের দুর্গন্ধে বাতাসের যেন নিজেরই নিঃশ্বাস আটকে আসছে। ঘেয়ো কুকুরের বিকট ঘেউ ঘেউ শব্দ পরিত্যক্ত প্রান্তরের স্তব্ধতা ভঙ্গ করছে। প্রভাতের সর্বাঙ্গে ঘা। পুঁজ পড়ছে। হে সুন্দরি বীভৎসতা, তুমি এত সুন্দরী! তাই আমি গ্রাম পরিত্যাগ করে নিত্য প্রত্যূষে তোমার কদর্যতায় স্নান করতে ধেয়ে আসি, তুমি আমায় অনেক শিখিয়েছ—প্রেয়সী আমার! তুমি আমায় শিখিয়েছ সংসারকে ঘৃণা করতে, ক্ষমতাকে তুচ্ছ করতে, ঈশ্বরের অত্যাচারের বিপক্ষে সোজা হয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে। হে সুন্দরি। আমায় সংসার হতে আরো দূরে টেনে নিয়ে যাও—যত দূর পারো। নরকে হয় তাও ভাল, সংসার থেকে যত দূরে হয়।"

এই স্বগতোক্তিটি বিশ্লেষণ করিলে তিনটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। সর্বপ্রথমে একটা বীভৎস পরিস্থিতির বাস্তব বর্ণনা। বদ্ধ জলার ভিতরে পচা হাড়ের দুর্গন্ধ আর তাহার বিষাক্ত ধোঁয়া। কুকুরের বিকট চীৎকার। তিন টুকরা চিত্রের মধ্য দিয়া পরিবেশটি মূর্তি লাভ করে। দ্বিতীয় স্তরে দেখি, এই বীভৎস পরিবেশ চাণক্যের নিজের অন্তরে। বাহিরের প্রকৃতির মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ নয়। চাণক্য আজ বীভৎস দৃষ্টি লইয়া জগৎকে দেখিতেছেন। প্রভাতের সর্বাঙ্গের ঘা হইতে যে পুঁজ ঝরিয়া পড়ে, তাহা আর প্রকৃতিতে নয়, চাণক্যের মনে। মনের অভ্যন্তরে বীভৎসতার যে মূর্তি চাণক্য অঙ্কন করিয়া লইয়াছেন, তাহাকে বাহিরে মিলাইয়া দেখিবার জন্যই নিত্য প্রত্যূষে তিনি শ্মশানে ছুটিয়া আসেন। কিন্তু কেন তিনি জগতের সৌন্দর্য হইতে মুখ

ফিরাইয়াছেন? ধীরে ধীরে নাট্যকার তাহার কারণ বিশ্লেষণ করিতেছেন। অপরিমেয় জ্ঞানের সঙ্গে অপরিসীম স্নেহের অধিকারী চাণক্য। বিধাতা সেই স্নেহেই আঘাত দিয়াছেন; চাণক্যের কন্যা অপহৃতা। তাই চাণক্যের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব। সেই জন্যই ভাষা এত উচ্ছ্বসিত—

> "মন্ত্রী মহাশয়! আমি কার্যান্তর থেকে রাত্রিকালে ফিরে এসে যখন দেখলাম যে আমার ভৃত্য ভূমিতলে অজ্ঞান, আর আমার কন্যার শয্যা শূন্য, তখন আমার ধমনীতে উষ্ণ রক্তস্রোত বইল, চক্ষে অন্ধকার দেখলাম, মাটি থেকে একটা তপ্ত বাষ্প আকাশে উঠ্‌তে লাগল। তারপর উন্মত্তবৎ রাস্তা দিয়ে 'মা-মা' বলে চীৎকার করতে করতে ছুটলাম। পার্শ্ববর্তী বনের মধ্যে পাখীরা কলরব করে উঠলো। নদীর ধারে গিয়ে ওপারে ডাকতে লাগলাম। সেই অন্ধকারের মধ্যে দুপারে কেবল কৃষ্ণা নদী গর্জন করে চলে গেল। আমি মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলাম।"

সংস্কৃত নাটকে দেখি নাট্যকার যখন কোনো বিশেষ স্থায়ী ভাবের জাগরণের মধ্য দিয়া রস-সৃষ্টি করেন, তখন আলম্বন এবং উদ্দীপন এই দুইটি বিভাবের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারপর হয় ব্যভিচারী ভাবের সংস্পর্শ। এইখানেও সেই রীতির অবতারণা দেখি। রস করুণ। আলম্বন বিভাব কন্যা। উদ্দীপন বিভাব অজ্ঞান ভৃত্য এবং শূন্য শয্যা। ব্যভিচারী ভাব ধমনীতে উষ্ণ রক্তস্রোতের প্রবাহ, অন্ধকার দৃষ্টি, উন্মত্তবৎ 'মা—মা' বলিয়া চীৎকার করিয়া ছুটিয়া যাওয়া। শেষ পর্যন্ত মূর্ছা। বর্ণনার মধ্য দিয়া এমনি করিয়া শোকের চিত্র যখন মূর্তিমান হইতে থাকে, এবং বিভাবাদির মধ্য দিয়া বক্তার নিজের ভাব সাধারণীকৃত হইয়া যখন আমাদের মনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তখন আমরা ঠিক কাব্যাস্বাদের মতো পারিপার্শ্বিক আনুষঙ্গিক বিষয়-বস্তু ও ঘটনা ভুলিয়া গিয়া শুধু সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী এই রস চর্বণ করিতে থাকি। জানি ইহা সেক্‌স্‌পীয়রীয় নাট্য-শিল্পে দোষাবহ। কেন না সেখানে আমরা হৃদয়-বৃত্তির নির্যাসটুকুকে মদ্যবৎ পান করি না। জীবনের বাস্তব ঘটনার যে দ্রাক্ষাগুলি মথিত করিয়া উহা নিষ্কাষিত হইয়াছে সেইগুলিকে ছোব্‌ড়া বলিয়া আমরা দূরে নিক্ষেপ করি না। নাট্যবস্তু এবং বস্তুর নির্যাস, কার্য এবং কারণ, উভয়কেই আমরা অঙ্গাঙ্গিভাবে নাটকে গ্রহণ করি। কিন্তু তবুও একথা সত্য যে, দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের হৃদয়বৃত্তির ব্যাকুলিত জাগরণের

এই কৌশল সাধারণ দর্শককে, এমন কি বুদ্ধি-ব্যবসায়ী সমালোচককেও বিস্ময়ে মূক করিয়া দেয়। তাই একই ব্যক্তি একই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের সমালোচক ও দর্শক হইতে পারেন না। ঐখানেই দ্বিজেন্দ্রলালের বিজয়।

আত্যন্তিক কাব্যস্পন্দন দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের ভাষার স্বাভাবিকতা অনেক জায়গায় নষ্ট করিয়াছে, 'নাট্য' সংলাপকে বহুস্থানে 'পাঠ্য' কবিতার পর্যায়ে তুলিয়াছে। তবুও পরিস্থিতির আভ্যন্তরীণ সঙ্ঘাতগুরুত্বের সঙ্গে সমান তাল রাখিয়া হৃদয়বৃত্তির তরঙ্গ-বিক্ষোভে স্পন্দিত এই ভাষা সর্বত্র কাব্য হয় নাই। উহা বহুস্থানে সার্থক নাট্য সংলাপ হইয়াছে।

তৃতীয় অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য। ছায়া ও চন্দ্রগুপ্তের সাক্ষাৎ। বিজয়ী চন্দ্রগুপ্ত প্রাণরক্ষাকারিণী ছায়ার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু ছায়া কি কৃতজ্ঞতা চায়? চন্দ্রগুপ্তকে সে ভালভাসে। সে চায় সেই ভালবাসার প্রতিদান। কিন্তু এতদিন সে এই প্রেম গোপন করিয়া আসিয়াছে। নিজের উদ্বেলিত অন্তরের বেদনায় সে এতদিন নিজেই ব্যথাহত হইয়া ফিরিয়াছে। চন্দ্রগুপ্তের এই কৃতজ্ঞতা আজ তাহাকে ব্যথিত করিল। ছায়া আজ মনের কথা প্রকাশ করিবে। নাট্যকার ছায়ার চরিত্র, মনের ভাব ও ভালবাসার বিশ্লেষণে কী অপূর্ব দক্ষতা দেখাইয়াছেন তাহাই আলোচনা করিব।

চন্দ্রগুপ্ত ছায়ার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। কিন্তু শুষ্ক কৃতজ্ঞতা ছায়া আশা করে নাই। চন্দ্রগুপ্তের কথার মধ্যে প্রেম-নিবেদনের এক কণাও নাই। ছায়া ব্যথিত হইল। প্রেম আহত হইলে পরিণত হয় অভিমানে। অভিমানে ভাষা সংক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু আঘাত করে। ছায়া বলে,—"কিছু প্রয়োজন নাই মহারাজ! আমরা হীন পার্বত্য জাতি। উপকার বিক্রয় করি না, মহৎ প্রবৃত্তির ব্যবসা করি না। মহারাজের জীবন রক্ষা করতে পেরেছি—এই সৌভাগ্যই আমার যথেষ্ট পুরস্কার। তার অধিক কিছু প্রত্যাশা করি না।" অভিমানের ভাষার এমনই বৈশিষ্ট্য যে অভিমানিনী যাহা অস্বীকার করে, গোপন করিতে চেষ্টা করে, তাহার অবাধ্য ভাষা ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়া তাহাই প্রকাশ করে। ছায়ার শেষ বক্তব্য, "আর অধিক কিছু প্রত্যাশা করি না" এর অর্থ, সে চন্দ্রগুপ্তের নিকট 'আরো কিছু' চাহিয়াছিল। পাইলে সেইটাই হইত তাহার চরম প্রাপ্য। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত বুঝিতেছেন না। 'প্রেম'কে তিনি 'মহত্ত্ব' বলিয়া ব্যাখ্যা দিয়া ভুল করিতেছেন। কিন্তু কি করিয়া ছায়া চন্দ্রগুপ্তের

ভুল ধরাইয়া দিবে? 'মহত্ত্ব' শব্দের মধ্যে যদি 'প্রেম' অর্থ নিহিত থাকে, তাহা হইলে ছায়া তাহা মানিয়া লইবে। সে যাহা বলিয়াছে তাহা যে মুখের কথা, অন্তরের নয়, তাহাই সে বলিতে চায়। তাই আবার তাহার মুখে অস্বীকারের ভাষা।......"আমি যা বলেছি তার ঐ একই অর্থ। তার মধ্যে 'কিংবা' নাই।" চন্দ্রগুপ্তের পূর্বগামী কথাটির মধ্যে 'কিংবা' শব্দে না বলা যেটুকু রহিয়াছে, সেইটুকুই ছায়ার আশার স্থল। ঐ 'কিংবা'টির অর্থই সে চন্দ্রগুপ্তের নিকট হইতে জানিতে চায়; তাই তাহার হৃদয়ের ব্যাকুলতাকে প্রতারিত করে মুখের অস্বীকার। উত্তরে চন্দ্রগুপ্ত বলেন, "ছায়া! তুমি একটি প্রহেলিকা।" এইখানেই নারীর বিজয়-গর্ব। পুরুষ তাহাকে দুর্বোধ্য প্রহেলিকা ভাবিয়া যতই তাহার ধ্যান করে, তাহার হৃদয়ে নারীর আসন ততই প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্বীকৃতি প্রেমেরই পূর্বলক্ষণ। ছায়ার আশার সঞ্চার হইল। এইবার আসিল আত্মপ্রকাশের লজ্জা। তাই "মহারাজ! আমি কোনো প্রত্যুপকার চাই না" বলিয়া সে প্রস্থান করিতে চায়। অবশ্য ঐ 'চাই না' কথার ভিতর সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে রহিয়াছে প্রতিদানের আবেদন। চন্দ্রগুপ্ত তাহা বুঝিতে পারেন না। আমরা জানি, নাটকে আগে হইতেই ছায়ার পূর্বরাগ শুরু হইয়াছে, চন্দ্রগুপ্তের নহে। তাই ধীর স্থির চন্দ্রগুপ্ত সর্বপ্রথম রহস্যের সন্ধান পাইয়া বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেন,—"দাঁড়াও ছায়া। আমি একটা কথা জি্গাসা করি। উপকার করে তার পরে উপকৃতের প্রতি তুমি এত উদাসীন কেন? আমি লক্ষ্য করেছি ছায়া যে তুমি, চন্দ্রকেতুর সঙ্গে যখন কথা কইছ, তখন আমি এলেই তুমি তৎক্ষণাৎ চলে যাও। এত উদাসীন!" পূর্বরাগ ধরা পড়িয়াছে জানিয়া ছায়া লজ্জায় মস্তক অবনত করে। কিন্তু সে মুগ্ধা নয়, প্রগল্‌ভা নায়িকা। তবুও কি করিয়া সে নিরাবরণ ভাষায় ভালবাসা ব্যক্ত করিবে? ভাষা তাই কাব্যের আশ্রয় গ্রহণ করিল।—

> "মহারাজ! আপনি কখন পর্বতশিখরে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখেছেন!—দিগন্তবিস্তৃত বনানীর উপর দিয়ে বিকশিত সূর্য-রশ্মির ঢেউ খেলে যায় যখন—দেখছেন কি?.........আমাদের জীবন সেই রকম—একটা উজ্জ্বল ঘনশ্যামলতা—আবেগে কাঁপছে। অধিত্যকাবাসী নীচে দাঁড়িয়ে তার কি দেখেতে পায় মহারাজ?"..
> ......"কিন্তু মহারাজ লক্ষ্য করেছেন কি যে, মেঘ যতই কৃষ্ণবর্ণ হয়, ততই সে সলিল-সম্ভার-সমৃদ্ধ হয়, তার মধ্যে ততই তীব্র

তড়িৎ খেলে? আমাদের হৃদয় আছে, এইটুকু কি আপনার মনে হয়? যদি জান্‌তেন যে সে হৃদয় কতখানি, তাতে কি তরঙ্গ খেল্‌ছে।"

এতখানি আত্মপ্রকাশের পরও যখন ছায়া জানিল তাহার প্রেম চন্দ্রগুপ্তের মনে একটা কৌতূহলী প্রশ্ন জাগাইয়াছে মাত্র, তখন তাহার অভিমান আরো তীব্র হইয়া উঠিল। ছায়া বলে—

"না মহারাজ! আমি আপনাকে ঘৃণা করি। বিবেচনা করেন যে, আমি ভিক্ষুকের মত আপনার প্রেম যাক্সা কর্চ্ছি? আপনি অনুগ্রহ করে আমায় প্রেমমুষ্টি ভিক্ষা দেবেন, আর আমি তাই হাত পেতে নেবো! এত বড় স্পর্ধা! —মহারাজ, আমি হীন বর্বর কৃষ্ণবর্ণ পার্বত্য রমণী। আর আপনি মগধের দেবস্তুত মহারাজ। তথাপি আমি আপনাকে ঘৃণা করি।"

বলিয়াই নিজের অন্তরের তীব্রজ্বালা লুকাইতে অভিমানিনী ছুটিয়া পলাইল। কিন্তু তাহার তীব্র ভালবাসার আকর্ষণ তাহাকে যে অভিমান করিতেও দেয় না। তাই আবার সে ছুটিয়া আসিয়া রূঢ় বাক্যের জন্য দয়িতের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। এতবড় অন্তর্দ্বন্দ্বের পর প্রেমের অকপট প্রকাশে ভাষায় উচ্ছ্বাসের বাণ ডাকিয়া আসে।—

> "যিনি আমার জাগ্রতে ধ্যান, নিদ্রায় স্বপ্ন, যিনি আমার ইহলোকের সম্পৎ, পরলোকের স্বর্গ, যাঁর দর্শন তীর্থ, অদর্শন অভিশাপ,—তাঁকে ঘৃণা করব!—মিথ্যা কথা বলেছি। তথাপি ইচ্ছা হয় যে যদি ঘৃণা করতে পারতাম! ·····আপনি আমার আহারে ক্ষুধা, শয়নে নিদ্রা, সর্ব সময়ে শান্তি কেড়ে নিয়েছেন। আপনি আমার চক্ষে জগৎ লুপ্ত করে দিয়েছেন, আপনার চিন্তায় আমার অস্তিত্ব লীন হয়ে যায়—আমি স্বর্গে আছি কি নরকে আছি বুঝতে পারি না! আবার জিজ্ঞাসা করছেন আপনি আমার কি করেছেন! নিষ্ঠুর!"

তীব্র অন্তর্জ্বালা প্রকাশে একমাত্র ভবভূতির উত্তর-রামচরিতের ভাষার সঙ্গেই ইহার তুলনা চলিতে পারে। বাংলা সাহিত্যে ইহার তুলনা নাই।

এই ভাষার সঙ্গতি এবং সৌন্দর্য কোথায়? লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, পরিস্থিতির বিকাশে, বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকের সঙ্ঘাতে মনস্তাত্ত্বিক যেটুকু পরিবর্তনে চিন্তা ও অনুভূতি যতটুকু আন্দোলিত হইতেছে, তাহার ততটুকু

প্রকাশে, এ ভাষা ধীরে ধীরে সমানুপাতিক বিকাশ লাভ করিয়াছে। তাই ইহা সুন্দর, হৃদয়গ্রাহী ও সঙ্গত।

কিন্তু প্রয়োগের বিচারে এই ভাষা কখনও কখনও অশোভন হইয়া পড়ে। উপরি-উদ্ধৃত ভাষার মাধুর্য মানিয়া লইলেও আমরা বলিতে বাধ্য হই, অশিক্ষিত পার্বত্য রমণীর মুখের ভাষা ইহা নহে। অযোগ্যের মুখেও তিনি অনেক সময় এই ভাষা তুলিয়া দেন। 'নূরজাহান' নাটকে লায়লার যুক্তি ও ভাষাবিন্যাস বালিকার যোগ্য নয়। আবার প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাক্য-বিন্যাস নাট্যকার শুধু কবিত্বের জন্যই করিয়াছেন।

চন্দ্রগুপ্ত প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য। চাণক্যের উক্তি—

> "অন্ধ! সেখানেও একটা ঝড় উঠবে!—কপিলের অভিশাপ নয়, বিশ্বামিত্রের তপোবল নয়, পরশুরামের শৌর্য নয়, বামনের ছলনা নয়। এ ব্রাহ্মণের বুদ্ধি আর শূদ্রের নিষ্ঠা, ব্রাহ্মণের সাধনা আর শূদ্রের প্রতিহিংসা, ব্রাহ্মণের তেজ আর শূদ্রের শক্তি। স্বর্গ মর্ত্য এক সঙ্গে! আর ভয় নাই। চন্দ্রগুপ্ত! ওঠো—।"

এইখানে যদি চাণক্য থামিতেন, তাহা হইলে তাঁহার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিত না। নন্দবংশ উচ্ছেদের ভয়াবহ সম্ভাবনা এবং মৌর্য-বংশ-প্রতিষ্ঠার পূর্বাভাস আমরা যথোপযুক্তভাবেই পাইতাম। কিন্তু তাহার পরও চাণক্য যে, ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন, তাহার মধ্যে কাব্যগুণ যথেষ্ট থাকিলেও নাটকীয় প্রয়োজনীয়তা নাই। উক্তিটি এই,—

> "এই প্রধূমিতা, প্রজ্জ্বলিতা, প্রবাহিত-রক্তস্রোতস্বতী ভৈরবী ভারত-ভূমির পরিবর্তে এক রত্নালঙ্কারা, পুষ্পোজ্জ্বলা, সঙ্গীতমুখরা হাস্যময়ী জননী। জলধি হতে জলধি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এক মহাসাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তুমি, আর তার পুরোহিত এই দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ চাণক্য।"

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালকে পশ্চাতে রাখিয়া দেশভক্ত কবি দ্বিজেন্দ্রলাল এখানে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের এই মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের অপূর্ব দক্ষতা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের উদ্বেলিত সজ্ঘাতকে কাব্যময়ী ভাষায় রূপ দেওয়ার প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতার সঙ্গে যদি কাহিনী-রূপায়ণের নৈপুণ্য যোগ দিত, তাহা লইলে বাংলা নাট্য-সাহিত্যে নাটকের সোনার ফসল ফলিত। কিন্তু তাহা হয় নাই বলিয়া

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের কাহিনীর মধ্যে অখণ্ড ঐক্য নাই, গল্পও স্থানিক ঐক্যের অভাবে জমাট বাঁধে না। খণ্ড খণ্ড ভাবে অনেকগুলি দৃশ্যই হয়ত মনোরম। সামগ্রিক সৌন্দর্যের একান্ত অভাব। চরিত্রের অন্তরকে তিনি বিপরীত বৃত্তির আঘাতে শতধা বিভক্ত করিতে পারেন, কিন্তু সেই খণ্ডগুলিকে জুড়িয়া দিয়া একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ গোটা মানুষ রচনা করিতে তিনি খুব কমই পারেন। সমস্ত আয়োজন বিন্যাসের অভাবে ব্যর্থ হইয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের ক্ষমতা আমাদিগকে বিস্ময়ে অভিভূত করে, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অক্ষমতাও আমাদিগকে ব্যথিত করে। দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য-শৈলীর আলোচনা করিলেই আমরা ইহা বুঝিতে পারিব।

প্রধানতঃ অমিত্রাক্ষর ছন্দে ইতিহাসাশ্রিত রোমান্‌স্‌নাট্য রচনা করিয়াই দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা নাট্য-সাহিত্য-জগতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁহার প্রথম দিকের এই রচনাগুলি সার্থক নাটক হয় নাই। কি কাহিনীবিন্যাস, কি চরিত্র-চিত্রণ, কোনো দিক দিয়া এই রচনাগুলি সার্থকতার পরিচয় বহন করে না। তবে তাঁহার রচনায় পরবর্তী কালে যে মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, এইগুলির মধ্যে প্রথম হইতেই সেই সকল দেখিতে পাই। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ধারা যখন পরিপুষ্টি লাভ করিয়া উঠিয়াছে, তখন দ্বিজেন্দ্রলালের আবির্ভাব। সুতরাং প্রথম পথিকৃতের অসুবিধাগুলি তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় নাই। মধুসূদন, দীনবন্ধু ও গিরিশচন্দ্রের নিকট হইতে তিনি অনেক কিছু গ্রহণ করিয়াছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাবও তাঁহার উপর কম নহে। তাঁহার রচিত নাটকগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বসূরীদের এই প্রভাবেরও আলোচনা করিব।

'সোরাব রুস্তম' ও 'সিংহল বিজয়', দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম দিকের রচনা। নাটক হিসাবে রচনা দুইটি সার্থক নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য-শৈলী তখনও ঠিক ঠিক গড়িয়া ওঠে নাই। একদিকে যেমন বিষয়বস্তুর নির্বাচনের পরীক্ষা চলিতেছিল, অন্যদিকে তেমনি প্রকাশভঙ্গীর আয়ত্তীকরণের চেষ্টাও আরম্ভ হইয়াছিল। এই দুইখানি নাটক তাহারই পরিচয় বহন করে। দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহাসাশ্রিত রোমান্‌স্ বা পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রোমান্টিক নাটক (প্রধানতঃ গীতাভিনয় বা অপেরা) রচনার চেষ্টা করিতে-ছিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক কবিমনের পক্ষে এই ধরনের নাটক সৃষ্টিই সম্ভব ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল যে কবি, তিনি নাটক রচনা না করিয়া শুধু সঙ্গীত রচনা

করিলেও যে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিকের মর্যাদা তিনি পাইতেন, তাঁহার রচিত গানগুলিই ইহার প্রমাণ। কিন্তু এই কবি-প্রতিভা অমিত্রাক্ষরে সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। পূর্বেই এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। সংলাপের এই ভাষা তাঁহার এই নাটকগুলিতে ভাব-প্রকাশের বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। তারপর কাহিনী ও চরিত্র। নাটকে এই দুইটির ভিতর নিতান্ত অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বর্তমান। ঘটনার বিকাশের মধ্য দিয়া নাটকের চরিত্র সৃষ্টি হয়। আবার চরিত্রের বিকাশই নাটকীয় ঘটনার সুষ্ঠু বিন্যাস ঘটাইয়া থাকে। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম দিকের রচনায় এই দুইটিরই নিতান্ত অভাব। তাঁহার রচিত পৌরাণিক নাটক 'পাষাণী' এবং 'ভীষ্ম'কে এই দিক দিয়া আলোচনার অযোগ্য বলিলেই চলে। 'পাষাণী' নাটকের নামকরণের কোনো সার্থকতা নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল অহল্যা-চরিত্রের পৌরাণিক প্রসিদ্ধি ত্যাগ করিয়া এক বিকৃত রুচির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার হাতে পড়িয়া ঋষি-পত্নী অহল্যা অতি সাধারণ কামুকী বারাঙ্গনার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র আধুনিক যুগের লম্পট জমিদার মাত্র। তপোবনের পৌরাণিক মহিমা চিরঞ্জীবের চপল সংলাপে খর্ব হইয়াছে। বিশ্বামিত্রের চরিত্র নিতান্ত অসত্য। 'অহল্যা'-চরিত্রটির মধ্যে সঙ্গতি আছে। মনস্তাত্ত্বিক ক্রমবিকাশের ধারা উহাকে নাটকীয় করিয়া তুলিয়াছে। ইন্দ্র-চরিত্রেরও আভ্যন্তরীণ সঙ্গতি রহিয়াছে। কিন্তু পৌরাণিক প্রসিদ্ধি-ত্যাগ জনিত অশ্রদ্ধা চরিত্র দুইটির নাটকীয় উৎকর্ষ আস্বাদনের পথে বাধা হইয়া দাঁড়ায়। 'ভীষ্ম' নাটকেও 'অম্বা', 'ভীষ্ম' এবং 'সত্যবতী' চরিত্র-চিত্রণে নাট্যকার চরম অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের এই অসার্থক নাটকগুলির মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। গোড়াগুড়ি হইতেই তিনি নায়ক-নায়িকা-চরিত্রের মধ্যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন। কখনও বা পারিপার্শ্বিক বিরুদ্ধ অবস্থার সহিত পাত্রপাত্রীর অন্তরের অবরুদ্ধ, অপূর্ণ বাসনার সঙ্ঘাতে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়; যেমন অহল্যা-চরিত্রে। কখনও বা পারিপার্শ্বিকের অবরুদ্ধসঙ্ঘাতে প্রতারিত, নির্যাতিত মানবাত্মা ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে! তাহা হইতে জগৎ ও জীবনের পর তাহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়া যায়। সে তখন নিজের অন্তরের জ্বালায় যাহাকে পায় তাহাকেই আক্রমণ করে। ইন্দ্র কর্তৃক পরিত্যক্তা, শতানন্দ কর্তৃক ভর্ৎসিতা অহল্যা ইহার উদাহরণ। আর একরকম তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব দ্বিজেন্দ্রলাল সৃষ্টি করিয়াছেন। দয়া-মায়া, ভক্তি-

স্নেহ প্রভৃতি সৎ প্রবৃত্তি যে সকল মানুষের সহজাত, তাহারা প্রাণান্তেও উহা ত্যাগ করিতে পারে না। অথচ বিধাতার এমন বিচিত্র বিধান যে, মানুষ যাহাকে ভালবাসে বা ভক্তি করে, তাহার নিকট হইতেই সে অনেক সময় চরম আঘাত পাইয়া থাকে। সে আঘাতে সমগ্র অন্তর বিষাক্ত হইয়া উঠিলেও ঐ ভক্তি বা ভালবাসার পাত্রকে অশ্রদ্ধা বা অবহেলাও সে করিতে পারে না। অন্তরের সঙ্গে তাই বাহিরের এই বৈপরীত্যের সঙ্ঘাতে সে নিজেই ব্যথিত হয়। তাহার সেই বেদনা উচ্ছ্বসিত বাণী মূর্তিলাভ করে। আর এই অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া এই চরিত্রগুলির মাহাত্ম্য আরো উজ্জ্বল হইয়া ওঠে। 'সিংহল-বিজয়' নাটকের বিজয়-চরিত্রে আমরা ইহার সূচনা দেখিতে পাই। অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা নাট্য-সাহিত্যে ইহার অভিনব প্রয়োগ করিলেও ইহা শেক্স্‌পীয়ারেরই অনুসরণ। বন্ধুপ্রীতি ও গণতন্ত্রের প্রতি ভালবাসা ব্রুটাসের অন্তরে যে বিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার মূলে ছিল বন্ধু সিজারের ব্যক্তিগত ক্ষমতাপ্রিয়তা। হ্যাম্‌লেটের অন্তর্দ্বন্দ্বের মূল প্রেরণা যোগাইয়াছিল তাহার মায়ের আচরণ। অবশ্য এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি দ্বিজেন্দ্র-লালের নাটকে কতখানি সার্থক হইয়াছিল তাহার আলোচনা আমরা করিব। তবে দ্বিজেন্দ্রলালের এই বৈশিষ্ট্যের দ্বারা ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। 'আলমগীর' নাটকে আলমগীর-উদীপুরী চরিত্র-রূপায়ণে তিনি এই শৈলীর সার্থকতা দেখাইয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে যে প্রবল স্বদেশ-ভক্তির পরিচয় আমরা পাই, 'সোরাব রুস্তম' এবং 'সিংহল-বিজয়ে' আমরা তাহা অনেকখানি বিকশিত দেখিতেছি। নাটকের ঘটনার পরিবর্তন, ঘাতপ্রতিঘাত প্রভৃতি ফুটাইয়া তুলিবার জন্ত দ্বিজেন্দ্রলাল সঙ্গীতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এই গানের প্রয়োগে দুইখানি নাটকেই কিন্তু বেশ সার্থকতা দেখা যায়। সুতরাং দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন-দর্শন ও নাট্য-শৈলী যে বৈশিষ্ট্য লাভ করিবে, প্রথম হইতে তাহার সূচনা দেখা গেল। এখন ঘটনা-বিন্যাস ও চরিত্র-চিত্রণের সার্থকতা এই নাটক দুইখানিতে কতটুকু হইয়াছে তাহাই আলোচনা করিব।

সোরাব-রুস্তমের ভূমিকায় নাট্যকার লিখিতেছেন,—

> "এই পুস্তকখানি রচনা করার একটি উদ্দেশ্য আছে। কিছুদিন হইতে একটি কথা শুনিতে পাইতেছি যে, আমাদের দেশের রঙ্গালয়ের দর্শকবৃন্দ অশ্লীল হাব-ভাব-সমন্বিত গ্রাম্য রসিকতা

শুনিবার জন্যই রঙ্গালয়ে গিয়া থাকেন।...আমি একবার আমার সাধ্যমত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই যে, সুরুচি-সঙ্গত অপেরা এখন চলে কি না।...

সোরাব-রুস্তম দস্তুরমত অপেরা নয়—অপেরায় কতকগুলি নাচ-গান জোড়া দিবার জন্য যেটুকু কথাবার্তার দরকার হয়—সেইটুকু কথাবার্তাই থাকে, কিন্তু এ নাটকের তৃতীয় অঙ্কে কথাই তাহার প্রাণ। নাচ-গান তাহার আনুষঙ্গিক ব্যাপার মাত্র। আবার এ নাটকের প্রথম অঙ্কে যেরূপ নাচ-গানের প্রাচুর্য আছে, কোনো নাটকে তাহা থাকে না। অতএব ইহা নাটকও নহে। এক কথায়—ইহা অপেরায় আরম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে নাটকে শেষ হইয়াছে।"

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য-শৈলী (প্রহসনের নহে) সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা বলা যায়,—"ইহা অপেরায় আরম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে নাটকে শেষ হইয়াছে।" ইংরাজী আদর্শের সংলাপপ্রধান নাট্য-শৈলীর সহিত যাত্রার সঙ্গীত-বহুলতার মিশ্রণ করিয়া গীতাভিনয় নাম দিয়া এক নূতন নাট্যসাহিত্য বাঙালী নাট্যকারেরা সৃষ্টি করিতেছিলেন। জনগণের বিকৃত রুচির চাহিদা মিটাইবার জন্য উহার ভিতর হাস্যরসের নামে ভাঁড়ামি প্রবেশ করিয়াছিল। এই 'সঙ্কর' নাট্যসাহিত্যকেই ইংরেজী গীতিনাট্যের নামানুকরণে 'অপেরা' বলা হইত। মনোমোহন বসুর গীতাভিনয়গুলিই যে এই শ্রেণীর নাটকের আদর্শ তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। গিরিশচন্দ্র মনোমোহনের শৈলীকে আর একটু সংস্কৃত করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল নাটক রচনার প্রথম দিকে মনোমোহন-গিরিশচন্দ্রের শৈলীর দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। সঙ্গীত যোজনায়ই এই প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। মনোমোহনের শৈলীর আলোচনায় দেখিয়াছি, যাত্রার সঙ্গীত-প্রাচুর্যকে তিনি কমাইয়া আনিয়াছেন। তাঁহার নাটকে গানগুলি প্রায়ই দৃশ্যের প্রথমে ও শেষে থাকে। দৃশ্যের মধ্যে মধ্যেও তিনি গান সংযোজন করিয়াছেন। সুখ, দুঃখ, বেদনা প্রভৃতির গভীরতা প্রকাশের জন্য নারী, পুরুষ উভয়ের মুখেই তিনি সঙ্গীত তুলিয়া দিয়াছেন। নিম্নস্তরের পাত্র-পাত্রীর মুখে হাসির গানের প্রয়োগ করিয়াছেন মনোমোহন ও গিরিশচন্দ্র উভয়েই। আবার একখানি গানকে ভাঙ্গিয়া গিরিশচন্দ্র বহু পাত্র-পাত্রীর মুখে তুলিয়া দিয়াছেন। 'জনা' নাটকের প্রথম অঙ্ক, পঞ্চম গর্ভাঙ্কে যোগিনীগণ ও প্রমথগণের যৌথ সঙ্গীত,

ইহার উদাহরণ। সোরাব-রুস্তমের যৌথ সঙ্গীত (যেমন প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্যে সারিয়া ও হাসিদার গান) গিরিশচন্দ্রের শৈলীরই অনুসরণ। সামিঙ্গনের রাজা ও তাঁহার পারিষদবর্গের আলাপের চপল হাস্য-কৌতুকের উপর যাত্রার প্রভাব পড়িয়াছে। ব্রজমোহন রায়ের অভিমন্যুবধ যাত্রার দুর্যোধন ও শকুনির আলাপও এই ধরনের। আমরা পূর্বেই তাহার আলোচনা করিয়াছি। পার্থক্যের মধ্যে এই যে, দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় যাত্রার স্থূল রসিকতা নাই। কিন্তু শুধু হাস্যরস সৃষ্টির জন্য রাজা-রাজড়ার চরিত্রকেও দ্বিজেন্দ্রলাল হালকা করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহা যাত্রার প্রভাব। অবশ্য নাটকে উপরি-উল্লিখিত প্রভাবগুলি বহিরঙ্গমূলক। কাহিনী ও চরিত্র-চিত্রণে সোরাব-রুস্তম নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল পূর্বসূরীদের চেয়ে অভিনবত্ব কিছুই দেখাইতে পারেন নাই। নাটকখানি প্রথমদিকে হাস্য-প্রধান এবং সঙ্গীত-বহুল হইয়া উঠিয়াছে তাহার কারণ প্রথম দিকে তিনি কাহিনীর মধ্যে বিশেষ গাম্ভীর্য বা চরিত্রের মধ্যে কোনো তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। অবশ্য নাটকে যে তাহার অবকাশ ছিল না তাহা নয়। শত্রুর আক্রমণে পরাজিত পারস্যরাজ কৈকায়ুশ ও তাঁহার মহিষীর আলাপে (প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য) নাটকের সুর খানিকটা গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল। স্ত্রীর উত্তেজনাপূর্ণ বাক্যে রাজা কৈকায়ুশের যদি চৈতন্য হইত, তাহা হইলে প্রথম হইতেই কাহিনীর গাম্ভীর্য বাড়িয়া যাইত। কিন্তু কৈকায়ুশ-চরিত্রে নাট্যকার রাজমর্যাদা অর্পণ করিতে পারেন নাই। তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্যে আবার আমরা যখন কৈকায়ুশের দর্শন পাই, তখন দেখি, মহিষীর ভর্ৎসনায় উত্তেজিত হইয়া তিনি রুস্তমকে বন্দী করিতে আদেশ করিতেছেন। এই আচরণ আকস্মিক। মহিষীর চরিত্রের সঙ্গে রাজচরিত্রের সমানুপাতিক বিকাশ হয় নাই বলিয়া ঘটনাও নাটকীয় হইয়া ওঠে নাই। তারপর বীর রুস্তমের প্রতি রাজকন্যা তামিনার পূর্বরাগের অবকাশে নাট্যকার হৃদয়গ্রাহী সংলাপ এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ ঘটনা সৃষ্টি করিতে পারিতেন। সমস্ত ঘটনা যবনিকার অন্তরালে রাখিয়া এবং তামিনা ও রুস্তমের প্রথম মিলনদৃশ্যটির রূপায়ণে স্বপ্নের আশ্রয় লইয়া নাট্যকার নাটককে কাব্য করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। কিন্তু উহা অবলম্বনে প্রেমোদ্বেল-হৃদয়, বিস্মিত নর-নারীর বাক্য ও আচরণে যে অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ হইত, নাট্যকার তাহা একেবারেই সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। নাটকের প্রথম হইতে আমরা রুস্তমের সাক্ষাৎ পাইতেছি। কিন্তু প্রথম অঙ্কে রুস্তম

চরিত্র আদৌ প্রস্ফুটিত হয় নাই। নাটকের নায়ক রুস্তম। রুস্তমের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তামিনা তাঁহাকে স্বামিত্বে বরণ করিয়াছেন। রুস্তমকে খুঁজিবার জন্যই সোরাব পারস্যে গমন করেন। মৃত্যুর মধ্য দিয়া সোরাব পিতৃ-পরিচয় লাভ করিলেন। কিন্তু সোরাবের মৃত্যুতে নাটকের বিষাদ-গাম্ভীর্যের পূর্ণতা হয় না। মৃত পুত্রের পার্শ্বে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, ঝড়-ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎ, বজ্রপাতকে উপেক্ষা করিয়া নিশ্চল পাষাণ-মূর্তির মতো রুস্তম দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। এই বিরাট শোকের চিত্র নাটকের পরিণতির গুরুত্ব শতগুণে বাড়াইয়া দেয়। সুতরাং নাটকের নায়ক সোরাব নহে,—রুস্তম। এই বীর রুস্তমের কর্মময় চরিত্র যেখান হইতে নাট্যকার ঠিক ঠিক ভাবে চিত্রণ করিতে শুরু করিয়াছেন, সেইখান হইতে নাটকীয় ঘটনা জমিয়াছে। তাই নাটকের চরিত্র-চিত্রণ ও ঘটনা-বিন্যাসের অন্তর্নিহিত আবেগেই উহা হইতে চটুল নাচ-গান ও হাস্য-পরিহাসের অংশ বাদ পড়িয়াছে। নাটকটি যে সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা লাভ করে নাই, অর্থাৎ উহার পূর্বার্ধের সহিত পরার্ধের যে সঙ্গতি হয় নাই, তাহার কারণ, নাট্যকার কমেডীর শৈলীতে নাটকখানির সূচনা করিয়া ট্রাজেডীতে শেষ করিয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয়, যে হাস্য-রস সৃষ্টির প্রেরণায় তিনি তুরাণের রাজা ও বিদূষকের চরিত্র প্রথমদিকে নিতান্ত হাল্‌কা করিয়া ফেলিয়াছেন, শেষ দিকে রাজ-চরিত্রে সেই হাস্য-রস রক্ষা করিতে পারেন নাই। প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্যে রাজা ও বিদূষকের আলাপে হাসির উপাদান আছে, কিন্তু রাজার বাক্যে ও আচরণে রাজকীয় গাম্ভীর্য নাই। দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্যে উভয়ের আলাপে হাস্যের মাত্রা অনেকখানি কমিয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য, রাজা ও তামিনার আলাপ। পিতা-পুত্রীর কথাবার্তার মধ্যে হাস্য-তামাসার অবকাশ নাই। রাজার সংলাপে রাজকীয় গাম্ভীর্য এবং বুদ্ধিমত্তা ফুটিয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে, রুস্তম, তামিনা ও সোরাব এই তিনটি প্রধান চরিত্র বেশ খানিক বিকশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্যে মাতা-পুত্রের আলাপ খুব সংক্ষিপ্ত হইলেও সুন্দর। প্রোষিত-ভর্তৃকা তামিনার বিষণ্ণতা, মাতৃভক্ত সোরাবের মাতার দুঃখ দূর করিবার ব্যাকুলতা এবং শেষপর্যন্ত পিতৃ-সন্ধানের বাসনা সংলাপের মধ্য দিয়া নাট্যকার সঙ্গত ও স্বাভাবিকভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সংলাপ হইতে নাট্যকার অযথা উচ্ছ্বাস-প্রবণতাকে একেবারেই দূরে সরাইয়া রাখিয়াছেন। এতখানি সংযম তাঁহার অনেক নাটকেই দেখা যায় না। এখন হইতে

সংলাপ ও ঘটনা-সৃষ্টির দক্ষতা এই নাটকে বেশ ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সোরাবের বীরত্বকাহিনী শুনিয়া রুস্তমের অন্তর আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছে। রুস্তম যদিও জানেন, তিনি পুত্রহীন, তথাপি কেন যেন তাঁহার ধারণা হইতেছে যদি সোরাব তাঁহার পুত্র হন! ওদিকে রুস্তমের বীরত্বে মুগ্ধ সোরাবেরও মনে জাগিতেছে, এই প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা তাঁহার পিতা রুস্তমই হইবেন। একদিকে আফ্রিদ্ এবং হুজীবের ষড়যন্ত্রে সোরাব রুস্তমের পরিচয় হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, অন্যদিকে বালক সোরাবকে প্রতিদ্বন্দ্বী জানিয়া অভিমানে রুস্তম তাঁহার নিকট আত্মপরিচয় গোপন রাখিয়াছেন। এই অভিমানই সর্বনাশের পথ পরিষ্কার করিল। সোরাবের সমস্ত ব্যাকুলতা, জিজ্ঞাসা এবং যুদ্ধ-বিরতির অনুনয় উপেক্ষা করিয়া রুস্তম তাঁহার সহিত দ্বৈরথ-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। অন্যায় যুদ্ধে পুত্রহত্যা করিলেন। সোরাবের পিতৃ-পরিচয় জিজ্ঞাসার ব্যাকুলতা এবং রুস্তমের বীরত্বের অভিমান নাটকের ভিতর সুন্দর-ভাবে ফুটিলেও মাঝে মাঝে নাট্যকারের দুর্বলতাও দেখা যায়। রুস্তম ও সোরাব উভয়ই উভয়কে সন্দেহ করিতেছেন। রুস্তমের সন্দেহ, সোরাব তাঁহার পুত্র, সোরাবের সন্দেহ রুস্তম তাঁহার পিতা। উভয়ের বীরত্বে উভয়েই মুগ্ধ। কিন্তু সোরাব যখন রুস্তমের নিকট নিজের পিতৃপরিচয় দিয়াই ফেলিলেন রুস্তম তাহা ইচ্ছা করিয়াই যেন শুনিলেন না। তৃতীয় অঙ্ক, ষষ্ঠ দৃশ্যে সোরাব রুস্তমকে বলিতেছেন, তিনি রুস্তম হইলে সোরাব তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন না। রুস্তম সোরাবের এই উক্তির অর্থ বুঝিলেন অন্যরূপ,—বিংশতিবর্ষীয় বালক মহাবীর রুস্তমের প্রতি করুণা করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিতেছেন না। কিন্তু রুস্তমের নিকট এই কথা শুনিয়া সোরাব যখন বলিলেন, "জানো রুস্তম আমার কে," তখন কি রুস্তম একবার কৌতূহলী হইয়াও তাঁহার সহিত সোরাবের সম্পর্ক কি তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না? যদি না পারিলেন, তাহা হইলে প্রথমেই রুস্তমের মনে সোরাবের প্রতি পুত্র-সন্দেহ জাগানোর কোন্ নাটকীয় সার্থকতা ছিল? সোরাবও বহু লোককে নিজের পিতৃসন্ধান জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, রুস্তমকে কেন মুখ ফুটিয়া একবার জিজ্ঞাসা করিলেন না? সুতরাং প্রহসনাত্মক রূপ ত্যাগ করিয়া রচনাটি অন্তর্দ্বন্দ্বময় ঘটনাবহুল নাট্যরূপ ধারণ করিলেও উহা সার্থক নাটক হইতে পারে নাই। ভিতরে অসঙ্গতি বা দুর্বলতা রহিয়াছে। অসঙ্গতির চরম পরিচয় রহিয়াছে আফ্রিদ-চরিত্রে। প্রেম পিতৃভক্তি এবং দেশ-ভক্তি

সব কিছুর সঙ্গতি রক্ষা করিতে গিয়া নাট্যকার চরিত্রটিকে একেবারে অবাস্তব করিয়া তুলিয়াছেন। রূপকথার রাজ্যেও এমন চরিত্র মিলিবে না।

সোরাব-রুস্তমের ভিতরই দেশপ্রেমের রূপ দেখা গেল আফ্রিদ্‌-চরিত্রে। দ্বিজেন্দ্রলালের পরবর্তী নাটকগুলির মুখ্য আকর্ষণ এই দেশ-প্রেম। সোরাব রুস্তমের শেষের দিকে গীতিনাট্যের শৈলী ত্যাগ করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল কর্মময়, অন্তর্দ্বন্দ্ব-বহুল নাট্যশৈলীর প্রতি যে প্রবণতা দেখাইয়াছেন, তাহাই শেষ পর্যন্ত তাঁহার নাটকে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সোরাব-রুস্তমে গদ্য সংলাপ কম। প্রধান পাত্র-পাত্রীর সংলাপগুলি প্রধানতঃ গদ্য। 'সিংহল বিজয়ে' ইহার ব্যতিক্রম দেখা গেল। এই পরিবর্তন সব দিক দিয়া। এই নাটকে নাট্যকার অমিত্রাক্ষরের মোহ ত্যাগ করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু গভীর, গম্ভীর মনোভাব এবং তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের ভাষায় তিনি কাব্যোচ্ছ্বাসপূর্ণ গদ্য ব্যবহার করিতে শুরু করিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের গদ্য-সংলাপের বৈশিষ্ট্য যাহা কিছু তাহা 'সিংহল বিজয়' হইতে প্রকাশ পাইতে লাগিল। সোরাব-রুস্তমের মধ্যে যে দেশ-প্রেম সামান্য একটা অংশ গ্রহণ করিয়াছিল মাত্র, সিংহল বিজয়ে তাহার স্থান হইল প্রধান। দ্বিজেন্দ্রলালের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল বিপরীত চরিত্র সৃষ্টি করা। 'পাষাণী' নাটকে সেইরূপ চরিত্র দেখিয়াছি। নাট্যকার অহল্যার পাশাপাশি মাধুরীকে সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু কামনা ও ছদ্মনাময়ী, ঈর্ধ্যাপরায়ণা কুবেণীর পার্শ্বে ত্যাগের প্রতিমূর্তি, নিঃস্বার্থ-প্রেমের জীবন্ত বিগ্রহ লীলার চরিত্রটি অঙ্কন করিয়া নাট্যকার প্রেম ও কামের ভিতরকার পার্থক্যটি অতি সুন্দর করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কুবেণীর সকাম ভালবাসা বিজয়কে নিজের ভোগ্যবস্তু হিসাবে পাইতে চায়, তাঁহাকে বন্দী করিতে চায়। লীলা তাহার প্রেমাস্পদকে বিশ্বের কর্মক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়া তাহার পৌরুষ-দীপ্ত আত্ম-বিকাশ দেখিয়া তৃপ্ত ও মুগ্ধ হইতে চায়। একজন চায় পুরুষকে বাঁধিতে, আর একজন চায় তাহাকে মুক্তি দান করিতে।

'সিংহল-বিজয়' নাটকে দেখিলাম, নাট্যকার অকারণ, অসঙ্গত হাস্যরস সৃষ্টির প্রচেষ্টা ত্যাগ করিয়াছেন। কাহিনীর জটিলতা, গোপন ষড়যন্ত্র, নানা প্রকার বৃত্তি-প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব, যাহা উৎকৃষ্ট বিষাদান্ত নাটক সৃষ্টি করিতে পারে, নাট্যকার তাহারই স্ফুরণে দক্ষতা অর্জন করিয়াছেন। নায়ক-চরিত্র নাটকীয় ঘটনার উপর আরম্ভ হইতে শেষপর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিতেছে। নায়ক

নায়িকার চরিত্রের অন্তর্নিহিত সংস্কার বাহিরের প্রভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া পারিপার্শ্বিকের পর যে প্রতিক্রিয়া করে, তাহা হইতেই যে নাটকীয় কর্মের সৃষ্টি হয়, সিংহল বিজয় নাটকে নাট্যকার তাহা প্রথমে সঙ্গতভাবে দেখাইতে পারিয়াছেন। বিজয় সিংহ এই নাট্যের নায়ক। নাটকের আদ্যন্ত ঘটনা এই বিজয়-চরিত্রেরই ক্রম-বিকাশ। শৈশবে মাতৃহারা, বিমাতার ষড়যন্ত্রে নির্যাতিত, পিতৃ-উপেক্ষিত বিজয় সিংহ। তাঁহার জীবনের কাহিনীতে আদ্যন্ত নাট্য-ঘটনা গড়িয়া উঠিয়াছে। মাতৃ-উপেক্ষিতা, মাতৃ-প্রণয়ী-কর্তৃক অপহৃতরাজ্যা, অবমানিতা সিংহল-রাজ-নন্দিনী কুবেণী। বিজয়ের সহিত তাঁহার ভাগ্যের অপূর্ব সাদৃশ্য। তাই উত্তাল-তরঙ্গময় অকূল সমুদ্রে এই দুইটি নর-নারীর সাক্ষাৎ। যে 'বিপরীত সম-সত্তা'র 'মিলন-প্রবণতা' বিধি-নির্দেশের মতো অগ্রসর হইতেছিল, হঠাৎ তাহা আজ একমুখী স্রোতে মিলিয়া যাইবার পথ পাইল। কিন্তু বিজয় ও কুবেণীর মিলনের পথে বাধা অনেক। গৃহের অশান্তি বিজয়কে ভারতবর্ষ হইতে উৎক্ষিপ্ত করিয়া লঙ্কায় ছুটাইয়াছে। পারিবারিক অশান্তির ঘূর্ণি-বায়ু কুবেণীকে কন্যাকুমারিকার উপকূলে নিক্ষেপ করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের মিলন সহজ হইল না। প্রবাসী বিজয় বুঝিলেন, পিতার প্রতি অভিমান করিয়া দেশত্যাগ করা যায়, কিন্তু পিতৃস্নেহ ভুলিবার নয়; দেশের স্পর্শ-সীমার বাহিরে আসিয়াও অন্তরে অন্তরে দেশ-মাতার তীব্র আকর্ষণ অনুভূত হয়। নব-বিজিত রাজ্য, সুন্দরী প্রেয়সীর অন্তর-নিংড়ানো ভালবাসা, কিছুই আর তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। বিজয় ছুটিয়া চলেন। কুবেণী নারী। বিজয়কে তিনি একদিন গর্বভরে তাঁহার রাজ্য দিতে চাহিয়াছিলেন। অনিন্দ্যসৌন্দর্য বিজয়ী বীরকে উপহার প্রদান করিয়া তিনি তাঁহাকে কৃতার্থ করিবার গর্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশ-ভক্ত, অনাসক্ত পুরুষের নিকট হইল তাঁহার পরাজয়। যে পুরুষ নারীর সৌন্দর্যে বন্দী হইতে চাহে না, যে আপন শক্তি, সৌন্দর্য ও পূরণী-শক্তির প্রেরণায় উদ্দাম-গতিতে জগৎকে মুগ্ধ ও তৃপ্ত করিতে ছুটিয়া চলে, সেই পুরুষের এতটুকু ভালবাসার অধিকারিণী হইবার জন্য নারী উন্মাদিনী হইয়া ওঠে। কুবেণী তাই বারে বারে আহত হইয়াও বিজয়ের মোহ ত্যাগ করিতে পারেন না। এখানে তাঁহার পরাজয় বিজয়ের নিকট নহে। তাঁহার শ্রেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী বিজয়ের ছদ্মবেশিনী স্ত্রী লীলা। লীলা নারী-

চরিত্রের ত্যাগের দিক, কুবেণী ভোগের। লীলা চাহেন নিজের পরিচয়টুকু গোপন করিয়াও নিজের ভালবাসা ও সেবা দিয়া প্রিয়তমকে তুষ্ট ও পুষ্ট করিতে। সেখানে প্রতিদানের বাসনা নাই। কুবেণী চাহেন পুরুষের শৌর্য ও সৌন্দর্যকে নিজের রূপের ফাঁদে বন্দী করিয়া ভোগ করিতে। তাই তাঁহার আশ্রয় ছলনা। যে-প্রেমে আত্ম-নিবেদন নাই, আছে উপভোগের চাহিদা, সে দুর্বল ভালবাসা ঈর্ষ্যা-কণ্টকিত হইয়া সত্যকার প্রেমকে আঘাত করে,—সহ্য করিতে পারে না। তাই মরণের মধ্য দিয়া কুবেণীর উপর লীলার বিজয়-লাভ প্রেম-দুন্দুভি-নিনাদে বিঘোষিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগা বিজয়ের অভাগিনী পত্নী কুবেণী। রাজ্য, ঐশ্বর্য, প্রিয়তমা পত্নী, স্নেহময় পিতা সকলই বিজয়ের ছিল, কিন্তু সব পাইয়াও তিনি সর্বহারা। যে মুহূর্তে যাহাকে তিনি আঁকড়াইয়া ধরিতে গিয়াছেন, সেই মুহূর্তেই মনে হইয়াছে, তাহার সব মায়া।—কিছুই সত্য নয়। এ-সত্য কুবেণীও উপলব্ধি করিয়াছেন। তাই সমস্ত মায়ার আকর্ষণ হইতে যে মহামন্ত্র মানুষকে মুক্তি দান করে জীবন-সায়াহ্নে তাহাই বহন করিয়া সিংহলে আসিলেন বীর বিজয় সিংহ। কিন্তু কুবেণীর জীবন-দীপ তাহার পূর্বেই নির্বাপিত হইয়াছে। স্বামীর সান্ত্বনার বাণী বিরহিণী প্রেয়সীর কর্ণমূলে পৌঁছাইল না; লঙ্কার আকাশে বাতাসে তাহা ধ্বনিত হইতে থাকিল। 'সিংহল-বিজয়' নাটকের ইহাই 'সত্য'-বস্তু। তাই 'সিংহল-বিজয়' ঠিক ঐতিহাসিক নাটক নহে। ইহা ইতিহাসাশ্রিত রোমান্‌স্। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের অপূর্ব কল্পনাশক্তি ইহার মধ্যে স্ফূর্তি-লাভ করিয়াছে।

শৈলীর দিক দিয়া 'সিংহল-বিজয়' দ্বিজেন্দ্রলালের মোটামুটি ভাবে প্রথম সার্থক রচনা। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের নায়ক-নায়িকার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, বাহিরের ঘটনা তাহাদিগকে বেশী অভিভূত করে না, ঘটনা-সৃষ্টির মূল প্রেরণা থাকে তাহাদের অন্তরে। বহুপোষিত বিভিন্ন প্রবৃত্তি অন্তরের ভিতর তীব্র দ্বন্দ্ব তুলিয়া মানুষকে যখন ব্যাকুল করিয়া তোলে, তখন সেই অন্তর-প্রবৃত্তির জ্বালায় বাহিরে মানুষের যে আচরণ ফুটিয়া ওঠে, তাহাই নাটকীয় কর্ম। দ্বিজেন্দ্রলালের বৈশিষ্ট্য হইল, এই প্রবৃত্তিগুলিকে বাক্যে ও কার্যে উচ্ছ্বসিত করিয়া প্রকাশ করা। আবার একটি চরিত্রকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল তাহার ঠিক বিপরীত আর একটি চরিত্র সৃষ্টি করেন। ভাবের আবেগে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকেব পাত্র-পাত্রীর অন্তরই

শুধু থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে না, সংলাপও হইয়া ওঠে কবিত্বময়। সেই কাব্য-প্রবণতা অনেক সময় প্রয়োজনের মাত্রা অতিক্রম করিয়া যায়। চরিত্র ও সংলাপের এই বৈশিষ্ট্য সিংহল বিজয় নাটকেই প্রথম ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'সিংহল বিজয়ে'র ইতিহাস অস্পষ্ট। চন্দ্রগুপ্ত নাটকের কাহিনী-ভাগের ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। ঐতিহাসিক চরিত্র চাণক্যের সাহায্যে ঐতিহাসিক রাজপুত্র চন্দ্রগুপ্ত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নন্দ-বংশ ধ্বংস করেন। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক আদ্যন্ত রোমান্‌স্ নহে। কিন্তু এখানেও নাট্যকার কল্পনার অশ্ব অবাধে ছুটাইয়া দিয়াছেন। নন্দ-কর্তৃক অপমানিত মনীষী ব্রাহ্মণ চাণক্য নন্দ-বংশ ধ্বংস না-করিয়া শিখা-বন্ধন করেন নাই সত্য। কি এ-চাণক্য ইতিহাসের অতটুকু চাণক্য নহেন। ইনি বুদ্ধিমান, কূটকৌশলী, বিচক্ষণ। চাণক্যের যাদুমন্ত্রে শ্মশানে সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু বাহিরের এই মহাশক্তিমান চাণক্য অন্তরস্থিত স্নেহের নিকট শিশুর মতো দুর্বল। তাই চাণক্যের বিদ্রোহ শুধু নন্দ-বংশের বিরুদ্ধে নহে। চাণক্য গৃহহারা গৃহী, পত্নীহারা পতি, কন্যাহারা পিতা। বিধাতা তাঁহার স্নেহের পাত্রগুলিকে একে একে ছিনাইয়া লইয়াছেন। মাটির রাজার বিরুদ্ধেই তাই এই শক্তিমান ব্রাহ্মণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া ক্ষান্ত হইতেছেন না। তাঁহার বিদ্রোহ সৃষ্টির বিরুদ্ধে। চাণক্য তাই ধ্বংসের মূর্ত বিগ্রহ। তিনি বীভৎসতার পূজারী। ক্ষমা তাঁহার নিকট দুর্বলতা, পরোপকার মূর্খতা। নন্দ-বংশ ধ্বংস করিয়া তিনি যে মৌর্য-বংশ স্থাপন করেন, তাহা শূন্য-হৃদয় প্রেমিকের আত্ম-বিস্মৃতির অবসর-কাটানোর জন্যই মাত্র। উহার সহিত চাণক্যের লাভ-লোকসানের কোনো সম্পর্ক নাই। চাণক্যের চরিত্র এবং চাণক্যের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব নাটকে এতই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে যে, ইহার নিকট ইতিহাস ম্লান হইয়া গিয়াছে। নাটকের নাম-ভূমিকা চন্দ্রগুপ্তের নিজস্ব কোনো সত্তা নাই। তিনি চাণক্যের ক্রীড়নক মাত্র। তাঁহার মধ্যে ভ্রাতৃস্নেহ মাঝে মাঝে প্রবল হইয়া রাজ্য-লাভের বাসনা অবদমিত করিয়া দেয়। যদিও চন্দ্রগুপ্তের প্রেমের ত্রিভুজ রচনা এই নাটকে নাট্যকারের উদ্দেশ্য নহে, তবুও তিনি চন্দ্রগুপ্তকে ঘিরিয়া যে প্রেম-ত্রিভুজ অঙ্কন করিয়াছেন, তাহার পটভূমিকায় চন্দ্রগুপ্ত যে হেলেনকে কোনোদিন ভালবাসিয়াছিলেন, তাহার পরিচয়ের কোনো সুস্পষ্ট স্মৃতিরেখা নাটকের মধ্যে আমরা অঙ্কিত দেখি না। সেলুকাসের সহিত সন্ধির পূর্বমুহূর্তে চন্দ্রগুপ্তের হেলেনের প্রতি প্রেম-স্বীকারকে আমরা সহজে মানিয়া লইতে পারি না। আবার ওদিকে যে-

হেলেন এন্টিগোনাস্‌কে ভালবাসিতেন, তিনি 'আন্তর্জাতিক বলি' হিসাবে বিবাহ করিলেন চন্দ্রগুপ্তকে। ছায়া জানে যে, চন্দ্রগুপ্ত তাহাকে ভালবাসেন না, তবু নিয়তির দুর্নিবার আকর্ষণের মতো সে চন্দ্রগুপ্তকেই বরণ করিল। চন্দ্রগুপ্তের তুলনায় প্রতিনায়ক এন্টিগোনাসের চরিত্র অতি মহৎ, উদার ও কর্মময়। চন্দ্রগুপ্ত সেখানে নিতান্ত ম্লান। আবার চাণক্য যখন চন্দ্রগুপ্তকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তখন চাণক্যহীন চন্দ্রগুপ্ত যে রাজা হিসাবে নিতান্ত অযোগ্য তাহা প্রমাণিত হইয়া যায়। সুতরাং সর্বদিক দিয়াই চন্দ্রগুপ্তকে আমরা ব্যর্থ নায়ক বলিতে বাধ্য হই।

নাটকটির নামকরণ হইতেও চরিত্র-চিত্রণ ও ঘটনা-বিন্যাসে ত্রুটি বা অসঙ্গতি অনেক। চন্দ্রগুপ্তকে এই নাট্যের নায়ক বলা যায় না। কারণ চন্দ্রগুপ্তের চরিত্রের অভিঘাতে নাটকীয় ঘটনা গড়িয়া ওঠে নাই। প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে আমরা বিশ্ববিজয়ী বীর সেকেন্দার সাহের আশীর্বাণীর মধ্য দিয়া ধারণা করিয়াছিলাম যে, আলেক্‌জাণ্ডারের আশীর্বাদ-পূত এই বীর নিজের শক্তি ও বুদ্ধির বলে একদিন ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি হইবেন। আর ঐ যে তন্বীকুমারী চিত্রপুত্তলিকার মতো নির্বাক-বিস্ময়ে এই দৃশ্য দর্শন করিতেছে, সেই উহাকে একদিন বরমাল্য দিয়া বরণ করিবে। নাটকের পরিণতি হয়ত তাহাই হইয়াছে। কিন্তু প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে সমস্ত ঘটনা চাণক্যের হাতের মুঠার ভিতর চলিয়া গেল।

চাণক্যকে কি নায়ক বলিতে পারি? অবশ্যই বলিব। কেন না, নায়কের অর্থ যদি এই হয় যে, যিনি নিজের চরিত্র ও কর্মের দ্বারা নাটকীয় ঘটনা সৃষ্টি করেন এবং সেই ঘটনাকে পরিণতির দিকে লইয়া যান, তাহা হইলেও চাণক্যই এই নাটকের নায়ক। কিন্তু প্রশ্ন হইবে, ঘটনা তাহা হইলে কোথায় শেষ করিব? নায়কের অন্তর্নিহিত যে সংস্কারের প্রেরণায় সে আপন চিন্তা ও কর্মের সঙ্ঘাতে নাট্য-ঘটনা সৃষ্টি করে, যেখানে সেই বাসনার সমাপ্তি, নাট্য-কাহিনীরও সেইখানেই শেষ হইবে। তাহা হইলে যে অতৃপ্ত পিতৃস্নেহ বিক্ষুব্ধ হইয়া ধ্বংস-যজ্ঞ সূচনা করিয়াছিল, আত্রেয়ীকে ফিরিয়া পাওয়ার পর সেই স্নেহই চাণক্যের মধ্যকার সুপ্ত ব্রাহ্মণকে যখন জাগাইয়া তুলিল, তখনই তো নাটকের যবনিকাপাত হওয়া উচিত ছিল। হেলেন, ছায়া, চন্দ্রগুপ্তের প্রেমের জের টানিয়া নাট্য-সমাপ্তির আর তাহা হইলে

কোনো প্রয়োজনই থাকে না। কাহিনী-বিন্যাসের এই ত্রুটি নাটকটিতে রহিয়া গিয়াছে।

কালানৌচিত্য এবং পাত্রানৌচিত্য নামক আর দুইটি মারাত্মক দোষ এই নাটকটির ভিতর আছে। হেলেনের মধ্য দিয়া নাট্যকার আধুনিক যুগের প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য-মিলনের গীত শুনাইয়াছেন। ইহা অনৈতিহাসিক। বিদূষী হেলেন বাঙালী মোড়লের মা-মরা আদুরে মেয়ে। অত্যধিক স্নেহের জন্য তিনি পিতার মর্যাদা রক্ষা করিয়া কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। পিতাকে গাধার সঙ্গে তুলনা করিতে তাঁহার এতটুকুও সঙ্কোচ বোধ হয় না। ছায়ার বাক্য ও আচরণ পার্বত্য-কন্যা-সুলভ নহে। আধুনিক শিক্ষিতা কন্যার ভাষা তাহার মুখে। তাহার প্রেমের ব্যাপারে সাদা-কালো সমস্যা প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের বর্ণসমস্যারই নামান্তর। ঐতিহাসিক নাটকে অনৈতিহাসিক বস্তু ও ভাবের আয়োজন অবাঞ্ছিত। 'মেবার-পতনে' এই দোষ চরমে উঠিয়াছে। 'মানসী' দ্বিজেন্দ্রলালের মানসী-সৃষ্টি। উনবিংশ শতকের দীপ-কুমারী ফ্লোরেন্স্ নাইটিংগেলের আদর্শে নাট্যকার এই চরিত্রটি সৃষ্টি করিয়া তাহার সহিত গীতার নিষ্কাম প্রেমের মিশ্রণ ঘটাইয়াছেন।

মেবারপতন **:**—দ্বিজেন্দ্রলালের 'মেবারপতন' নাটকখানিকে এক কথায় ভাল বা মন্দ, সার্থক বা অসার্থক নাটক বলিয়া সংক্ষেপে সমালোচনা করা যায় না। এই নাটকখানির মধ্যে যেমন নাট্যশৈলী ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়া একখানি পূর্ণাঙ্গ সার্থক নাটকের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল, তেমনি নাট্যকার তাঁহার সৃষ্টি হইতে নিজেকে নির্লিপ্ত রাখিতে না পারায়, অর্থাৎ নাট্যোল্লিখিত চরিত্রগুলির মুখ দিয়া নিজের ধারণা ভাবনাগুলি রূপায়িত করিয়া তুলিবার জন্য, সেই সম্ভাবনা ব্যর্থ হইয়াছে। যে-সুরে তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন, পরিণতিতে সেই সুর একেবারেই পরিবর্তন করিয়াছেন। এইভাবে নিজের সৃষ্টিকে তিনি নিজেই নষ্ট করিয়াছেন। নাটকটির আলোচনা করিলেই আমরা এ কথার অর্থ বুঝিতে পারিব।

নাটকখানির আরম্ভ অতি সুন্দর। কোনো শ্রেষ্ঠ নাট্যকারই বোধ হয় ইহা হইতে সুন্দরভাবে এই নাটকখানি আরম্ভ করিতে পারিতেন না। শালুম্ব্রাপতি গোবিন্দ সিংহ পুত্র অজয় সিংহের সহিত মধ্যাহ্নবেলায় আপন কুটিরে দাঁড়াইয়া আলাপ করিতেছিলেন। মেবারের একটি সংকটজনক অবস্থা আজ

উপস্থিত হইয়াছে। মোগলসৈন্য মেবার আক্রমণ করিতে আসিতেছে। রাণা অমর সিংহ সন্ধি করিবেন ইচ্ছা করিয়া আগামী প্রভাতে সামন্তদিগকে সভাগৃহে উপস্থিত হইতে আহ্বান জানাইয়াছেন। অমর সিংহের রাজসভায়ই তো এই দৃশ্যের অবতারণা হইতে পারিত। কিন্তু গোবিন্দ সিংহের কুটিরে এ বিষয়ে প্রথম আলোচনার দৃশ্যকে আমরা দেখিতে পাই কেন? বিপদে-আপদে, উৎসবে-ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে রাণা প্রতাপ সিংহের যাঁহারা নিত্যসহচর ছিলেন, তাঁহার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া যাঁহারা দেশ ও জাতির মর্যাদা রক্ষার্থে সারাজীবন যুদ্ধ করিয়াছেন, কঠোর দারিদ্র্য বরণ করিয়াও মর্যাদা বিসর্জন দেন নাই, সেই স্বদেশবৎসলদের মধ্যে জীবিত আছেন মাত্র গোবিন্দ সিংহ। রাণা অমর সিংহ পিতার আদর্শ ভুলিয়া গেলেও গোবিন্দ সিংহ রাণা প্রতাপের আদর্শ ভোলেন নাই। গোবিন্দ সিংহ বর্তমান থাকিতে তাই মোগলের সঙ্গে সন্ধি হইতে পারে না। তাই গোবিন্দ সিংহের কুটিরেই নাট্যকাহিনীর উদ্বোধন হইল। কিন্তু কালের স্রোত রোধ করিবার ক্ষমতা যে বৃদ্ধ গোবিন্দ সিংহের আর নাই, যৌবনে যে তরবারি তিনি সঞ্চালন করিয়া দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়াছেন, সে তরবারি তুলিবার ক্ষমতা যে আজ এই বৃদ্ধের নাই, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন। তাই নাটকের একটা করুণ, বিষাদময় পরিণতির আভাস এই আরম্ভের দৃশ্যেই ফুটিয়া ওঠে। নাটকের শেষে গোবিন্দ সিংহের কন্যা কল্যাণী: উক্তি দর্শকের মনে একটি বিস্ময়মিশ্রিত প্রশ্ন জাগায় "যদি জান্তে বাবা! যদি বুঝ্‌তে!" দেশপ্রেমের আবেগে অভিভূত এই বৃদ্ধ কী কথা বুঝিতে পারেন নাই? এই দেশপ্রেমের বিরুদ্ধে তাঁহার নিজের রক্তই যেন কোন্ সর্বনাশা বিদ্রোহের সূচনা করিতেছে। কিছু বুঝা না গেলেও দর্শক এইটুকু অনুমান করিতে পারে যে, কঠোর দেশপ্রেমিক গোবিন্দ সিংহ যেমন প্রাণ দিয়াও স্বদেশের মহিমা রক্ষা করিবেন, কিছুতেই সন্ধি হইতে দিবেন না, তেমনি এই গোবিন্দ সিংহের ঘরের মধ্যেই তাঁহার কন্যা তাঁহার দেশপ্রেমকে সংকীর্ণ ভাবচেতনা বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিমান পোষণ করিয়া চলিয়াছে। সুতরাং নানা বিরুদ্ধ-ভাবের সংঘাতে নাট্য-কাহিনী দ্বন্দ্বীভূত হইয়া উঠিবে ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। সুতরাং নাটকের আরম্ভটি সত্যই চমৎকার। দ্বিতীয় দৃশ্যে আমরা দেখিতে পাই, দেশপ্রেমের আবেশে অভিভূত হইয়া মেবারের নারীগণ পথে পথে জাতির অতীত গৌরব-গাথা গাহিতে গাহিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। সুতরাং যে জাতির নারীপুরুষ সকলেই

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, বহিরাগত শত্রুর পক্ষে সে জাতিকে সহজে বশীভূত বা পরাজিত করা সম্ভব নয়। রাণা অমর সিংহ সন্ধি করিতে চাহিলেও তাঁহার দেশবাসী তাঁহাকে সন্ধি করিতে দিবে না। কারণ রাজা একা কোনো জাতির প্রতিনিধি নহেন। রাজ্যের আপামর জনসাধারণকে লইয়াই জাতি। এই জনমতের নিকট রাজাকেও মাথা নত করিতে হয়। রাণা অমর সিংহের রাজসভায় সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপনের পূর্বে নাট্যকার মেবার রাজ্যের নরনারীর স্বদেশপ্রীতি সম্বন্ধে আমাদিগকে অবহিত করাইয়া লইলেন। তৃতীয় দৃশ্যে রাণা অমর সিংহ এই জনমতেরই সম্মুখীন হইবেন।

'মেবারপতন' নাটকের নায়ক রাণা অমর সিংহকে বিলাসপ্রিয়, দুর্বল, স্বদেশপ্রীতিহীন, কাপুরুষ বলিয়া অভিহিত করিতে আমার প্রবল আপত্তি আছে। আর সে আপত্তি যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই আমি মনে করি। রাজনীতির দিক দিয়া বিবেচনা করিতে গেলে রাণা অমর সিংহকে বুদ্ধিমান, দূরদর্শী রাজা বলিয়াই মনে হইবে। জাতির জীবনে দেশপ্রেমিকতা, স্বাধীনতাপ্রীতি প্রভৃতি অত্যুচ্চ ভাব-সম্পদ, সন্দেহ নাই, কিন্তু একথা নির্মম, নিষ্ঠুর সত্য, যে অতিপরাক্রান্ত, দুর্বার শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সমূহ ধ্বংস হওয়ার চেয়ে সন্ধি করিয়া আত্মরক্ষা করা অনেক ভাল। মোগল নামেমাত্র মেবার অধিকার করিত। সামান্য কর দিলেই সে সন্তুষ্ট থাকিত। মেবারের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় সে হস্তক্ষেপ করিত না বা মেবারের সমৃদ্ধিও সে নষ্ট করিত না। রাণা অমর সিংহ বুদ্ধিমানের মতো দেশের সম্পদ এবং দেশের মানুষ-গুলিকে বাঁচাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু মেবারের সৈন্য-সামন্ত ও জনগণ দেশপ্রেমের ভাবের বন্যায় যুক্তি এবং দূরদৃষ্টি ভাসাইয়া দিয়া নিজেরাও মরণ-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে প্রস্তুত হইল। রাণা অমর সিংহ যুক্তির পর যুক্তি দিয়া প্রাণপণ শক্তিতে সামন্তদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। সামন্তদিগের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি মোগলদূতের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু এমন সময়ে রাজসভায় সত্যবতী প্রবেশ করিয়া পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করিয়া দিলেন। রাণা পরিষ্কার বুঝিতে পারিলেন, দেশের নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে সমগ্র জাতি যখন স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হয়, তখন সে জাতিকে কেহ অবদমিত করিতে পারে না। সুতরাং তিনি যুদ্ধ করিবেন বলিয়া মনস্থ করিলেন। ভাবের বন্যাবেগে যুক্তির বাঁধ এমনি করিয়া বারে বারে ভাঙিয়া যায়।

প্রবলপরাক্রান্ত মোগলশক্তির বিরুদ্ধে সমগ্র মেবার যে এইভাবে রাণা অমর সিংহের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হইয়া মরণযুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, রাণার সন্ধির প্রস্তাব বাতিল করিয়া দিয়াছিল ইহা ঐতিহাসিক সত্য। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল সেই সত্যকে নাটকে রূপ দিয়াছেন মাত্র। বিংশ শতকের নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার দেশবাসীর সম্মুখে এমনিতরো দেশ-প্রেমের একটা মহান্ আদর্শ তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছিলেন। এখানকার মহাপরাক্রান্ত মোগলশক্তি প্রবলপরাক্রান্ত ইংরেজেরই প্রতিনিধিমাত্র। দ্বিজেন্দ্রলাল পরোক্ষে তাঁহার দেশবাসীকে এই কথাই বলিতে চাহিলেন, দেশের শত্রু ইংরেজ যত শক্তিশালীই হোক না কেন, দেশের আপামর জনসাধারণ যদি নারীপুরুষ নির্বিশেষে তাহাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়, তাহা হইলে জাতির বিজয় অবশ্যম্ভাবী। আর জয়-পরাজয়ের চিন্তা বিসর্জন দিয়া স্বাধীনতা বা স্বদেশপ্রীতির জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হওয়াই জাতির মহনীয় কর্তব্য। এখানে মেবারের রাজপুতগণ সেই কর্তব্যের জন্য প্রস্তুত হইল।

কিন্তু দেশপ্রেমের এই উচ্চগ্রামের সুর নাট্যকার শেষ পর্যন্ত রক্ষা করিতে পারেন নাই। ইহার সহিত সম্পূর্ণ বিরোধী একটি ভাবের সংঘাত ঘটাইয়া নাট্যকার নিজের আয়োজনকে নিজেই পণ্ড করিয়াছেন। একাধারে দেশপ্রেম এবং বিশ্বপ্রেম দুইটি সবসময়ে মানিয়া চলা সম্ভব নয়। স্বীকার করিতে আপত্তি নাই যে দেশপ্রেমও বড় আকারের স্বার্থপরতা। 'জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়' যে অনেক সময়ে ধর্মকে 'বলের বন্যায়' ভাসাইয়া লয় এবং স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত বাধাইয়া লোভে লোভে আগুন জ্বালাইয়া দেয়, একথা সত্য। তবুও দেশকাল-পাত্র-ভেদে দেশপ্রেমের প্রয়োজন আছে। বিশেষ করিয়া যে জাতি দুর্বল, পরাজিত বা প্রবল শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত, সে যদি দেশপ্রেম বিসর্জন দিয়া বিশ্বপ্রেমে মত্ত হইতে যায় তাহা হইলে তাহার মৃত্যু অনিবার্য। মেবারের দ্বারদেশে প্রবল শত্রু মোগল উপস্থিত। এই সময়ে মেবারী রাজপুতদের সম্মুখে দুইটি পথ খোলা ছিল। একটি হইল মোগলের সহিত সসম্মানে সন্ধি করিয়া মেবারবাসীর জীবন ও সম্পদ রক্ষা করা। কারণ, মোগল সামান্য কর পাইলেই সন্তুষ্ট থাকিত। তাহারা মেবারকে নামে মাত্র বশীভূত রাখিতে চায়। রাণা অমর সিংহ সেই পথই বাছিয়া লইতেছিলেন। অন্যপথ হইল, জীবন, সম্পদ সব কিছু বিসর্জন দিয়া স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়া মৃত্যু বরণ করা। ইহাতে সব গেলেও একটি জাতির গৌরব এবং আত্মদান

ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে। মেবারবাসী সেই গৌরবের পথই বাছিয়া লইয়াছিল। ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের স্থান কোথায়? এই চরম সংকটের মুহূর্তে মেবারবাসীর মনে দেশপ্রেম বাদ দিয়া বিশ্বপ্রেমের কোনো ধারণা আসিতেই পারে না। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার মানসকন্যা মানসীর মধ্যে এই বিশ্বপ্রেমের জাগরণ করাইয়া নাটকের মূল সুরের মধ্যে আর একটা নূতন সুর প্রবাহিত করাইয়াছেন। আমাদের প্রশ্ন হইল এই যে, এই বিশ্বপ্রেমের সুরটি নাটকের মূল ভাবের অনুগ কি না? ইহার দ্বারা মূলভাব পুষ্ট হইয়াছে কি না? আমরা বিচার করিলে দেখিতে পাইব, মানসীর চরিত্র দ্বারা 'মেবারপতন' নাটকের মূল কাহিনী বা চরিত্র এতটুকুও প্রভাবিত হয় নাই। এই চরিত্রটি নিতান্ত পরাশ্রয়ী পরগাছার মতো মূল কাহিনীর উপর অনর্থক অবাঞ্ছিত বোঝা হইয়া চাপিয়া রহিয়াছে। তাহার কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠা এবং শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে আহত সৈন্যদের শুশ্রূষা মূল কাহিনীর গতি পরিবর্তনে বা নিয়ন্ত্রণে এতটুকু সাহায্য করে নাই। অজয়ের সঙ্গে তাহার ব্যক্তিগত প্রেমের যে অনু-কাহিনী এই নাটকে দেখা যায়, তাহার সঙ্গে মেবারবাসীর এই জীবনমরণ-সমস্যার বিন্দুমাত্র যোগ নাই। এইদিক দিয়া 'কল্যাণী'র চরিত্র বরং মূল কাহিনী এবং ভাবধারার উপর কিছু প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছে।

স্বদেশভক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল ভারতবাসীর স্বদেশভক্তির মধ্যে দুইটি দুর্বলতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। দেশপ্রেম কোনো বিশেষ দেশের অধিবাসীর মধ্যে একটা নিবিড় ভাবের ঐক্য আনিতে পারে বটে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির মধ্যে একটা বিদ্বেষ, রেশারেশি বা স্বার্থপরতার সম্পর্ক স্থাপন করে। ভারতবাসী যদি 'সারা জাহাঁসে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা' বলিয়া গর্ববোধ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি হইবার সাধনা করে, তাহা হইলে প্রতিবেশী পারস্যদেশীয়েরা ঐ একই সুরে একই কথা বলিবে না কেন? ফলে প্রতিবেশী উভয়দেশের মধ্যে অনৈক্য এবং বিদ্বেষের সম্পর্ক গড়িয়া ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনের ফলে মানুষে-মানুষে, দেশে দেশে, পরিচয়ের গণ্ডী যখন বিস্তৃত হইয়া চলিয়াছে, তখন সংকীর্ণ দেশপ্রেম আঁকড়াইয়া না রহিয়া 'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে সে জাতির নাম মানুষ জাতি' মনে করিয়া সমস্ত মানুষ মিলিয়া 'one world' (একই বিশ্বপরিবার) গড়িয়া তুলিবার সাধনা করায় তো পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের পরিচয়। অন্যদিকে যদি মনে

করি, ভারতবর্ষের পক্ষে পরাধীনতার শৃংখল হইতে মুক্তিলাভের জন্য দেশপ্রেমই বিশ্বপ্রেমের চেয়ে বেশি প্রয়োজন, তবুও আমরা দেখিব যে দ্বিজেন্দ্রলাল দেখিলেন যে হিন্দু মুসলমানের ধর্মীয় বিভেদ বা সাম্প্রদায়িকতা আমাদের এই দেশপ্রেমে এমন ফাটল ধরাইতেছে যে শেষ পর্যন্ত নিজেদের বিভেদ-বুদ্ধির জন্য বিদেশী ইংরাজকে তাড়ানো অসম্ভব হইয়া পড়িবে। দ্বিজেন্দ্রলাল তাই হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথাও 'মেবারপতন' লিখিতে গিয়া ভাবিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল দেখিয়াছেন, আজ যাহারা বিধর্মী মুসলমান বলিয়া হিন্দুদের সঙ্গে সহযোগিতা করিতেছে না, বরং বিরোধিতা করিয়া যাইতেছে, তাহাদের শতকরা নব্বই জনেরও বেশির ভাগ এদেশেরই ধর্মান্তরিত হিন্দু। হিন্দু সমাজের অত্যাচার এবং অনুদারতার ফলেই ইহারা মুসলমান হইতে বাধ্য হইয়াছে। এই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যদি মিলন না হয়, তাহা হইলে ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলন একেবারেই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তাই 'মেবারপতন' নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল মোগল-সেনাপতি মহাবৎ খাঁকে এই ধর্মান্তরিত হিন্দুদের প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, অবশ্য মহাবৎ খাঁ যে সগর সিংহের ধর্মান্তরিত পুত্র মহীপৎ সিং, এই জনশ্রুতির কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। তিনি জন্মসূত্রেই মুসলমান এবং অভারতীয়। তবুও দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার নাটকীয় উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য চরিত্রটিকে এইভাবে রূপ দিয়াছেন। ধর্ম সম্বন্ধে বিংশ শতকের মানুষের বোধ আর সপ্তদশ শতকের মানুষের বোধ এক নয়। তাই বিংশ শতকের বোধ সপ্তদশ শতকের মানুষের উপর আরোপ করিতে গেলে কালানৌচিত্য দোষ বা anachronism দেখা দিবেই। বিংশ শতাব্দীর মানুষ হয়তো ভাবিতে পারে, ধর্মে ধর্মে বিভেদ বিশেষ কিছুই নাই। ধর্ম ত্যাগ করিলে মানুষ অমানুষ হইয়া যায় না। তাহার মধ্যে দয়াধর্ম, নীতিজ্ঞান, জীবকল্যাণবোধ, সচ্চরিত্রতা, কর্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতি শাশ্বত মনুষ্যধর্মের নীতিগুলি অবশ্যই বিদ্যমান থাকিতে পারে। 'মেবারপতন' নাটকের কল্যাণীর মধ্যে এই ধর্মনিরপেক্ষ মনুষ্যত্ববোধের একটা আদর্শ বিদ্যমান ছিল। তাই তাহার ধর্মান্তরিত স্বামী মহীপৎ সিং অর্থাৎ মহাবৎ খাঁও, তাহার চক্ষে দেবতা। এই দেবমূর্তির স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া কল্যাণী পিতার দেশপ্রেমকে অস্বীকার করিয়া স্বামীর সন্ধানে পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল চাহিয়াছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ মনুষ্যত্ববোধের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের নরনারীর দাম্পত্যজীবনের

মিলন ঘটাইতে। তাঁহার এই ইচ্ছা সমাজনীতি ও বিজ্ঞানের দিক দিয়া কতখানি সমর্থনযোগ্য সে বিচার আমরা এখানে করিতে চাহি না। তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন, আমরা তাহাই আলোচনা করিতেছি মাত্র। কিন্তু কল্যাণী যখন দেখিল যে তাহার কল্পিত মানব, বীর মহাবতের আদেশেই সৈন্যগণ নিরীহ প্রজাদের ঘরবাড়ি জ্বালাইয়া দিতেছে, নারীর উপর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে, তখন তাহার স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। মহাবতের অমানুষিকতা তাহার চক্ষে প্রকট হইয়া উঠিল। আমাদের বক্তব্য হইল এই যে, ষোড়শ সপ্তদশ শতকের কোনো রাজপুত সামন্তকন্যা এইরূপ ধর্মনিরপেক্ষ মনুষ্যত্বের ধারণা পোষণ করিতে পারে কি না? সেই যুগের ধর্মীয় সংস্কারের পটভূমিকায় ইহা সম্ভব নয়। তাই কল্যাণী-চরিত্র এই নাটকে অবাস্তব। উহার মধ্য দিয়া নাট্যকারের প্রচারবাদই মূর্তিলাভ করিয়াছে। তাই এই চরিত্রটি অনাটকীয়। বিশেষ করিয়া স্বাদেশিকতাবোধের যে মহামন্ত্রের প্রভাবে একটি জাতি নিশ্চিত পরাজয় জানিয়াও হাসিতে হাসিতে মরণের মুখে ছুটিয়া চলে, জাতিধর্ম নিরপেক্ষ বিশ্বমানবতাবোধ তাহাদের পথে বাধা সৃষ্টি করে, নূতন কোনো প্রেরণা বহন করিয়া আনে না। কল্যাণীর চরিত্র তাই বিপরীত সজ্ঞাতে গোবিন্দ সিংহের চরিত্রকে অনেকখানি বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে। দেশপ্রেমে উৎসর্গিতজীবন গোবিন্দ সিংহ। মুসলমানকে তিনি ঘৃণা করেন তাহারা ভিন্নধর্মী বলিয়া নয়। এই জাতি মেবারের শত্রু। মেবারবাসী তাহাদের কোনো ক্ষতি না করিলেও এই জাতি শুধু গায়ের জোরে মেবারের স্বাধীনতা হরণ করিতে চায়। মহাবৎ খাঁ ইহাদের সাহায্যকারী এবং সেনাপতি। তাই মহাবতের প্রতি গোবিন্দ সিংহের রোষ ও ঘৃণার উদ্রেক হয়। গোবিন্দ সিংহ যখন জানিতে পারিলেন যে তাঁহার কন্যা এখনও এই দেশের শত্রুর প্রতি ভালবাসা পোষণ করে, তখন তিনি কন্যাকে এবং সেই কন্যার সমর্থনকারী ভ্রাতা অজয় সিংহকেও বিসর্জন দিলেন। দেশের জন্য বৃদ্ধ গোবিন্দ সিংহ পুত্র কন্যা এবং নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হইলেন।

মহাবৎ খাঁকে মেবারী রাজপুত করিয়া দেখানোর ফলে নাট্যকারের আর একটি মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। দেশের মাটির প্রতি মমতা কোনো অবস্থায়ই মরিবার নয়। ধর্মান্তরিত মহাবৎ জানেন যে দেশবাসী আর কিছুতেই তাঁহাকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিবে না; তিনি সগৌরবে আর মেবারে বাস করিতে পারিবেন না। তবুও যে দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই

দেশের প্রতি সহজাত মমতাবোধেই তিনি মেবারযুদ্ধে সেনাপতিত্ব করিতে সম্মত হন নাই। দেশত্যাগী এবং ধর্মত্যাগী ব্যক্তিরও স্বদেশের প্রতি কতখানি মমতা।

এই নাটকে দেশপ্রেম যতখানি গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, দ্বিজেন্দ্রলালের অন্য কোনো নাটকে উহা ততখানি প্রভাব বিস্তার করে নাই। সগর সিংহ রাণা প্রতাপ সিংহের ভ্রাতা। তিনি মূর্খ এবং স্বার্থপর। সত্য সত্যই তাঁহার কোনো গুণ নাই। রামায়ণ-কাহিনীর নামও তিনি শুনেন নাই। নিজের প্রাণটা বাঁচানোই তিনি একমাত্র কর্তব্য বলিয়া মনে করেন। তাই এই কাপুরুষটি শুধু প্রাণে বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই মোগলের দাসত্ব বরণ করিয়াছিলেন। এহেন কাপুরুষ, কুলকলঙ্ক ব্যক্তিও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়া দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন করিতে পারেন। সগর সিংহের মধ্য দিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল দেশপ্রেমের এই মহনীয় গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং 'মেবারপতন' নাটক পাঠ করিয়া বা উহার অভিনয় দেখিতে দেখিতে একথা মাঝে মাঝে অবশ্যই মনে হয় যে দেশের চেয়ে বড় আর কিছু নাই এবং থাকিতেও পারে না। তাই এই দেশপ্রেমের প্রচণ্ড ভাবোচ্ছ্বাসের মধ্যে বিশ্ব-প্রেমের ক্ষীণ বুদ্বুদ সৃষ্টি না হইলেই ভাল হইত। বিশেষ করিয়া নাটকের সমাপ্তিতে রাণা অমর সিংহ এবং মোগল-সেনাপতি মহাবৎ খাঁকে আবার মানুষ হইতে আহ্বান জানাইয়া বিশ্বপ্রেমের গান শুনানো নিতান্ত অবাস্তব, অসঙ্গত ও অনর্থক হইয়াছে। সপ্তদশ শতকের মোগল এবং রাজপুত মিলিয়া মেবারের রণভূমিতে কী অভিনব মিলন সঙ্গীত রচনা করিবে তাহা আমরা বুঝিয়া পাই না। হিন্দু মুসলমানের মিলিত সাধনায় স্বাধীন, সুন্দর, সোনার ভারত গড়িয়া তুলিবার স্বপ্ন তো এই বিংশ শতকের।

কিন্তু জাতীয় চরিত্রের একটি দুর্বলতা দ্বিজেন্দ্রলাল এই নাটকে অতি সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বহিঃশত্রু এদেশের যতখানি অকল্যাণ ও সর্বনাশ সাধন করিয়াছে, তাহার বেশি করিয়াছে ঘরের শত্রুরা। অথচ তাহারা আমাদেরই স্বজাতি, আমাদেরই রক্ত, আমাদেরই ভাই। ব্যক্তিগত হীনমন্যতা, ঈর্ষ্যা প্রভৃতির জন্য এই ধরনের ব্যক্তিগণ স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধে বিদেশীর সঙ্গে মিলিত হইয়া দেশের ও দশের শত্রুতা সাধন করিয়াছে। ইহা শুধু এইযুগের ব্যাপার নয়। ভারতবর্ষে জয়চাদ থেকে জগৎশেঠ পর্যন্ত ইহাদিগের ধারা বিস্তৃত। এই ধরনের একটি চরিত্র গজ সিংহ। মোগলপদলেহী, এই অপদার্থটি রাণা

অমর সিংহকে শ্রদ্ধা দিতে পারে না, যেহেতু রাণাও তাহার মতো মোগলের ক্রীতদাস হন নাই। শুধু তাহাই নয়, রাণা যাহাতে পরাজিত হইয়া মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন সেজন্য এই মর্যাদাবোধহীন অপদার্থটি মোগলবাহিনীর সঙ্গে মেবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসে। পরাজিত রাণার অপমানে উল্লসিত হইয়া সে তাঁহাকে আরো অপমানিত এবং লাঞ্ছিত করিবার জন্য মহাবৎ খাঁকে অচিরে মেবার অধিকার করিতে বলে। স্বদেশী যুগে যে সকল ভারতীয় ইংরাজের দেওয়া চাকুরীর লোভে বা বড় রকম পুরস্কারের আশায় অগ্নিযুগের বিপ্লবী ছেলেদের ধরাইয়া দিয়াছে, স্বদেশপ্রেমিক স্বেচ্ছাসেবকদের বেত্রাঘাতে জর্জরিত করিয়া তাহাদের রক্তে কারাপ্রাচীর রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছে, এই গজ সিংহ তাহাদেরই পূর্বপুরুষ.।

এইবার আমরা নাটকখানির শিল্পগত দোষগুণের কিছুটা বিচার করিব। কেহ কেহ অভিযোগ করিয়া বলিয়াছেন যে 'মেবারপতন' নাটকে সত্যকার কোনো নায়ক নাই। তাঁহারা রাণা অমর সিংহকে নায়কের মর্যাদা দিতে চান না। অমর সিংহের মধ্যে নাটকীয় কর্মের অভাব তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন। এ-বিষয়ে আমার বক্তব্য ভিন্ন। নায়ক-বিহীন নাটক কল্পনা করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। যিনি আপন কার্য ও বাক্যের সাহায্যে, অর্থাৎ আপন চরিত্রের অভিব্যক্তিতে, নাটকীয় ঘটনাকে বিকশিত করিয়া পরিণতির দিকে লইয়া যান, অথবা যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া নাটকের ঘটনা আবর্তিত হইতে হইতে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়, তিনিই নাটকের নায়ক। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে রাণা অমর সিংহকেই আমরা নাট্যের নায়ক বলিব। 'মেবারপতন' মেবারী রাজপুতদের স্বাধীনতা রক্ষার শেষ যুদ্ধের বিষাদ-করুণ ইতিহাস। এই ট্রাজেডীর নায়ক ভাগ্যহত রাণা অমর সিংহ। সমস্ত ঘটনার কেন্দ্রে এই চরিত্রটি অবস্থান করিয়া নাটকের যোগসূত্র বজায় রাখিয়াছে। অমর সিংহ ভীরু, কাপুরুষ বা কর্মবিমুখ নহেন। তিনি বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্। তিনি জানেন, মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া মোগলের বিশাল বাহিনীর আক্রমণ রোধ করা যাইবে না। তাই মোগল যখন সামান্য কর পাইলেই সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইবে, তখন তিনি দেশবাসীর ঐশ্বর্য এবং প্রাণ নষ্ট করিবেন কেন? তাই তিনি মোগলের সহিত সম্মানজনক শর্তে সন্ধি করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহারা কোনোদিন অন্যের নিকট মাথা নত করেন নাই, রাণা প্রতাপের সঙ্গে যাঁহারা কঠোর দারিদ্র্য বরণ করিয়া বনে জঙ্গলে

ঘুরিয়া জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দেশের স্বাধীনতার জন্ত যুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারা বা তাঁহাদের বংশধরগণ মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিবেন কেন? তাই মেবারের সামন্তগণ একবাক্যে সন্ধির বিরোধিতা করিলেন। কিন্তু একটা কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে মেবাররাজ্য গণতন্ত্র নয়। রাণা ইচ্ছা করিলে সামন্তদের কথা উপেক্ষা করিয়া মোগলের সঙ্গে সন্ধি করিতে পারিতেন। রাজভক্ত সামন্তগণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাণার আদেশ মানিয়া লইতেন। কিন্তু দেখা গেল, রাণা নিজেও যুক্তি-বিবেচনা, ভবিষ্যৎ-পরিণামজ্ঞান সমস্ত বিসর্জন দিয়া যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইলেন। সামন্তগণের যুক্তি যাহা করিতে পারিল না, সত্যবতীর আবির্ভাবে তাহা সম্ভব হইল। রাণা বুঝিলেন, যে জাতির নারীপুরুষ সকলেই স্বাধীনতার জন্ত প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তাহাকে এই গৌরবজনক মৃত্যুই বরণ করিতে দেওয়া উচিত। দেশতো শুধু মাটি নয়। সেই মাটির সন্তান যাহারা, তাহারা যদি স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত নিজেদের দেহের রক্ত দান করিয়া মাতৃভূমিকে বিরঞ্জিত করিতে চায়, তাহা হইলে রাণা একা বাধা দিতে যাইবেন কেন? সৈন্ত-সামন্ত এবং জনগণের সঙ্গে রাণা অমর সিংহ নিজেও স্বদেশপ্রেমে মত্ত হইয়া উঠিলেন। সমগ্র একটা জাতির এতখানি দেশপ্রেমের অভিব্যক্তি দ্বিজেন্দ্রলালের আর কোনো নাটকে প্রকাশ পায় নাই। বাংলা নাট্য-সাহিত্যেও দেশপ্রেমের এতখানি উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তি অন্ত কোনো নাটকে মিলিবে না।

রাণা অমর সিংহ মোগলের সহিত প্রথম বারের যুদ্ধে জয় লাভ করিলেন। সৈন্ত-সামন্ত সকলেই উল্লসিত। কিন্তু রাণার মনে উল্লাস নাই। তিনি জানেন যে পরাজিত মোগল একবার যুদ্ধ করিয়াই নিরস্ত হইবে না। এবার সে তাহার সমস্ত সৈন্ত লইয়া মেবারে আসিয়া হানা দিবে। তাহাই হইল। মোগল আবার মেবারে যুদ্ধের জন্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু রাণা যুদ্ধ করিতে অসম্মত। কারণ রাণা জানেন, প্রথমবার জয়লাভ করিতে তাঁহাকে অনেক সৈন্ত হারাইতে হইয়াছে। এবার হয়তো সমস্ত সৈন্ত নষ্ট করিয়াও যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব হইবে না। কিন্তু মেবারী রাজপুত জয় চায় না। স্বাধীনতার জন্ত বীরের মতো যুদ্ধ করিয়া রণক্ষেত্রে প্রাণ দিতে চায়। এই প্রাণদানেই জাতির গৌরব। এবারও তাই সত্যবতীর যুক্তির নিকট রাণা পরাজয় স্বীকার করিলেন। দেশ-প্রেমের জন্ত এবারও সমগ্র জাতি মরিতে চলিল। রাণা যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হইলেন। শাহাজাদা পরভেজ মোগলবাহিনীর

অধ্যক্ষ হইয়া আসিলেন। কিন্তু রাজপুতগণ প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করিল। পরাজিত পরভেজ পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। উদয়পুরের সভাগৃহ বিজয়োল্লাসে মুখরিত হইয়া উঠিল। রাজকবি কিশোরদাস রাজা অমর সিংহকে বিজয়সঙ্গীত গাহিয়া শুনাইলেন। কিন্তু সমগ্র মেবারের এই বিজয়-উল্লাসের মধ্যে একটিমাত্র ব্যক্তিই বিষণ্ণ এবং গম্ভীর। তিনি রাণা অমর সিংহ। রাজা এবং প্রজার চিন্তাধারার পার্থক্যটুকু আমরা যেন লক্ষ্য করিতে ভুলিয়া না যাই। দেশের সৈন্য-সামন্ত নরনারী সকলেই জানে দেশের মাটি তাহাদের, দেশের অতীত কৃষ্টিও তাহাদের। এই দেশের মাটির জন্য এবং কৃষ্টির জন্য প্রাণপাত করায় যে গৌরব এবং আনন্দ তাহা অপর কিছুতে নাই। কিন্তু রাণা জানেন যে মাটিটুকুই শুধু দেশ নয়। দেশের নরনারীগণই রাজ্যের প্রধান সম্পদ। তাহারাই যুদ্ধে মরিয়া যদি নিঃশেষ হইয়া যায়, তবে তিনি রাজত্ব করিবেন কাহাদের লইয়া। সূর্যবংশীয় ভগবান রামচন্দ্রের সন্তান রাণা অমর সিংহের এই প্রজাবৎসলতাই তাঁহাকে বারে বারে সন্ধি করিতে প্রেরণা দিয়াছে। কিন্তু এই প্রজাদের দেশপ্রেমের প্রবল আগ্রহের নিকট তিনি নতি স্বীকার করিয়াছেন। রাণা বুঝিয়াছেন, জাতি যখন দেশের জন্য যুদ্ধ করিয়া গৌরবজনক মৃত্যু বরণ করিতে চায় তখন তাহাকে মরিতে দেওয়াই উচিত। তিনি নিজেও সেই মৃত্যুতে অংশ গ্রহণ করিবেন। তৃতীয়বারে মহাবৎ খাঁয়ের অধিনায়কত্বে মোগল চরম আঘাত হানিবার জন্য মেবারে উপস্থিত হইয়াছে, তখন রাণা অমর সিংহের সৈন্য-সংখ্যা মাত্র পাঁচ হাজারের মতো। তাহা লইয়াই রাণা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। রঘুবীর, কেশব, জয় সিংহ, প্রভৃতি যে সামন্তগণ একদিন রাণাকে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করিয়াছিলেন, আজ তাঁহারাই রাণাকে সন্ধি করিতে অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু রাণা তো নিজের প্রাণের জন্য বা ভোগৈশ্বর্যের জন্য মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিতে চান নাই। তিনি চাহিয়াছিলেন সন্ধি করিয়া তাঁহার দেশের জনসম্পদ ও ধনসম্পদ উভয়ই রক্ষা করিতে। আজ যখন মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহার সবই গিয়াছে, তখন এই গৌরবের সম্মানভূমিতে রাণার একার বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি? তিনি বীরের মৃত্যু বরণ করিতে চলিলেন। রাণা অমর সিংহকে আমরা কি করিয়া, ভীরু, দুর্বল, বিলাসী ও কর্মকুণ্ঠ বলিব? তিনি পিতার উপযুক্ত সন্তান। দেশের জন্য সর্বত্যাগী মহাবীর। 'মেবারপতন' নাটকের তিনিই নায়ক। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার নাটকখানির নায়কের এই

বীরত্ব, দেশপ্রেম এবং আত্মত্যাগের প্রশংসা না করিয়া পারেন নাই। মোগল সেনাপতি মহাবৎ খাঁও অমর সিংহের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। তাই তাঁহাকে বলিতে শুনি,—"এই বলে গৌরব অনুভব কচ্ছি, যে আমি ধর্মে মুসলমান হলেও, আমি জাতিতে এই রাজপুত, এই মনে করে, যে আমি এই অমর সিংহের ভাই। যে ব্যক্তি পঞ্চসহস্র সৈন্য নিয়ে আমার লক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, সে মর্তেই এসেছিল। এই নির্ভীকতা, এ স্বদেশপ্রাণতা, ভারতবর্ষের মধ্যে এক রাজপুতেরই আছে। আর আমি সেই রাজপুত।"

রাণা অমর সিংহের গৌরবময় পরাজয়ের ঘটনায়ই নাটকখানির শেষ হওয়া উচিত ছিল। নাটকের পঞ্চম অঙ্কটি অতিরিক্ত, অপ্রয়োজনীয় রচনা। কারণ, রাণা অমর সিংহের পরাজয়ের পর আর নাটকীয় কৌতূহল কিছুই থাকে না। কিন্তু নাট্যকার প্রচারবাদের মোহে এই পঞ্চম অঙ্কটি সন্নিবেশিত করিয়াছেন। পঞ্চম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে রাণা অমর সিংহ কর্তৃক যুদ্ধ বর্ণনার কোনো নাটকীয় সার্থকতা নাই। ইহা কর্মহীন বিবৃতি। দ্বিতীয় দৃশ্যে অজয়ের মৃত্যুতে শোকাহত মানসীর প্রেম-স্বীকারোক্তিও নাটকীয় ঘটনা বা চরিত্রের উপর কিছুই নূতন আলোকপাত করে না। যাত্রার অতিকান্নার অনেকখানি অভিব্যক্তি মাত্র এই দৃশ্যে হয়। তৃতীয় দৃশ্যে গোবিন্দ সিংহ, মানসী, কল্যাণী প্রত্যেকেই শোকের উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তি করিতেছে মাত্র। ইহাতে বেদনার অভিব্যক্তি হয় মাত্র। নাট্যকাহিনীর ক্রমবিকাশ বা চরিত্রের ক্রমাভিব ক্তি কিছুই হয় না। পঞ্চম অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যটির অনেকখানি নাটকীয় সার্থকতা আছে। গোবিন্দ সিংহের দেশপ্রেম এবং মহাবৎ খাঁর দেশদ্রোহিতার চিত্র এখানে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। কিন্তু তাহারও বড় একটা প্রয়োজন ছিল না। কারণ মহাবৎ খাঁর পরিচয় নাটকে অনেক আগেই প্রকাশ পাইয়াছে। পঞ্চম দৃশ্যে রাণা অমর সিংহ ও মহাবৎ খাঁর সাক্ষাৎকারে এই ষষ্ঠ দৃশ্যেরই পুনরাবৃত্তি। তাই এই দৃশ্যটির মধ্যে আকর্ষণীয় কিছুই নাই। সমসাময়িক রাজনীতির প্রভাবে পড়িয়া দ্বিজেন্দ্রলাল এই অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্য ও পঞ্চম দৃশ্যের খানিকটা অংশ রচনা করিয়াছেন। ঐ অংশ দুইটি নাটকের ঐতিহাসিকত্ব ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। ষষ্ঠ দৃশ্যের প্রারম্ভে চারণীদের গানে স্বদেশপ্রেমিক স্বেচ্ছা-সেবকদের জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম্'-এর কথা মনে করাইয়া দেয়। সেই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ কিভাবে দমননীতির দ্বারা জাতীয়সঙ্গীত এবং শোভাযাত্রা বন্ধ করিয়াছিল তাহাও বুঝা যায় মোগল সৈন্যদের আচরণ ও

উক্তিতে। নাটকের ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রের সম্ভাব্যতার উর্ধ্বে উঠিয়া সমসাময়িক যুগের ভাবপ্রচারে উৎসুক নাট্যকার এখানে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার রচনার শিল্পগুণ নষ্ট করিয়াছে। তেমনি ধরনে নাটকের উপসংহারেও দ্বিজেন্দ্রলালের নিজের যুগের হিন্দুমুসলমানের মিলনের কথা মোগলযুগের রাণা অমর সিংহ এবং সেনাপতি মহাবৎ খাঁকে শুনাইয়া নাট্যকার নাটকের ঐতিহাসিক রস ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। তাই দেখা যায় দ্বিজেন্দ্রলাল একখানি সার্থক দেশপ্রেমের উদ্বোধক নাটক রচনার সুন্দর আয়োজন করিয়াও শেষরক্ষা করিতে পারিলেন না। ব্যক্তিগত ধারণা-ভাবনা এবং ভাবাদর্শ অতীতের পাত্রপাত্রীর মধ্যে আরোপ করিতে গিয়া তিনি একদিকে যেমন ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই, অন্যদিকে তেমনি কাহিনী ও চরিত্রের সঙ্গে ঐ ভাবরাজিকে সুকৌশলে মিলাইয়া দিয়া সম্ভাব্য বাস্তবতা ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। 'মেবারপতন' নাটকখানি তাই দ্বিজেন্দ্রলালের ক্ষমতা এবং অক্ষমতা উভয়েরই পরিচয় বহন করিয়া চলিয়াছে।

এই নাটকের শিল্পগত বিশেষ ত্রুটি হইতেছে কয়েকটি চরিত্রের মাধ্যমে হাস্যরস পরিবেশনের চেষ্টা করা। মোগল-সেনাপতি খাঁ-খানান হেদায়েৎ আলি খাঁ বাহাদুরকে দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু সেনাপতি হিসাবে নিতান্ত অক্ষম, ভীরু, কাপুরুষ করিয়াই অঙ্কিত করেন নাই। তাঁহাকে একটা নির্বোধ, ভাঁড় সাজাইয়া তিনি তাঁহাকে লইয়া সস্তা রঙ্গ-তামাসা করিয়াছেন। এই সেনাপতি আবার ম্যা'ল্‌ভোলিওর মতো নিতান্ত বোকার ন্যায় রাজকন্যা মানসীর প্রেমে পড়িয়া দূতী পাঠাইতেছেন। এই কল্পনা অশ্রদ্ধেয়, অসঙ্গত এবং অশোভন। মোগলসম্রাট যাঁহাকে মেবার-যুদ্ধে সেনাপতি করিয়া পাঠান, সে-ব্যক্তি একটি বাক্য-সর্বস্ব, অপদার্থ, নির্বোধ, কাপুরুষ হইতে পারেন না নিশ্চয়ই। গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের লইয়া এই রূপ লঘু হাস্যরস পরিবেশন করিতে গিয়া নাট্যকার সার্থক হাস্যরস সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। উহা অসার্থক এবং অশোভন ভাঁড়ামিতে পর্যবসিত হইয়াছে।

এই নাটকের কয়েকটি চরিত্রকে নাট্যকার আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। তাহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেছে রাণা অমর সিংহ, গোবিন্দ সিংহ, মহাবৎ খাঁ, সগর সিংহ এবং সত্যবতীর চরিত্র। রাণার চরিত্র সম্বন্ধে আমরা প্রসঙ্গতঃ আলোচনা করিয়াছি। গোবিন্দ সিংহ মেবারের

স্বাধীনতাকামী, স্বদেশভক্ত রাজপুত সামন্তদের সর্বশেষ এবং সর্বপ্রধান প্রতিনিধি। দেশের জন্য, জাতির জন্য, পুত্র-কন্যা, নিজের জীবন, সমস্তই বিসর্জন দিয়া এই বৃদ্ধ সামন্ত যে তেজস্বিতা ও আত্মত্যাগের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। বৃদ্ধ গোবিন্দ সিংহ যদি রাণা অমর সিংহকে তেজস্বিনী ভাষায় উদ্বুদ্ধ করিয়া না তুলিতেন, তাহা হইলে রাণা ও রাজপুত সামন্তগণ অনেক আগেই ভাঙিয়া পড়িতেন, সন্দেহ নাই। মেবারের চরম বিপর্যয়ের মুহূর্তে অন্যান্য সাগন্তগণ যখন নিরুৎসাহ হইয়া রাণাকে সন্ধিতে সম্মত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এই বৃদ্ধের মুখ দিয়া তখনও কিন্তু সন্ধির কথা বাহির হয় নাই। এই বৃদ্ধ সামন্ত পুত্রশোকে অভিভূত হইয়াছেন বটে ; ভাঙিয়া পড়েন নাই। চির স্বাধীন মহাবীর জাতিকে মোগল-পদানত দেখিবার পূর্বে নিজে দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন। সমগ্র মেবার রাজ্যে এতবড় মহাবীর আর একটিও নাই।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'মেবারপতন' নাটকের মহাবৎ খাঁ ইতিহাসের মহাবৎ খাঁ নন। নাট্যকার ঐতিহাসিক কিংবদন্তী মাত্র অবলম্বন করিয়া এই মহাবীরকে সৃষ্টি করিয়াছেন। মহাবৎ খাঁ দেশত্যাগী, ধর্মত্যাগী, শত্রুপদসেবী রাজপুত-কুলাঙ্গার। কিন্তু তিনিও মেবারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন না, যেহেতু মেবার তাঁহার জন্মভূমি। জন্মভূমির প্রতি এই শ্রদ্ধা চরিত্রগুলিকেও শ্রদ্ধাস্পদ করিয়া তোলে। তিনি হিন্দুর সংকীর্ণতা এবং দোষ-দুর্বলতার প্রতি অসহিষ্ণু হইয়াই তাহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য মেবার আক্রমণ করেন। এই শত্রুতা প্রচ্ছন্ন অনুরাগেরই ফল। কিন্তু নাট্যকারের পরিকল্পনায় এখানেও আমরা কিছুটা ত্রুটি লক্ষ্য করিব। হিন্দু সমাজের যাহারা শাসক ও নিয়ামক, সেই রাজা, সামন্ত, পুরোহিত প্রভৃতির উপর মহাবৎ খাঁর রোষ দেখা দিলে তাহাই সঙ্গত হইত। নিরীহ গ্রামবাসীদিগের ঘরবাড়ি জ্বালাইয়া দিয়া এবং তাহাদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করিবার আদেশ দিয়া মহাবৎ খাঁ হিন্দুসমাজের কি করিয়া শাস্তি-বিধান করিলেন? বরং ইহা যে নৃশংসতার কার্য এবং একান্ত গর্হিত তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না। এই কার্যের জন্যই কল্যাণী মহাবতের প্রতি তাহার চিরদিনের পোষিত শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলিল। অবশ্য শেষের দিকে মহাবৎ রাণা অমর সিংহকে বধ বা বন্দী না করিবার নির্দেশ দিয়া মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছেন। গজ সিংহের ঈর্ষ্যাপরায়ণতার নিন্দা করিয়া তিনি প্রকৃত বীরের মতো কাজ করিয়াছেন।

কাপুরুষ, মূর্খ, ভীরু, অপদার্থ চরিত্র সগর সিংহ। কিন্তু কন্যা ও পৌত্রের দেশপ্রেমের আদর্শে এই চরিত্রটিরও অনুতাপ সূচিত হইয়াছে। চিতোর-দুর্গ অমর সিংহকে দান করিয়া তিনি আত্মহত্যা করিয়া বীরত্ব ও দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়াছেন। সে দিক দিয়া চরিত্রটির পরিকল্পনা মহনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু চরিত্রটির নির্মাণে শিল্পগত ত্রুটি বর্তমান্। সগর সিংহের চরিত্রে আদি ও অন্ত্য দুই অংশের মধ্যে স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের ধারা অনুসৃত হয় নাই। ভীরু, কাপুরুষ, দুর্বল ও দেশেপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রাণ বিসর্জন করিয়া ধন্য হইতে পারেন। সে দিক দিয়া পরিকল্পনার ত্রুটি বিশেষ কিছুই নাই। কিন্তু চরিত্রটি ভাব-ভাষা ও কর্মের মাধ্যমে যে ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার স্বাভাবিক পরিণতি তো তাহার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ঘটানো উচিত ছিল। যে মহামূর্খ কাপুরুষ বাল্মীকিকে তুলসীদাসের পুত্র বলিয়া মনে করে, সে কী করিয়া মহাবাগ্মী হইয়া ওঠে? দেশপ্রেম, স্বাদেশিকতা প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহার মুখে গুরুগম্ভীর বক্তৃতা কি করিয়া আবির্ভূত হয়? সংলাপের সম্ভাব্যতা এবং পরিমিতি-জ্ঞানের অভাবে দ্বিজেন্দ্রলাল এই চরিত্রটিকে শেষ দিকে অসম্ভব না হইলেও অবাস্তব করিয়া তুলিয়াছেন।

সত্যবতী নাট্যকারের কল্পিত আদর্শচরিত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু ইতিহাসের কাহিনীর সঙ্গে এই চরিত্রটি অতি সঙ্গতভাবে মিলিয়া গিয়াছে। তাই এই চরিত্রের পরিকল্পনায় কোন প্রকার দুর্বলতা নাই। রাজকন্যা, রাজবধূ যে দেশপ্রেমের আকর্ষণে নিজের সংসার এবং শিশুপুত্রের মমতা পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া চারণীগণ-সঙ্গে দেশময় দেশের অতীত গৌরব-গাথা গান করিয়া দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবেন, ইহা অস্বাভাবিক নয়। আর ইহা কালানৌচিত্য দোষেও দুষ্ট নয়। কারণ মেবারের চারণ-সঙ্গীতে ঠিক এই কাজটি করা হইত। সত্যবতী ইতিহাসের মেবার নব-নারীর দেশপ্রেমের মূর্ত সঙ্গীত এবং বিংশ শতকের দেশবন্দনার বাণী-বিগ্রহ। 'মেবারপতন' নাটকের মূল প্রেরণার মূর্ত প্রাণরস।

এই নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি সঙ্গীত পরিবেশনে প্রকাশিত হইয়াছে। নাটকে সঙ্গীত প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। এ-বিষয়ে নূতন কথা হইল এই যে মানুষের বিশেষ বিশেষ ভাব যখন আবেগের আতিশয্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে, তখন সেই আত্যন্তিক প্রকাশের জন্য প্রয়োজন হয় সঙ্গীতের। 'মেবারপতন' নাটকখানি

একটি বিশেষ ভাবাবেগে চঞ্চল। উহা হইতেছে মেবারী রাজপুতদের স্বদেশপ্রীতি। গানে গানে এই দেশপ্রেম উচ্ছ্বাসের বন্যা সৃষ্টি করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। নাটকখানির আরম্ভে গোবিন্দ সিংহের দেশপ্রেম-প্রকাশক উক্তিগুলির মধ্যে যে ভাবাবেগ গুমরিয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি দান করে দ্বিতীয় দৃশ্যে উদয়পুরের রাজপথে সত্যবতী ও চারণগণের গান। সুদূর অতীত কাল হইতে কেমন করিয়া স্বাধীন মেবারী বীরগণ শৌর্য-বীর্যের পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন, গানটির মধ্য দিয়া তাহারই প্রকাশ হয়। এই আশা ও উৎসাহব্যঞ্জক সঙ্গীতটি জাতীয় জীবনে অসীম প্রেরণা সঞ্চার করে। যে জাতি চিরদিন জয়লাভ করিয়া আসিয়াছে, কোনোদিন কোনো শত্রুর নিকট মস্তক অবনত করে নাই, সেই জাতি আজিকার বিপদের দিনে দুর্বলতা প্রকাশ করিবে না। উহা মেবারী গণমনের সংকল্পবাণীকেই অভিব্যক্ত করিয়াছে। প্রথম অঙ্ক, অষ্টম দৃশ্য। উদয়পুরের রাজপথে আমরা আর একখানি চারণসঙ্গীত শুনিতে পাইতেছি। বহু স্বদেশভক্ত বীর জীবন দান করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছে। মহারাণা অমর সিংহ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন। এই বিজয়ের আনন্দ উচ্ছ্বসিত ধারায় সমবেতকণ্ঠের সঙ্গীতের স্রোতে প্রবাহিত হইয়াছে। জনগণের উচ্ছল আনন্দের অভিব্যক্তি-ব্যঞ্জক এই সঙ্গীতটি না হইলে এত বড় বিজয়ের আনন্দ সম্যক্ প্রকাশলাভ করিত না। তাই একখানি সঙ্গীত দিয়াই একটি দৃশ্য রচনা করা হইয়াছে। এই সঙ্গীতের পূর্বে বা পরে কোনো সংলাপ জুড়িয়া দিলে এই আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত, উচ্ছলিত প্রকাশে বাধা সৃষ্টি হইত। বিজয়ের আনন্দ প্রকাশে দ্বিজেন্দ্রলাল যতখানি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, পরাজয়ের বেদনার অভিব্যক্তিতে ঠিক ততখানি কৃতিত্ব তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন।

পঞ্চম অঙ্ক, ষষ্ঠ দৃশ্য। মোগলের সঙ্গে শেষ যুদ্ধে মেবারের পরাজয় হইয়াছে। মেবারের স্বাধীনতাসূর্য চিরতরে অস্তমিত। চিরস্বাধীন জাতির এই পরাজয়ের বেদনা চারণীগণের সঙ্গীতে কান্নার সুরে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। শুধু মানুষ নয়—মেবারের পরাজয়ে প্রকৃতিও বেদনায় কাঁদিয়া উঠিয়াছে। মেবারের আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করিয়া যে ক্রন্দনের উচ্ছ্বাস বহিয়া চলিয়াছে, দ্বিজেন্দ্রলাল এই সঙ্গীতে তাহাই মূর্ত করিয়াছেন। 'মেবারপতন' নাটকে এই গান কয়খানির যতখানি তাৎপর্য তাহা আর কোন গানেই নাই। নাটকের সমাপনী গীতিখানি এই সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে না বলিয়াই

অশোভন। এই গভীর, গম্ভীর বিপদের পর ঐ ক্ষুদ্র সান্ত্বনার সুর একেবারে ব্যর্থ পরিহাসের মতো শুনায়। নাটকের ঘটনার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া ঘটনার আভ্যন্তরিক প্রেরণায় উহা জন্মলাভ করে নাই। লেখকের নিজস্ব ভাবনা এই নাটকের উপসংহার বাহির হইতে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। করুণ রসের সহিত হাস্যরসের চিরন্তন বিরোধের মতো নাটকের প্রবহমান ভাবধারার অনুগামী সঙ্গীতগুলির সঙ্গে এই গানগুলিরও তেমনি বিরোধের সম্পর্ক বর্তমান।

অন্যান্য যে কয়টি গান এই নাটকে আছে, তাহার মধ্যে বিশেষ অভিনবত্ব কিছু নাই। আপন মনের আনন্দ-বেদনার অভিব্যক্তির জন্য মানসী কয়েকটি গান করিয়াছে। মধুসূদন তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে পূর্বরাগিনী কৃষ্ণকুমারীর মুখে ঐ সব ক্ষেত্রে কয়েকটি গান অধিক নিপুণতার সহিত প্রয়োগ করিয়াছেন।

নাট্যশৈলীর দিক দিয়া বিচার করিলে 'মেবারপতন' দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণা প্রতাপ সিংহ', 'সাজাহান' এবং 'নূরজাহান' নাটকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। ঐ সকল নাটকে কাহিনী-বিন্যাস, চরিত্রচিত্রণ, ইতিহাসের বিশ্বস্ত অনুসরণ প্রভৃতিতে দ্বিজেন্দ্রলাল যে কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু 'মেবারপতন' নাটকে একটি গৌরবোজ্জ্বল জাতির পতনের ইতিহাস যেভাবে তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার আর কোনো নাটকে মিলিবে না। 'মেবারপতন' তাই ইহার দোষ-ত্রুটি সমেত বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে স্বমহিমায় স্থান লাভ করিয়াছে।

ঐতিহাসিক বিশুদ্ধির দিক দিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের তিনখানি মাত্র নাটকের আলোচনা করা যাইতে পারে। 'প্রতাপ সিংহ', 'সাজাহান' ও 'নূরজাহান'। ঘটনা সংস্থাপনের দিক দিয়া 'প্রতাপ সিংহ' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অশ্রুমতী'র সগোত্র। অশ্রুমতীর ভিতর প্রতাপ ও তাঁহার অনুচরবর্গের চরিত্র-চিত্রণে নাট্যকার বিশ্বস্তভাবে টডের রাজস্থানের অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলি নিছক কল্পনা-প্রসূত। 'প্রতাপ সিংহ' নাটকে নাট্যকার ইতিহাসকে আরো একটু বিস্তৃতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। রাণা প্রতাপ, সালুম্ব্রাপতি গোবিন্দ সিংহ, ঝালাপতি মানা, মন্ত্রী ভীম সিংহ, মান সিংহ, আকবর প্রভৃতি চরিত্রে নাট্যকার ইতিহাসকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। রাণা প্রতাপের স্বাধীনতা ও হিন্দু-মর্যাদাবোধ, অপমানিত মান সিংহের প্রতিশোধ-

বাসনা, আকবরের কূট-নীতিজ্ঞতা, রাজপুত মন্ত্রী-সেনাপতিদের প্রভুভক্তি ইতিহাসে যেমন যেমন লিখিতে হইয়াছে, নাটকেও তেমন তেমন স্থান পাইয়াছে। শক্ত-চরিত্র সৃষ্টিতে নাট্যকারের ঐতিহাসিক জ্ঞানের সহিত কবি-কল্পনা মিশ্রিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা অসঙ্গতি সৃষ্টি করে নাই। শক্ত সিংহ লোভের বশে প্রতাপকে হত্যা করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। নির্বাসিত শক্ত ভ্রাতার উপর প্রতিশোধ লইবার জন্যই দেশ ও জাতির শত্রু হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই ভ্রাতার দেশ-প্রেমই তাঁহাকে আবার ফিরাইয়া আনিল। নাট্যকার এই শুষ্ক ঐতিহাসিক কাহিনীর মধ্যে দার্শনিকতার অবতারণা করিয়া নাটকের মধ্যে যেমন গাম্ভীর্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি শক্ত সিংহকে বাঁচাইয়াছেনও অনেকখানি। শক্ত বিদ্বান ও চিন্তাশীল। তিনি দার্শনিক। দার্শনিকতা তাঁহাকে নাস্তিক করিয়াছে। দেশ-প্রেম, জ্যেষ্ঠত্ব, কনিষ্ঠত্ব প্রভৃতির সত্যকার মূল্য কিছু আছে কি না তাহা তাঁহার দার্শনিকতা-প্রবণ মন বুঝিতে পারে না। দেশ ও জ্যেষ্ঠভ্রাতার সহিত শক্তের যে বিরোধ তাহা এই দার্শনিকতার বিরোধ। ইহার মধ্যে ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ নাই। হাজার যুক্তি যাহা না করিতে পারে, দুইটি উদাহরণ তাহা বুঝাইয়া দেয়। রাণার দেশ-প্রেম এবং দৌলৎ-উন্নিসার ভালবাসা শক্তের যুক্তি-প্রবণ হৃদয়েও প্রেমের বন্যা বহাইয়া দিল। শক্ত-চরিত্র অনৈতিহাসিক হইতে পারে, অর্থাৎ ঐতিহাসিক শক্ত সিংহ এমন দার্শনিক নিশ্চয়ই ছিলেন না, কিন্তু চরিত্রটি অসঙ্গত নহে। চরিত্রটির আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি যেমন নাই, তেমনি সমগ্র নাট্যকাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতেও ইহা অসঙ্গত নহে। নাট্যকারের স্বাধীন কল্পনা তাই অসুন্দর হয় নাই। কিন্তু কল্পনার এই সঙ্গতি তিনি নাটকের সমস্ত চরিত্রে রক্ষা করিতে পারেন নাই। সেলিম বিলাসী যুবক, সমর-নীতিতে অনভিজ্ঞ। দুইটি বালিকার উত্তেজনায় তিনি সেনাপতি মান সিংহকে শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিতে বলেন। আর তাহা লইয়া মান সিংহের গৃহে গিয়া তাঁহাকে তিনি আক্রমণ করেন। ইতিহাসের বিচারে ইহা অসত্য এবং নাট্যবিচারে অসঙ্গত। বিপক্ষসৈন্যের শিবিরে রাজকুমারীগণ নির্ভয়ে প্রবেশ করিতেছেন, অবাধে প্রেম-নিবেদন করিতেছেন। ইতিহাস এখানে অবাস্তব রোমান্সে পর্যবসিত হয়। তারপর সুরাপানোন্মত্ত অমর সিংহের মেহেরউন্নিসার প্রতি আসক্তি অনৈতিহাসিক এবং অশোভন।

শৈলীর দিক দিয়া নাটকখানি উন্নত ধরনের। ঘটনাগুলি আরম্ভ হইতে

শেষ পর্যন্ত বেশ ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ববর্তী ঘটনার অভিঘাতে অতি স্বাভাবিক ভাবে পরবর্তী ঘটনার উদ্ভব হইতেছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাস নিছক গল্পের একঘেয়ে বিবৃতির মতো হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে ইতিহাসের নীরস কাহিনী নর-নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধারণা-ভাবনার সংস্পর্শে আসিয়া জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। হলদিঘাটের যুদ্ধের আয়োজনের মূলে রাণা প্রতাপ, শক্ত সিংহ, আকবর, মান সিংহের কর্ম, চিন্তা ও অনুভূতিময় সমগ্র সত্তার আন্দোলন দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের জীবন হইতে ঐ ঘটনা বিচ্ছিন্ন নহে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উপযুক্ত সংলাপের অভাবে ইতিহাসকে জীবন্ত করিতে পারেন নাই। গিরিশচন্দ্র 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকে ইতিহাসের দ্রুতগামী কাহিনীকে কর্মের মধ্য দিয়া স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে পারেন নাই। তাই ইতিহাস সেখানে অতীত কাহিনীর একটানা বিবৃতি মাত্র। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকেই সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক পাত্র-পাত্রীর জীবনের ঘটনা অন্তর-বৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাতে জীবনীয় রূপ লাভ করিল। চরিত্র ও ঘটনাগুলি নাটকে স্মৃতির কঙ্কালমাত্রে পর্যবসিত না হইয়া জীবন লইয়া রঙ্গমঞ্চে ঘোরাফেরা করিতে লাগিল। 'প্রতাপ সিংহ' নাটকে ইহার সার্থক রূপায়ণ অনেকখানি দেখা যায়।

দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলি সম্বন্ধে একটা বিশেষ বক্তব্য এই যে একমাত্র 'সাজাহান' নাটকে ভিন্ন আর কোনোখানিতেই যাত্রা-শৈলীর লক্ষণীয় প্রভাব কিছু নাই। দ্বিজেন্দ্রলালই একমাত্র নাট্যকার যিনি বিশ্বস্ত ভাবে শেক্স্পীয়ারের নাট্যশৈলী অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে অপেরার শৈলী অবলম্বন করিয়া তিনি নাট্য-সাহিত্য রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন, 'সোরাব-রুস্তমে'র শেষ অংশ হইতে তাহা পরিত্যাগের একটা প্রবণতা তাঁহার রচনার মধ্যে আমরা লক্ষ্য করিতেছিলাম। 'সিংহল-বিজয়' নাটকে যে যে অংশে ষড়যন্ত্র, অন্তর্দ্বন্দ্ব বা তীব্র কর্ম-সঙ্ঘাত রহিয়াছে, নাটক হইতে অপেরার শৈলী সেখানে স্বাভাবিকভাবে বিদায় লইয়াছে। শুধুমাত্র সাগরালিঙ্গিতা লঙ্কায় কুবেনী, সখীগণ, জয়সেন ও বালকগণের সঙ্গীতে ঐ প্রভাব কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে। 'চন্দ্রগুপ্তে' সঙ্গীত-প্রয়োগের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ হইল। শুধু সঙ্গীতের জন্য বা অবকাশ বিনোদনের জন্য আর নাটকে গান সংযোজিত হইতেছে না। চরিত্রের গভীরতম রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য বা

পরিস্থিতির গুরুত্ব প্রকাশের জন্য 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে সঙ্গীত সংযোজিত হইতেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীত-যোজনার এই কৃতিত্বের আলোচনা পূর্বেই করিয়াছি। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক হইতেই দ্বিজেন্দ্রলাল সঙ্গীত প্রয়োগে অন্ততঃ যাত্রা বা অপেরার গীত-বাহুল্য হইতে মুক্ত হইলেন। 'চন্দ্রগুপ্ত'-নাটকে চরিত্র-গাম্ভীর্য, ঘটনার বৈচিত্র্য, মানব-মনের অবচেতন স্তরে সুপ্ত প্রবৃত্তির সংক্ষুব্ধ রূপ সকলই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই নাটকখানিতে দ্বিজেন্দ্রলালের কয়েকটি মারাত্মক ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। একটি নায়কত্ব-বিচার ও তৎসংশ্লিষ্ট কাহিনী-সংস্থাপন। দ্বিতীয়টি হইল কাহিনীর 'কিঞ্চিদবলগ্নবিন্দুকত্ব'। পরবর্তী অঙ্কে বা দৃশ্যে যে ঘটনা ঘটিবে বা যে পাত্র-পাত্রীর আগমন হইবে, পূর্ববর্তী অঙ্কে বা দৃশ্যে তাহার বা তাহাদের পরিচিতির সূত্র একটু না একটু অবশ্যই থাকিবার প্রয়োজন। কোনো প্রকার পূর্বাভাষ না দিয়া যেন কোনো চরিত্র বা কোনো ঘটনা নাটকে না আসে। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে ইহা একটি বড় ত্রুটি। নাটকটির প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্যের মধ্যে কোথাও চাণক্যের এতটুকুও উল্লেখ নাই। চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে আমরা জানিলাম যে তিনি দিগ্বিজয়ী বীর হইবেন। তারপর সেই দিগ্বিজয়ী বীরের জীবনের পরবর্তী ঘটনা জানিবার জন্যই আমাদের কৌতূহল যখন স্বাভাবিক হইয়া ওঠে, তখন আকস্মিক ভাবে দ্বিতীয় দৃশ্যটি আসিয়া পড়ে। চাণক্য আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি ব্যক্তি যাঁহার সম্বন্ধে পূর্বে কিছু বলা হয় নাই। কাত্যায়নের সঙ্গে তাঁহার মৈত্রীর মধ্য দিয়া নন্দ-বংশের অমঙ্গলের আভাস পাই বটে, কিন্তু এই দুই ব্রাহ্মণের মিলনের মাধ্যমে চন্দ্রগুপ্তের কী ভাবী সুবিধার সঞ্চার হইবে তাহার ইঙ্গিতমাত্রও আমরা এখানে পাইলাম না। 'চন্দ্রগুপ্তে'র মধ্যে আর একটি বড় ত্রুটি হইল ঘটনার অসম্ভাব্যতা। যে চন্দ্রগুপ্তকে ধরিবার জন্য গুপ্তচর ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, প্রহরী-বেষ্টিত পুরোদ্যানে তিনি কি করিয়া একাকী প্রবেশ করিয়া মাতা মুরাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন, তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না। এই ধরনের ত্রুটি হইতে 'প্রতাপ সিংহ' নাটক মুক্ত হইয়াছে। নাটক যে নায়ক-চরিত্রেরই বিকাশ,—নায়কের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধারণা-ভাবনা বা অন্তর-সংস্কারের সঙ্ঘাতেই যে নাটকীয় কর্ম-প্রবাহের সৃষ্টি হয়, দ্বিজেন্দ্রলালের 'প্রতাপ সিংহে' তাহা বুঝা যায়। হিন্দু রাণা কিছুতেই মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিবেন না। নাটকের আরম্ভেই তিনি কালীমায়ের সম্মুখে মেবারের সামন্তদের দিয়া ঐ প্রতিজ্ঞাই করাইয়া লইলেন। মেবারী কখনও মোগলের

ঘরে কন্যাদান করিবে না। কিন্তু নাটকের আরম্ভেই এক প্রবল দ্বন্দ্বের আভাস ফুটিয়া ওঠে। প্রতাপের শত্রু মোগল নয়। রক্তের বিরুদ্ধে রক্তের অভিযান শুরু হইয়াছে। রাজপুত্র হইয়াও বিধির বিধানে নির্বাসিত শক্ত সিংহ আজ রাণার কৃপায় স্বদেশে আনীত। যে দেশ তাঁহাকে দুই মুঠা অন্ন দিতে পারে নাই, শৈশবে কোলে স্থান দেয় নাই, সে দেশের প্রতি শক্তের কোনো কর্তব্য নাই। বিদ্বান, বুদ্ধিমান, শক্তিমান শক্ত জ্যেষ্ঠত্বকেই শ্রেষ্ঠত্ব বলিয়া মানিতে পারেন না। তাই তিনি মোগলের সঙ্গে যোগদান করিলেন। রাজ্যের লোভে নহে,—প্রতাপের শ্রেষ্ঠত্ব পরীক্ষার জন্য। ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইয়ের ষড়যন্ত্র। প্রতাপ হিন্দু। হিন্দুর ধর্ম ও হিন্দু নারীর মর্যাদা রক্ষার জন্য তিনি কঠোর দারিদ্র্য বরণ করিয়াছেন, প্রবল প্রতিপক্ষ মোগলের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু মাড়বার, অম্বর, বিকানীর প্রভৃতির মোগলপদলেহী হিন্দু, মনুষ্যত্ব ও মর্যাদাবোধ একেবারেই হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাহারা চাটুকার, বিলাসী, শ্রেষ্ঠ-নিন্দুক। সমগ্র হিন্দুস্থানের মধ্যে মোগল-শাসনের প্রতিবাদের জলন্ত মূর্তি হিসাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন এক প্রতাপ সিংহ। মান সিংহ অধঃপতিত হইলেও প্রতাপের মর্যাদা বুঝিতেন। শক্ত সিংহ রাণার বিরুদ্ধে আকবরকে উত্তেজিত করিলেও ধূর্ত রাজনীতিবিদ্ আকবর তাঁহার ঐ হিন্দু সেনাপতির উত্তেজনার অপেক্ষা করিতেছিলেন। মান সিংহ শোলাপুর হইতে ফিরিবার পথে প্রতাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল রাণার পুত্রের নিকট ভগিনী দান করিয়া বংশের হারানো গৌরব উদ্ধার করা। কিন্তু রাণা তাঁহার চরম অপমান করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। শক্তের পুঞ্জীভূত অভিমান যে যুদ্ধের আয়োজন করিতেছিল, মান সিংহের অপমান তাহা আরো দ্রুত ঘনাইয়া তুলিল। নিজের আচরণের দ্বারা রাণা নিজের ভবিষ্যৎ ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিলেন। প্রথম অঙ্কে নাট্যবস্তুর 'স্থাপনা' বা 'বীজ-বপন' সমাপ্ত হইল। এই বীজই ক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া যে মহীরুহ সৃষ্টি করিবে, তাহার ফল ভোগ করিবেন প্রতাপ।

নাটকীয় ঘটনার জটিল জাল বুনিবার যে সূত্র কয়টি প্রথম অঙ্কে নিবেশিত হইল, সেগুলিকে দ্বিতীয় অঙ্কে ছড়াইয়া দিয়া তৃতীয় অঙ্কে নাট্যকার গুছাইয়া তুলিয়াছেন; নাট্যকাহিনী 'গোপুচ্ছাগ্র-সমন্বিত' হইয়া পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। প্রতাপের এই দেশপ্রেম এবং জাতিপ্রেমকে প্রশংসা করিবার বা উৎসাহিত করিবার জন্য হিন্দুর মধ্যে কোনো পুরুষ নাই। বিকানীর-রাজপুত্র

পৃথ্বীরাজ ক্ষত্রিয় হইয়াও মোগলের মোসাহেব। অসি ত্যাগ করিয়া মসীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন শুধু অকারণ মোগলের স্তবগান করিবার জন্ত। প্রতাপের মহত্ত্ব প্রাণ ভরিয়া উপলব্ধি করিতেছেন একটি হিন্দু নারী—পৃথ্বীর পত্নী যোশীবাঈ। যুদ্ধ ঘনাইয়া আসিল। এই যুদ্ধ দেখিবার জন্ত সম্রাটের কন্তা এবং ভাগিনেয়ী সমরক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। শক্তিমান অভিজ্ঞ সেনাপতি মান সিংহ। তিনি দুর্গম পর্বতময় মেবার রাজ্য আক্রমণের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না, শত্রু-সৈন্তের আক্রমণ অপেক্ষা করিবেন। বিলাসী বালক সেলিম রণ-নীতিতে অভিজ্ঞ নন। এই প্রতীক্ষার ধৈর্য তাঁহার নাই। মেহেরউন্নিসার উত্তেজনায় তিনি আরো উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। মান সিংহের সহিত সেলিমের ভাবী বিরোধের সূত্রপাত হইল। এদিকে শক্ত সিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছেন। যে মেবারকে তিনি স্বদেশ বলিয়া মানিতে চাহেন না, মনের অবচেতন স্তর হইতে সন্তানের অন্তরে সুপ্ত মাতৃ-ভক্তির মতো সেই দেশপ্রেম তাঁহার অভিমানাহত জাগ্রত চেতনাকে অভিভূত করিতে চাহে। তাই শক্ত সিংহের অন্তরে অন্তরে চলিতেছে ভক্তির সঙ্গে যুক্তির লড়াই। অভিমানের দৃঢ়তা থাকিলেও আত্মকর্মের ন্যায়ানুগামিতার প্রতি অটল বিশ্বাস শক্তের আর নাই। অন্তরে অন্তরে নিজ কৃতকার্যের জন্ত খানিকটা যেন অনুশোচনা শুরু হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রতাপের প্রতি রুদ্ধ অভিমান এখনও তাঁহাকে দেশদ্রোহিতার দিকে টানিয়া লইতেছে। দ্বিতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য। শক্তের অন্তরের এই দ্বন্দ্বীভূত অবস্থায় তাঁহার শিবিরে সন্ন্যাসিনীবেশে প্রবেশ করিলেন প্রতাপ সিংহের কন্তা ইরা। ইরার যুক্তির নিকট শক্ত পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার এই অভিমান যে অকৃতজ্ঞ, দেশদ্রোহীর অকারণ-অসূয়াপ্রসূত, ইরা তাহা প্রমাণ করিয়া দিলেন। যুক্তিবাদী শক্ত সর্বপ্রথম আত্মকার্যের অন্তায় দিকটা ভাবিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি কথা দিলেন, যদি তিনি বুঝেন যে, তিনি অন্তায় করিতেছেন, এ অন্তায়ের প্রতিকার তিনি করিবেন। শক্ত সিংহের জীবনযাত্রার পরিবর্তন যে শুরু হইবে, দ্বিতীয় অঙ্কেই আমরা তাহার ইঙ্গিত পাইলাম। এই পরিবর্তনের আর একটা দিকের (যে-দিক সম্বন্ধে শক্তও নিজে কোনো দিন ভাবেন নাই) আভাসও আমরা এই দ্বিতীয় অঙ্কে পাই। দার্শনিক, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে উদাসীন শক্ত সিংহ নিজের অজ্ঞাতসারে যেন নেহাত জৈবপ্রেরণায় অতো নারীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া উঠিতেছেন। চলমানা দৌলৎ-উন্নিসাকে

নিবারণ করিবার একটা ঝোঁক শক্তকে দৌলতের দিকে কয়েক পা আগাইয়া দিল।

শক্ত কিন্তু হঠাৎ ফিরিলেন না। কমলমীর প্রবেশের গোপন পথ তিনি মান সিংহকে বলিয়া দিলেন। রাণা প্রতাপ আর অপেক্ষায় থাকিলেন না। পরদিন তিনি মোগল-শিবির আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

রাণা প্রতাপ প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তবুও সম্মান বিক্রয় করিবেন না। স্ত্রীর অনুরোধ তাঁহার চক্ষে ঘুম আনিতে পারে নাই। সৈন্য ও সামন্তগণকে উৎসাহ দিতে গিয়া প্রতাপ তাহাদিগকে পিতৃ-পুরুষের গৌরব স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি সমস্ত সৈন্যের পুরোভাগে রহিলেন। আজ শত্রু-মিত্র সকলের মুখে প্রতাপের প্রশংসার কথা শুনিয়া শক্তের ভুল ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। প্রতাপের মহত্ত্ব তিনি উপলব্ধি করিলেন। তাই চরম বিপদের মুহূর্তে শক্ত সিংহই প্রতাপকে রক্ষা করিতে ছুটিলেন। সন্ধ্যাকালে নির্ঝর-তীরে দুই বিবদমান ভ্রাতার মিলন হইল। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ। প্রতাপ ও শক্তের মধ্যে যে ব্যবধানের বাঁধ রচিত হইয়াছিল, হলদিঘাটের রক্ত-প্রবাহে তাহা ভঙ্গ হইল বটে; কিন্তু প্রতাপ ও শক্ত মিলিয়া যে রণ-ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহার গতি থামিবার নহে। স্রোত একমুখী না হইয়া গতি পরিবর্তন করিল মাত্র।

তৃতীয় অঙ্কে ঘটনার চরমোত্থান। সাহসী, সত্যবাদী বীর শক্ত সিংহ। রাণাকে রক্ষা করিয়া তিনি স্বেচ্ছায় সেলিমের হাতে ধরা দিয়াছেন। এই আত্মসমর্পণের পরিণাম তিনি জানেন। তবুও রাজপুত তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন না। শক্তের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইল। তাহার পূর্বে সেলিম তাঁহাকে পদাঘাত করিলেন। দার্শনিক নির্ভীক শক্তের মৃত্যুভয় নাই। কিন্তু জীবনে তিনি অপমান সহ্য করেন নাই। এই পদাঘাতের প্রতিশোধ তাঁহাকে লইতেই হইবে। কিন্তু উপায় নাই। উপায় জুটিল। মেহের-উন্নিসা ও দৌলৎ-উন্নিসা উভয়েই যে শক্তের প্রতি আকৃষ্ট, এই চরম বিপদের মুহূর্তে তাহা আর গোপন থাকিল না। যে দুইটি বালিকার জীবন নাটকীয় ঘটনার ভিতর পরগাছার মতো গজাইয়া উঠিতেছিল, নাট্যকার তাহা নাটকের একটি প্রধান চরিত্রের জীবন-মরণ সমস্যার সঙ্গে জড়িত করিয়া দিলেন। শক্তের জীবন-রক্ষার জন্য এই দুইটি নারীর প্রয়োজন ছিল। শক্তের সহিত দৌলৎ-উন্নিসার পলায়ন ঘটনাকে আরো জটিল করিয়া

তুলিল। নাট্যকার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া দেখাইয়া দিলেন, মোগল-হারেমের ভিতর হিন্দু-নারীর মর্যাদাবোধ বিদ্রোহ প্রকাশ করিতেছে। আকবর পিতা হইলেও হিন্দুনারীকে ভোগ্য বস্তু মাত্র মনে করেন। আর সেই হিন্দুনারীই মেহের-উন্নিসার জননী। নারীত্বের অবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়া বাদশাজাদী গৃহত্যাগ করিয়া পিতৃ-শত্রুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বাদশাহ্ আকবরের সঙ্কীর্ণতার উপর রাণার উদারতার জয় হইল।

চতুর্থ অঙ্কে সমগ্র আয়োজন পরিপূর্ণ হইল। এখান হইতে ঘটনা নিশ্চিত পরিণতির দিকে ছুটিয়া চলিল। মুক্তিপ্রাপ্ত শক্ত সিংহ দুর্গের পর দুর্গ অধিকার করিয়া শক্তিশালী হইতেছেন। পৃথ্বীরাজ অসি ত্যাগ করিয়া মসীর সাহায্যে যে মোগল বাদশাহের স্তবগান করিতেছিলেন, সেই বাদশাহই সমস্ত কালি তাঁহার মুখে মাখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যোশী ছুরিকার সাহায্যে আত্মরক্ষা করিলেও স্বামীর ক্লৈব্য সহ্য করিতে না পারিয়া আত্ম-হত্যা করিলেন। প্রচণ্ড আঘাতে পৃথ্বীর চেতনার উদয় হইল। এইবার প্রতাপের অসি এবং পৃথ্বীর মসী একসঙ্গে মোগলের বিরুদ্ধে লাগিল। রাণা প্রতাপ কঠোর দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া সংগ্রাম করিয়া আসিতেছিলেন। পুত্র-কন্যার দুঃখ শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল। তিনি সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। স্বয়ং মান সিংহ পর্যন্ত এ সংবাদে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কিন্তু সন্ধি হইল না। হিন্দুনারীর অপমানের সংবাদে সুপ্ত সিংহ আবার জাগ্রত হইলেন।

পঞ্চম অঙ্ক—ঘটনা পরিণতির দিকে। প্রতাপের সঙ্ঘাত-বহুল জীবনে চরম শান্তি কোনোদিনই আসিল না। যুদ্ধ আসন্ন, জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া শক্ত সিংহ নারীর ভালবাসা উপলব্ধি করিলেন। হাজার অবহেলা পাইয়াও যে নারী পুরুষকে ভালবাসে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার জন্য প্রাণ দেয়, সে নারীর প্রেম উপেক্ষার বস্তু নহে। হতভাগ্য শক্ত সিংহ এমন প্রেমময়ী স্ত্রী পাইয়াও তাহাকে হারাইয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাহা অপেক্ষা হতভাগ্য রাণা প্রতাপ। যে ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদের মধ্য দিয়া তাঁহার জীবন-নাট্য শুরু হইয়াছিল, মিলনেই তাহার শেষ হইল না। মোগল-যুদ্ধে যে ভ্রাতা তাঁহার দক্ষিণ হস্ত, বংশের মর্যাদা রক্ষার জন্য তাঁহাকেও বিসর্জন দিতে হইল। দৌলৎ-উন্নিসার অপূর্ব আত্মত্যাগ এবং প্রতাপের কঠোর মর্যাদাভিমান

পঞ্চম অঙ্কের ঘটনার সহজ গতির মধ্যে বৈচিত্র্য আনিয়া উহাকে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে। ঘটনাকে কোথাও নীরস বা মন্থর হইতে দেয় নাই। ভ্রাতৃবিতাড়িত শক্ত সিংহ এবার আর কাহার বিরুদ্ধে অভিমান করিবেন? যে ব্যক্তি দেশের কেহ নয়, যাঁহাকে ভালবাসিবার পাত্র বিশাল বিশ্বে একজনও অবশিষ্ট নাই, জীবন তাঁহার পক্ষে দুর্ভর। শক্ত সিংহ মরণের পথে ছুটিয়া চলিলেন। সেলিমের বিবাহের শোভাযাত্রা। দুঃসাহসী বীর ক্ষিপ্রবেগে পালকীবাহকদের হত্যা করিয়া সেলিমকে পদাঘাত করিয়া শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইবার পূর্বেই আত্মহত্যা করিলেন। যে-চরিত্র নিতান্ত প্রহেলিকার মতো আবির্ভূত হইয়াছিল, খেয়াল যাঁহাকে ঘূর্ণিবাত্যার মতো সংসার-সমুদ্রে ঘুরাইয়া ফিরাইয়াছে, খেয়ালের মধ্য দিয়া তাঁহার শেষ হইল। শক্ত সিংহের স্বাভাবিক মৃত্যুই হইত অস্বাভাবিক।

পত্নীহারা, কন্যাহারা, ভ্রাতৃহারা প্রতাপ। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়াও তিনি চিতোর উদ্ধার করিতে পারিলেন না। সৈন্য-সামন্তকে মোগলের বশ্যতা স্বীকার না করিবার প্রতিজ্ঞা করাইয়া চিতোরের দিকে তাকাইয়া তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের এই নাটকটির মধ্যে কাহিনীর কোথাও অবান্তরত্ব নাই। কোনো চরিত্রই অপ্রয়োজনীয় নহে। কাহিনীর মধ্যে বাঁধুনির অভাব কোথাও এতটুকু পরিলক্ষিত হয় না। ভাষায় যে অতিমাত্র কাব্য-ঝঙ্কার দ্বিজেন্দ্রলালের বহু নাটককে ব্যর্থ করিয়াছে, 'প্রতাপ সিংহ' নাটকে তাহা নাই। নাটকের ভিতর ছোটবড় প্রত্যেকটি চরিত্রের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। অন্যান্য নাটকে যেমন প্রধান চরিত্রের আওতায় পড়িয়া অপ্রধান চরিত্রগুলি নষ্ট হইয়াছে, এই নাটকে তাহা হয় নাই। সমসাময়িক কোনো দার্শনিক বা রাজনৈতিক মতবাদ মাথা জাগাইয়া এই নাটকের ঐতিহাসিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে নাই। তাই শৈলীর দিক দিয়া বিচার করিলে 'প্রতাপ সিংহ' দ্বিজেন্দ্রলালের একখানা সার্থক নাটক।

'চন্দ্রগুপ্ত', 'প্রতাপ সিংহ' প্রভৃতি হইতে 'সাজাহানে'র নাট্য-শৈলীর একটু পার্থক্য আছে। এই নাটকটিতে কাহিনীর জটিলতা, ঘটনার ঘনঘটা, তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের সঙ্ঘাতে জটিল কর্ম-প্রবাহে ফেনাইয়া ওঠা প্রভৃতি নাই। সমভূমিতে প্রবাহিত নদী-স্রোতের মতো কাহিনীর একটানা স্রোত চলিয়াছে। শুধু দুই-তিন জায়গায় বাঁকে বাঁকে মোড় ফিরিবার সময় ঘটনার

যাহা কিছু আবর্ত সৃষ্টি হইয়াছে। মাঝে মাঝে দুই একটি চরিত্রের মুখে যে উচ্ছ্বাসময়ী ভাষা তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা ঐ জলাবর্তেরই ধ্বনি মাত্র। নাটকটির মধ্যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা, কপটতা, প্রতারণা প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা হইতে প্রবল কর্ম-সঙ্ঘাত কিছুই সৃষ্টি হইয়া ওঠে নাই। কারণ খুব সোজা। নাট্যকার ঔরংজীবকে একটি বক-ধার্মিক, শয়তান চরিত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজীর সঙ্গে অন্তরস্থিত মনুষ্যত্ববোধের দ্বন্দ্ব ঔরংজীবের মধ্যে কোথাও ফুটিয়া ওঠে নাই। তাই ঔরংজীবের চরিত্রে রহস্য বা জটিলতা বলিয়া কিছুই নাই। শেষ দৃশ্যে ঔরংজীবের বিবেক-দংশনজনিত অনুতাপ এবং সাজাহানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা তাই নিতান্ত আকস্মিক এবং অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। নাটকের অন্যান্য পাত্র-পাত্রী সকলে ষড়যন্ত্রী ঔরংজীবের হাতে কলের পুতুলের মতো নাচিয়াছে। বিপরীত প্রবৃত্তির সঙ্ঘাতে যে মুহূর্তে অভিভূত হইয়া তাহারা কর্ম ও চিন্তার দ্বারা ঘটনার সরল প্রবাহে একটা বিক্ষোভ ঘটাইতে চাহিয়াছে, তখনই নিয়তির বিধানের ন্যায় অতি আকস্মিক ভাবে ঔরংজীবের ষড়যন্ত্র তাহাদিগকে নিষ্ক্রিয় করিয়াছে, স্তম্ভিত করিয়াছে, অকল্যাণের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। নাটকে দুই-তিনটি জায়গায় মাত্র কাহিনী জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু তাহাও নিতান্ত ক্ষণিকের। ঔরংজীব তাহাকে স্থায়ী হইতে দেন নাই। নাটকের প্রথম অঙ্কে ঔরংজীবের যে ষড়যন্ত্র শুরু হইল, তাহার ফলে দারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন, মোরাদ বন্দী হইলেন। ঔরংজীব কোথাও বাধা পান নাই। দ্বিতীয় অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্যে রাজা যশোবন্ত সিংহ রাজদরবারে যখন প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন এবং জাহানারা হঠাৎ দরবার-কক্ষে প্রবেশ করিয়া যখন সেই বিদ্রোহ-বহ্নি ধূমায়িত করিয়া তুলিলেন, তখন ঔরংজীবের খান-দুই বক্তৃতার এবং তদনুগ অভিনয়ে ঘটনার মোড় আকস্মিক ভাবে ঘুরিয়া গেল। ছলনা-পটু বাক্য-বীর ঔরংজীব সমস্ত পরিস্থিতিকে নিজের আয়ত্তে আনিয়া ফেলিলেন। এই দৃশ্যটিতে ঘটনার চরমোত্থান বলিতে পারি। ঔরংজীবের ভাগ্য ইহার পর ক্রমেই সুপ্রসন্ন হইতে লাগিল। তারপর মাত্র তৃতীয় অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্যে আর একবার মহম্মদের বিদ্রোহের মধ্য দিয়া নাট্যকাহিনী জটিল হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। ঔরংজীবের একখানা চিঠির সাহায্যে সে সম্ভাবনাও চূর্ণীকৃত হইল। সুতরাং নাট্যোল্লিখিত পাত্রী-পাত্রীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, করা না-করা,

হওয়া না-হওয়ার মধ্য দিয়া নাট্যকাহিনী গড়িয়া উঠিবার অবকাশ কোথাও পাইল না। শুধু ঔরংজীবের শাঠ্য, ষড়যন্ত্র প্রভৃতির সাক্ষী হিসাবে কতকগুলি ঘটনা আসিয়া যাইতে লাগিল। এই নাটকের কাহিনী-বিন্যাস দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' বা ব্রজমোহন রায়ের 'অভিমন্যুবধ' যাত্রার ধরনে হইয়াছে। ইহার ফল হইয়াছে এই যে কোনো চরিত্রেই নাটকীয় কর্ম দেখা যায় না। চরিত্রগুলির বিকাশধর্ম মোটেও নাই। দুই একটি চরিত্রে যেটুকু গতি আছে, তাহা কর্মের নহে,—ভাবোচ্ছ্বাসের। সে দিক দিয়া ঐ চরিত্রগুলিতে যাত্রার প্রভাব আছে। নাটকীয় কর্মের অভাব পূরণ করিবার জন্যই নাট্যকার যাত্রার জলো ভাবোচ্ছ্বাসে চরিত্রগুলি সিক্ত করিয়াছেন। মৃত্যুর মুখে দাঁড়াইয়া দারা ও নাদিরার উক্তি-প্রত্যুক্তি দর্শকের চক্ষে জল আনিয়া দেয় বটে, সেই সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার হরিশ্চন্দ্র, শৈব্যা ও রোহিতাশ্বের শ্মশানে মিলনের দৃশ্যটি মনে করাইয়া দেয়। রাজত্ব লইয়া ছিনিমিনি খেলার প্রবল দ্বন্দ্বের রাজ্যে পিয়ারার হাস্যমুখর চঞ্চল প্রেমবাণীগুলি এই গভীর, গম্ভীর পরিস্থিতির উপর একটু স্বস্তি-বচন পাঠ করে বটে, কিন্তু পরিস্থিতির ঐ গুরু-গাম্ভীর্যের সঙ্গে উহার সঙ্গতি নাই। স্বামীর বিরুদ্ধে, তাহার শত্রু যখন সসৈন্যে দ্বারদেশে উপনীত, তখন কোনো সুস্থ মস্তিষ্ক যুবরাজ-পত্নী দিল্লীর লাড্ডু চাহিয়া বসিতে পারে না। মহারাজ যশোবন্ত সিংহের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ ও রাজপুতজাতি-সুলভ অসৎ-নিরোধী মনোভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। তিনি সিংহের মতোই ঔরংজীবের অন্যায়ের প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু জয় সিংহের সামান্য কথায় এই রাজপুত বীর যখন ঔরংজীবের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন, তখন কিন্তু চরিত্রটি দুর্বোধ্য হইয়া উঠিল। চরিত্রটির পূর্বগামী আচরণাবলীর সঙ্গে এই পরবর্তী আচরণের সঙ্গতি নাই। বরং বিশ্বাসঘাতক জয় সিংহের চরিত্রটি ভালই ফুটিয়াছে।

সমস্ত নাটকের মধ্যে দুইটি মাত্র চরিত্র অতি সুন্দর বিকশিত হইয়াছে। একটি নাম-ভূমিকা সাজাহান,—অন্যটি জাহানারা। নাটকটির 'সাজাহান' নামটি সার্থক হইয়াছে। এই নাটকের নায়ক ঔরংজীব নহেন,—সাজাহান। নাটকটি ট্রাজেডী,—কমেডি নহে। তাই কপট, কূট-কৌশলী বিজয়ী সম্রাট ঔরংজীব এই নাটকের নায়ক নহেন। ঔরংজীবের উপর নাট্যকারের এতটুকুও শ্রদ্ধা বর্ষিত হয় নাই। জাহানারার জ্বালাময়ী বক্তৃতা, দিল্‌দারের তীব্র ভর্ৎসনা এবং জহরতের শেষকালীন চরম অভিশাপের মধ্য দিয়া

ঔরংজীবের প্রতি নাট্যকারের অশ্রদ্ধা অভিব্যক্ত হইয়া ওঠে। তাঁহার বিজয় দুর্ভাগ্যের নামান্তর বলিয়া প্রতিভাত হয়। সুতরাং নাটকটিকে শুভ-পরিণাম নাটক বলিতে পারি না। আবার ইহাকে ট্রাজেডী বলিতে গেলে ঔরংজীবকে নায়ক বলিতে আপত্তি হয়। কেন না, ঔরংজীব জীবন-যুদ্ধে, পরাজিত নহেন, অথচ বিজয়ের মধ্য দিয়া আমাদের অন্তরকে তিনি শ্রদ্ধা-মিশ্র ভীতির দ্বারা অভিভূত করিতে পারেন না। সেদিক দিয়া আমাদের সমস্ত শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করেন সাজাহান। শক্তিমান রাজা একদিন ক্ষমতা ও সৌভাগ্যের অত্যুচ্চ সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। বার্ধক্য এবং পঙ্গুত্ব নিষ্ঠুর নিয়তির মতো তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছে। নিয়তির ক্রূর চক্রান্তে তিনি আজ আপন পুত্রের হাতে বন্দী। দৌর্বল্য শুধু তাঁহার শরীরের নয়,—মনেরও। বিপত্নীক বৃদ্ধ সম্রাট মায়ের মতো স্নেহে যে সন্তানদের পালন করিয়াছেন; সেই সন্তানেরাই আজ তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। সেই পুত্রের হাতে তিনি আজ বন্দী। তাই পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মতো তর্জন গর্জন করা ভিন্ন তাঁহার আর কোনো উপায় নাই। চারিদিকের আঘাত কুড়াইয়া কুড়াইয়া তিনি নিজের অন্তর বোঝাই করিতেছেন। তাই তিনি কখনও ক্রোধে গর্জন করিতেছেন, কখনও অভিমানে ফুলিয়া উঠিতেছেন, কখনও উন্মত্তবৎ আচরণ করিতেছেন। মহাপরাধ ঔরংজীবকে শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করার মধ্য দিয়া সাজাহানের পিতৃজীবনের ট্রাজেডীর বেদনা আরো করুণ হইয়া ফুটিয়া ওঠে। 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশ নিষ্ক্রিয় হইয়াও যেমন নাট্যের নায়ক, 'সাজাহান' নাটকে সাজাহানও তাই।

জাহানারা সাহাজানের কন্যা হইয়াও মাতা। মা যেমন অসুস্থ সন্তানের শুশ্রূষার জন্য রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া থাকে, জাহানারাকে তাহাই করিতে দেখি। ঔরংজীবের যোগ্যা প্রতিদ্বন্দ্বিনী এই নারী। ক্রুদ্ধা সিংহিনীর মতো তিনি ঔরংজীবকে আক্রমণ করিয়া ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছেন। পিতার অনুরোধে তিনি যখন ঔরংজীবকে ক্ষমা করেন, তাহার মধ্য দিয়াও দুষ্কৃতকারীর প্রতি অভিমান-ক্ষুব্ধ অভিশাপ গুমরিয়া শ্বসিয়া ওঠে।

'নুরজাহান' নাটকে নাট্যকার কাহিনী-নির্বাচনে অভিনব পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্বালোচিত নাটকগুলিতে অন্ততঃ নায়ক-নায়িকা বা প্রধান চরিত্রগুলির জীবনে নাট্যকার মোটামুটিভাবে ইতিহাসকে গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু নুরজাহান নাটকে কল্পনার আশ্রয় লইয়া তিনি ইতিহাসের মূল কাঠামোকেই বিকৃত করিয়াছেন।*

ইতিহাসের নুরজাহান তাঁহার পূর্ব-স্বামী শের আফগানকে ভালবাসিয়াছিলেন কি না ইতিহাস সে-বিষয়ে ভালমন্দ কিছুই বলে না; তবে মোটামুটি জানা যায় যে নুরজাহানের জীবনে মেহেরউন্নিসার স্বামী শের খাঁর স্মৃতি কোনো রেখাপাত করে নাই। জাহাঙ্গীরের সহিত তাঁহার বিবাহিত জীবন সুখেরই হইয়াছিল। স্বামীহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য জাহাঙ্গীরকে বিবাহ করিয়া তিনি তিলে তিলে তাঁহাকে ধ্বংসের পথে পরিচালিত করেন

*Extracts frcm History of Jahangir by Beni Prasad,

"On May sixteen, 1604, Salim was recalled from a hunt by a message— that his favourite wife was writhing in convulsions from the large draughts of opium she had swallowod," Page 54,

"But the emperor sorrow-striken at the death of his foster-brother, absolutely refused to see her and placed her in attendance on the queen-mother. The vile, crafty lady once more laid her plans to captivate Jahangir and after four years, completely succeeded. It is all very fascinating but it is not history. Sober history unfolds a tale lacking in such picturesque romances, but full of human interest," Chapter VIII.

"They refer to Nur jahan's early life, to her husband's violent death, to her marriage with Jahangir, to her vast influence over him, but they do not even insinuate any early love between them, any share of the second husband in the murder of the first," Chap. VIII.

"She loved Jahangir intensely. She mourned him intensely." Chap, VIII.

"It was in perfect harmony with her character that she was intensely ambitious...To an ambitious and dominating temperament. Nur jahan added practical capacity of the highest order." Chap. VIII.

"He was not unwilling to see the business of Government pass into the hands of a fair creature, who loved with all the strength of her strong personality whom he loved with all hiz ardour of passion, who studied his temperament, who was willing to follow all the principles of his Government, who gave him entire satisfaction and yet spared him a great deal of exertion and anxiety." Chap. VIII.

"The affectionate care of Nur jahan alone saved his life. She greatly led him to dominion his drink,' to abstain frem unwholesome diet, and to take appropriate remedies." Chap. XIV.

"Hence forward she wore only white cloth, abstained from parties of pleasure, and lived privately in sorrow, chiefly at Lahore, with her daughter, the widow of Prince Shahriyar." Chap, XXII.

নাই। অসুস্থ সম্রাটকে যখন চিকিৎসকেরা একে একে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তখন এই পতিপ্রাণা রমণীর সেবায়ই তিনি সুস্থ হইয়া ওঠেন। মেহেরউন্নিসাকে লাভ করিবার জন্য জাহাঙ্গীরের একটির পর একটি করিয়া হীন ষড়যন্ত্র তাঁহার সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ স্বীকার না-করিলেও সাজাহানের আমলে এসম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক উপকথার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু জাহাঙ্গীর যে শের খাঁর বিধবাকে কৌশলে লাভ করিবার জন্য নিজের অন্তঃপুরে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখেন এবং আসফ প্রভৃতিকে লেলাইয়া দেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য নহে। সুবেদার কুতবউদ্দীনের মৃত্যুতে মর্মাহত সম্রাট মেহেরউন্নিসার মুখ দেখিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। মেহেরউন্নিসাই বরং সুযোগ করিয়া লইয়া সম্রাটের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। তারপর মান সিংহ-ভগিনী (যাঁহার নাম মানবাই—রেবা নহে) সেলিমের বাদশাহ হইবার পূর্বেই আত্মহত্যা করেন। সুতরাং রেবার প্রতি নুরজাহানের ঈর্ষ্যা নাটকে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করিলেও ইহার ঐতিহাসিকত্ব নাই। ইতিহাসে শের খাঁর কন্যা লাডিল্লার নাম আছে, কিন্তু সে নুরজাহান-চরিত্রের প্রতিবাদ নহে। নাট্যকার নাটকীয় প্রয়োজনে ইতিহাসকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া, বিকৃত করিয়া ঢালিয়া সাজিয়াছেন।

আমাদের স্বীকার করিতে আপত্তি নাই যে,

> "নুরজাহান-চরিত্রে সঙ্গতি নাই। সে স্বামীকেও ভালবাসে নাই, জাহাঙ্গীরকেও নয়, অথচ তাহার মনোভাব পরিবর্তনের কোনো উপযুক্ত কারণ দেখানো হয় নাই।"
>
> —'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' : ২য় খণ্ড, ৩৮৯ পৃষ্ঠা,
>
> —ডঃ সুকুমার সেন।

তবুও নুরজাহানই এই নাটকের মুখ্য চরিত্র। তাঁহাকে দিয়া নাটকের আরম্ভ; নাট্যকাহিনী তাঁহার চরিত্রের সজ্ঘাতে বিকশিত এবং তাঁহাকে দিয়াই নাটকের পরিণতি হইয়াছে। নাটকটি তাই নায়িকা-সর্বস্ব। সুতরাং নাটকটির শিল্পগত সার্থকতা বিচার করিতে হইলে নায়িকা-চরিত্রের সঙ্গতি ও সার্থকতা সর্বপ্রথম বিচার্য। চরিত্রটির আরম্ভ অতি সুন্দর। প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যেই আমরা দেখিলাম, নুরজাহান তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়াছেন।—"সেলিম সম্রাট!—আবার সে কথা কেন মনে আসে?—না সে চিন্তাকে আমি মনে আসতে দেব না—না না না! সে প্রথম যৌবনের

একটা খেয়াল মাত্র। এখন আবার সে চিন্তা কেন? সেলিম সম্রাট, তাতে আমার কি? আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কাজ কি?"—এই উক্তি হইতে পরিষ্কার বুঝা যায়, নুরজাহানের মনে দুইটি বিরুদ্ধ শক্তি কাজ করিতেছে। একটি বিশ্বাসিনী পতিব্রতা আদর্শ নারীর কর্তব্য। যৌবনের খেয়ালে যদিও হয়ত কোনো দিন সেলিমের প্রতি তাঁহার এতটুকু অনুরাগ হইয়াছিল, কিন্তু আজ যখন তিনি শের খাঁর বিবাহিতা পত্নী, পরপুরুষ যতই মহান্ হউক, তাহার কথা আজ মনে আনাও তাঁহার পাপ। কিন্তু পরমুহূর্তেই দারুণ উচ্চাশা তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিতেছে। ভাগ্যবান সেলিম আজ ভারতেশ্বর। ভারতেশ্বরীর গৌরব-পূর্ণ সিংহাসন আজ হয়ত নুরজাহানেরই হইতে পারিত। এই আন্দোলিত চিন্তাতরঙ্গে নুরজাহানের মন যখন দোলায়িত ঠিক সেই মুহূর্তেই শের খাঁ আসিয়া সংবাদ দিলেন, সেলিম তাঁহাকে পাঁচহাজারী মনসবদার করিয়া আগ্রায় ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। নুরজাহান সেলিমের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াই স্বামীকে নিষেধ করিলেন। সুতরাং স্বামীর প্রতি তাঁহার অন্ততঃ মমত্ববোধ রহিয়াছে বুঝিলাম। আবার শের খাঁর উক্তি হইতে জানা গেল, মেহেরউন্নিসা মাঝে মাঝে বিচলিত হন। অর্থাৎ সেলিমের স্মৃতি যে বিবাহিত জীবনেও তিনি ভুলিতে পারেন নাই তাহার ইঙ্গিত নাট্যকার দিয়া গেলেন। এখানে আমরা অনুমান করিতে পারি, সেলিমের প্রতি মেহেরউন্নিসার আন্তরিক প্রেম থাকা স্বাভাবিক। কেন না, সেলিম যখন হইতে সম্রাট হন নাই, তখন হইতেই নুরজাহান তাঁহার স্মৃতি বহন করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্যকার প্রেম কি? যাহা নারীর সত্যকার প্রেম, তাহা মনুষ্যত্বের এবং শ্রেষ্ঠত্বের পূজা করে। সে দিক দিয়া শের খাঁ সেলিম হইতে সর্বাংশে শ্রেয়ঃ। শের খাঁ বীর, মহান্, সচ্চরিত্র। সেলিম বিলাসী, ইন্দ্রিয়ের দাস, পরনারী-লোলুপ। বার বার কৌশলে শের খাঁকে হত্যা করিতে গিয়া ব্যর্থ। তাঁহার একমাত্র সৌভাগ্য তিনি আগ্রার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। পৈতৃক রাজ্যাধিকার বলে আজ তিনি শের খাঁর মতো একটি মহামানবকে নির্যাতিত করিবার অবকাশ পাইয়াছেন। যিনি নারীত্বের আদর্শস্থানীয়া, এমন মহান্ স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া স্বামীর বিপদ ও মৃত্যুকে তিনি বরণ করিতে পারিতেন। কিন্তু নুরজাহান আর যাহাই হউন, প্রেমিকা নহেন। এমন স্বামীকেই তিনি ভালবাসিলেন না। স্ত্রীর এই ঔদাসীন্য শের খাঁর অভিমান জাগাইয়া তুলিল। তিনি বীরের মৃত্যু বরণ

করিলেন। প্রতিনায়কের নিকট নায়ক জাহাঙ্গীরের চরিত্র অতিশয় ম্লান হইয়া গিয়াছে।

নুরজাহানের উচ্চাশাই কি তাঁহার স্বামিহত্যার কারণ হইয়াছিল? তাঁহার ঔদাসীন্যই তাঁহার স্বামীকে জীবন-বিসর্জনের প্রেরণা যোগাইয়াছিল? নাট্যাংশে ইহা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে সন্দেহ নাই। হৃদয়-বৃত্তির তীব্র সঙ্ঘাতে ঘটনা রূপায়িত হইতেছে। প্রবৃত্তির ঘূর্ণিপাক এক মহা ঝড় তুলিতে চলিয়াছে। নাট্যকার কাহিনীর চমৎকারিত্ব, নায়ক-নায়িকার অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং ঘটনার তীব্র সঙ্ঘাত সৃষ্টি করিবার জন্য নুরজাহানের মনকে এমন দ্বিধা-বিভক্ত করিয়াছেন। নুরজাহানের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না করিলে কাহিনী নিতান্ত সরল রেখায় চলিত। আর ইহাতে নুরজাহানের চরিত্র-চিত্রণে তিনি যতখানি দক্ষতা দেখাইতে পারুন আর নাই পারুন, তাঁহার পারিপার্শ্বিক জগৎকে অতি অপূর্বভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। নুরজাহানকে অবলম্বন করিয়া শের খাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব সুন্দর ফুটিয়াছে। এই চরিত্রটি নাট্যকারের প্রতিভার অসাধারণত্ব ধরাইয়া দেয়। মহাবৎ খাঁর চরিত্রে মহত্ত্ব, উদারতা, ক্ষমতা ও সহিষ্ণুতার সমন্বয় করিয়া তিনি চরিত্রটিকে অনন্য-সাধারণ করিয়াছেন। একদিক দিয়া ভাবিয়া দেখিলে এই চরিত্রটি নুরজাহানের সম্পূর্ণ এবং উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী। নুরজাহান জাহাঙ্গীরকে ভালবাসেন না, ভালবাসেন তাঁহার ক্ষমতাকে। তাই নিজের নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মোগল সম্রাটকে নিজের দৈহিক সৌন্দর্য পান করাইতেছেন এবং রূপের যাদুতে সেলিমকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহার রাজক্ষমতা হাতে লইয়া স্বেচ্ছাচারিতার ঘোড়া ছুটাইয়া দিয়াছেন। আর মহাবৎ সম্রাটের সমস্ত দুর্বলতা সত্ত্বেও তাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসেন। সম্রাট আকবরের পবিত্র বংশের যশ তিনি ম্লান হইতে দিতে চাহেন না। তাই তাঁহার বিদ্রোহও ভালবাসার নামান্তর। সমস্ত ক্ষমতা হাতের মুঠার মধ্যে পাইয়াও তিনি তাহা বিলাইয়া দিয়া ফকির হন। নুরজাহানের দম্ভদৃপ্ত সম্রাজ্ঞী-গরিমা, ক্ষমতার মোহও তাই এই মোগল সেনানীর নিকট একমুহূর্তে দুর্বল মেষশাবকের মতো মাথা নত করে। নাটকের নায়কার ঘটনার সমস্ত তুচ্ছতা ও কদর্যতার উর্ধ্বে অমল-ধবল গৌরী-শৃঙ্গের মতো গৌরবে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ান এই মহাবৎ খাঁ। সমগ্র বাংলা ঐতিহাসিক নাটকে এই চরিত্রটির তুলনা হয় না। আর মহাবৎ খাঁকে এমন মহনীয় করিয়া আঁকার কারণ এই মনে হয় যে দ্বিজেন্দ্রলাল জাহাঙ্গীরের

রূপ-মোহ এবং নুরজাহানের এই পুনর্বিবাহ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। দেখিতে পারেন নাই বলিয়াই তিনি বিচারকের আসনে বসিয়াছেন। লায়লার মুখ দিয়া নাট্যকারের নিজের কথা অতি স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কোনো বিশেষ ভূমিকার মাধ্যমে নাট্য-কাহিনী এবং প্রধান প্রধান চরিত্রের সমালোচনা করা দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের একটি বৈশিষ্ট্য। সাজাহানের দিলদার ও জাহানারা এই জাতীয় চরিত্র। কিন্তু সাজাহান নাটকে জাহানারা চরিত্র যতখানি সঙ্গত হইয়াছে, নুরজাহানের লায়লা ততখানি অসঙ্গত। যদিও চরিত্র দুইটি জাতি-বর্ণ, বাক্‌বিন্যাস ও কার্য-প্রণালীতে এতটুকুও ভিন্ন নয়। আওরঙ্গজেবের নিষ্ঠুরতা, অমানুষিকতা ও কপটতাকে চোখে আঙুল দিয়া ধরাইয়া দিবার জন্য অন্তঃপুরে শনিদৃষ্টির মতো জাগ রহিয়াছে জাহানারা। আবার যখন রাজসভায় নিজের বুদ্ধি ও বাক্‌-চাতুর্যের বলে সমস্ত রাজসৈন্য-সামন্তদিগকে আওরঙ্গজেব নিজের পক্ষে টানিয়া লয়, তখনই রুদ্রবেশে সেই প্রকাণ্ড দরবারে সাজাহানের পক্ষ থেকে মূর্ত অভিযোগরূপে আবির্ভূত হয় জাহানারা। এখানেও তেমনি জাহাঙ্গীরের অত্যাচার এবং নুরজাহানের স্বেচ্ছাচারকে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবার জন্য অন্তঃপুরে এবং রাজদরবারে আকস্মিকভাবে নাটকীয় আবির্ভাব হয় লায়লার। কিন্তু মোগল রাজপরিবারের নিজস্ব অন্তঃপুরশ্চারিণী আওরঙ্গজেব-ভগিনী জাহানারার পক্ষে আওরঙ্গজেবের কার্যের প্রতিবাদ করা যতখানি সম্ভব এবং স্বাভাবিক, একজন সামান্য জায়গীরদারের বন্দিনী অল্পবয়স্কা কন্যার পক্ষে তাহা ততখানি সম্ভব এবং স্বাভাবিক কিনা তাহা অবশ্যই ভাবিবার বিষয়।

যাহাই হউক, আবার আমরা নুরজাহান চরিত্রে ফিরিয়া যাই। পূর্বেই বলিয়াছি, নুরজাহান ও জাহাঙ্গীরের বিবাহকে নাট্যকার শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারেন নাই বলিয়া নুরজাহানের বিবাহ-পরবর্তী জীবনকে এক অনিয়ন্ত্রিত, অসংযত মনের স্বেচ্ছাচারিতার খেলা হিসাবে দেখাইয়াছেন। ইতিহাসের দিক দিয়া ইহা অসত্য। ইহা সত্য যে শেষ জীবনে জাহাঙ্গীর ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির আনন্দে মশগুল হইয়া গিয়াছেন। মহাবৎ খাঁর বিদ্রোহ ঐতিহাসিক। কিন্তু ইতিহাসে নুরজাহান বিচক্ষণা, বুদ্ধিমতী এবং স্বামীর শুভাকাঙ্ক্ষিণী নারী বলিয়াই পরিচিতা। নিজের বুদ্ধি ও প্রতিভার বলে এই ঔদা। মহাবৎ খাঁর হস্ত হইতে বন্দী স্বামীকে উদ্ধার করেন। সুতরাং

জাহাঙ্গীরের ও নুরজাহানের শেষ জীবন অঙ্কনে নাট্যকার ইতিহাসের মর্যাদা সর্বাংশে রক্ষা করেন নাই।

নাট্যকার যে পরিপ্রেক্ষিতে নুরজাহান-চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে নুরজাহানের শেষ পরিণতি ঐরূপ না হইয়া উপায় ছিল না। সেলিমের সঙ্গে তাঁহার পরিচয়ের যেটুকু ইঙ্গিত তাঁহার মুখে আমরা শুনিয়াছি, তাহা হইতে অনুমান করিতে পারি, সেলিমের প্রতি তাঁহার প্রেম বা হৃদয়-গলা আত্ম-নিবেদন ছিল না। ছিল রূপগর্বে মাতোয়ারা সৌন্দর্য-পসারিণীর বিজয়-দম্ভ। সেই দম্ভকে তিনি চিরদিন স্মরণে রাখিয়াছেন। তাই শের খাঁর প্রেমকে তিনি বুঝিয়াও বুঝেন নাই। সেলিমের প্রতি তাঁহার যে আকর্ষণ তাহা ঐশ্বর্য ও ক্ষমতালিপ্সার। তাহাই যদি হয়, তবে সেই ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা হাতে পাইয়াও তাহাকে নুরজাহান কেন ধ্বংসের ও স্বেচ্ছাচারিতার উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করিলেন? যদি বুঝিতাম, শের খাঁকে তিনি সত্যই ভালবাসিয়া-ছিলেন এবং এই বিবাহ অসহায়া বিধবার প্রতিশোধ লইবার প্রচ্ছন্ন উপায় মাত্র, তাহা হইলেও না হয় নুরজাহানের আচরণকে মানিয়া লইতে পারিতাম। কিন্তু শের খাঁকে নুরজাহান কোন দিন ভালবাসেন নাই ইহাই তো নাট্যকারের বক্তব্য। অথচ ভালবাসা নারীজীবনের সবটুকু। উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলে নারী এই ভালবাসার জন্য জীবনের অন্যান্য সব কিছুই বিসর্জন দেয়। নারী-জীবনের এই চরম সত্যকে নাট্যকার নুরজাহানের জীবন হইতে একেবারে নিষ্কাশিত করিয়াছেন। নুরজাহানের মধ্যে পুরুষোচিত বহু লক্ষণ আছে, কিন্তু সুষ্ঠু নারীত্ব নাই। নুরজাহানের পুনর্বিবাহের পরবর্তী জীবনের ঘটনাবলী সমর্থন করিতে হইলে আমাদের স্বীকার করা উচিত যে তিনি শের খাঁকে মনে-প্রাণে ভালবাসিয়াছিলেন। আর নারী যদি একবার প্রাণ দিয়া কোনো পুরুষকে ভালবাসে, তাহা হইলে সে জীবনে কোনদিন অন্য পুরুষকে সেই ভালবাসা দান করিতে পারে না ইহা বর্তমান নারী-মনস্তাত্ত্বিকেরাও স্বীকার করেন। সেখানে পুরুষের অবাঞ্ছিত ভালবাসার অত্যাচার নারীর স্নায়ুমণ্ডলীতে দ্বৈধী বিক্ষেপ সৃষ্টি করিয়া মনোজগতে আনে প্রচণ্ড বিক্ষোভ। সেই জন্য বিক্ষিপ্ত, রুদ্ধ, নির্যাতিত মনোবৃত্তি নারীকে অসহিষ্ণু ও ধ্বংসশীলা করিয়া তোলে। শেষ পর্যন্ত তাহার মস্তিষ্ক-বিকার ঘটাইয়া থাকে। নুরজাহানের পক্ষে ইহার সকলই সম্ভব হইত যদি তিনি শের খাঁকে ভালবাসিয়া থাকিতেন। কিন্তু নাট্যকার নাটকের কোথাও এমন

ইঙ্গিত দেন নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের সামনে দুইটি মাত্র পথ ছিল। সেলিমের সঙ্গে নুরজাহানের বিবাহ দিয়া তিনি সুখের সংসার বাঁধিতে পারিতেন। কিন্তু তাহাতে নাটকটির আকস্মিক সমাপ্তি ঘটিত। এই আকস্মিক পরিসমাপ্তির হাত হইতে নাটককে বাঁচাইবার জন্যই তিনি নুরজাহানের উচ্চাশাকে অতখানি অতিচারী করিয়াছেন। নাটকের দিক দিয়া ইহা অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল স্বীকার করি। কিন্তু তাহা আরো খানিক সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু একদিক দিয়া নাটকখানির প্রশংসা অবশ্যই করিতে হইবে। দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার মধ্যে এই একখানি মাত্র নাটক যাহার গঠন-রীতি অতি সুসম্পূর্ণ। অবশ্য নুরজাহান-চরিত্রের আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি স্মরণ রাখিয়াই আমরা বলিতেছি, নাটকের সমস্ত কাহিনীকে ও অন্যান্য পার্শ্ব-চরিত্রকে নায়িকাচরিত্রের সঙ্ঘাত-সংস্পর্শে ফুটাইয়া তুলিবার এমন সার্থক প্রচেষ্টা দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যান্য নাটকে নাই, ইহার প্রত্যেক পরবর্তী ঘটনা পূর্ববর্তী ঘটনার সঙ্ঘাতে ও পরিপূরণের প্রয়োজনে গড়িয়া উঠিতেছে। আর প্রত্যেকটি ঘটনা প্রত্যক্ষে হউক আর পরোক্ষেই হউক, কেন্দ্রায়িত হইতেছে নুরজাহানে। এই দিক দিয়া নাটকখানি সার্থকত্ব লাভ করিয়াছে। স্থান-কাল-পাত্রের এমন ঐক্য তাঁহার অন্য কোনো নাটকে নাই।

এই নাটকের আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত দৃশ্য হইতে দৃশ্যান্তরে যাইবার সময় প্রত্যেক পূর্ববর্তী ঘটনায় পরবর্তী ঘটনার উৎসুক গতিবেগের স্পষ্ট ইঙ্গিত থাকে। প্রত্যেক পরবর্তী ঘটনা পূর্ববর্তী ঘটনার স্পন্দিত গতিবেগের আকুতি বহন করিয়া পূর্ণতা লাভের দিকে ছুটিয়া চলে। তাই এই নাটক-খানির আদ্যন্ত রসানুভূতির নিবিড়তা এবং ঐক্য বজায় থাকে। দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় ঐতিহাসিক নাটক যে পরিণতি লাভ করিল, উহা পরবর্তী কালে তাহা হইতে অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই।

———

অষ্টম অধ্যায়

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মূলতঃ রোমান্স্ নাট্যের রচয়িতা; এই বিশেষ ক্ষেত্রেই তাঁহার সাফল্য এবং বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার মতো; রোমান্স্-প্রিয়তা তাঁহার অনেক নাটকের ঐতিহাসিকতা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, বাস্তবতাকে অবাস্তবতার মধ্যে মিলাইয়া দিয়াছে; 'আহেরিয়া', 'রত্নেশ্বরের মন্দিরে', 'চাঁদবিবি' নাটকের আলোচনা; উপকথা-সম্বল নাটকে ক্ষীরোদপ্রসাদের সাফল্য সর্বাধিক; বাস্তবতামূলক, ঐতিহাসিক ও রোমান্টিক্ নাটকের শৈলীর পার্থক্য; 'আলিবাবা' ও 'বরুণা' নাটকের আলোচনা; 'আলমগীর' নাটকে ক্ষীরোদপ্রসাদের সংলাপ ও চরিত্র সৃষ্টির অপূর্ব দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে; পৌরাণিক নাটক রচনায় ক্ষীরোদপ্রসাদ পুরাণকাহিনীর অলৌকিকত্বকে সম্ভাব্য বাস্তবতার দ্বারা মণ্ডিত করিয়াছেন; সেজন্য তিনি পুরাণপ্রসিদ্ধি অনেক স্থলে উপেক্ষা করিয়াছেন; পৌরাণিক চরিত্রে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের অভিনব ভঙ্গী গ্রহণ করিয়া তিনি কাহিনীর মধ্যে ঘনত্ব ও গতিবেগ সৃষ্টি করিয়াছেন; চরিত্রের মধ্যে আনিয়াছেন জটিলতা; কবিত্বপূর্ণ সংলাপে দৃশ্যে দৃশ্যে আরোহ অবরোহের ঘনীভূত মুহূর্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, 'উলূপী', 'ভীষ্ম' নাটকের আলোচনা; ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নর-নারায়ণ' বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক; উহার মধ্যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নাট্যরীতির সমন্বয় হইয়াছে; 'নর-নারায়ণ'-এর আলোচনা।

ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে রোমান্স্ এতোই প্রাধান্য-লাভ করিয়াছিল যে তাহার জন্য তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাস খুঁজিয়া পাওয়া কষ্ট। রোমান্টিক নাটকে আখ্যায়িকার আকস্মিক পরিবর্তন ও অসংযত গতিবেগ কর্মকে গোপন করিয়াছে, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যে বিস্ময়মিশ্রিত কৌতূহল ভিন্ন অন্য কিছুর সীমারেখা রাখে নাই। অর্থাৎ পরিস্থিতি হইতে পরিস্থিতিতে সংক্রমণ কালে ঘটনার যে ক্রমাগতি থাকার প্রয়োজন, চরিত্রের সঙ্ঘাত ও বিকাশের মধ্য দিয়া কর্মকে রূপায়িত করিবার যে প্রয়াস, ক্ষীরোদপ্রসাদের অনেক নাটকেই তাহা নাই। তাঁহার ঐতিহাসিক, রোমান্টিক, কাল্পনিক, সমস্ত নাটকেই এই একই নীতি অনুসৃত হইয়াছে। 'আহেরিয়া' নাটকের নায়ক ভট্টি-বংশীয় বালক বীর 'দেবরায়' চর্মকার-পল্লীতে প্রতিপালিত। শিক্ষা-দীক্ষা তাহার কিছুই হয় নাই। অকস্মাৎ 'আহেরিয়া' উৎসবে বারাহা লাদাই-এর

বীরকুল যখন মাতিয়া উঠিল, তখন এই বীরবংশীয় বালকের ধমনীতে নিজের অজ্ঞাতসারে সুপ্ত বীররক্ত নাচিতে লাগিল। কী এক অজ্ঞাত আকর্ষণে সে-ও বীরবেশে ছুটিয়া বাহির হইল। বংশ-গরিমার সুপ্ত শক্তিকে প্রাধান্য দিতে গিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ যৌক্তিকতা বিসর্জন দিয়াছেন। বংশানুক্রমিকতা মরিবার নয়, এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে না-হয় স্বীকার করিলাম। মানিলাম বীরের বংশে বীর সন্তান জন্মগ্রহণ করাই স্বাভাবিক। কিন্তু কোন্ যুক্তিতে মানিয়া লইব যে মহাবংশে জন্মগ্রহণ করিলে যথোপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন হয় না? কোন্ শক্তি বলে এই বীর বালক সুশিক্ষিত রাজপুতদিগকে অশ্বারোহণে ও যুদ্ধে একে একে পরাস্ত করিল? সুতরাং দেখিতে পাই, চরিত্রটির সুযৌক্তিক ক্রমবিকাশ নাই। ইহা উপকথার পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। 'রত্নেশ্বরের মন্দিরে' নাটকেও একই শৈলীর পুনরাবর্তন দেখিতে পাই। 'রত্নেশ্বর' বীরনগরের জমিদার মৃত 'রঘুরাম সিংহ' ঠাকুরের পুত্র। তাহার খুল্লতাত জানকীরাম সম্পত্তির মোহে তাহাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু রঘুরামের ভৃত্য মাধব কর্মকারের চেষ্টায় শিশুটির জীবন রক্ষা হয়। মাধবের মাতা যাদবপুর মৌজায় গিয়া নিজের নাতি পরিচয়ে এই শিশুটিকে পালন করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে নিরাশ্রয় বালক 'রত্নেশ্বর' মৌজাদার জটাধারী সিংহের বাড়িতে চাকরের কার্য করিয়া জীবন ধারণ করিতে থাকে। এই হইল রত্নেশ্বরের পূর্বপরিচয়। যখন হইতে আমরা রত্নেশ্বরকে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি তখন সে অতিবিংশতিবর্ষ যুবক। আমরা অবশ্যই বুঝিয়া লইব যে শিশুকাল হইতে বহু ভাগ্য-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া বালকটি জীবন ধারণ করিয়া আসিয়াছে বলিয়া তাহার শিক্ষা-দীক্ষার কোনো ব্যবস্থাই হয় নাই। বিশেষতঃ জটাধারী সিংহের উগ্রচণ্ডা স্ত্রীর রোষান্বিত বাণী হইতেই বুঝা যায়, রত্নেশ্বরকে অনাদৃত, অবহেলিত চাকর করিয়াই রাখা হইয়াছিল। পরে যখন 'সুরমা'র হারমোনিয়মের বাক্স বাজাইয়া 'রত্নেশ্বর' গান করে, তখনও আমরা জানিতে পাই, আধুনিক সভ্যতার আলোক এই যুবকটি পায় নাই। লেখক এমন একটি পুরুষকে নায়ক করিতে গিয়া কতকগুলি অনুপেক্ষণীয় অসঙ্গতি সৃষ্টি করিয়াছেন। সমস্ত কাহিনীর অবলম্বন যদিও তিনটি রাজপুত পরিবার, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, কাহিনীর ঘটনাকাল 'টড্'-বর্ণিত রাজপুত-বীরত্বের যুগ নয়,—আধুনিক ঊনবিংশ শতক। কারণ প্রতিনায়কটি ক্ষীণদেহ,

শারীরিক-শক্তিবিমুখ, বাক্যবাগীশ, ইঙ্গবঙ্গ-সংস্কৃতিতে অভিস্নাত, বাঙালী ভদ্রলোক। এই প্রত্যক্ষ বাস্তবতার সঙ্গে রোমান্টিকতার সংযোগ করিতে গিয়া নাট্যকার বিপদে পড়িয়াছেন। আমাদের প্রশ্ন রহিয়া যায়, এই যুগে শুধু শারীরিকশক্তিবলে পাঁচ-সাতজন যুবককে পরাজিত করিলে, পাখীমারা বন্দুক দিয়া বাঘ মারিলে এবং সাঁতার কাটিয়া নদী পার হইলেই কি তাহাকে একটি শিক্ষিতা জমিদার-কন্যার যোগ্য বর বিবেচনা করা সম্ভব? এই শক্তি সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠিতে পারে। সুশিক্ষিত শিকারী ভিন্ন পাখীমারা বন্দুক দিয়া বাঘ মারা যায় কি না? এই বন্দুক-চালনা 'রত্নেশ্বর' কোথায় শিখিয়াছিল? অবশ্য বাঘের সহিত মল্লযুদ্ধের কথাও আছে। রত্নেশ্বরের নদীপার হওয়া লইয়া নাট্যকার যে রোমান্‌স্ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার যৌক্তিকতা না-ই তুলিলাম। রত্নেশ্বরের ব্যাঘ্র-শিকার, সুরমাকে বাঁচানো, সব কিছু কাহিনী মিলিয়া জনসাধারণে যথেষ্ট প্রবাদ তৈয়ারী হইল। আমাদের মনে করিতে হইবে, তখন বাংলা দেশে কয়েকটি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র চালু হইয়াছে। এই রোমান্টিক দুঃসাহসী কার্যগুলি কি কর্মী বীরের নামসমেত বড় বড় হরফে সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায়ই মুদ্রিত হইত না? নাট্যকার রোমান্‌সের মোহে বাস্তবতাকে একেবারেই অস্বীকার করিয়াছেন। ওদিকে শৈলীর আর একটা বড় ত্রুটি আমরা লক্ষ্য করি। নিজের চরিত্র-বিকাশের মধ্য দিয়া 'রত্নেশ্বর' যতখানি না উন্নত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার অধিক করিয়া নাট্যকার তাহাকে প্রচার করিয়াছেন। রত্নেশ্বরকে ঠাকুর রঘুরাম সিংহের পুত্র বলিয়া 'মাধব' পরিচিত করাইতে না-করাইতেই শুধু গ্রাম্য জন নয়, স্বয়ং সপরিবার 'জটাধারী সিংহ' বাড়ির এই অশিক্ষিত, অবহেলিত, দুর্দান্ত চাকরটিকে মনিব বলিয়া মানিয়া লইল। এ-বিষয়ে কোনো প্রশ্ন তাহার মনে জাগিল না, কেহ এতটুকু অনুসন্ধানও করিল না। 'রাজা কৃত্তিবাস'ও 'রত্নেশ্বরের' বংশ-গরিমা এবং মহত্ত্ব ঢোক-গিলিয়া বিশ্বাস করিয়া লইলেন। পরীক্ষার যে উপায় তিনি অবলম্বন করিলেন, তাহাতে যে-কোনো বংশীয়, যে কোনো পালোয়ানই উত্তীর্ণ হইতে পারিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই নাটকের প্রধান চরিত্রগুলির কোনো আভ্যন্তরীণ সঙ্গতি নাই এবং বাস্তবতাও বিশেষ কিছু নাই।

ক্ষীরোদপ্রসাদের কয়েকখানি ঐতিহাসিক নাটক এই একই দোষে দুষ্ট। 'চাঁদ বিবি' নাটকের বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে। বিলাসী সুলতান ইব্রাহিমের ভোগোন্মত্ততার সুযোগ লইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার

চেষ্টায় নিরত ওম্‌রাহ অন্তর্বিরোধ সৃষ্টি করিলেন এবং শেষ পর্যন্ত বহিঃশক্তি মোগলকে ডাকিয়া আনিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা বিসর্জন দিলেন। ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা। বিজাপুরের মহীয়সী বীরাঙ্গনা 'চাঁদ সুলতানা' মোগল সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া রণক্ষেত্রে প্রাণ-বিসর্জন দিয়াছিলেন, ইহাও ইতিহাসেরই কথা। কিন্তু দুই দিক দিয়া দুইটি বিরুদ্ধ প্রেরণা আসিয়া নাটকখানির ঐতিহাসিকতা ও নাটকীয়তা নষ্ট করিয়াছে। প্রথমটি হইতেছে আধুনিক যুগের অতিসচেতন স্বাদেশিকতা। হিন্দু-মুসলমান সমস্ত চরিত্রকে স্বদেশপ্রাণ করিয়া তোলায় ও তাহাদের মুখে কথায় কথায় বিদেশী-শাসনের প্রতি অবজ্ঞার বাণী সংযোজনে লেখকের উদ্দেশ্য-প্রবণতা ধরা পড়িয়া যায়। দ্বিতীয়টি কাহিনীর অতিমাত্র রোমান্‌স্‌-প্রবণতা। আমরা একটু লক্ষ্য করিলে দেখিব, নাট্যকার সমস্ত নাটকের মধ্যে অতিপ্রাধান্য দিয়াছেন দুইটি নারীকে। একটি 'চাঁদ সুলতানা' অন্যটি 'যশোদা'। সমস্ত নাটকে এই দুইটি সবচেয়ে আকর্ষণীয় চরিত্র। যোশীবাঈ আমীর-ওমরাহের গুপ্ত ষড়যন্ত্র ভেদ করে; গুপ্তভাবে আক্রমণকারী শত্রুর আয়োজন ব্যর্থ করিয়া দেয়। শক্তি ও বুদ্ধিতে, রাজভক্তি ও কর্তব্যপরায়ণতায় যোশীবাঈ তাই আহ্‌মদনগরের সমস্ত পুরুষের চেয়েও বেশি করিয়া আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতে এই যোদ্ধবেশিনী রমণী নিজেই শুধু অস্ত্র ধারণ করে না—স্বামীকে আসন্ন মৃত্যুর মুখে হাসিতে হাসিতে পাঠাইয়া দেয়। তাই সমস্ত নারী-পুরুষের মধ্যে শ্রদ্ধা ও সমবেদনার শ্রেষ্ঠ অধিকার তাহার। ওদিকে সমস্ত দাক্ষিণাত্যের পাঠান রাজলক্ষ্মীর মানবীকৃত মূর্তিতে, বিবদমান ওমরাহদের মধ্যে সন্ধিস্থাপনায়, আক্রমণকারী বিদেশীকে দলিত-মথিত করিয়া পিতৃরাজ্য রক্ষায় সিংহবাহিনীর ন্যায় রণোন্মাদনায়, বীরাঙ্গনা চাঁদ সুলতানা যে-ভাবে সমস্ত কাহিনীর রশ্মি নিজের হাতে লইয়াছেন, তাহাতে তিনি শুধু কেন্দ্রস্থ চরিত্র নহেন, তিনি এই নাটকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা,—নায়িকা। সুতরাং সমস্ত নাটকখানির মধ্যে প্রধান, শ্রদ্ধেয় এবং আকর্ষণীয় চরিত্র দুইটি নারীর।

তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু এইবার আমরা দেখিব, এই দুইটি প্রধান চরিত্র অঙ্কনে নাট্যকার ঐতিহাসিক সত্যকে উপেক্ষা করিয়া কী উৎকটভাবে কল্পনাবিলাসী হইয়াছেন। বিবদমান উজীর ও ওমরাহের কলহ মিটাইতে চাঁদ সুলতানার আকস্মিক আবির্ভাব পরীরানীর মতো। বিজাপুর ও আহ্মদনগরের রাজধানী দুই রাজ্যের সীমারেখার এপার-ওপারে

অবস্থিত নয়। সুতরাং আমরা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারি না যে অপরাহ্নে মৃগয়ার ছলে অশ্বারোহণ করিয়া 'চাঁদসুলতানা' কি করিয়া পিতৃরাজ্যে আসিয়া পৌঁছিলেন! এবং তাহা আসিলেনও সবার অজ্ঞাতে। দুই বিবদমান ওমরাহের ঠিক বিবাদমুহূর্তে, আকাশ হইতে হঠাৎ খসিয়া পড়া চাঁদের মতো, গৃহমধ্যে তাঁহার আবির্ভাব হইল। তাঁহার আকস্মিক আবির্ভাবের মন্ত্রশক্তিতে মুগ্ধ ওমরাহ ইন্দ্রজালাভিভূতের ন্যায় এক নিমেষে নিজেদের দ্বন্দ্বাভিমান বিসর্জন দিল, আবার 'চাঁদ সুলতানা' স্বামীর রাজ্যে প্রস্থান করিলেন, রাত্রি প্রভাত হইবার অবকাশ পাইল না। আমরা পবন-নন্দন হনূমানের গন্ধমাদন আনয়নকে বিশ্বাস করিতে পারি, পরীরানীর পক্ষিরাজ ঘোড়াকেও মানিয়া লইতে আপত্তি করি না। কিন্তু ঐতিহাসিক চাঁদ সুলতানার এই কার্যকে মানিয়া লইবার যুক্তি খুঁজিয়া পাই না।

রাজপুতনার ইতিহাসে এক কৃষক বালিকা স্বীয় বীরত্বের পরিচয়ে রাজপত্নী হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। চলন্ত অশ্বের গায়ে কৌশলে মহিষ-বাঁধা দড়ি জড়াইয়া দিয়া আরোহী সৈনিককে ভূতলশায়ী করা এবং বিরাট বন্য বরাহকে শস্য-দণ্ডের আঘাতে হত্যা করিয়া অবলীলাক্রমে শিকারে আগত রাজপুত্রের সমীপে টানিয়া আনা তাঁহার কীর্তি। সুতরাং একজন মারাঠী অশ্বারূঢ়া রমণীর পক্ষে অনুসরণকারী একজন বিপক্ষ সৈন্যকে চুলের মুঠি ধরিয়া সারাপথ ঝুলাইয়া আনা এতটুকু অসম্ভব নয়। কিন্তু অতর্কিতভাবে আমীরদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে তর্ক-যুদ্ধ করা একজন মধ্যযুগীয় পুরশ্চারিণীর পক্ষে কতটা বাস্তব,—বিশেষতঃ মুসলমানের সঙ্গে হিন্দু রমণীর, তাহা জিজ্ঞাস্য। যোশীবাঈকে যেমন করিয়া নগরে-প্রান্তরে, কাননে-উপবনে, রণক্ষেত্রে-অন্তঃপুরে অবাধে বিচরণ করানো হইয়াছে তাহাতে তাহার চরিত্রের বাস্তবতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

চাঁদ সুলতানার অন্বেষণে সম্রাট আদিল শাহের গৃহত্যাগ করা স্বাভাবিক। বংশ-গরিমা রক্ষার জন্য নিজে ফিরিয়া না আসার বা চাঁদ সুলতানাকে আসিতে না দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করাও স্বাভাবিক। কিন্তু চোরের মতো রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ভগিনীর সাক্ষাৎ লাভের ফলাফল কি তাঁহার সুলতানী বুদ্ধিতে তিনি বুঝিতে পারেন নাই? এই অতি অপ্রত্যাশিত সাধারণ ভুলটি নাট্যকার বিজাপুরের সুলতানকে দিয়া করাইয়াছেন। আবার এই সামান্য ভুলের উপর নির্ভর করিয়া বিজাপুর ও আহ্মদনগরের

মধ্যে তিনি মহাযুদ্ধ সঙ্ঘটন করিলেন। তাহার সূত্র ধরিয়া আসিল মোগল। আহ্‌মদনগরের পতন হইল। ইতিহাসের 'রূঢ় বাস্তবতা'র মধ্যে এই 'রোমান্‌স্‌' সৃষ্টির অবকাশ কোথায়? ক্ষীরোদপ্রসাদের কল্পনা অতিচারী হইয়া ইতিহাসকে বিকৃত করিয়াছে। ইতিহাসাশ্রিত কাহিনী অবলম্বনে রচিত অন্যান্য নাটকেও ঐ একই দোষ দেখা যাইবে। সবকয়খানি নাটক আলোচনা করিবার অবকাশ এখানে নাই।

ক্ষীরোদপ্রসাদের এইরূপ দোষত্রুটিপূর্ণ অনাটকীয় নাটকের সংখ্যা যথেষ্ট। কিন্তু তাঁহার এই অসার্থক নাটকগুলি দেখিয়া যদি তাঁহাকে নিম্নশ্রেণীর নাট্যকার বলিয়া আমরা রায় দিয়া বসি, তাহা হইলে তাঁহার যে কয়েকখানা ভাল নাটক আছে, সেগুলির প্রতি অবিচার করা হইবে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, সেই ভাল নাটকগুলি কি? এবং কেন সেগুলিকে ভাল নাটক বলিতেছি?

কেন বলিতেছি তাহা বলিবার পূর্বে আমাদের একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। নাটকের বিষয়বস্তু অনুসারে তাহার রস-পরিবেষণের ও আস্বাদনের তারতম্য হয়। বিষয়বস্তু ও রসের পার্থক্যের জন্য নাটকের আকৃতি এবং প্রকৃতিরও পার্থক্য হইয়া থাকে। যে নাটকের কাহিনীই হইল অতিমাত্র বাস্তব, সামাজিক বা ঐতিহাসিক, তাহার বাস্তবতা যাহাতে এইটুকুও ক্ষুণ্ণ না হয় সে দিকে আমরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখি। সামাজিক নাটকে কাহিনীর চমৎকারিত্বের চেয়েও মনস্তাত্ত্বিক সঙ্ঘাত আমরা বেশি আশা করি। রোমান্টিক নাটকে ঘটনার যে চমৎকারিত্ব তাহা সদা-সর্বদা আমাদিগকে বিস্ময়ে অভিভূত করে, কিন্তু 'সম্ভাব্য বাস্তবতা'কে অস্বীকার করে না বলিয়া অস্বাভাবিক হয় না। আবার ইতিহাসের কাহিনীর যুগ-পরিবেশ ও চরিত্র সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমাদের একটা বিশেষ ধারণা বা জ্ঞান থাকার জন্য ঐতিহাসিক পাত্র-পাত্রী আমাদের বর্তমানের অন্তরালবর্তী হইলেও রোমান্টিক নাটকের কাল্পনিক চরিত্রের দ্বারা যাহা ঘটাইতে পারি, ঐতিহাসিক পাত্র-পাত্রীকে দিয়া তাহা পারি না। এইগুলি মনে করিয়া বিশেষ বিশেষ ধরনের নাটকের বিচারে আমাদের মনকেও তদ্রূপ তৈয়ারী রাখিতে হইবে। 'Othello' নাটকের চরিত্র ও কাহিনীর বিচার আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গীতে করিব 'Mid-Summer-Night's-Dream' বা 'Tempest' নাটকের চরিত্র ও ঘটনার বিচার সেই দৃষ্টিতে করিব না। কেন না,

রোমাণ্টিক নাটক ওথেলোর জগৎ এবং উপকথা-সম্বল 'নিদাঘনিশীথ-স্বপ্ন' বা 'ঝটিকা' নাট্যের জগৎ ও জীবন এক নয়। ইতিহাস-গন্ধী রোমান্‌সের রাজ্যে ওথেলোর বিরাট শক্তিমত্তা ও মূঢ়তা, ডেস্‌ডিমেনোর কমনীয় প্রেম ও মহনীয় নারীত্ব, ইয়াগোর দুর্দান্ত ঈর্ষ্যা, এ সকল যতখানি সত্য, ঝড়ের রাতে, বাত্যাবিক্ষুব্ধ, সমুদ্রের তরঙ্গ-গর্জনের মধ্যে অর্ধ-দৈত্য ক্যালিব্যান্‌'ও ততখানি সত্য। এখানে আমাদের লক্ষণীয়, নাট্যকার বিশিষ্ট পরিবেশে, বিশিষ্ট পাত্র-পাত্রীকে নিজস্ব পূর্ণতা দান করিতে পারিয়াছেন কি না।

ক্ষীরোদপ্রসাদের বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্র ইতিহাস নয়, পুরাণ নয়, রোমান্‌স্। এই সকল নাটকে গল্পের রস জমাট বাঁধিয়াছে। কোথাও এতটুকু দুঃসহ অসঙ্গতি নাই, অসুন্দরত্ব নাই। যেটুকু আছে তাহা লেখকের, শিল্পের দোষ ততটা নয় যতটা তাহার বিশ্বাসের। কবির কল্পনা গগনচারী হইয়াও যে কত সংযত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলে তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। আবার অবলম্বিত কাহিনীর প্রভেদে রূপায়ণেরও যে সুনিপুণ পার্থক্য ঘটিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার মতো। যে ভাবে 'আলিবাবা' নাটকের কাহিনী ও চরিত্র রচনা করা হইয়াছে, 'বাদ্‌শাযাদী' বা 'বরুণা'র কাহিনী ও চরিত্র সেই ভাবে রচিত হয় নাই। ক্ষীরোদপ্রসাদের সমস্ত নাটকের আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। 'আলিবাবা' ও 'বরুণা' নাটকের আলোচনা করিয়া তাঁহার প্রতিভার দিগ্‌দর্শন করিব।

'আলিবাবা'র অবলম্বন রূপকথা। রূপকথায় পাত্র-পাত্রীর মনোবিকলন, অন্তর্দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ প্রভৃতির বালাই নাই। গল্পটিকে রঙীন, মধুর করিয়া উপস্থাপিত করিতে পারিলেই হইল। আমাদের বাস্তববাদী, যুক্তি-তর্ক-সংবাহী, বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিমান, প্রৌঢ় মনটি যখন ঘুমাইয়া পড়ে তখন আমাদের কল্পনা-পিপাসু শিশু-মনটি বাস্তব-অবাস্তবের মধ্যে অতি ক্ষীণ সারস্বত বিশ্বাসের সূত্র মাত্র অবলম্বন করিয়া কল্পনার স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করে; আর তখনই সে আস্বাদন করে রূপকথা। 'রূপকথা' লইয়া যদি 'নাটক' রচিত হয়, তবে সে নাটকের আস্বাদনে ঐ শিশুমন লইয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। এই মন লইয়া 'আলিবাবা' নাটকের বিচার করিলে আমরা দেখিব 'আলিবাবা' নাট্যকারের এক অনবদ্য সৃষ্টি।

'আলিবাবা' হাসি ও গানের সমাবেশে সমৃদ্ধ। কাহিনী হইতে ছন্দ-সঞ্জাত

নিষ্কাশিত করিয়া দিলে নাটককে অন্য দিক দিয়া আকর্ষণীয় করিতে হয়। তাই 'মর্জিনা', 'আবদাল্লা' ও 'হোসেন' চরিত্রের সৃষ্টি। 'মর্জিনা'-'আবদাল্লা'র দ্বৈত-গীতি নাটকটির মনোরম আকর্ষণ। অথচ তাহা কোথাও এতটুকু অবাস্তব বা অসঙ্গত হয় নাই। কাহিনীর মধ্যে বিষাদ আছে, মৃত্যু আছে, কিন্তু তাহা নাটকের কৌতুক-প্রবণতাকে কোথাও এতটুকু নষ্ট করে না। সুখে-দুঃখে জীবন 'মন্দাক্রান্তা তালে' নাচিয়া চলিয়া যায়। কাসিমের মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রীর বৈধব্য করুণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করিতে পারিত। কিন্তু নাট্যকার তাহাও হাসির তারল্যে ডুবাইয়া দিয়াছেন। অবশ্য কাসিমের মৃত্যুর আশঙ্কায় 'সাকিনা'র 'আলি'কে জড়াইয়া ধরিয়া বিরাট চীৎকার করাটা একটু অসঙ্গত মনে হয়। ঐখানে রস তরল ও ফিকা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যেমনই কাসিমের মৃত্যু, সঙ্গে সঙ্গে 'সাকিনা'র সহিত 'আলি'র বিবাহ। উপকথার কাহিনী না হইলে আমরা এখানে স্বামীর মৃত্যু এবং পরবর্তী বিবাহের মধ্যে শোকের সময়ের প্রশ্ন তুলিতে পারিতাম। কৌশলী নাট্যকার অতি সংক্ষেপে মর্জিনার একখানি স্বগতোক্তিতে সে সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। মর্জিনার উক্তি ওমরাহ-বিধবার পত্যন্তর গ্রহণের যে চিত্র প্রকাশ করে, বিলাসিনী নারীর ক্ষণিক শোকের প্রতি যে তীব্র ব্যঙ্গ-বাণ নিক্ষেপ করে, তাহাতে আমাদের বিচারপ্রবণ মনের খানিকটা ব্যথিত জাগরণ হইতে না-হইতেই আবার নাট্যকার সেখান হইতে আমাদিগকে সরাইয়া আনেন। জীবনের গম্ভীর দিকের ইঙ্গিত দিয়া তিনি উপকথার মধ্যে বাস্তব মানুষের হৃৎস্পন্দন আনিতে না আনিতেই আবার উপকথার ভঙ্গীতে চলিয়া যান। গল্পের আকর্ষণ-প্রাধান্যকে কিছুতেই খাটো করিতে দেন না। কিন্তু উপকথা ও বাস্তব জীবনের সুন্দর মিশ্রণ তিনি করিয়াছেন। সংলাপের প্রতি পদক্ষেপে চিত্তবৃত্তির বিশ্লেষণ উপকথা-সম্বল নাট্যের অবলম্বন নহে। কিন্তু কাহিনী নিছক আষাঢ়ে গল্প হইয়া না দাঁড়ায়, সেইজন্য প্রতি দৃশ্যে আনীত প্রতিটি চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য, অন্তর্দ্বন্দ্ব, দৃশ্য হইতে দৃশ্যান্তরে ক্রমমান কর্মগতি, অতি সংক্ষিপ্ত, সুকৌশলী সংলাপখণ্ডের মধ্য দিয়া আকস্মিকভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং উপকথার পরিবেশ হইতে অন্ততঃ মুহূর্তের জন্যও আমাদের মনকে মুক্তি দিয়া জীবনের সঙ্ঘাতময়, দুঃখময় সমস্যা-জটিলতার দিকে আকৃষ্ট করে। সেই ইঙ্গিতের ক্ষণিকতা নাট্যকারের শিল্প-চাতুর্যের পরিচয় দিতে না-দিতেই আমরা আবার গল্পের দিকে ফিরিয়া আসি।

'আলিবাবা'র কাহিনী ও চরিত্রের বিশ্লেষণ করিয়া আমরা উপরি-উক্ত মন্তব্যের সমর্থন করিতে চেষ্টা করিব। প্রস্তাবনাসঙ্গীত শেষ হইয়া গেলে নাটকের যেখান থেকে আরম্ভ হয়, সেখানে প্রথমেই আমরা দেখি ক্রীতদাস 'আবদাল্লা' ও ক্রীতদাসী 'মর্জিনা'কে। তাহাদের দাস-জীবনের বেদনাকে তাহারা ঢাকিয়া রাখিয়াছে আনন্দে। কিন্তু মুক্ত-জীবনের লোভ যে তাহাদের মনের অবচেতন স্তরে রহিয়াছে তাহা বেশ বুঝা যায় তাহাদের কৌতুক-আলাপের মধ্য দিয়াও—"মর্! ফের মস্‌করা! তবে আমি যেমন করে পারি বেগম হব।" পরবর্তীকালে মহৈশ্বর্যশালী আলিবাবার পুত্রবধূ যে 'মর্জিনা' হইবে, তাহার জন্য নাট্যকার পূর্ব হইতে প্রস্তুতি শুরু করিয়াছেন। অথচ নেহাৎ ঠাট্টার মধ্য দিয়া এই বাসনা ব্যক্ত হওয়ায় ইহার ভবিষ্যৎ বাস্তব-রূপায়ণ লইয়া আদি হইতে মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ভবিষ্যতে মুক্তি পাওয়ার ও বড় হওয়ার মতো বহুগুণ প্রথম হইতেই তাহার চরিত্রে দেখা যায়। কাসিমের স্ত্রী যে ফতিমাকে ঠকাইয়া অল্প পয়সায় অনেক কাঠ কিনিবে তাহা সে সহ্য করিতে পারে না। পারে না বলিয়াই সে আলির স্ত্রীকে বলে,—"তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে ইচ্ছা করে।" ফতিমা তাহার কথা বুঝিতে পারিয়া বলে,—"বোকা হলে কি মা গরীবের সংসার যোগে যাগে চালাতে পারি? আপনার জন্য,—বুঝেই বা কি করব?" এই সামান্য উক্তির মধ্য দিয়া ফতিমার মহত্ত্ব এবং সাকিনার নীচতা প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইয়া ওঠে। স্ত্রীর এই লোকসানের কারবারের কথা আলিবাবারও অজ্ঞাত নয়। পুত্রের প্রশ্নে সে বলে—"তোমার গর্ভধারিণী যে রকম ব্যবসার সূত্রপাত করেছেন, তাতে ঘরে থাকা আর সইবে না। বুঝি বনে চির বসবাস করতে হয়।" স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার জন্যই সে হয়ত মুখ বুজিয়া সব সহ্য করিয়া যায়। কিন্তু নিজের দরিদ্র-জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণায় মনটা তাহার অভিমানে ক্ষুব্ধ হইয়া আছে। অবেলায় কুঠার স্কন্ধে লইয়া আলি জঙ্গলের দিকে রওনা হইলে যখন তাহার স্ত্রী প্রশ্ন করে, "ওকি তুমি এখন আবার কুড়ুল কাঁধে করেছ যে?" তখন উত্তরে আলি বলে—"ওটা কাঁধের সঙ্গে কি রকম একটা আঠা লেগে জড়িয়ে গেছে।" দরিদ্র কাঠুরিয়ার জীবনের প্রতি ধিক্কার এর চেয়ে অল্প কথায় জোরালো করিয়া প্রকাশ করা যায় না। এই কথা শুনিয়া আমরা হয়ত ভাবিতে পারিতাম, আলির স্ত্রী স্বামীর এই দুঃসহ কষ্ট দেখিয়াও কেন অল্প দামে সাকিনার নিকট ঠকিয়া কাঠ বিক্রয় করিয়া আসে? ইহা অন্যায়,

—স্বামীর প্রতি অবিচার। কিন্তু উত্তরে যখন ফতিমা বলে,—"বড় মানুষের মেয়ে, চাইতে যদি তার চক্ষুলজ্জাই হয়—তাহলে একটু আধটু গোলমাল করে নিতেও কি দোষ ?…তোমার ভাই যদি রোজগার করতে না পারত, তাহলে যে তোমাকে সমস্ত ভারই নিতে হত। আমি সব বুঝি—বুঝেও চুপ করে থাকি—নাও এস। নেহাতই যাও ত একটু সরবৎ খেয়ে যাও।" তখন আমরা তাহার মহত্ত্বে মুগ্ধ হই। পতিপ্রেমেরও পরিচয় পাই তাহার ঐ শেষ কথায়, স্বামীকে খাওয়ানোর অনুরোধে। ওদিকে মর্জিনাও যে আলিপরিবারের সঙ্গে মমত্বের বন্ধনে নিজের অলক্ষিতেও আবদ্ধ হইতেছে, তাহা জানিতে পাই এই পরিবারের প্রতি তাহার সমবেদনায়, অকর্মণ্য হুসেনকে ভৎসনায়,—"এমন অকর্মণ্য সন্তান তুমি, বাপ রোজগার করে আনে, তুমি খাটিয়েও খেতে জান না।" মর্জিনার প্রতি এই দৃশ্যে হুসেনের প্রেম-নিবেদন স্বল্পভাষী, প্রকাশ-ক্ষমতাহীন কাঠুরিয়ার পুত্রের উপযোগী হইয়াছে। না-বলিতে পারার মূর্খ-সুলভ অক্ষমতাই তাহার প্রেমকে বাস্তব করিয়াছে। যাহা হউক, মনের দুঃখে আলিবাবা কাঠ কাটিতে বনে চলিল।

এইবার দুঃখ-নিবৃত্তির পালা। 'আলি' বনে কাঠ কাটিতে দিয়া দস্যু দলের সাক্ষাৎ লাভ করিল। দস্যুর ধন-সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দস্যু-সর্দার যে দার্শনিকতাপূর্ণ কথা বলে, তাহা স্বল্প, সুন্দর ও শোভন। দস্যুর কদর্য জীবনের মধ্যেও এই সামান্য কথা কয়টি বাউলের উদাস সুর আনিয়া দিয়াছে। আমাদেরও মনে প্রশ্ন জাগে, সত্যই ত! এই অপরিসীম ধনরত্ন কে ভোগ করিবে? ভোগ করিবে 'আলি'। দরিদ্র কাঠুরিয়া আজ রত্নভাণ্ডারের সন্ধান পাইয়াছে। কিন্তু অতি-আনন্দে সে আত্মহারা হইয়া না পড়ে, তাহার জন্য খোদার নিকট ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা প্রার্থনা করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভাই-এর ঐশ্বর্য এবং নিজেদের দারিদ্র্য স্মরণ করিয়া অভিমান করিতেছে। অদৃষ্টে কি আছে জানিবার জন্য আপাততঃ 'আলি' অন্তরালে গমন করিল। দস্যুরা গুহা হইতে বাহির হইয়া গান গাহিতে গাহিতে হিরাটের দিকে চলিল।

ধনরত্ন লইয়া 'আলি' বাড়ি ফিরিয়াছে। এই দৃশ্যটির কল্পনা অতি মনোরম। স্ত্রী ফতিমা স্বামীর বিলম্ব দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিল। স্বামী কি আনিয়াছে তাহা সে জানে না। 'আলি' তাহাকে যতই নিষেধ

করিতেছে, সে ততই চীৎকার করিতেছে। তাহার যুক্তি হইতেছে তাহার যখন কাহারো জিনিসের দিকে নজর দেয় না,—চুরি করে না, অসদুপায়ে জীবন ধারণ করে না, তখন চীৎকার করিবার তাহার অধিকার আছে। অবশ্য স্বামী যে কেন তাহাকে নিষেধ করিতেছে সে তাহা বোঝে না। 'আলিবাবা' তাহাকে থামাইবার জন্য আসল কথাটি প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন,—"চুপ, চুপ, কাঠ নয়—মোহর, মোহর!" মোহরের নাম শুনিয়া সে আরো চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। ভাবিল, তাহার স্বামী ডাকাতি শুরু করিয়াছে। সুতরাং তাহার ভয়, স্বামী রাজ-শাসনে প্রাণ হারাইবে। পরিস্থিতিটি খুব ছোট, সংলাপও অতি সামান্য। এই অপরিসর পরিস্থিতিতে সুসংযোজিত স্বল্প সংলাপে নাট্যকার দরিদ্র কাঠুরিয়াপত্নীর অল্পবুদ্ধিতার সঙ্গে পতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার অপূর্ব সমন্বয় করিয়াছেন; হাস্যরস পরিবেশনের মাধ্যমে কাঠুরিয়া-পত্নীর পতি-প্রেম, আনন্দ ও ভয়ের সঙ্গতিপূর্ণ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। আবার যখন এই চীৎকারে প্রতিবেশিনীরা ছুটিয়া আসিল, তখন তাহাদিগকে প্রতারিত করিতে ফতিমা যে মিথ্যাকথা বলিতেছে, তাহার মধ্য দিয়া ধরা পড়ে যে সে সরলা; অতি চতুরার অভিনয়ও সে করিতে পারে না। তাহার সারল্য যে অনেকখানি বোকামির পর্যায়ে নামিয়া আসে তাহা বুঝিতেছি 'মর্জিনা'র সঙ্গে তাহার আলাপে। মর্জিনা তাহাকে যখন জিজ্ঞাসা করিল, 'ধান গাছের কি গুঁড়ি আছে?' তখন সে, বচন-বিন্যাসের পটুতার অভাবে, যাহা এতক্ষণ গোপন করিতে চাহিয়াছিল তাহাই প্রকাশ করিয়া ফেলিল,—"আছে বই কি? বনের ভিতর কত কি আছে, কে বলতে পারে? খুঁজলে ধানের গাছ কেন, টাকার গাছ পর্যন্ত পাওয়া যায়।" কথাটি বলিয়াই সে বুঝিতে পারিল, গোপন সত্য প্রকাশ করিয়া ফেলিতেছে। তাই সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "ও মা আমার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে মা, আমি কি বলতে কি বলছি মা! বনে কিছু মেলে না, কেবল মেলে অন্ধকার। দাও ত দাও মা। নইলে বল চ'লে যাই।"

দ্বিতীয় অঙ্ক—প্রথম দৃশ্য। বহু ধনের মালিক আলি ও তাহার স্ত্রীর কথোপকথনে হাস্যরস সৃষ্টি হইয়াছে। সে হাস্য humour। জীবনের গম্ভীর সত্যকে উহা স্পর্শ করিয়া যায়। প্রবাদ আছে, ঢেঁকির স্বর্গে গেলেও ধান ভানিতে হয়! পূর্ব সংস্কার ত্যাগ করা ভয়ানক কষ্ট। 'ফতিমা' স্বামীকে পাঁচটা বাঁদী কিনিয়া দিতে বলিতেছে। কেন?—"কাঠ চেলাতে চেলাতে

যখন মেহনৎ হবে, গা দিয়ে গল্ গল্ করে ঘাম বেরুবে তখন দুজন হলে গা-হাত-পা টিপে দিলে, দুজন বাতাস করলে, একজন সরবৎ তৈরী করে মুখে ধরলে, একজন বা হয়ত পাশটিতে বসে দুইটি গান গাইলে।" ধনীপত্নীর পরিচারিকাদের সে দেখিয়াছে। কিন্তু ধনীর স্ত্রী হইলে যে ঐ কাঠ কাটার প্রয়োজন হইবে না ইহা সে ভাবিতেই পারে নাই। আলি একটু বুদ্ধিমান। সে মনে মনে বিচার করিতেছে,—"একটু একটু করে উঠ্‌তে হবে। একেবারে উঠ্‌লেই লোকে সন্দেহ করবে—বাদশার কানে যাবে। একেবারে আমীরী চাল করলেই মারা যাব! তাড়াতাড়ি কর না, আলি সাহেব, সবুর—সবুর!" কিন্তু এতখানি বুঝিয়াও সে এই আকস্মিক সৌভাগ্যের সুখ বহন করিতে পারিতেছে না। অনভ্যস্ত সুখের সঙ্গে জীবনটাকে সে কিছুতেই খাপ খাওয়াইতে পারিতেছে না। তাই সে এ জঞ্জাল বিদায় করিতে চায়। 'মর্জিনা'কে বলে, "আমারা অনেক টাকা পেয়েছি, তার নেশা আমরা কেউ বরদাস্ত করতে পারছি না—টাকাগুলো তুই নিবি?" অল্প কথায় মনের চমৎকার বিশ্লেষণ! এই ভাবে আলোচনা করিলে দেখিব, গল্পের অবাধ গতির সঙ্গে সঙ্গে সামান্য কথায়, একটুমাত্র ইঙ্গিতে, কেমন করিয়া চরিত্রের গূঢ় ব্যঞ্জনা নাট্যকার সৃষ্টি করিয়াছেন। আর তাহা পারিয়াছেন বলিয়া নাটকটি নিছক উপকথা হইয়া দাঁড়ায় নাই।

এবার বরুণার আলোচনা। বরুণা ও বাদশাজাদী নাটকের অবলম্বন রূপকথা নয়—রোমান্‌স্। রূপকথা ও রোমান্‌স্ উভয়ের মধ্যেই চরিত্রের বিকাশ অপেক্ষা গল্পের চমৎকারিত্ব প্রধান আকর্ষণ। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এইখানে যে, উপকথা নিছক সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য অসম্ভব ও অবাস্তবকেও স্বীকার করিয়া লয়, আর রোমান্‌সের ঘটনা সর্বত্র সর্বদা না ঘটিলেও তাহার অসাধারণত্ব ও চমৎকারিত্ব অসম্ভব এবং অবাস্তব নয়। তাই রূপকথা হইতে রোমান্‌স্ জীবনের ও জগতের আরো কাছাকাছি আসে। কিন্তু সদাপরিচয়ের রাজ্যে নিত্য সঙ্ঘটনতার মধ্যে তাহাকে পাওয়া যায় না। রোমান্‌সের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, ইহার পাত্র-পাত্রীগুলির চরিত্র বিকশিত হয় সামান্য, অথবা মোটেই নয়। কিন্তু কাহিনী চলিতে থাকে। অনিবার্য কোনো ঘটনার এই ক্রম-পরিবর্তমান ঘনঘটা যে রহস্যের মোহজাল বিস্তার করে, রোমান্‌সের তাহাই প্রধান আকর্ষণ। 'বরুণা' এবং 'বাদশাজাদী' নাটকে এই গুণাবলী আমরা লক্ষ্য করিব।

ক্ষীরোদপ্রসাদের এই নাটকগুলির চরিত্রাবলী তথা-কথিত 'সচল' নয়। ইহা কি নাটকের দোষ? আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব, রোমান্টিক নাটকে ইহা দোষের না হইয়া গুণেরই হইয়াছে। অতি সামান্য ক্ষেত্রেই মাত্র তাহা দোষাবহ। তাহার আগে দেখা যাক, এই চরিত্রগুলি 'সচল' নহে কেন? 'কেন' তাহার প্রথম কারণ এই যে চরিত্র ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে ক্ষীরোদপ্রসাদ বংশানুক্রমিকতা, জন্মগত পরিবেশ প্রভৃতির পর অনেকখানি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। বাদশাহী বুদ্ধির ও ফকিরী বুদ্ধির পার্থক্য, চিন্তাপ্রণালীর বিভিন্নতা প্রভৃতি তিনি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাই তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির বুদ্ধি বিশ্লেষাত্মক না হইয়া অনেক সময় নিশ্চয়াত্মক হয়। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বন্দ্বের বালাই নাই। তাই এই সকল নাটকের পাত্রপাত্রীর কর্তব্য বা কর্মগতি নির্ধারণে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব পাই না। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যস্ফুরিত নিশ্চয়াত্মক নির্দেশে কর্ম নিমেষে গতি-পরিবর্তন করার জন্য অনেকে হয়ত ক্ষীরোদপ্রসাদের 'সংস্থিতি সৃষ্টিতে কোন কাণ্ডজ্ঞান ছিল না' বলিয়া গালাগালি করেন। কিন্তু তাহা ঠিক হয় না।

আলোচনা করিয়া দেখা যাক। 'বরুণা' একখানি শ্রেষ্ঠ রোমান্স্‌নাট্য। আরম্ভেই তাহা পরিষ্কার বুঝা গেল। কীর্তন গানের গৌরচন্দ্রিকা শুনিলেই যেমন বুঝা যায়, পালাটি কি, 'মান' না 'বিরহ', তেমনি ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকের প্রস্তাবনা-সঙ্গীত শুনিলেই বুঝা যায়, নাটকের মূল ভাবটি কি। এই নাটকের মধ্যে যে 'রূপ সোহাগে কাড়াকাড়ি'র জন্য 'যাতনা' জাগিয়া উঠিবে এবং পাশাপাশি 'কান্নাহাসি' দেখিয়া আমরা 'প্রেমের নিশানা' দেখিতে পাইব, 'রঙ্গিণীগণের গীত' তাহা জানাইয়া গেল।

এখন নাট্যবস্তুর আরম্ভ। উপবনে একাকিনী বরুণার গীত। সঙ্গীতের প্রেমার্তি তাহার মনের দ্বন্দ্বের আভাষ দেয়। 'বরুণা'র মনে প্রেম-খেলার সঙ্গীর অভাব-বোধ জাগিয়াছে। গান এবং স্বগতোক্তিতেই তাহা বোঝা যায়। এখন আর সে নিজের পরিবেশে সন্তুষ্ট থাকিতে চাহে না। সকলের মধ্যে থাকিয়াও সে নিঃসঙ্গ। ব্যাধের কন্যার মনোবিকলনের ভাষা ইহা নয়। এই গানও ব্যাধের কন্যার নয়। 'বরুণা' কিন্তু জানে না যে সে 'রাজকন্যা'। মনের অস্থিরতা তাহাকে এই বিজন পরিবেশের বাহিরে টানিয়া লইতে চায়। তাই সে পিতার নিকট শহরে মাংস-বিক্রয়ের জন্য যাইতে অনুমতি প্রার্থনা করে। ব্যাধ তাহাকে জানাইয়া দিল যে, সে

'রাজকন্যা'। কিন্তু কোন্ রাজার মেয়ে তাহা ঠিক বলিতে পারিল না। ক্ষীরোদপ্রসাদের কোনো কোনো নাটকে আমরা এমনি করিয়া ভাগ্য-নির্যাতিত রাজপুত্র-কন্যাদের দেখিয়াছি। তাহাদের অন্তরের অবচেতন-স্তরশায়ী বংশ-গরিমা হীন পরিবেশ হইতে মুক্তি লাভ করিতে তাহাদিগকে ব্যাকুল করিয়াছে। শেষে একদিন তাহারা জানিয়াছে যে, তাহাদের বংশানুক্রমিকতা অনেক বড়। যেমনি তাহা জানিল, অমনি কোথা হইতে শক্তির, বিশ্বাস ও কর্মের বন্যা ছুটিয়া আসিল যাহার অবাধ গতি কেহ রোধ করিতে পারিল না। কিন্তু কোথা হইতে আসিল এই শক্তি? ইহা অবচেতন-সংস্কার-সঞ্জাত হইলেও সেই সংস্কারকে কার্যকরী করার জন্য ব্যবহারিক শিক্ষার প্রয়োজনের প্রশ্ন থাকে কি না, ঐ সকল নাটকে ক্ষীরোদপ্রসাদ সে কথা লইয়া মাথা ঘামান নাই। কিন্তু 'বরুণা'র বেলায় দেখিতেছি অন্যরূপ। ব্যাধের গৃহে পালিতা হইলেও সে বাল্যে সন্ন্যাসিনী কর্তৃক শিক্ষিতা। সুতরাং রাজকন্যার যোগ্য শিক্ষা-দীক্ষা সে পাইয়াছিল কি না এ প্রশ্নের মীমাংসা আমরা করিয়া লইতে পারি, এই ভাবিয়া যে ভদ্রবংশীয়া কন্যার শিক্ষা সে পাইয়াছিল। ব্যাধ তাহাকে উপবনের মধ্যে রাজকন্যার ঐশ্বর্যে পালন করিয়াছে। বিজন কাননে যেন দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার স্বহস্তে রচিত স্বপ্ন-কাননের সে কিন্নরকণ্ঠী রানী। তাহার কানন-পরিবেশ ও দিব্যতান সঙ্গীতের মাধুর্য রাজপুত্রকে অলৌকিক মায়ার সন্ধান দেয়। বাস্তব পরিবেশের এক প্রান্তে, অরণ্যের অনতি-পরিচিত নির্জনতার অবকাশে নাট্যকার যে স্বপ্নরাজ্য রচনা করিয়াছেন তাহা শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভার পরিচয় বহন করে। আবার এই রোমান্টিক পরিবেশকে অতিক্রম করিয়া নাট্যকার যখন জানার জগতে সংযোগ-স্থল সৃষ্টি করেন, তখনও আমরা দেখি, রাজপুরী রাজনীতির আবহাওয়ায় গম্ভীর নয়। আপন-ভোলা সদাশিব মহারাজ 'শিববর্মা'র রাজকার্যের পরিচয় যবনিকার অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে। সেখানে ক্ষমতার খেলা নাই, আছে প্রেম-স্নেহ-ভালবাসার খেলা। তাহার জন্যই তাহার কপট কোপ। সেই কৃতক-রোষ কখন যে ভালবাসায় গলিয়া ঝরিয়া পড়িবে তাহা আমরা জানি না। তাই বলিয়া যে শিববর্মার রাজকীয় বুদ্ধি নাই তাহা আমরা ভাবিতে পারিব না। বহুদর্শী রাজার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দ্বন্দ্বাতীত, নিশ্চয়াত্মক। তিনি জানেন, অভিরাম কেরলরাজের ছদ্মবেশী ভ্রাতুষ্পুত্র মাধবেন্দ্র। আবার

এতবড় একটা গোপন সমস্যা যাহার রাজদৃষ্টিকে অভিভূত করিতে পারে নাই, তিনি পুত্রের প্রেমোন্মত্ততার কথা শুনিয়া এবং তাঁহার অস্ফুট-স্বরে গীত গানের সন্ধান পাইয়া যে অনুমান করিবেন, পুত্র কোনো সুগায়িকা সুন্দরী কন্যার সঙ্গীতেই মুগ্ধ হইয়াছেন, এবং এই কন্যা যে সামান্যা নয়, বরং নিরুদ্দিষ্টা কেবলরাজকুমারী হওয়া সম্ভব, তাহাতে আমরা সন্দেহ করিতে পারি না। বরং তাঁহার এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিই ঘটনার সঙ্ঘাতকে অতিমাত্র তীব্রতর করিয়াছে। বিচার-বিশ্লেষণের এতটুকু সময় দেয় নাই বলিয়া গল্প দ্রুত সঙ্ঘাতে রসঘন হইয়াছে দেখা যায়। ব্যাধপল্লীর উপর রাজকুমারের সহচরগণ যে অত্যাচার করিয়াছে, তাহার প্রতিশোধের বাসনার ছলে বরুণা গানের মদির আকর্ষণে রাজপুত্রকে উদ্যানের চারিদিকে ঘুরাইয়া মারিল। ব্যাধ-সর্দার মংরু শেষপর্যন্ত এই সঙ্গীতকারিণীর সন্ধান দিবার ভরসা দিয়া 'পুণ্ডরীক'কে আনিল 'বরুণা'র নিকট। সর্পভূষণা ছদ্মবেশিনী 'বরুণা' রাজকুমারের সম্মুখে আসিল। তাহাকে দেখিয়া পুণ্ডরীকের বিশ্বাস হইল না যে সেই তাহাকে গানের টানে এতক্ষণ ধরিয়া ঘুরাইয়াছে। মোহান্ধ রাজকুমার এবার ক্রোধান্ধ—"কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।" রাজকুমার কিরাত-নন্দিনীকে হত্যা করিবার জন্য ধনুক ধারণ করিলেন। অচঞ্চলা 'বরুণা' আর একখানা গান ধরিল। রাজপুত্রের আর সন্দেহ থাকিল না যে যাহার সঙ্গীতে তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন সে এই কিরাতকন্যা। মুগ্ধ, আত্মবিস্মৃত রাজপুত্রের হস্ত নিজেরই অজ্ঞাতে কিরাতকন্যার হস্ত ধারণ করিল। 'বরুণা' বলিয়া উঠিল, পাণিগ্রহণে কুমার তাহাকে বিবাহ করিয়াছেন। মোহভঙ্গে আত্মস্থ রাজপুত্র বলিলেন, কিরাত-কন্যাকে তিনি গ্রহণ করিতে পারিবেন না। কৌতূহলী রাজপুত্র প্রশ্ন করিলেন, এ গান কিরাত কন্যা কোথায় শিখিয়াছে? শুনিলেন এক রাজকন্যার নিকট। এখন হইতে তিনি আমরণ সেই রাজকন্যার সন্ধানে রত হইলেন। যদি সন্ধান না মিলে, মৃত্যুর দিনে তিনি কিরাতকন্যাকে বিবাহ করিবার অঙ্গীকার করিয়া চলিয়া গেলেন। রহস্য সমাধানের দিকে আসিল না। নূতন সমস্যা সৃষ্টির অভিমুখে চলিল।

এই ত্র্যঙ্ক নাটকটির প্রথম অঙ্কে যে সমস্যার সূচনা, দ্বিতীয় অঙ্কে তাহার পরিপক্বতা এবং তৃতীয় অঙ্কে সমাপ্তি। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যে চরম পরিণতির ইঙ্গিত বুদ্ধিমান রাজার কথায় ফুটিয়া উঠে,—"দেওয়ান! এবারে

আমি নিশ্চিন্ত—কর্তব্য স্থির করবার ভার এখন তোমার।" কি করিয়া রাজা নিশ্চিন্ত হইলেন সে আলোচনা পরে করিতেছি। কিন্তু রাজার এই নিশ্চিন্ততা যদিও পরিণতির ছায়াপাত করে, তবুও নাট্যকার পরিণতির জন্য প্রতীক্ষমানতার কৌতূহলটুকু নষ্ট করিতে চাহেন না। সুকৌশলে সেটুকু বজায় রাখেন। রাজা এক নিমেষেই সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছিলেন পুত্রের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়া। কেন না রাজকুমারের প্রতিজ্ঞা, মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তিনি কিরাতনন্দিনীকে বিবাহ করিবেন। বুদ্ধিমতী 'বরুণা' রাজাকে এক বৎসরের সময় দিয়া নিশ্চিত পরিণতিকে বিলম্বিত করিয়া দেয়। ওদিকে রাজাও প্রতিজ্ঞা করিয়া বসেন, এক বৎসরের মধ্যে রাজকুমার ফিরিয়া না আসিলে তিনি তাঁহার প্রতিভূ মন্ত্রী মানবেন্দ্রের প্রাণ বধ করিবেন। সুতরাং যদিও আমরা পরিণতির অনেকখানি ইঙ্গিত পাই, তবুও নিশ্চিত হইতে পারি না। তাই শেষপর্যন্ত উৎসুক নেত্রে তাকাইয়া থাকি। এমনি করিয়া নাট্যকার আদ্যন্ত তাঁহার গল্পের আকর্ষণ বজায় রাখেন।

দ্বিতীয় অঙ্কটির বহু স্থানের বিস্তৃত আলোচনা করা দরকার। জীবনের সহজ-সরল ও জটিল-গম্ভীর দুইটি দিক উপস্থাপিত করা হইয়াছে এই অঙ্কে। সপরিবেশ রাজা শিববর্মার হাস্য-চপল মূর্তি নাট্যকার যেমন নিপুণতার সঙ্গে অঙ্কিত করিয়াছেন, তেমনি কাহিনী ও চরিত্র-চিত্রণে হাসাইতে হাসাইতেই তিনি গম্ভীর পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছেন। জীবনের সহজ-সরল দিকটায় নিমেষের মধ্যে গাম্ভীর্য আসিয়া জুটিল। আমরা স্বীকার করি যে এই নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে 'অভিরাম-মাধবী'র আলাপে, বা বন্দীগণের সহিত রাজা 'শিববর্মা'র কৌতুকপূর্ণ কথোপকথনে উচ্চ ধরনের humour বা satire কিছুই নাই। শাস্তিদান ব্যাপারে কিছু যুক্তির মার-প্যাঁচ আছে বটে। কিন্তু এই হাস্যরস তরল হইলেও গ্রাম্যতাদোষ-বর্জিত। বাক্যে বা কার্যে কোনো দিক দিয়া রাজ-চরিত্রের অমর্যাদাকর হয় নাই। কন্যাতুল্যা 'মাধবী'কে ভৃত্য 'অভিরাম'কে দান করাটি হাস্যচ্ছলে হইলেও আমরা দোষ ধরিতে পারিতাম। রানী এবং মন্ত্রী উভয়ে সে দোষ ধরিয়াছেনও। কিন্তু এই হাস্য-চপলতার মধ্যেও যে বুদ্ধিমান রাজার রাজদৃষ্টি রহিয়াছে, অতি সত্বরই আমরা তাহা জানিতে পারি। রাজা পুত্রের প্রলাপের সূত্র ধরিয়া রোগ-নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিলেন, জানিলেন বিশ্রুত কোনো সঙ্গীতের

আবৃত্তি রাজপুত্র করিতেছেন। হাস্ত-চপল মহারাজ গম্ভীর হইলেন। রাজার সন্দেহ হইল, এই সঙ্গীতকারিণী নিরুদ্দিষ্টা কেরল-রাজকন্যা। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদ এই সন্দেহকে স্পষ্ট করিয়া নাটকের শিল্পমাধুর্য নষ্ট করেন নাই। 'অভিরাম'কে রাজা কেরল-রাজকুমারীর সন্ধান করিতে-বলিলেন। আর 'অভিরাম' যে কেরল-রাজকুমারীর ভ্রাতা তাহাও তিনি বলিয়া দিলেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গ লইয়া তিনি যে একটি সজ্ঘাতপূর্ণ মুহূর্ত বা পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা অপূর্ব। এইখানকার খানিকটা সংলাপ উদ্ধৃত করিয়া উহার শিল্পচাতুর্য বিশ্লেষণ করিতেছি।

"অভি।.........গানের গোড়াত এক বেদেনীর মালঞ্চ।

শিব। অভিরাম! শুনেছি কেরল-রাজকুমারী শৈশবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। তার সংবাদ আর কখনও কোথাও কি শুনতে পেয়েছ?

অভি। আপনি এসব কথাও জেনে রেখেছেন?

শিব। আগে আমার কথার উত্তর দাও।"

উত্তর 'অভিরাম' কি দিবে? উত্তর দিলে অবশ্যই আত্মপ্রকাশ হইবে। 'অভিরাম' তাই কৌশলে প্রসঙ্গটি এড়াইবার চেষ্টা করে,—"আজ্ঞে গরীব ভৃত্য আমি:··এসকল কথা কি জানব মহারাজ?" রাজা ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন,—"তার অন্বেষণে এক কেরল-রাজকুমার বহুকাল থেকে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়েছে, তার কোনো সংবাদ জানো? 'অভিরাম' বিস্মিত হইল, কিন্তু তবুও আত্মপ্রকাশ করিল না। বলিল, "আজ্ঞে, আমি কি জানব?" কৌশলী, বুদ্ধিমান রাজা অভিরামের নিকট হইতে স্বীকারোক্তি আদায় করিলেন।—

"শিব। জান না ত? তা হলেই হল। আমি নিশ্চিন্ত হই।

অভি। কেন মহারাজ?

শিব। মাধবীটি কে জান?

অভি। এই কেরল-রাজকুমারী না কি?"

রাজা সোজা উত্তর দিলেন না। সত্য ও মিথ্যা কিছুই বলিলেন না। শুধু বলিলেন, "তোমার কি বোধ হয়?" অভিরাম আর ভাবিতে পারিল না। মুহূর্তে তাহার মনে হইল, সে মহাপাপ করিয়াছে। সুতরাং আত্মহত্যাই তাহার প্রায়শ্চিত্ত। তাই সে মহারাজের নিকট কিছুক্ষণের জন্ত বিদায় চায়।

রাজা তাহার মনের কথা বুঝেন। তিনি বলিলেন, "তুমি গেলে আর ফিরবে না,......আত্মহত্যা করবে।" এইবার 'অভিরাম' আর আত্মগোপন করিতে পারিল না। বলিতে যাইতেছিল যে 'মাধবী' তাহার ভগিনী। রাজা আর তাহাকে রহস্তের অন্ধকারে রাখিলেন না, বলিয়া দিলেন, 'মাধবী' কেরল-রাজকুমারী নয়। তাই ভ্রাতাকে তিনি ভগিনীর সন্ধান করিতে অনুমতি দিলেন। অথচ ঐ বেদেনীই যে কেরল-রাজকুমারী একথা তিনি স্পষ্টতঃ বলিলেন না। কেন না, ইহা মহারাজের অনুমান মাত্র, এবং অনুমান প্রমাণ-সাপেক্ষ। এই আলোচিত মুহূর্তমাত্রের পরিস্থিতিটির ব্যাপ্তি খুব ক্ষুদ্র। অতি সামান্য সুনির্বাচিত কয়েকটি সংলাপে ক্ষীরোদপ্রসাদ পাত্রপাত্রীকে কেমন করিয়া নিমেষ মধ্যে জীবন-মৃত্যুর সঙ্গমস্থলে আনয়ন করেন এবং দর্শক যে নিরুদ্ধনিঃশ্বাসে ব্যাকুল আবেগে পরিণতি দেখিবার প্রতীক্ষায় থাকে, তাহা আমরা দেখিলাম। বাংলায় আর কোনো নাট্যকার অতি অল্প কথায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিবেশে এইরূপ দ্বন্দ্বীভূত পরিস্থিতি সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। সুতরাং এদিক দিয়া আমরা তাঁহার প্রশংসা না করিয়া পারি না। আর এই শিল্পচাতুর্য গল্প-রস-প্রধান নাটকের মধ্যে অতি প্রয়োজনীয় এবং সার্থক। গল্পের প্রবাহ অবাধে চলিতে থাকে, তাহার প্রাধান্য কোথাও এতটুকুও ক্ষুণ্ন না করিয়া যথাপ্রয়োজনীয় স্থানে এমনি কতকগুলি বিশিষ্ট, দ্বন্দ্বঘন মুহূর্ত তিনি সৃষ্টি করেন। সহজ, সরল ভাবে লঘুগতিতে জীবন প্রবাহ গল্পের রস-কল-নাদিত ধারায় যখন প্রবাহিত হয় তাহার মধ্যে ইঙ্গিত মাত্রে, সামান্য সংলাপে চরিত্রের একটি বিশিষ্ট দিকে নাট্যকার তড়িদ্‌রেখার মতো আলোক সম্পাত করেন। যে বংশানুক্রমিক সংস্কার বা যে অপূর্ণ বাসনা মনের অবচেতন স্তরে ঘুরপাক খাইতেছিল, পরিস্থিতির বিরুদ্ধ পরিবেশে বা অন্য সংস্কারের বাধায় যাহা কিছুতেই সহজ প্রকাশ পায় নাই, এমনি কয়েকটি সুনির্বাচিত মুহূর্তে তাহা হঠাৎ প্রকাশ পাইয়া গল্পের সমস্ত গতিকে অন্য দিকে ঘুরাইয়া দেয়। ফলে কাহিনীর সেই সারল্য আর থাকে না। উহা চলিতে চলিতে অমনি আর একটি মুহূর্তের ঘাটে গিয়া হাজির হয়। এই মুহূর্তগুলির গুরুত্ব এবং নির্বাচন কৌশল না বুঝিয়া আমরা যদি ক্ষীরোদপ্রসাদের সৃষ্ট কাহিনীকে আকস্মিক এবং চরিত্রকে অবিকশিত বলি তাহা হইলে অবশ্যই ভুল হইবে। আবার এমন হয় যে, কাহিনীর প্রধান অবলম্বন নায়ক-নায়িকার চরিত্রের রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে যে পার্শ্বচরিত্রগুলি চলে, তাহাদের বিস্তৃত বিকাশ নাট্যে

সম্ভব হয় না। তখন ঐ পার্শ্বচরিত্রগুলির বিকাশে নাট্যকার এমনি কতকগুলি বিশেষ মুহূর্ত বাছিয়া লন। একটা উদাহরণ দিতেছি।

দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে 'মাধবী' কঞ্চুকীর খোঁজে আসিয়াছে। কিন্তু কঞ্চুকীর ঘরে বসিয়া 'অভিরাম' তাহার সঙ্গে ব্যঙ্গালাপ করিতেছে। 'মাধবী' কিন্তু কঞ্চুকীজ্ঞানে 'অভিরাম'কে সব কথা খুলিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। 'অভিরাম' বলিল,—"বল্ মাধবী, অভে শালাকে ফাঁসি দি। মাধবী উত্তর দিল,—"আমি বল্‌তে যাব কেন? সে ভালমানুষের ছেলে, যখন দোষী কি না দোষী জানি না—" নাটকে অভিরামের সহিত 'মাধবী'র ইহার পূর্বে কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই। তাহাদের মধ্যে ভালবাসা জন্মিয়াছে কি না তাহাও আমরা জানি না। এই সামান্য উক্তিতে আমরা বুঝিতে পারি, ইহা ভালবাসা না হউক, সমবেদনা। আর সমবেদনা যে প্রেমের দূতী তাহা বুঝিতেও আমাদের বিলম্ব হয় না। ইহার পর এই দৃশ্যে কঞ্চুকীর সহিত মাধবীর আলাপে 'মাধবী' জানিল, 'অভিরাম'কে সন্দেহ করা বৃথা। রাজা তাহাকে ভৃত্যের মতো দেখেন না। তিনি মনে করেন, মহদ্বংশীয় কোনো মহান্ ব্যক্তি ভৃত্যের ছদ্মবেশে রহিয়াছে মাত্র। আমরা বুঝিতে পারি, 'মাধবী'র প্রেমে প্রত্যয় এবং দৃঢ়তা আনিবার জন্য কঞ্চুকীর এই কথা কত প্রয়োজনীয়। এই ভালবাসা উচিত কি না তাহা লইয়া 'মাধবী'র মনে তীব্র আন্দোলন চলিতে পারিত। গল্পের মূল প্রবাহ ক্ষুণ্ণ হয় বলিয়া নাট্যকার সে অবকাশ দেন নাই। কিন্তু 'মাধবী' যে 'অভিরাম'কে ভালবাসে, তাহা সে স্বীকার না করিয়াও কেমন করিয়া স্বীকার করে, দুই টুক্‌রা মাত্র সংলাপে তাহা আমরা জানিতে পারি। কে 'মাধবী'র সঙ্গে রহস্য করিয়া গেল তাহার সন্ধান করিতে গিয়া মাধবী হঠাৎ অভিরামের সাক্ষাৎ পাইয়াছে। তাই সে যেন 'অভিরাম' তাহার সঙ্গে যে অন্যায় আলাপ করিয়াছে তাহার কৈফিয়ৎ দাবী করে।

"মাধবী। কি তুমি অভিরাম?

অভি। এই দেখ্‌তেই পাচ্ছ—তোমাদের ভারবাহী ভৃত্য।

মাধবী। আমার সঙ্গে তুমি এমন করে রহস্য কর্‌লে কেন?

অভি। তুমি আমাকে ঘৃণা কর। আজ তাই যাবার সময় একটু শোধ নিলুম।"

যাবার সময় কথাটি শুনিয়া 'মাধবী' কিন্তু মনে মনে অভিযোগ বিসর্জন দিতেছে। সে চাহে, যাহাতে 'অভিরাম' চলিয়া না যায়।—

"মাধবী। তুমি যাবে কেন?

অভি। তুমি আমাকে ঘৃণা কর কেন? ঘৃণা করাও যেমন তোমার ইচ্ছে, চলে যাওয়াও তেমনি আমার ইচ্ছে।"

উভয়ের প্রেম সম্বন্ধে উভয়েরই সজাগ জ্ঞান না থাকিলে এই অভিমানের বাণী আসে না। নইলে একটি কন্যা একটি পুরুষকে ঘৃণা করিলেই বা কি এবং একটি পুরুষ চলিয়া গেলে অসম্পর্কিতা নারীরই বা কি আসিয়া যায়? সুতরাং এই অভিমান প্রেমের নামান্তর। 'মাধবী' তাহা বুঝিয়াছে। নিজের ভালবাসা সে খোলাখুলি প্রকাশ করিল না বটে, কিন্তু প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া লইল।—

"মাধবী। তুমি আমাকে রহস্য করেছ। আমি কাল প্রাতঃকালে রাজার কাছে নালিশ করব। যদি আজ রাত্রেই পালিয়ে যাও, তাহলে যথার্থই বুঝব তুমি নীচ ভৃত্য—কাপুরুষ।

অভি। বেশ, কাল প্রাতঃকাল পর্যন্ত থেকে যাব।"

'অভিরাম' থাকিয়া গেল এবং অভিযোগের ফল হইল তাহার 'মাধবী'লাভ।

ইহার পর এই অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে, রাজা অভিরামকে হঠাৎ একটা পুত্রবধূ খুঁজিয়া আনার আদেশ দিতেছেন। এই আদেশ নেহাৎ কৌতুক কি না বুঝিবার উপায় নাই। রাজা নিজেও তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। আবার এই কৌতুকপূর্ণ আদেশের ফলেই যে 'অভিরাম' হঠাৎ 'বরুণা'র সন্ধান পাইবে তাহারই বা নিশ্চয়তা কি ছিল? যেমন মহারাজের কোনো রহস্যপূর্ণ দূরদৃষ্টির ইঙ্গিত এই আদেশের মধ্যে নাই তেমনি অভিরামের দৃষ্টিপথে 'বরুণা'র আগমন কাক-তালীয় ন্যায়ে হইয়াছে। এই দুর্বলতা সম্বন্ধে নাট্যকার নিজেও যে অবহিত ছিলেন না তাহা নহে। তাই অভিরামের স্বগতোক্তির মধ্য দিয়া তিনি একটু কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন—"বনে বেটীরে আমাদের বোকা বানিয়েছে, আমি এখানে বেটীদের নিয়ে একটু মজা করি। এদিকে মজা, ওদিকে একটা সমস্যার মীমাংসা। মহারাজ কি উদ্দেশ্যে আমাকে রাজপুত্রবধূ আন্‌বার ভার দিলেন বুঝতে পারলুম না। রাজাও আদেশ করলেন, আমিও অমনি চলে এলুম। আমি ত বুঝেছি রহস্য,—রাজাও কি বুঝে রহস্য করেছেন? অথবা এ কোন দৈবলীলা।

এই অল্প সময়ের মধ্যে এ অঘটন কেউ কি ঘটাতে পারে?" কিন্তু কৈফিয়ৎ নাট্যকারের সাময়িক দুর্বলতাকে আরো স্পষ্ট করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে রাজা বিপদে পড়িলেন। নিজেও তিনি তাহা বুঝিলেন,—"তাই ত, অভিরাম সত্য সত্যই কি একটা বেদেনীই ধরে আনবে নাকি?" বেদেনী আসিল। মন্ত্রী মানবেন্দ্র টাকা, অলঙ্কার এবং তালুকের লোভ দেখাইলেন। বেদেনী 'স্বামী' ভিন্ন কিছুই প্রার্থনা করিল না। এইবার মহারাজের পালা। রাজার সঙ্গে বেদেনীর আলাপ অতি সংক্ষিপ্ত।

"শিব। কি মা, কিছু পুরস্কার নিয়ে আমাকে বেশাই দেবে কি?

বরুণা। কি দিবি রাজা?

শিব। অর্থ, অলঙ্কার, বাসগৃহ, ভরণ-পোষণের জন্য বিষয়-সম্পত্তি?

বরুণা। হামি লিব নি।

শিব। জমিদারী?

বরুণা। হামি লিব নি।

শিব। আমার রাজ্য?

বরুণা। না রাজা, আমি রাজ্য লিব নি, সোয়ামী লিব।"

ইঁহার পর রাজা আর প্রশ্ন করিলেন না। পুত্রকে আনিবার আদেশ দিলেন। প্রশ্ন না করার হেতু কি? হেতু এই যে কন্যা যদি সামান্যা বেদেনীই হয়, তাহা হইলে বিষয়, সম্পত্তি বা রাজ্যের লোভ সে স্বামীর জন্য বিসর্জন দিতে পারে না। তারপর রাজা যখন জানিলেন বনের মধ্যে এই কিরাতকন্যার গান শুনিয়া তাহার পুত্র পাগল হইয়াছেন, ইহাকে বিবাহ করিবার প্রতিশ্রুতিও রাজপুত্র দিয়াছেন, তখন নিশ্চিন্ত হইলেন।

তৃতীয় অঙ্ক। রাজপুত্রের রাজকন্যা অন্বেষণের পালা। সঙ্গীতের মোহিনী মাধুরীর সঙ্গে সৌন্দর্যের নয়নানন্দকর সম্মিলনের খোঁজে রাজপুত্র বাহির হইলেন। পিছনে পিছনে চলিয়াছে 'অভিরাম'। সঙ্গীত শুধু কালোয়াতের নিকট শেখা স্বর-ভঙ্গিমা নয়। প্রেমের ফুটন্ত আবেগে হৃদয় গলিয়া নির্যাস হইয়া বাহির হয় গানে। সেই বিগলিত প্রেমের সঙ্গে সুললিত কণ্ঠস্বর মিশিয়া যে মোহিনী রমণীর গেয় সঙ্গীতের স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে, তিনিই পুণ্ডরীকের মানসী রাজনন্দিনী। তাঁহারই খোঁজে রাজপুত্র আজ পাগল হইয়া ছুটিয়াছেন। কিন্তু পথে শুধুমাত্র রূপ বা সঙ্গীতের মোহে

তিনি আবদ্ধ না হন, তাই তাহাকে পরীক্ষা করিয়া লইবার জন্ত অভিরামের আয়োজন। বেঙ্কটেশ্বরের মন্দিরে আগতা রাজকন্তাদের সকলকেই 'অভিরাম' বরুণার সেই সঙ্গীত শিখাইয়া দিল। কুরূপা জটাবতীর কণ্ঠে সঙ্গীতের সম্পূর্ণটুকু পাওয়া গেল না, কণ্ঠস্বরের সে উন্মাদকর ঝঙ্কারও নাই। রাজপুত্র ছলনা বুঝিতে পারিলেন। 'অভিরাম' 'পুণ্ডরীক'কে লইয়া চলিল কাঞ্চী-রাজকুমারীর নিকট। তাঁহার জগন্মোহন রূপ দর্শন মাত্রেই 'পুণ্ডরীক' মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার আশা হইল, এই রূপময়ীই হয়ত অমন মধুর সঙ্গীতের রচয়িত্রী এবং গায়িকা। তাঁহার অধীর প্রতীক্ষার আবেগ সঙ্গীত এবং সৌন্দর্য এক করিয়া মিলাইয়া বিচার করিবার অবসর খুঁজিল না। মনের আবেগে তিনি কাঞ্চীকুমারীকে 'প্রাণেশ্বরী' বলিয়া রাজপুরীতে অতিথি হইলেন। কিন্তু মোহ ভাঙ্গিতে দেরী হইল না। তিনি বুঝিলেন, রাজকুমারীর রূপ আছে, কণ্ঠস্বর আছে, কিন্তু প্রেমের স্বতঃস্ফূর্ত সঙ্গীত নাই। কালোয়াতের ওস্তাদী আর প্রেমের আবেগে কম্পিত কণ্ঠের স্বভাব-স্ফূর্তির মধ্যে পার্থক্য অনেক। তাই 'পুণ্ডরীক' বলেন, "রাজকুমারী—কথার প্রাণে যে একটা সুর আছে, তা গীত-মাধুর্যের অপেক্ষা রাখে না। সে যে আপনা আপনিই মিষ্ট—।" ইহার উত্তরে রাজকুমারী যখন সঙ্গীতের ভাষায় শুনাইয়া দিলেন যে, 'পুণ্ডরীক' রূপে মুগ্ধ হইয়াই তাহাকে ভালবাসিয়াছেন, রাজপুত্র তখনই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া ছুটিলেন।

অবস্থা জটিল। এতদিন ধরিয়া এক বিদেশী রাজপুত্র কাঞ্চীরাজের পুরীতে তাঁহার কন্তার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করিয়াছেন। আজ হঠাৎ রাজকন্তাকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার পলায়নে অপমানিত রাজা পুণ্ডরীককে বন্দী করিতে ছুটিয়াছেন। পরিস্থিতি ভীষণ। চারিদিকে অজস্র সৈন্ত। সম্মুখে নদী। মধ্যে একাকী পলায়মান রাজপুত্র। পরিস্থিতির ত্রস্ত ব্যাকুলতাকে নাট্যকার অদ্ভুতভাবে রূপ দিয়াছেন। রাজপুত্রের এই অবধারিত বিপদের মুহূর্তে ব্যাধগণ-সহ সর্দার মংরুর আবির্ভাব হইল। রাজপুত্রের রক্ষার দিকে ব্যাকুল দৃষ্টি থাকার ফলে এই ব্যাধ-বাহিনীর আগমনের আকস্মিকতা সম্বন্ধে আমরা প্রশ্ন করিতে ভুলিয়া যাই। আর ইহার আগেই আমরা একবার স্বামীর অনুসরণকারিণী 'বরুণা'কে দেখিয়াছি। সুতরাং কল্পনা করিতে অসুবিধা হয় না যে তাহার পালক পিতা ব্যাধসর্দার সদলবলে গুপ্তভাবে তাহাকে রক্ষা করিতেছে।

নদী বক্ষ। মরণের গ্রাস। সাহসী বীরকুমার এই নিশ্চিত মৃত্যুর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন; ঠিক এমন সময় 'বরুণা'র আবির্ভাব। সময় নিতান্ত অল্প। বেরসিকের ন্যায় এই সংক্ষুব্ধ, ত্রস্ত পরিবেশে নায়ক-নায়িকাকে দাঁড় করাইয়া লম্বা লম্বা বক্তৃতা দেওয়ানোর অবকাশ নাট্যকারের নাই। রাজপুত্র অতি সংক্ষেপে 'বরুণা'কে নিষেধ করিতেছেন। 'বরুণা'ও অতি সংক্ষেপে উত্তর দিল, তাহার ফিরিবার উপায় নাই। দম্পতী মৃত্যু-ভয়াল নদীবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল। উপযুক্ত পরিবেশে, যোগ্য পাত্রের মুখে গদ্যের ভাষা যে কতখানি কবিত্বপূর্ণ হইতে পারে, ক্ষীরোদপ্রসাদ এইখানে তাহার পরিচয় দিয়াছেন।—

> "তবে আয়—জীবনের শেষক্ষণে পরস্পরে উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে—আয় কিরাত-নন্দিনী, উত্তাল তরঙ্গ-শিরে আমাদের বাসর-শয্যা রচনা করি।……খরস্রোতা তটিনী ভীম কলনাদে এখনি আমাদের সকল কথা উদর-গত করবে। এই আমার প্রথম প্রেমালাপ, এই আমার শেষ। উপরের ভবিষ্যৎ-সঙ্গী অশরীরী সহচরদের সাক্ষী রেখে এস প্রিয়তমে, তোমাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করি।"

সমস্ত পরিস্থিতির গুরুত্বকে এই ভাষা মহিমান্বিত করিয়াছে স্বীকার করিতেই হইবে।

শেষ দৃশ্য। বধ্য ভূমি। দৃশ্যের আরম্ভই হইতেছে রাজা শিব সিংহের কথায়।—"আর কেন দেওয়ান? বর্ষান্তের আর একদণ্ড মাত্র সময় অবশিষ্ট। আমার মিথ্যাবাদী, কাপুরুষ পুত্রের ফিরে আসবার জন্য তোমার প্রাণ দায়ী। পুত্র ফিরল না—তুমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।" সকলে অধীর প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। জল্লাদ খড়্গ উত্তোলন করিয়াছে। দর্শক নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে নাটকের পরিণতি দেখিতে অপেক্ষা করে। একটি নিরীহ, মহামানবের প্রাণ গেলেই কি রাজপুত্র আসিবেন? ক্ষীরোদপ্রসাদের রোমান্টিক নাটক যতই পরিণতির দিকে আসিতে থাকে, ততই কাহিনীর সঙ্ঘাত হয় তীব্র। অর্থাৎ প্রথম যে ঘটনা আরম্ভ হয় সহজ, সরলভাবে, শেষের দিকে তাহা ঘনীভূত ও জটিল হইয়া একটা আভ্যন্তরীণ সঙ্ঘাত-প্রবণতা প্রাপ্ত হয়। কেননা, মুখ্য ও গৌণ কাহিনীর সম্মিলনে, নায়ক-নায়িকার সৃষ্ট ঘটনার বৃহত্তর বিস্তারে নাটকীয় দ্বন্দ্ব তখন জমিয়া ওঠে। তখনি আরম্ভ হয় কাহিনীর

রহস্যময় অতিক্রান্ত। রঙ্গমঞ্চে তখন হইতে পাত্র-পাত্রী যাহারা আসিতে থাকে, তাহাদের বাক্যে, কার্যে ঐ অতিক্রুততার সঞ্চার হয়। তাই শেষের দিকে সংলাপ হয় সংক্ষিপ্ত ও আবেগ-চঞ্চল। যেন কাহিনী এত দ্রুত চলিয়াও শেষ হইতে চাহে না। দর্শকের অধীর প্রতীক্ষমানতা এই গতিকেও মন্থরতা বলিয়া জ্ঞান করে। কিন্তু এই বাস্তবতাকে নাট্যকার নীরস গল্প বিবৃতিতে নিরসন করেন না। পরিণতি অগ্রসর হয় সংক্ষিপ্ত, কর্মময়, পরিমাপিত সংলাপে। সেই সংলাপের পরিসরের ক্ষুদ্রতাই তাহার আবেগ-তীব্রতাকে বাড়াইয়া দেয়। মানবেন্দ্রের জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে যখন মুহূর্ত মাত্র ব্যবধান, তখন অভিরামের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া যে কথা বাহির হইয়া আসে, তাহা সংক্ষিপ্ত। কিন্তু তাহার মধ্যে প্রবল অনুশোচনা এবং নৈরাশ্যের সঙ্গে আশা ও দৃঢ়বিশ্বাস কি অপূর্বভাবে মিশিয়া আছে—

> "তাই ত। আমার ভুলে কি সব নষ্ট হল? মহারাজ। আমি দেখতে পাচ্ছি—উন্মাদের মতো রাজকুমার সময়ে পৌঁছবার জন্য ছুটে আস্‌ছে। মহারাজ! পবনের বেগ, পবনের বেগ, তবু বুঝি পারলে না!"

অভিরামের এই হতাশ-ভাবকে আরো একটু বাড়াইয়া দেয় এবং পরিস্থিতিকে আরও বিষণ্ন করিয়া তোলে শিববর্মার একটি মাত্র বাক্য—"এখনও এক পল বিলম্ব জল্লাদ!"

'পুণ্ডরীক' আসিল। সর্পভূষণা কিরাতকন্যা পুষ্প-বিশোভিতা হইয়া আসিল বধূবেশে। আনন্দগিরি 'বরুণা'র পরিচয় করাইয়া দিলেন। শ্মশানে বিবাহের বাঁশী বাজিয়া উঠিল।

নাট্যকারের অত্যধিক রোমান্‌স্‌-প্রিয়তা তাঁহার ইতিহাস-প্রধান নাটক-গুলিকেও প্রভাবান্বিত করিয়াছে।

'প্রতাপাদিত্য' সম্বন্ধেই প্রথম আলোচনা করা যাক। এখানেও ক্ষীরোদপ্রসাদের চিরাচরিত রোমান্‌স্‌-প্রিয়তা নাটকের ঐতিহাসিকতা খর্ব করিয়াছে। চরিত্রের বাস্তবতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগাইয়াছে। কোনো কোনো চরিত্র যেমন অবাঞ্ছিতভাবে বিকৃত হইয়াছে তেমনি প্রধান প্রধান অনেক চরিত্র অবিকশিত রহিয়াছে। আবার এই কাহিনীবিন্যাসে রোমাণ্টিকতার সঙ্গে অতিরিক্ত আধুনিক স্বাদেশিকতা যুক্ত হইয়া হয়ত নাটককে জনপ্রিয় করিয়াছে, কিন্তু ঐতিহাসিক করে নাই। ঐতিহাসিক নাটকে রোমান্‌স্‌ বা

কল্পনার অবকাশ কতখানি তাহা লইয়া তর্ক না তুলিয়াও বলা যাইতে পারে, 'প্রতাপাদিত্য' নাটকে রোমান্সের অবকাশ ছিল। যশোরেশ্বর প্রতাপাদিত্যের জীবনীর মধ্যে ইতিহাস ও জনশ্রুতি সমান অংশ জুড়িয়া রহিয়াছে। সুতরাং নাট্যকার যদি ইতিহাসের সঙ্গে জনশ্রুতিরও আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে দোষ দিতে পারি না। যদি তাঁহাকে দায়ী করিতে হয়, তবে দায়ী করিব ইতিহাসের সঙ্গে সেই জনশ্রুতির সাহিত্যিক সঙ্গতি না-রাখার জন্য। সেই দিক দিয়া বলিতে পারি, এই নাটকে নাট্যকারের কল্পিত রোমান্স্ এবং জনশ্রুতি-জাত কাহিনী-বিন্যাস সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করে বলিয়া আমাদের আপত্তি। শঙ্কর, সূর্যকান্ত এবং কমলের জন্মভূমি, বাসস্থান প্রভৃতির গণ্ডগোল যদি তিনি করিয়াই থাকেন, তাহাতে এমন মারাত্মক কোন ত্রুটি ধরা যায় না। কেন না, এ সম্বন্ধে ইতিহাসও তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানাইতে পারে নাই। নাটকে কল্যাণীর অতিপ্রাধান্য শঙ্করের স্ত্রী বলিয়াই হইয়াছে। তাহার মধ্যে অসঙ্গতির তেমন কিছুই দেখি না। উদয়াদিত্যের মায়ের নাম শরৎকুমারীর স্থলে কাত্যায়নী হইয়া যাওয়ায় নাট্যকারের ইতিহাস-জ্ঞানের অভাব সূচিত হয় বটে; ঐ নামটি চরিত্রটিকে বিকৃত করে নাই। কিন্তু আমরা দেখিব, নায়ক 'প্রতাপাদিত্যে-'র চরিত্র সৃষ্টিতে এবং তাঁহার পরিবেশ রচনাতেই নাট্যকার সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারেন নাই এবং প্রতাপ-চরিত্রের ক্রমবিকাশের সূত্রগুলিও স্পষ্ট নহে।

রাজা প্রতাপাদিত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে যে নাটকে, তাহার আরম্ভ শঙ্কর চক্রবর্তীকে দিয়া হইল কেন এ-প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। অধ্যাপক শ্রীসাধনকুমার ভট্টাচার্য প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা প্রসঙ্গে এ প্রশ্ন তুলিয়াছেন* এবং বলিয়াছেন, শঙ্করের উদ্দেশ্য ছিল প্রসাদপুরের প্রজাদের দুঃখ-দৈন্য রাজাকে জানানো, লক্ষ্যভেদের আবেগে তিনি তাহা ভুলিয়া গেলেন। অবশ্য শঙ্কর চক্রবর্তী যশোর যাত্রার পূর্বেই প্রজাদের মহারাজ বসন্ত রায়ের রাজ্যে চলিয়া যাইতে পরামর্শ দিয়া গিয়াছিলেন। তিনি নিজে তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছেন। সুতরাং সাধনবাবুর অভিযোগ খুব দৃঢ় নহে। যাহা হউক নাট্যকারের আসল উদ্দেশ্যটি ছিল অন্য রকম। শঙ্কর চক্রবর্তী

---

*'নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক-বিচার', শ্রীসাধনকুমার ভট্টাচার্য : ২য় খণ্ড, ৬২-৬৩ পৃষ্ঠা।

অরাজক মোগল অধিকারের অত্যাচারিতের প্রতিনিধি। নাট্যকার রাজা প্রতাপাদিত্যকে নির্যাতিত বাঙালীর বিদ্রোহমূর্তিরূপে কল্পনা করিয়াছিলেন। স্বদেশভক্ত শক্তিমান রাজার চারিপার্শ্বে বাংলার বিক্ষুব্ধ জনশক্তির সমাবেশ করানোই ছিল নাট্যকারের উদ্দেশ্য। তাই উপক্রত পাঠান-সন্তানগণ অত্যাচারের প্রতিকারার্থ সমবেত হয় ব্রাহ্মণ শঙ্কর চক্রবর্তীর নিকটে। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রচার নাট্যকার এই সুযোগে একটু করিয়া লইয়াছেন। জাতীয় জাগরণ যে কোনো বিশেষ শক্তিমানের জাগরণ নহে, কোনো বিশেষ সম্প্রদায়েরও নহে, এই সত্যটি তিনি প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। তাই প্রতাপকে ঘিরিয়া হিন্দু-মুসলমান, সেনানায়ক ও দস্যু-সর্দারদের আয়োজন। এই আয়োজনের পূর্ণতা চলিয়াছে দুই অঙ্ক ধরিয়া। আবার ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীকে জানাইতে হইবে যে দেশের জন্য শক্তিসংগ্রহ এবং শাসক-শক্তির বিরুদ্ধে অভিযান শক্তিরই আরাধনা। প্রতাপাদিত্যের প্রতি কালীমাতার করুণা লোক-প্রসিদ্ধ। এখানে নাট্যকার সেই সুযোগও লইয়াছেন। ইহার সবই সম্ভব হইতে পারিত। অন্ততঃ সারস্বত বিশ্বাসের বস্তু হইতে আপত্তি থাকিত না। কিন্তু নাট্যকার কাহিনীকে অতিমাত্র চমকপ্রদ করিতে গিয়াই গণ্ডগোল করিয়া বসিয়াছেন। বস্তুগুলির নাট্যীকৃত রূপই আমাদের মনঃপূত হয় না।

কেন হয় না তাহাই বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইব। প্রতাপ ও শঙ্করের সাক্ষাৎ আকস্মিক নয়। প্রসাদপুর হইতে প্রজাবৃন্দ সঙ্গে করিয়া শঙ্কর চক্রবর্তী যশোর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। সুতরাং তিনি যে যশোর আসিয়া পৌঁছাইবেন তাহা অনুমেয়। কিন্তু প্রশ্নটি হইল সাক্ষাতের মুহূর্ত ও তন্মুহূর্তের সৃষ্ট পরিস্থিতি লইয়া। আমরা স্বীকার করিতে রাজি আছি যে প্রতাপের অভ্যুত্থান ও পতনের ব্যাখ্যা দেওয়ার সুন্দর আয়োজন তিনি করিয়াছেন। কোষ্ঠীর ফলে বিশ্বাসী রাজা বিক্রমাদিত্য পুত্রকে বৈষ্ণব করিবার জন্য বসন্ত রায় ও গোবিন্দদাসকে নিযুক্ত করিয়াছেন। গুরুহত্যার ভয় হইতে অব্যাহতি পাওয়ার এই যে প্রচেষ্টা তাহার মধ্যেই ভবিষ্যতে বসন্ত রায়ের হত্যার ইঙ্গিত থাকে। আবার পুত্র যে পিতার এত চেষ্টা সত্ত্বেও বৈষ্ণব হইলেন না, বরং শক্তির সাধনার দিক বাছিয়া লইলেন, তাহাও আমরা দেখিতেছি। সুতরাং অনুমেয়, নিয়তির গূঢ় ইঙ্গিতে, পিতার নিতান্ত অনিচ্ছায় প্রতাপ ভবিষ্যতের রহস্যময়তার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহার

সঙ্গে নিতান্ত দৈবক্রমেই আসিয়া মিলিলেন শঙ্কর চক্রবর্তী। বিজয়ার মাধ্যমে দেবীর কৃপাও নামিয়া আসিল নিতান্ত অহেতুকী করুণার মতো। কবি-কল্পনা হিসাবে আয়োজনটি সত্যই ভাল হইত যদি উহা নাট্যগুণ-সমন্বিত হইত। কেন হয় নাই? হয় নাই তাহার কারণ এই যে ঐতিহাসিক নাটকের কাহিনীবিন্যাস ও রোমান্‌স্‌ বা উপকথা-নাট্যের কাহিনী-বিন্যাসে শৈলীর যে পার্থক্য থাকে, নাট্যকার তাহা এখানে স্বীকার করেন নাই। এমন কি তাঁহার কয়েকখানা রোমান্‌স্‌-নাট্যে তিনি কাহিনীর আকস্মিকতারও যে সম্ভাব্যতা বজায় রাখিয়াছেন, এখানে ঐতিহাসিক নাটকে তাহাও অস্বীকার করিয়াছেন। শঙ্কর রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকট আসিবেন এ ঘটনা আমরা আগে জানিলেও, যে পরিবেশে যেমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া তিনি রাজসমীপে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে। দূর হইতে এককালে তিনজনের নিক্ষিপ্ত বাণে একটি পক্ষী বিদ্ধ হওয়ার প্রসঙ্গ না হয় স্বীকার করিয়া লইলাম, আর কোনো স্থান না পাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে পক্ষীটি বৈষ্ণব-ধর্মালোচনা-রত রাজা বিক্রমাদিত্যের সামনে আসিয়া পড়িবে, এই আকস্মিকতাকেও বিধি-নির্দিষ্ট বলিয়া মানিয়া লইলাম। কিন্তু তিনজন লক্ষ্যকারীই যে অনন্য-দৃষ্টি হইয়া ঐ পক্ষীটির পতন অনুসরণ করিতে করিতে বিনা বাধায় গোবিন্দদেবের মন্দিরপ্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইবেন, তাহা কি করিয়া মানিয়া লইব? পক্ষীর এমন কি গুরুত্ব ছিল যে তাহার অনুসরণে তিনজনে এককালে প্রবৃত্ত হইতেই হইবে? আর এই সম্বন্ধে বাংলার জন-শক্তি, রাজশক্তি এবং দেবশক্তির প্রতিনিধি শঙ্কর, প্রতাপাদিত্য ও বিজয়া যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহাতে পক্ষীর অনুসরণের কোনো প্রয়োজন হয় না। লক্ষ্যভেদেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ব্রাহ্মণের কৈফিয়ৎ বাঙালী ব্রাহ্মণের চিরদুর্বল করে লক্ষ্যভেদের সামর্থ্য আছে কি না তিনি পরীক্ষা করিতেছিলেন। লক্ষ্যভেদের সঙ্গেই পরীক্ষা শেষ হয়। ওদিকে বিজয়ার বেলায়ও তাই। মুসলমানশক্তির আক্রমনে একটি ব্রাহ্মণ-পরিবার ছারখার হইয়াছিল। কপোতপরিবারে শ্যেনের অত্যাচারে সেই স্মৃতি জলিয়া উঠিল। তাই তিনি শ্যেনকে হত্যা করিয়াছেন। কিন্তু এই কুমারী কপালিনীর কোনো বর্ণনা আমরা আগে হইতে পাই নাই। রাজ-অন্তঃপুরের সন্নিকটে তাহার আকস্মিক আগমনের কোনো হেতুও আমরা জানি না। নাট্যকার যেন জোর করিয়া একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করিবার জন্য

তাঁহাকে আনিয়াছেন। আবার তাঁহাকে দেখিয়া অভিভূত শঙ্কর ও প্রতাপের যে উক্তি তাহার মধ্য দিয়া নাট্যকারের প্রচারপ্রিয়তা প্রকাশ পাইয়াছে। বিজয়াকে দেখিয়া কেন যে শঙ্করের মনে হইল, 'দুর্বল-পীড়ন-দর্শন-কাতর' দীন ব্রাহ্মণের আহ্বানে মা দুর্গতিনাশিনী সাড়া দিয়াছেন তাহা বুঝিলাম না। এই উক্তির পিছনে যে বিশ্বাস কাজ করে, নাটকে তাহার উদ্ভবের কোনো কার্য-কারণ-সম্পর্ক নাই। এই চমক-প্রদ কাহিনীর যুক্তিহীনতা ও আকস্মিকতা ঐতিহাসিক নাটকের পক্ষে অশোভন। ওদিকে প্রতাপের মোগলবিজয়ী শক্তির পরীক্ষা হইবে সামান্য পক্ষীকে হত্যা করিয়া, ইহাও কোনো সুযুক্তি নয়।

যাহা হউক, একদিকে জনশক্তি, রাজশক্তি ও দেবশক্তির মিলনের মধ্য দিয়া প্রতাপাদিত্যকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা নাট্যকার যেমন করিলেন, অন্য দিক দিয়া বিরোধের ত্র্যহস্পর্শ ঘটাইতেও তিনি চেষ্টা কম পান নাই। কিন্তু সে আয়োজনও সঙ্গতির অভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। রাজা বিক্রমরায়ের মনের বাসনা প্রতাপকে বিদায় করা। হত্যার চিন্তাও যে তিনি করেন নাই তাহা নহে, কিন্তু পিতার মুখ দিয়া সে কথা বাহির হইয়াও হয় না। বিক্রমরায়কে নাট্যকার ভাঁড় সাজাইয়াই থাকুন আর যাহাই করুন না কেন, নাটকে তাহাকে যে ভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে, তাহাতে চরিত্রটি অতি সার্থকভাবে প্রকট। পিতার স্নেহ, রাজ্য রক্ষার দায়িত্ব, ভ্রাতৃপ্রেম একসঙ্গে মিলিয়া রাজা বিক্রম রায়কে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। অগত্যা প্রতাপকে আগ্রায় পাঠানোর আয়োজন হইল। এই আগ্রা-গমনকে প্রতাপ গ্রহণ করিলেন নির্বাসনের ষড়যন্ত্ররূপে। কিন্তু বসন্ত রায়ের প্রতি তাঁহার এই সন্দেহ ঘটিবার কোনো উপযুক্ত কারণ নাট্যকার দেখান নাই। ওদিকে ভবানন্দ ও গোবিন্দ রায় প্রতাপের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। কিন্তু শক্তিমান, বুদ্ধিমান রাজা এবং তাঁহার প্রতিভাবান মন্ত্রীর চক্ষে ধুলা দিয়া রাজ্যনাশের ষড়যন্ত্র করিতে হইলে বুদ্ধির যতখানি গুরুত্ব, গাম্ভীর্য এবং স্থৈর্য প্রয়োজন, ভবানন্দ বা গোবিন্দ রায়ের চরিত্রে তাহা নাই। গোবিন্দ রায় ছেলে-মানুষ আর ভবানন্দ বাচাল। প্রকৃত ভাঁড় তাহাকেই সাজানো হইয়াছে। ভবানন্দ ও গোবিন্দ রায় দুইজনের কেহই নাটকে সক্রিয় ষড়যন্ত্র করেন নাই। দুষ্ট চরিত্রের সুনিয়ন্ত্রিত কর্মধারা ইহাদের নাই। সুতরাং যেমন প্রতাপের প্রতিষ্ঠার জন্য নাট্যকার নাটকোচিত কর্ম-শৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে পারেন নাই তেমনি

তাঁহার দুর্ভাগ্যের পথ প্রস্তুত করিবার কোনো কর্মময় আয়োজন নাটকে দেখা যায় না।

শঙ্করের স্ত্রীকে দেখিবার লোভে প্রতাপাদিত্য প্রসাদপুর রওনা হইলেন ইহা যেমন আমরা হঠাৎ শুনিলাম, কমল প্রভৃতি দস্যুগণের সঙ্গেও তাঁহার মিলন তেমনি যেন কেমন করিয়া হইয়া গেল। দেব-কৃপাকে বেশী ফলাও করিতে গিয়া প্রতাপাদিত্যের কর্মময়তাকে নাট্যকার একেবারে বিসর্জন দিয়াছেন। অথচ কেন যে প্রতাপ এই দেবকৃপার অধিকারী, কালীর মানবীকৃত মূর্তি বিজয়াও সে কথা বলেন নাই। শুধু অকারণ করুণাই দেখাইয়াছেন।

ওদিকে যে ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া প্রতাপের সঙ্গে মোগলের সংঘর্ষ হইল তাহাও নাটকীয় নহে। শঙ্করের স্ত্রীকে রাজমহলের নবাব কেন চাহিয়া পাঠাইলেন? নাট্যকার সেজন্য কোনো কৈফিয়ত দেন নাই। একটি গ্রাম্য বধুকে বন্দিনী করিতে নবাবশক্তির এতখানি আয়োজন কেন করিতে হইল? যদি ইহা নিতান্ত রূপমোহ হয়, তাহা হইলে কবে কি করিয়া কল্যাণীর রূপের খ্যাতি নবাবের কানে উঠিল? যদি ইহা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হয়, নাটকে তাহার ইঙ্গিত কোথায়? নাট্যকার সে সবই অন্ধকারে রাখিয়াছেন। আর ইহাকে কেন্দ্র করিয়া রাজমহলে শের খাঁর সঙ্গে প্রতাপের যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে আপত্তি ছিল না। কিন্তু ইতিহাসের দিক দিয়া যাহাই হউক না কেন, নাট্যশৈলীর দিক দিয়া নাট্যকার ইহার কোনো প্রস্তুতি দেখান নাই। যদি এই প্রস্তুতি থাকিত, তাহা হইলে শের খাঁর সঙ্গে প্রতাপের যুদ্ধকে আমরা স্বীকার করিয়া লইতে পারিতাম। প্রতাপের প্রত্যাগমন ও শেরখাঁর সঙ্গে যুদ্ধের সম্ভাবনার যে প্রশ্ন সাধনবাবু তুলিয়াছেন, সেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেন না, একটি প্রতিষ্ঠিত রাজ্যকে হঠাৎ আক্রমণ করা যায় না। তাহার জন্য প্রস্তুতি প্রয়োজন। তাহা ভিন্ন অভিযোগ ও সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছিল। সুতরাং কল্যাণীর অপহরণ-চেষ্টা এবং যশোর আক্রমণের মধ্যে সময়ের প্রশ্ন থাকিতে পারে। ওদিকে আবার মোগলের সহিত প্রতাপের বিরোধ সঙ্ঘটনের কোনো সুশৃঙ্খল আয়োজন নাই। বঙ্গদেশ অধিকারের সংবাদ বাদশাহের কানে উঠিয়াছে এই কথাটি আমরা একবারমাত্র শুনিলাম। কিন্তু কি করিয়া কোন্ প্রসঙ্গে উঠিল, কখন উঠিল, নাট্যের পূর্বগামী কোন্ সঙ্ঘটনের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া হিসাবে মোগলের আক্রমণ হইল, তাহা আমরা জানি না। সুতরাং কাহিনীর রস জমিয়া উঠে না। চরিত্রের কর্মময়তা

কোথাও এতটুকু লক্ষ্য করা যায় না। তারপর নাটকের সমাপ্তি নিতান্ত অনাটকীয়। ধুমঘাট প্রসঙ্গে প্রতাপের সহিত বসন্ত রায়ের যে বিবাদ তাহাও নিতান্ত আকস্মিক এবং অবাঞ্ছিত। যে স্নেহদুর্বল পিতৃব্য নিজের সন্তানের চেয়েও প্রতাপকে প্রিয় জ্ঞান করেন, যিনি শান্তস্বভাব বৈষ্ণব, তিনি যে কেন প্রতাপের ভিক্ষায় হঠাৎ এমন উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, তাহার কোনো অর্থ আমরা খুঁজিয়া পাই না। প্রতাপের প্রার্থনার যৌক্তিকতা এবং গুরুত্ব বসন্ত রায় ধীরে সুস্থে বিবেচনা করিতে পারিতেন কিনা? আর একটা বিরোধের সুযোগ এখানে ছিল। গোবিন্দ রায় যদি কর্মপ্রবণ সুচতুর হইতেন, তিনি পিতাকে চাকসিরি ফিরাইয়া না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিতে পারিতেন, এবং এই ব্যাপারে একটি পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ঘটাইতে পারিতেন। তাহা হইলে প্রতাপের প্রতি বসন্ত রায়ের স্নেহ ও গোবিন্দ রায়ের অনুরোধ দুইটি মিলিয়া একটি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইতে পারিত। সেই সুযোগে প্রতাপ, বসন্ত রায়কে ভুল বুঝিবার অবকাশ পাইতেন। তারপর যুদ্ধক্ষেত্র হইতে গোবিন্দ রায়ের পলায়ন যে উদ্দেশ্যমূলক, তাহা বুঝিবার কোনো সুযোগ নাট্যকার আমাদিগকে দেন নাই। গোবিন্দ রায়ের আচরণ ষড়যন্ত্রমূলক কিনা প্রতাপ নাটকের কোথাও তাহা বুঝিয়াছেন কি? রাম রায়ের পলায়নে প্রতাপ যে ধারণা করিলেন, ইহা বসন্ত রায়ের কাজ, নাটকে তাহার জন্যও কোনো প্রস্তুতি নাই। তাই বসন্ত রায়ের হত্যার দৃশ্যে প্রতাপের আকস্মিক মতি পরিবর্তনের বা গোবিন্দ রায়ের প্রতাপকে হঠাৎ আক্রমণের কোনো যৌক্তিকতা পাই না। নাট্যকার এখানে ইতিহাসকে স্বীকার করিয়াছেন কিনা তাহার বিচার না করিয়াও বলিতেছি, শুধু নাট্যনীতির দিক দিয়াই নাটকখানি অনেকখানি অসার্থক। অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রের দুই একটি ছোটো খাটো ত্রুটি আছে। তাহার আলোচনায় বিরত রহিলাম। শুধু ঐতিহাসিক নাটকে কয়েকটি অবাঞ্ছিত অলৌকিক কাণ্ড নাট্যকার যে ঘটাইয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিব। জলদস্যু রডাকে ধরিবার জন্য নাট্যকার বিজয়াকে মেরী-মূর্তি ধরাইতেছেন। আবার নাটকের সমাপ্তিতে বন্দী প্রতাপের চক্ষের সামনে নাট্যকার ব্রিটানিয়ার আবির্ভাব করাইতেছেন। ঐতিহাসিক নাটকের সমাপ্তিতে আধুনিক যাত্রার এই অবাঞ্ছিত আগমন আমরা মানিয়া লইতে পারি না।

উপসংহারে বক্তব্য, ঐতিহাসিক নাটকে কল্পনার অবাঞ্ছিত প্রবেশ ইতিহাসকেই শুধু ক্ষুণ্ণ করে নাই, নাটকের নাটকীয়তা নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

অন্তদিকে যে স্বদেশপ্রীতি নাটকের প্রধান আকর্ষণ, তাহা নায়ক চরিত্রের অনিবার্য বিকাশের মধ্য দিয়া হয় নাই। প্রতাপের কয়েকটি উক্তিমাত্র সেখানে সম্বল। প্রতাপের উত্থান ও পতন উভয়ের মধ্যে দৈবের অবাঞ্ছিত প্রবেশ কার্য-কারণ-সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয় নাই। তাই, নাটকের পরিণতি বিষণ্ণ হইলেও উহা ট্রাজেডী নহে। সৌভাগ্যের উচ্চ শিখর হইতে নিজের সৃষ্ট কর্মের সঙ্ঘাতে, নিজের চরিত্রের কোনো অবিচ্ছেদ্য দুর্বলতায় নিজ মন বা পরিস্থিতির মধ্যে সঙ্গতি রক্ষার অভাবে এই বিষাদময়ী পরিণতি তাঁহার জীবনে নামিয়া আসে নাই। তাই নাটকখানি সার্থক নহে।

'আলমগীর' নাটকেও নাট্যকারের রোমান্স্-প্রীতি অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটাইয়াছে, অনেক অসম্ভাব্যতার অবতারণা করিয়াছে। কিন্তু তবুও এই নাটকে নায়ক-নায়িকার চরিত্র সৃষ্টির যে দক্ষতা নাট্যকার দেখাইয়াছেন, তাহা অপূর্ব। সেইজন্ত তাঁহার সৃষ্ট সমস্ত ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে 'আলমগীরে'র একটু বৈশিষ্ট্য আছে।

এই নাটকের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ 'আলমগীর' ও 'উদিপুরী'র চরিত্র। অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্র সঙ্ঘাতে, সরলতার সহিত দুর্বলতার অপূর্ব মিশ্রণে, ঘৃণার সঙ্গে প্রেমের বিবাহবন্ধনে, অভিমানিনীর আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রেরণায় কাহিনীকে নিজের ইচ্ছামতো রূপায়ণে, উদিপুরী চরিত্রের রূপমহিমা অনলরেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। অগ্নির নয়ন-ধাঁধানো দীপ্তি এবং গাত্রদাহকর তেজ দুইটিই এই চরিত্রে রহিয়াছে। অন্তদিকে ব্যক্তিত্বাভিমানী, চির অপরাজেয় 'আলমগীর'। তাঁহার প্রতি নাটকে বিরোধিতা ত্রিধাবিভক্ত। কুৎসিতদেহ সম্রাট 'কাশ্মীরী বেগম'কে 'বিবাহ' করেন নাই; 'বন্দিনী' করিয়াছেন। অনিন্দ্যসুন্দর রূপমাধুর্য এক প্রেমহীন কদাকার রাজপুরুষের পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িবে আর সম্রাট বিধাতার এই নয়নানন্দকর সৃষ্টিকে করুণামিশ্রিত বিদ্রূপ করিবেন। কিন্তু তাঁহার সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে। তিনি দেখিলেন, কাশ্মীরী বেগমের শুধু রূপই অপরাজেয় নয়, ব্যক্তিত্বও ততখানি অজেয়। বিশ্ববিজয়ী 'আলমগীর' এই বালিকাটিকে জয় করিতে পারেন নাই; এবং পারেন নাই বলিয়াই তাঁহার অভিমান। সেইজন্তই তিনি ব্যঙ্গ করিয়া তাঁহার নাম রাখিলেন 'উদিপুরী'! সম্রাট আকবরের আমল হইতে মোগলবীরগণ অন্যান্ত রাজপুত-পরিবারের আভিজাত্য-গর্ব খর্ব করিয়াছেন। সকল রাজপুতই মোগলের ঘরে কন্তা দান করিয়াছে, করে নাই কেবল এক

শক্তিমান, গর্বী মেবারী। 'উদয়পুরী' রাজ্য ত্যাগ করিয়াছে, প্রাণ বিসর্জন দিয়াছে, কিন্তু কুলগর্ব নষ্ট করে নাই। জয়মল্ল-পুত্রের প্রাণদান, রাণা প্রতাপ সিংহের যোগীব্রত প্রভৃতি মেবারের ইতিহাসকে যে গৌরবোজ্জল সম্মান দিয়াছে তাহার নিকট বিজয়ী মোগলের ঐশ্বর্য-বিলাস, শক্তি-প্রমত্ততা অতি তুচ্ছ। এই ব্যঙ্গই হইল 'উদিপুরী'র সম্মান। স্বীকার করি 'উদিপুরী'-চরিত্রকে নাট্যকার একটু বেশী রঞ্জিত করিয়াছেন। কিন্তু এই সুন্দরীর আব্দার-অত্যাচার 'আলমগীর' শেষ পর্যন্ত সহ্য করিয়াছেন, ইতিহাস তাহারও প্রমাণ দেয়। তবে 'উদয়পুরী' কুলকন্যার স্বামীভক্তি ও আভিজাত্য-গর্ব নিজের চরিত্রে বরণ করিয়া 'উদিপুরী' বেগম যে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহা নাট্যকারের নিজের সৃষ্টি। নিজের সৃষ্টি হইলেও রচনা সার্থক এবং সুন্দর। 'উদিপুরী' আলমগীরকে ভালবাসে। সে ভালবাসা প্রেমের প্রতিদানে নয়—দুঃস্থের প্রতি করুণায়, দুর্বলের প্রতি সহানুভূতিতে। বুদ্ধদেব আটপ্রকার স্ত্রীর ব্যাখ্যা দিতে গিয়া বলিয়াছেন, এক প্রকার স্ত্রী আছেন, যাঁহারা 'স্ত্রী' হইয়াও 'মাতা'। 'জননীর স্নেহ, রমণীর দয়া' তাঁহাদের মধ্যে প্রবল। 'উদিপুরী' সেই 'মাতৃসমা' জাতীয়া। আলমগীরের প্রতি তাঁহার যে ভালবাসা সে নিঃসহায়ের প্রতি করুণা। 'আলমগীর' যতক্ষণ জাগ্রত থাকেন, ততক্ষণ তিনি শক্তিমান, অপরাজেয়। কিন্তু নিদ্রার কোলে গাহমান সম্রাটের মনের অবচেতন স্তর হইতে নিজকৃত অপরাধ-অত্যাচারের স্মৃতি যখন মূর্তি ধরিয়া নরকের প্রহরীর মতো তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসে, ভয়ে অভিভূত সম্রাট তখন শিশুর মতো কাঁপিতে থাকেন। কখনো তিনি নিজের অজ্ঞাতে স্বপ্নের ঘোরে আত্মহত্যা করিতে যান। কিন্তু রুগ্ণ বিকারগ্রস্ত শিশুর শয্যাপার্শ্বে অতন্দ্রনেত্রে জাগ্রতা, উৎকণ্ঠিতা মাতার ন্যায় জাগিয়া থাকেন 'উদিপুরী' বেগম,—আর প্রাসাদের প্রহরিগণ তখন ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। 'আলমগীরে'র অমানুষিক উপেক্ষার সহিত এই দেবীজনোচিত সেবার যে বৈপরীত্য নাট্যকার দেখাইয়াছেন, তাহাতেই 'উদিপুরী'র চরিত্র আরো মহনীয় হইয়া ফুটিয়া ওঠে।

আর একটা বিষয় এখানে লক্ষ্য করিবার মতো। 'আলমগীর' নিজের চরিত্র-বিকাশের মধ্য দিয়া নাটকে যতখানি না ফুটিয়া উঠিয়াছেন, তাহার বেশি তিনি প্রকাশিত হইয়াছেন 'উদিপুরী'র সংলাপের মাধ্যমে। অথচ চরিত্র-চিত্রণে এতটুকু অনাটকীয়তা লক্ষ্য করা যাইবে না, এতটুকু প্রচারবাদ

মিলিবে না। আলমগীরের এতবড় অসহায়ত্ব প্রকাশ পাইল একটি সঙ্গত নাটকীয় মুহূর্তে। 'রূপকুমারী'কে আনিবার ষড়যন্ত্র 'উদিপুরী' ব্যর্থ করিয়া দিতেছে জানিতে পারিয়া ক্রোধান্ধ সম্রাট যখন 'উদিপুরী'কে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করিবার আদেশ দিবেন, সেই মুহূর্তে ধীরে ধীরে 'উদিপুরী' বেগম সম্রাটের দুর্বলতার কথা প্রকাশ করেন। সম্রাট কৃতজ্ঞতা ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়েন। পরিস্থিতি 'উদিপুরী'কে সত্য প্রকাশ করিতে বাধ্য করিয়াছে। জাগ্রত আলমগীরের আচরণের মধ্য দিয়া এই সত্য প্রকাশ পাইবার কোনো উপায় ছিল না। আবার নাট্যকার যদি স্বপ্নাভিভূত আলমগীরের দেবদূত দর্শনের পার্শ্বে অতন্দ্রা, করুণাব্যাকুলিতা, মাতৃমূর্তি এই স্ত্রীটিকে এমন করিয়া অঙ্কিত না করিতেন, আলমগীরের অসহায়ত্ব তাহা হইলে এত প্রত্যক্ষ হইয়া ফুটিত না। অথচ প্রসঙ্গটি কাহিনীর বিবৃতির আকারে প্রকাশিত হয় নাই। চরিত্রের বিকাশের ধারায় সংলাপের স্বতঃস্ফূর্ত গতির প্রবাহে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাই উহা এত আকর্ষণীয়।

আলমগীরের নিজের কথা ও আচরণের মধ্য দিয়া যেখানে নাট্যকার তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়াছেন, সেখানে অনেক ক্ষেত্রে অসঙ্গতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর স্থাপনের যে কৈফিয়ৎ দিয়া তিনি আত্ম-দোষ ক্ষালনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার যৌক্তিকতা নাই। হিন্দুর তীর্থ পুরোহিত-পাণ্ডাগণের লুণ্ঠন-ক্ষেত্র। সেই লুণ্ঠন বন্ধের জন্য সত্যদ্রষ্টা ধার্মিক সম্রাট জিজিয়ার প্রবর্তন করেন। কিন্তু যখন প্রশ্ন করা হয়, এই কর মুসলমান মোল্লা-মৌলভীর উপর কেন ধার্য করা হয় না, তখন আর উত্তর নাই। সুতরাং যে ন্যায়দর্শী মূর্তিতে নাট্যকার 'আলমগীর'কে অঙ্কিত করিতে চাহিয়াছেন, সে মূর্তি বারে বারে ম্লান হইয়া গিয়াছে। তারপর হিন্দু-মুসলমানের মিলন-প্রচেষ্টার জয়গান করিতে গিয়া নাট্যকার যাহা করিয়াছেন, তাহা অনৈতিহাসিক এবং অনাটকীয়। মোগল অন্তঃপুরের প্রাচীর ফুঁড়িয়া ভীম সিংহ কিভাবে বাহির হইল, তাহার বিচার করিতে না করিতেই দেখি, সম্রাট 'আলমগীর' নিজের বাদশাহী মুকুট তাহার মস্তকে পরাইয়া দিতেছেন। কিন্তু কেন দিতেছেন, বাদশাহ তাহার কোনো ব্যাখ্যা দেন নাই। এই আকস্মিকতার ফাঁক ভর্তি করিবার কোন আয়োজন নাট্যকার আগে হইতে করেন নাই। এই চমকসৃষ্টির প্রচেষ্টা সমস্ত পরিস্থিতির সঙ্গে আলমগীরের চরিত্রের স্বাভাবিকতা নষ্ট করিয়াছে। তারপর আলমগীরের

উক্তিতে যেখানে নাটকের সমাপ্তি হয়, সেখানে হিন্দু-মুসলমানের যে মিলনের গান করা হইয়াছে, সমস্ত নাটকের পটভূমিকায় তাহা নিতান্ত বেসুরা। কেন না রাণার বিরুদ্ধে অভিযানের আয়োজন সম্রাট করিয়াছিলেন সমস্ত হিন্দুশক্তিকে দলিয়া পিষিয়া তাহার উপর মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিতে। বারে বারে আমরা এই কথাই শুনিয়াছি। কাফের-বিদ্বেষী ধর্মান্ধ সম্রাটের মুখে হিন্দু-মুসলমানের এই মিলনের বাণী শুধু অনৈতিহাসিকই নয়,—অনাটকীয়। তাহা ছাড়া নাট্যকার সেখানে আলমগীরের মাধ্যমে অতি উৎকট ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। 'আলমগীর' যখন বলেন, "হে কবি, বছর যাক্, যুগ যাক্, বহু শতাব্দী চলে যাক্, শতাব্দীর পারে, একদিন তোমার তুলিকামুখে আলমগীরের এ মিলন-অভিলাষ—হিন্দু-মুসলমানের মিলন-অভিলাষ মুখর হোক।" তখন পরিষ্কার বুঝা যায়, এ বাণী সম্রাট আলমগীরের নয়, আধুনিক বঙ্গের স্বদেশ-ভক্ত নাট্যকারের। কিন্তু এই আলমগীরের মনোবিকলনে নাট্যকার মাঝে মাঝে যে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, সংলাপের কৌশলী বিন্যাসের যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। কূটকৌশলী 'বাদশাহ' আলমগীরের পরিচয় পাই যখন তিনি বলেন—"পরস্পরের প্রতি দ্বেষ ঈর্ষ্যায় বুদ্ধিহীন রাজপুত, তোমরা এতকাল মিলতে পারনি। তোমার কথায় বুঝলাম, এই জিজিয়া কর অবলম্বনে তোমাদের ভিতরে মিলবার প্রবৃত্তি জেগেছে। আমিও ত সেটা জাগাতে চাই। দিল্লীর ময়ূরাসন ঘিরে কতকগুলো অস্থিরচিত্ত সামন্তকে আমি আর বস্‌তে দিতে চাই না। সমস্ত রাজপুত রাজাগুলোকে যদি সাধারণ প্রজার পর্যায়ে ফেলতে পারি, তবেই আমার 'আলমগীর' উপাধি সার্থক।" আওরঙ্গজেবের মুখ আর মন যে এক নয়, (মুখে তাঁহার ধর্মের বুলি আর অন্তরে সাম্রাজ্যলিপ্সা), মনের কপটতাকে যে তিনি ভাষার আবরণে সুন্দরভাবে ঢাকিয়া ফেলিতে পারেন, তাহাও নাট্যকার সার্থক ভাবে দেখাইয়াছেন,—

> "ভুল বুঝছ দিলির খাঁ! আক্রোশ আমার কারও উপর নেই। ভালবাসা—যে কথাটার সাধারণ অর্থ মমতা—তাও কারও উপর নেই! ভালবাসি একমাত্র ধর্ম! ফকিরী নিতে গিয়ে সেই ধর্মের জন্য আমি বাদশাহী নিয়েছি। ধর্মের গায়ে আঘাত লাগ্‌বার সম্ভাবনা হয়েছিল, তাই অমন প্রজারঞ্জন পিতাকে সিংহাসনচ্যুত হ'তে হয়েছে। অমন লোকপ্রিয় দারাকে অকালে দুনিয়া ছাড়তে হয়েছে। সুজা

> কোন্ দূর আরাকানে বর্বর কাফেরের হাতে প্রাণ দিয়েছে। এমন কি আমার জ্যেষ্ঠ ও প্রিয়তম পুত্র মহম্মদ, গোয়ালিয়রের দুর্গে তার যৌবনস্বাস্থ্য সমাধিস্থ ক'রেছে। আর ঐ বিশ্বাসঘাতক বিধর্মী—দিলির, সেই উদ্ধত রাজপুতের চিহ্ন রাখতে ধর্ম আমাকে উপদেশ দেয় না।"

আমরা পরিষ্কার বুঝিতে পারি, নিজের কৃত রাশি রাশি অন্যায়কে ধর্মের ধুয়া তুলিয়া সমর্থন করায় যে আওরঙ্গজেব সিদ্ধহস্ত, এ তাঁহারই বাণী। কিন্তু এই কপট তথাকথিত ধর্মাশ্রয়ী সম্রাট যশোবন্ত সিংহের পর তাঁহার ক্রোধের কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া যে মর্মস্পর্শী ভাষায় সুজার ও তাঁহার স্ত্রী পিয়ারীবানুর শোচনীয় মৃত্যুর বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে মুহূর্তের জন্যও কূটনীতিক আওরঙ্গজেবকে ভুলাইয়া দেয়। আমাদের চক্ষের সামনে সম্রাটের এক হৃদয়বান মহানুভব রূপ প্রকাশ করে। যশোবন্ত সিংহের বিশ্বাসঘাতকতা যে মোগল-বংশগরিমা কতখানি ক্ষুণ্ণ করিয়াছে তাহা আমরা জানিতে পাই। ইতিহাস এই ব্যাখ্যা স্বীকার করিবে কি না জানি না। পিতৃনির্যাতনকারী, নৃশংস ভ্রাতৃহন্তা আওরঙ্গজেব সুজাকে ক্ষমা করিতেন কিনা তাহা লইয়া নিশ্চয়ই বিচারের অবকাশ আছে। কিন্তু এই অংশের ভাষা যে নিতান্ত মর্মস্পর্শী তাহা স্বীকার করিতেই হইবে,—

> "দুরাত্মা যদি সেদিন আমাকে সামান্যমাত্র সাহায্য করতো তা'হলেও সুজাকে আমি ধরতে পারতুম।......মূর্খ, দাম্ভিক, মাতাল, কিন্তু উদার সুজা। একবার তাকে ধ'রতে পারলে, মিষ্ট ব্যবহারে সহজেই তাকে আপনার করে নিতে পারতুম।......তার পত্নী পিয়ারীবানু—নারীরত্ন। মোগল-হারেমে তার মত মহিমময়ী রমণী আমি দেখিনি। আজও পর্যন্ত তার স্মরণে আমার চিরনীরস চক্ষুও সজল হয়। মনে কর দিলির খাঁ, দেহের পবিত্রতা রক্ষা ক'রতে আরাকানেই সেই বর্বর রাজার সম্মুখে তার ভীষণ আত্মহত্যা। রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অনেক ভীষণ মৃত্যু দেখেছি। কিন্তু দেওয়ালে বারংবার মাথার আঘাতে নিজের অনুপম রূপরাশিকে ছারখার করে মরা—এরূপ মৃত্যুর কথা—উঃ—......তার প্রিয়তমা কন্যা—আমার ভাবী পুত্রবধূ—হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ সম্রাজ্ঞী, তৈমুর-বংশের কোহিনুর—তার পিতৃঘাতী মাতৃঘাতী শয়তানের অন্তঃপুরে—উঃ! দিলির খাঁ!

সমস্ত মারোয়ারকে লোকশূন্য ক'রবার সাহায্য না ক'রে, সেই দুরাত্মার বংশের জন্য তুমি ওকালতি করতে এসেছ!"

ইহা হইতে মর্মস্পর্শী জ্বালাময়ী ভাষা আর কি হইতে পারে? সুকৌশলী বাক্‌বিন্যাস-চাতুর্যে কি করিয়া যে স্থায়িভাবের জাগরণ ঘটাইতে হয়, কি করিয়া নিজের ভাবনাকে ভাষার সাহায্যে অন্যের অন্তরে সম্পূর্ণ প্রবিষ্ট করাইতে হয়, তাহার পরিচয় নাট্যকার এখানে দিয়াছেন। এই বর্ণনার নিকট, বিবেকের আবেদনে, প্রতিবাদের ভাষা মূক হইয়া আসে।

'আলমগীর' চরিত্রের দ্বৈতসত্তার উল্লেখ নাট্যকার করিয়াছেন। ঐতিহাসিক আওরঙ্গজেবের এই দ্বৈতসত্তা কি এবং নাটকেই বা তাহা কি ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে? 'আলমগীর' ধর্মপ্রাণ মুসলমান। মোগল পরিবারে সুরা-নারী-ব্যসনের যে কদর্য প্রবাহ বহিয়াছিল, ধর্মপ্রাণ, সংযত সম্রাট তাহা হইতে শতহস্ত দূরে রহিয়াছিলেন। 'উদিপুরী' সত্যই বলিয়াছেন আওরঙ্গজেবের অতি বড় শত্রুও তাঁহাকে চরিত্রহীন বলিতে পারে না। কিন্তু ঋষিজীবনের সঙ্গে ধূর্ততা, নৃশংসতা এবং মানবজাতির পর অবিশ্বাস পাশাপাশি রহিয়াছে। 'মানুষ' আওরঙ্গজেবের সঙ্গে সঙ্গে আর একটা 'অমানুষ' তাঁহাকে অধিকার করিয়া থাকে। ষড়যন্ত্র যখন তিনি করেন, তখন তাঁহার মুখে বন্ধুর হাসি। হত্যা করেন তিনি ভালবাসার অভিনয়ে। শুধু যে তিনি হিন্দুর প্রতি নির্যাতনকে ইস্‌লামের জিগির তুলিয়া ধর্মকার্য বলিয়া ব্যাখ্যা করেন তাহাই নহে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভ্রাতৃহত্যাকে তিনি কূট-কৌশলী আচরণ ও বাক্যবিন্যাসে ঢাকিয়া ফেলেন। দারার ছিন্ন-মুণ্ডের উপর কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করিতে তাঁহার আটকায় না। সাম্রাজ্যের জন্য নৃশংস ভ্রাতৃহত্যা ইস্‌লামও কি সমর্থন করে? সুতরাং সম্রাটের দ্বৈতসত্তা ঐতিহাসিক।

আওরঙ্গজেবের নিজের চরিত্রে ও উদিপুরীর সংলাপে ঐতিহাসিক আলমগীরের এই রূপ প্রত্যক্ষ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। নাটকের বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিলেই আমরা তাহা বুঝিতে পারিব।

নাটকের আরম্ভে যে স্থানে বসিয়া যে ব্যক্তিদ্বয়ের আলাপ হইতেছে তাহার সঙ্গতি সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিবার অবকাশ অবশ্যই আছে। বাঁদীগণের গীত শেষ হইলে প্রবেশ করিতেছে 'উদিপুরী'-বেগম ও 'শ্যাম সিংহ'। স্থান দিল্লী-প্রাসাদ—রঙমহল। আওরঙ্গজেবের অন্তঃপুরে তাঁহারই স্ত্রীর সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করিতেছেন একজন হিন্দু সামন্ত—রাজপুত। সুতরাং

স্থান ও পাত্রের ঔচিত্য লইয়া প্রশ্ন অবশ্যই তোলা যাইতে পারে। এই অসঙ্গতিটুকু বাদ দিলে আমরা দেখিব, 'উদিপুরী' ও শ্যাম সিংহের আলাপ গোটা নাটকখানির ভূমিকা। 'কাশ্মীরী বাঈ'-এর ঈর্ষ্যা 'উদিপুরী'কে উত্তেজিত করিয়াছে। 'রূপকুমারী' যে তাহার চেয়েও সুন্দরী এই সত্যটুকু সে সহ্য করিতে চাহে না। ওদিকে ভাবী সপত্নী-বিদ্বেষ তাহাকে সতর্ক করে। তাই কথায় কথায় 'শ্যাম সিংহ'কে উত্তেজিত করিয়া সে তাহাকে ভাগিনেয়ীর সম্মান রক্ষার্থে রাজপুতের ন্যায় ব্যবহার করিতে বলে। নাটকের আরম্ভেই একটা বিরোধের আভাস পাইলাম। প্রবলপ্রতাপ সম্রাট নিজের খেয়াল চরিতার্থের পথে সর্বপ্রথম বাধা পাইবেন তাঁহার অন্তঃপুরে। সুতরাং 'রূপকুমারী'কে লইয়া যে বিবাদ শুরু হইল তাহা শুধু বহিরঙ্গ রাজনৈতিক বিবাদ নয়,—তাহা 'উদিপুরী'-'আওরঙ্গজেবে'র শক্তি-সাধনার অন্তর্বিরোধও বটে। এখন হইতে তাই বাহিরের ঘটনার অবলম্বনে চলে রাজদম্পতীর জয়পরাজয়ের খেলা। এই খেলার চালে হঠাৎ কোথা হইতে 'রাজ সিংহ' আসিয়া জুটিয়া গিয়াছেন। অবশ্য ইতিহাস বলে, আওরঙ্গজেবের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য 'রূপকুমারী' রাজ সিংহের নিকট পত্র প্রেরণ করেন এবং রাণা পত্র পাইয়া পথিমধ্যে মোগল সৈন্যের নিকট হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করেন। 'উদিপুরী' বেগম-প্রসঙ্গ সেখানে নাই। আওরঙ্গজেবের প্রবর্তিত জিজিয়া করের প্রতিবাদ করাই আওরঙ্গজেবের মেবার আক্রমণের মুখ্য কারণ বটে, 'রূপকুমারী'-হরণও অন্যতম। কিন্তু নাট্যকার 'উদিপুরী' নামের গৌরবে মহিমান্বিতা 'উদিপুরী'-বেগমকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া যেন তাহারই প্রয়োজনার্থে 'রাজ সিংহ'-কাহিনীকে 'আওরঙ্গজেব-উদিপুরী'-কাহিনীর সঙ্গে জড়িত করিয়াছেন। তাই নাটকে দেখি, 'রাজ সিংহ' 'রূপকুমারী'কে যে রক্ষা করিয়াছেন 'উদিপুরী'র নিকট রাজ সিংহের পত্রে সে সংবাদ আসে। আওরঙ্গজেবের প্রতিটি পদক্ষেপের উদ্দেশ্য 'উদিপুরী'র নিকট ধরা পড়ে। তাই বারে বারে সম্রাট পরাজিত হন। এই নাটকের নায়ক 'আওরঙ্গজেব' এবং নায়িকা 'উদিপুরী'। 'রূপকুমারী'-চরিত্র নাটকে অস্ফুট এবং ম্লান। নাটকে তাঁহার চরিত্র-বিকাশের যে সুযোগটুকু ছিল, 'উদিপুরী'র দিকে অতিমাত্র দৃষ্টি দিতে গিয়া নাট্যকার তাহা উপেক্ষা করিয়াছেন। যে তেজস্বিনী নারী অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী হইয়াও বংশ-মর্যাদা এবং ধর্মরক্ষার জন্য বৃদ্ধ রাজ সিংহের গলায় মালা দিবার প্রস্তাব

করিলেন, সে শক্তিমতীর চরিত্রের কোন বিকাশ নাটকে নাই। কাব্যমোহ এবং চমক-সৃষ্টির প্রয়াসে নাট্যকার চরিত্রটিকে অসঙ্গত ও অবাস্তব করিয়াছেন। 'বীরাবাঈ'-এর গৃহত্যাগ এবং 'বৃদ্ধশিশু' ভীম সিংহকে স্তন্য পান করানোর ব্যাপারে প্রথমাংশ উপকথার মতো, দ্বিতীয় অংশ অবাস্তব, কেন না বীরাবাঈ সদ্যপ্রসূতা নহেন। আবার তিনি যে কোন্ উদ্দেশ্যে রূপনগরের দিকে পুত্রকে লইয়া ছুটিয়া চলিলেন, জানি না। আকস্মিকভাবে তাঁহার সঙ্গে রূপকুমারীর পরিচয়। আকস্মিকভাবে তাঁহাকে রাজ সিংহের নিবেদিতা করিয়া তোলা। ইহার মধ্যে না আছে ইতিহাস, না আছে নাট্যগুণ। বরং এই আকস্মিকতা ইতিহাসের গুরুত্ব এবং 'রূপকুমারী' চরিত্রের মহত্ত্ব খর্ব করিয়াছে। তারপর হঠাৎ মোগলশিবিরে 'রূপকুমারী'র আকস্মিক আগমন অসম্ভব, অবাস্তব, অনৈতিহাসিক। সুতরাং দেখা যায়, চরিত্রচিত্রণের স্বাভাবিকতায়, মনোবিকলনের দক্ষতায় 'উদিপুরী' চরিত্র এই নাটকের শ্রেষ্ঠ এবং একতম আকর্ষণ। আর এই মহিমময়ী রমণী সম্রাট আলমগীরকেও পরাজিত করিয়াছেন বলিয়া নাটকের নাম 'উদিপুরী' হইলে আরো সঙ্গত ছাড়া অসঙ্গত হইত না।

যাহা হউক, নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্য হইতে আমরা আলমগীরের দর্শন পাই। নাটকে তাঁহার সর্বপ্রথম স্বগতোক্তিটিই 'আলমগীর'-চরিত্রের পরিচায়ক। 'রূপকুমারী'র অনিন্দ্যসৌন্দর্যের নিকট 'উদিপুরী'র মস্তক অবনত করানোর ইচ্ছা আলমগীরের অন্তরে রহিয়াছে। পলিতকেশ, গলিতদন্ত বৃদ্ধের মনে আবার এই তরুণীর যৌবনসুধা পানের উন্মত্ত বাসনাও জাগিয়াছে। কিন্তু অন্তরে তীব্র আন্দোলন চলিলেও বাহিরে তিনি তাহা প্রকাশ করেন না, অতি যত্নে তিনি নিজের বাসনাকে গোপন রাখেন। ঐখানে আলমগীরের দ্বৈতসত্তা। তাই শ্যাম সিংহের সঙ্গে তিনি কপট আলাপ শুরু করিয়াছেন। তিনি শ্যাম সিংহকে আদেশ করেন, যোগ্য পাত্র দেখিয়া ভাগিনেয়ীর বিবাহ দিতে। মনে করিবার কারণ নাই যে ইহা সম্রাটের উদারতা। কেন না শ্যাম সিংহ চলিয়া গেলে তিনি যে স্বগতোক্তি করেন, তাহাতে পরিষ্কার বুঝা যায়, রাজপুত জাতির মধ্যে এই বিবাহ লইয়া যাহাতে আত্মকলহ শুরু হয়, তাহাই এই ধুরন্ধর রাজনীতিকের কাম্য। তাঁহার অন্তরের বাসনা,—হিন্দুবিদ্বেষ,—প্রকাশ পায় দিলির খাঁর সঙ্গে আলাপে। কিন্তু কূটকৌশলী বাক্‌বিন্যাসে এই বিদ্বেষকেও তিনি একটা

কর্তব্যের আবরণ দেন। 'যশোবন্ত সিংহ' সম্বন্ধে, এই দৃশ্যে তাঁহার মন্তব্যের আলোচনা পূর্বেই করিয়াছি। কিন্তু এই দ্বৈতসত্তার সঙ্গতি নাট্যকার সর্বত্র রক্ষা করিতে পারেন নাই। এই দৃশ্যেই তাহার পরিচয় রহিয়াছে। 'দিলির খাঁ'র সম্মুখে আত্মহারা সম্রাট স্বীকার করিতেছেন তাঁহার স্মৃতিপটে একটি মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। যদিও 'দিলির' এই উক্তির তাৎপর্য বুঝে নাই, তবুও আলমগীরের এতখানি আত্মপ্রকাশ সম্ভব নহে। তারপর এই প্রসঙ্গে কি করিয়া রাজ সিংহের কথা তাঁহার মনে পড়িল, কেন যে তিনি বলেন, নিজে রাজ সিংহের সঙ্গে 'রূপকুমারী'র বিবাহের ঘটকালি করিয়া তিনি রাজ সিংহের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতেন তাহা বুঝিবার মতো কোনো প্রস্তুতি এতক্ষণ পর্যন্ত নাটকে পাই নাই। সুতরাং এই উক্তি আকস্মিক এবং অসার্থক।

দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য। 'উদিপুরী' যে 'রূপকুমারী'র রূপ-পরীক্ষার জন্য তাঁহার পুত্র 'কামবক্স্'কে রূপনগরে পাঠাইয়াছেন, 'আওরঙ্গজেব' তাহা জানিয়াছেন; এবং জানিয়াছেন বলিয়াই তিনি 'উদিপুরী'কে শাস্তি দিতে আসিয়াছেন। 'আওরঙ্গজেব' জানেন, জাতিগর্বাভিমানী রাজপুতবীরাঙ্গনা 'রূপকুমারী'র রূপ দেখিয়া ভুলিবে না। আলমগীর-পুত্র অপমান পাইয়া ফিরিয়া আসিবেন। তাই এই অপমানের মূল কারণ 'উদিপুরী'-বেগমকে তিনি বন্দী করিবেন. কিন্তু সম্রাটের বাক্যে ও কার্যে কী কপটতা। গোয়ালিয়র দুর্গে যাহাকে চিরনির্বাসিত করিতে আসিয়াছেন, তাহাকে 'প্রিয়তমে' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। কিন্তু 'উদিপুরী' আলমগীরের যোগ্যা পত্নী। 'উদিপুরী' জানেন সম্রাটের উদ্দেশ্য কি। তাঁহার ভালবাসার কপটতা বেগম জীবন দিয়া আস্বাদন করিয়াছেন কিন্তু আলমগীরের ঘৃণার বিরুদ্ধে তিনিও যে তীব্র ঘৃণা পোষণ করেন সম্রাট তাহা আজ জানিলেন। সম্রাটের সঙ্কল্প কেউ জানে না বলিয়া তাঁহার নিজের যে ধারণা ছিল, তাহা নষ্ট হইল। সম্রাট দেখিলেন তিনি পরাজিত। সুতরাং এখন হইতে 'রূপকুমারী'কে আনয়নের জন্য সম্রাট যে চেষ্টা করিবেন, তাহা রূপতৃষ্ণার নহে, 'কাশ্মীরীবাঈ'কে পরাজিত করার জন্য। সুতরাং নাটকের যে ত্রিধাবিভক্ত দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার সত্যকার সূচনা হইল। রাজপুত নারীর সম্মান, 'উদিপুরী'র বিজয়গর্ব ও স্বাধিকার রক্ষার প্রচেষ্টা এবং জিজিয়া করের প্রবর্তনে বিক্ষুব্ধ হিন্দুদের জাগরণ, এই তিন কারণে তিন দিক দিয়া নাটকের ঘটনার দ্বন্দ্ব শুরু হইল।

চতুর্থ অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য। 'আওরঙ্গজেব' ও 'উদিপুরী'। আওরঙ্গজেবের ধারণা এবাদৎ খাঁ যখন রূপকুমারীকে লইয়া রূপনগর ত্যাগ করিয়াছে, তখন অবশ্যই তিনি উদিপুরীর দর্পচূর্ণ করিতে পারিবেন। কিন্তু 'উদিপুরী' জানেন, 'রূপকুমারী' আসিবে না। 'আলমগীর' তাহার বাক্যে ও আচরণে উত্তেজিত হইতেছেন। তিনি বলিলেন, 'তোমায় ক্ষিপ্তা মনে করে এখনি তোমায় বন্দিনী করতে হবে।' কথার উত্তরে 'উদিপুরী' যাহা বলেন তাহার মধ্য দিয়া বিশ্ববিজয়ী সম্রাটের করুণ অসহায়ত্ব ও অশান্তির ছবি ফুটিয়া ওঠে। সম্রাট জানেন না, নিদ্রিত সম্রাটের অবচেতন মনে কী দারুণ নরক-যন্ত্রণা লুক্কায়িত। তাই জলাতঙ্ক রোগীর সহিত 'উদিপুরী' তাঁহার তুলনা করিতেই তিনি চমকিতবৎ 'উদিপুরী'র মুখের দিকে তাকাইয়া থাকেন। হয়তো স্বপ্নের ক্ষীণ স্মৃতির লেশমাত্র সম্রাটের সম্বল। হয়তো তিনি তাহার কোনো ব্যাখ্যা খুঁজিয়া পান না। 'উদিপুরী'র এই আকস্মিক উক্তিতে তাঁহার দৃষ্টি খানিকটা সেই স্বপ্ন-বিশ্লেষণের দিকে ছুটিয়া যায়। কিন্তু 'উদিপুরী'র কথা তিনি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। মনে করিতেছেন, 'সম্রাটের মন নরম করিবার ইহা ছলনা মাত্র।' 'আওরঙ্গজেব' ছলনা সহ্য করেন না। তাই তিনি বলেন, 'তুমি কার সম্মুখে এ সব কথা বল্‌ছ, তা জান?' অসীমসাহসিকা 'উদিপুরী' তীব্র ব্যঙ্গের ভিতর দিয়া উত্তর দেয়,—"উদিপুরীর কৃপাপাত্র, দুনিয়ার মালিক, প্রবল শক্তিধর—আওরঙ্গজেবের সম্মুখে।" এই উদ্ধত আচরণ আলমগীরের সহ্য হইবার নহে। তিনি কাশ্মীরী বেগমকে গোয়ালিয়রে পাঠাইবার জন্য মন্‌সবদার তলব করিলেন। মুহূর্তটি জটিল। মৃত্যু সম্মুখে দেখিয়াও 'উদিপুরী'-বেগম আত্মসংবরণ করিতেছেন না। ইহার মনস্তত্ব কি? 'উদিপুরী'র কথায় যাহা প্রকাশ পাইল, তাহা এই, 'উদিপুরী'র নির্বাণনের সঙ্গে সঙ্গে আলমগীরেরও জীবন যে শেষ হইয়া আসিবে। স্বপ্নের তাড়না সহ্য করিতে না পারিয়া 'আলমগীর' যখন আত্মহত্যা করার চেষ্টা করিবেন তখন 'উদিপুরী' ভিন্ন কে তাঁহাকে রক্ষা করিবে? সুতরাং 'উদিপুরী'র সাহস, নিজের জীবন রক্ষার জন্য 'আওরঙ্গজেব' 'উদিপুরী'কে রক্ষা করিবেন। সম্রাট বিস্মিত হইলেন। 'উদিপুরী'কে শাস্তি দিবার বাসনা তিনি বিসর্জন দিলেন। সম্রাট এই রহস্যের শেষ জানিবার জন্য ব্যস্ত। অপরাজেয়, ব্যক্তিত্বাভিমানী 'আলমগীর' আজ শিশুর মতো নিঃসহায় হইতেছেন। বিস্মিত সম্রাট 'তয়বরখাঁ'র নিকটও হাতজোড় করিয়া

তাঁহাকে মুহূর্তের জন্ত সরিয়া যাইতে অনুরোধ করিতেছেন। চিরদিনের আদেশকারী আওরঙ্গজেবের করজোড়ে অনুনয়! সম্রাট শেষ পর্যন্ত প্রহরীদের নিকট হইতে সংবাদ লইয়া জানিলেন, 'উদিপুরী'র বর্ণনা এতটুকুও মিথ্যা নয়। কৃতজ্ঞ সম্রাটের মুখ হইতে মর্মের কথা বাহির হইল, "প্রিয়তমে!" এইখানে 'উদিপুরী'র বিজয়। কপটতা ত্যাগ করিয়া এই প্রথম তিনি নারীকে প্রাণ খুলিয়া ভালবাসা জানাইলেন। কিন্তু ইহা যে আলমগীরের মৃত্যু! আলমগীরের মনের কথা বিশ্বে অন্ততঃ একজনও জানিতে পারিয়াছে।

পঞ্চম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য। রাণা 'রাজ সিংহ' জিজিয়া করের প্রতিবাদে যে পত্র দিয়াছেন, তাহাতে 'আওরঙ্গজেব' আহত হইয়াছেন। তিনি চান রাণার গর্ব চূর্ণ করিতে। তাই তিনি পুত্রদের ডাকিয়া আনাইলেন। 'উদিপুরী' জানেন, যে পুত্র সর্বপ্রথম সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে, সম্রাট তাহাকেই সেনাপতি পদ দিবেন। আসিল 'আকবর'। সম্রাট তাহা আশা করেন নাই। তিনি বিস্মিত হইলেন। তবুও সঙ্কল্প রক্ষা করিলেন। 'আকবর' হইল সেনাপতি। আওরঙ্গজেবের মনে সন্দেহ রহিয়াছে রাণাকে পরাজিত করা সম্ভব কিনা। অথচ রাণাকে পরাজিত করিতে না পারিলে ময়ূর-সিংহাসন যে ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে তাহা তিনি জানেন। তাঁহাকে যদি 'আকবর' পরাজিত করিতে পারে, তবে মোগল সাম্রাজ্য নিষ্কণ্টক হয়। সম্রাটের জীবদ্দশায় আর মোগল সাম্রাজ্যের পতন হয় না। তাই বিজয়ী শক্তিমান পুত্রকে তিনি সিংহাসন দান করিয়া যাইবেন ইহাই হয়তো বলিতে যাইতেছিলেন। এমন সময় 'উদিপুরী'র আকস্মিক আগমন হইল। তাঁহার আগমন ও উক্তি আমরা আশা করি নাই। কিন্তু কেন এই উক্তি? কেন এই আকস্মিক আগমন? ভ্রাতৃঘাতী, পিতৃনির্যাতনকারী সম্রাটের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করাই এই আগমনের উদ্দেশ্য নহে। স্বামীর কল্যাণাকাঙ্ক্ষিণী প্রেমময়ী স্ত্রীর অভিমান ভর্ৎসনার আকারে প্রকাশ পায়। কূটনীতিবিশারদ্ আলমগীরের এখন বিচারেও ভুল হইতেছে। নিজের ভুলে এক অপদার্থ পুত্রকে সেনাপতি করিয়া 'আলমগীর' যে নিজের সাম্রাজ্য এবং জীবন উভয়ই সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিতেছেন, তাহা 'উদিপুরী' সহ্য করিতে পারিতেছে না। যৌবনের সেই শক্তি, সেই আত্মবিশ্বাস আওরঙ্গজেবের আর নাই। তিনি আজ সেনাবাহিনী নিজে পরিচালনার ভার না লইয়া এক অকর্মণ্য পুত্রের হাতে ছাড়িয়া দিতেছেন। 'আলমগীর' জানিলেন, এই সাম্রাজ্য ধ্বংসের ভয়েই

'কামবক্‌স্' সবার আগে আগ্রা পৌঁছিলেও 'উদিপুরী' তাহাকে সম্রাটের সহিত দেখা করিতে দেয় নাই। 'উদিপুরী'র অন্তর ও বাহিরের সৌন্দর্যে 'আলমগীর' আজ মুগ্ধ। নারীত্বের পরিপূর্ণ মহিমার নিকট 'আলমগীর' আজ পরাজিত। কিন্তু সম্মান! এই সম্মান তাহাকে উদয়পুর আক্রমণ করিতে উদ্দীপ্ত করিল।

পঞ্চম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য। আওরঙ্গজেবের সম্মান রক্ষা হইল না। রাণা রাজ সিংহের পত্র 'উদিপুরী'র মারফৎ তিনি পাইলেন। উত্তেজিত 'আওরঙ্গজেব' এইবার 'উদিপুরী'কে বন্দী করিবার আদেশ দিলেন। 'উদিপুরী' ও 'আওরঙ্গজেব'-চরিত্র এই পর্যন্ত ক্রমবিকাশের স্বাভাবিকতা রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু নাট্যকার এই দৃশ্যে জয় সিংহ, ভীম সিংহকে আনাইয়া নাট্যকৌশল একেবারে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। ইহার পর আর তাঁহাদের চরিত্রের বিকাশ নাই।

'আওরঙ্গজেব'-'উদিপুরী' কাহিনী নাটকের প্রধান আকর্ষণ। চির-বিজয়ী আলমগীরের দেহে, মনে, কর্মে, ঘরে-বাহিরে শোচনীয় পরাজয় প্রতিষ্ঠাই এই নাটকের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। নাটকের 'আলমগীর' নাম যদি সার্থক বিবেচনা করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, 'আলমগীর' ট্রাজেডী। ক্ষমতা, ঐশ্বর্য, বুদ্ধি এবং ব্যক্তিত্বের অধিকারী আওরঙ্গজেব, জরা, মনোবিকার, আত্মবিশ্বাসহীনতা এবং স্ত্রী-বুদ্ধির নিকট এমন শোচনীয় ভাবে পরাজিত আর কখনও হন নাই। শক্তির উন্মাদনায়, বুদ্ধির কূটত্বের ভরসায় তিনি হৃদয়ের শাশ্বত সত্যকে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছেন। চির-সহিষ্ণুতাময়ী, অবহেলিতা, প্রেমিকা নারী তাঁহাকে চোখে আঙুল দিয়া প্রেমের মহিমা বুঝাইয়া দিয়াছে, শুষ্ক কাষ্ঠের হৃদয়ে জাগাইয়াছে প্রেম, আনিয়াছে সমবেদনা ও পরনির্ভরতা। সুতরাং মহনীয় ব্যক্তিত্বের শোচনীয় পরিণাম দেখানো যদি ট্রাজেডীর মূল উদ্দেশ্য হয়, 'আওরঙ্গজেব' 'ট্রাজেডী'র 'নায়ক'। তিনি বারে বারে আত্ম-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইতেছেন। নিষ্ঠুর নিয়তি তাঁহাকে বৃদ্ধ ও দুর্বলস্নায়ু করিয়াছে। আর তাই এক শক্তিময়ী বুদ্ধিমতী নারী তাঁহাকে পরাজিত করিতেছে। সুতরাং দৈবী এবং মানুষী উভয় প্রকার শক্তি আজ তাঁহার বিরুদ্ধে। ইহাই নাটকের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। শুধু দেশ-প্রেমের মোহে নাট্যকার তাঁহাকে দিয়া যে মিলন-বাণী উচ্চারণ করাইয়াছেন, তাহা নাটকের মূল প্রেরণা নয়, নিতান্ত অনাটকীয় প্রচার মাত্র। ট্রাজেডীর কারুণ্যকে তাহা অভিভূত করিতে পারে না।

অন্যদিকে 'উদিপুরী'—তিনি বিজয়িনী হইয়াও পরাজিতা। কারণ যৌবনের সেই শক্তিমান বিরাট পুরুষের জীর্ণ কঙ্কালকে মাতার ন্যায় স্নেহে তিনি রক্ষা করিতেছেন। তাই তাঁহার বিজয়ের আনন্দ আপ্লুত হয় সমবেদনার অশ্রুজলে। নাটকে তিনি গর্বিতা, বিজয়িনীই নন, সমব্যথিতা, কল্যাণী স্ত্রী। তাই নিজের বিজয় তিনি স্বামীর পরাজয়ে বিসর্জন দেন। তিনি জয়ী হইয়াও 'জয়' শব্দ মুখে উচ্চারণ করিতে পারেন না। সুতরাং আওরঙ্গজেবের ট্রাজেডীকে তিনি আরো গভীর করিয়াছেন মাত্র।

এইবার রাণা-পরিবার ও 'রূপকুমারী'-প্রসঙ্গের আলোচনা। আগেই বলিয়াছি, 'রূপকুমারী'-প্রসঙ্গ নিতান্ত আকস্মিক, অযাচিত এবং অনাটকীয় ভাবে রাণার নিকট আসিয়া পড়িয়াছে। নাটকে ইহার কোনো নিজস্ব আকর্ষণ নাই। তারপর রাণা রাজ সিংহের পারিবারিক দ্বন্দ্ব। ইহা নাটকের অনেকখানি অংশ জুড়িয়া রহিয়াছে। ঐতিহাসিক নাটকে তীব্র রোমান্টিকতার প্রবেশ যদি কোথাও হইয়া থাকে, তবে তাহা এখানে। অবশ্য রাজপুত জাতির ইতিহাসে এই রোমান্টিকতার অবকাশ যথেষ্টই রহিয়াছে। কথায় কথায় অস্ত্রের ব্যবহার, কথায় কথায় প্রাণঘাতী প্রতিজ্ঞা এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া যাওয়া রাজপুত জাতির বৈশিষ্ট্য। রাজপুত প্রাণ দেয়, সম্মান বিসর্জন দেয় না। রাজ সিংহের স্ত্রৈণত্ব, ভীম সিংহের জ্যেষ্ঠত্বের অভিমান এবং তাহা হইতে উদ্ভূত ভ্রাতৃকলহ, সেই কলহের সূত্র ধরিয়া ভীম সিংহের চিরদিনের জন্য মেবার-ত্যাগ সকলই সম্ভব হইতে পারে। এই ঘটনা যদি সমস্ত পৌংখানুপুঙ্খ্যে ইতিহাসে নাও ঘটিয়া থাকে, তবুও ইহা রাজপুত ইতিহাসের ঐতিহ্যের ধারায় সত্য ঘটনা। অর্থাৎ রাজপুত-চরিত্রে উহা ঐভাবে ঘটিতে পারিত। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য, রাজ সিংহের ঘরের কথা কি নাটকের প্রধান অবলম্বন? তাহা নয়। যে ভাবে নাটকের আরম্ভ, তাহাতে দেখি, আওরঙ্গজেব-উদিপুরীর জয়-পরাজয়ের দ্বন্দ্বের অনুগ কাহিনীরূপে আসিয়াছে রাণা রাজ সিংহের কাহিনী। সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের মধুর মহিমায় রাজনীতিক বহির্দ্বন্দ্ব নিতান্ত ম্লান। কিন্তু রাজ সিংহের পারিবারিক দ্বন্দ্ব মুখ্য কাহিনীর পাশাপাশি আদ্যন্ত সমান্তরাল ভাবে চলিয়াছে। কোনো অনিবার্য প্রয়োজনে এবং আভ্যন্তরীণ গতির আবেগে এই গৌণ কাহিনী মুখ্য কাহিনীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশিয়া যাইতে পারে নাই। মুখ্য কাহিনীকে খণ্ডিত করিয়া নিতান্ত অসংলগ্নভাবে চলিয়াছে এই গৌণ

কাহিনী। ওদিকে নিজ পারিবারিক সমস্যায় অভিভূত রাণার নিকট আওরঙ্গজেবের পরোয়ানা যেমন আকস্মিক ভাবে আসে, তেমনি রাণাও আওরঙ্গজেবকে যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখও আমরা পাইয়াছি প্রসঙ্গতঃ, পারিবারিক সমস্যায় বিব্রত বাদশাহের সংলাপের মধ্য দিয়া। সুতরাং দুই শক্তিমান রাজার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব হইল; সেই যুদ্ধের গুরুত্ব, আয়োজনের সংক্ষুব্ধতা সকলই এই দুই যুধ্যমান মহারথীর পারিবারিক দ্বন্দ্বের আড়ালে চাপা পড়িয়াছে। অতএব মুখ্য কাহিনীর অনিবার্য প্রয়োজনে সঙ্ঘাতে বা সংস্পর্শে গৌণ কাহিনী সঙ্ঘটিত হয় নাই। তাই উহা নাটককে অযথা ভারাক্রান্ত করিয়া রাখে। নাট্যকার সুকৌশলী হইলে রাজ সিংহের এই পারিবারিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া অসহায়ত্বের সঙ্গে শক্তিমত্তার অপূর্ব সঙ্ঘটন করিতে পারিতেন। যে-মুহূর্তে তাঁহার স্কন্ধে মোগল-যুদ্ধ চাপিয়া পড়িত, তখনই ভীমসিংহ-জয়সিংহের বিবাদ ঘনাইয়া আসিত। অন্তর ও বাহিরের সঙ্ঘাতে রাণা যেমন একদিকে বিব্রত হইতেন, তেমনি শক্তিমান ভীম সিংহের মধ্যেও জ্যেষ্ঠত্বমর্যাদাজ্ঞান, প্রতারক পিতার প্রতি অভিমান এবং দেশপ্রেমের প্রবল দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইতে পারিত। নাট্যকার সস্তা রোমান্সের মোহে এমন একটি অপূর্ব সুযোগ হারাইয়াছেন।

এইবার এই নাটকের ভাষা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্যে আওরঙ্গজেবের সহিত 'উদিপুরী'র আলাপে ভাষা মাঝে মাঝে দীর্ঘ কাব্যগন্ধী বক্তৃতার পর্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে। নাটকের মধ্যে লিরিকের এই অবাঞ্ছিত প্রয়োগ যদিও সুন্দর নয়, তবুও যে পরিস্থিতিতে 'উদিপুরী'র এই উক্তি, তাহার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করিলে ইহার উচ্চগ্রামের কবিত্ব এবং ক্লান্তিকর দৈর্ঘ্য আমরা অনেকখানি মানিয়া লইতে পারি। ইহা 'উদিপুরী'র সর্বহারা ব্যথিত হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস এবং অভিযোগ! চরিত্রের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ বলিয়া ইহার আংশিক অসংযমকেও আমরা ক্ষমা করিতে পারি। পঞ্চম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে বিজয়িনী 'উদিপুরী' বেগম তাঁহার বুদ্ধিকৌশলে পরাজিত আলমগীরকে ব্যঙ্গ করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। বিজয়ের সেই আনন্দমুহূর্তে 'তহ্বর খাঁ' আসিয়া চরম বিষাদের সংবাদ দিল, সম্রাট 'উদিপুরী'র পুত্রকে বন্দী করিয়া হত্যা করিবেন। মুহূর্তে মায়ের বিজয়ের হাসি ম্লান হইল। 'উদিপুরী' পুত্রের অনিবার্য মৃত্যু রোধ করিতে পারিবেন না তাহা জানেন। আজ তাই এই চরম দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া শাশ্বত মাতৃমূর্তি তাঁহার

স্মৃতিতে ভাসিয়া আসিল। যে মা শৈশবে এই কন্যাকে বিসর্জন দিয়াছিলেন, সেই মায়ের স্নেহ ও বেদনার যুগপৎ দ্বন্দ্ব অন্তরে বহন করিয়া বিজয়িনী 'উদিপুরী' পুত্রকে বলি দিতে প্রস্তুত হইলেন।—

> "হাঁ রে ছেলে, তোরই কি কেবল মা আছে—আমার নেই? মা—মা! শৈশবে তোমাকে দেখিনি—যৌবনে তোমাকে স্মরণেও আনিনি—এখন চোখ বুজে তোমার রূপের আভাস পাচ্ছি। সর্ব শক্তিময়ী, সুস্পষ্ট হও মা—হৃদয়ে এস—বাক্যে এস—চলাচলে এস—ভ্রূভঙ্গে এস।"

একটি মায়ের ব্যথিত বেদনায় যুগ-যুগান্তের বিরহাতুরা জননীর ক্রন্দন গুমরিয়া উঠিয়াছে। পরিস্থিতির সঙ্গতিতে এই ভাষা সমস্ত কাহিনীর উপর বিষাদ-গাম্ভীর্য আনিয়া দেয়।

রাজ সিংহের পারিবারিক দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণে প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে ভাষা আরো কবিত্বপূর্ণ এবং উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। তাহার কারণ, সেখানে ভাষা ঘটনা ও চরিত্রের ধীর-মন্থর, সংযত, অনিবার্য বিকাশের মধ্য দিয়া ফুটিয়া ওঠে নাই। মনের যে দ্বন্দ্ব বাহিরে কার্যে রূপায়িত হইয়াছে, সেই দ্বন্দ্ব-আন্দোলনকে যবনিকার অন্তরালে রাখিয়া কর্মের আকস্মিকতা সৃষ্টি করা হইয়াছে মাত্র। ইহা সত্যই দোষের হইতে পারিত। কিন্তু একদিকে রাজপুত জাতির রহস্যময় চরিত্র, অন্যদিকে রাণার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, এই দুইটি মিলিয়া কর্মকে গৌণ করে, ভাষাকে স্পন্দিত করে। তাই রাজ সিংহের অনুশোচনা ও ভীম সিংহের অভিমানের ভাষা উচ্ছ্বসিত হইয়াও অসুন্দর হয় না। কারণ রাণার উক্তিতে যে কবিত্ব, তাহার ভাব-পটভূমিকায় একদিকে রহিয়াছে স্ত্রৈণ রাণার স্নেহ-দৌর্বল্যের জন্য অনুশোচনা, অন্যদিকে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গকারী চঞ্চলমতি পুত্রের আচরণের জন্য দুঃখ। আর সর্বপ্রকারে যোগ্য ভীম সিংহকে বঞ্চিত করিয়া তিনি যে একটি অপদার্থ পুত্রকে মেবারের উত্তরাধিকারী করিয়া ভুল করিয়াছেন, তাহার জন্য আছে তীব্র অনুতাপ। অপরপক্ষে ক্ষমাশীল ভীম সিংহের অভিমান পিতাকে অভিযুক্ত করিতে গিয়া শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া পড়ে। পরিস্থিতিতে ইংরাজী নাটকের কর্মময়তা নাই সত্য, কিন্তু সংস্কৃত নাটকে রস-নিষ্পত্তির জন্য 'স্থায়িভাবের' যে আন্দোলন থাকে তাহা অতি চমৎকার ভাবে রহিয়াছে। আলম্বন-বিভাব, উদ্দীপন-বিভাব এবং অনুভাবের অপূর্ব সামঞ্জস্যে ভাষা এখানে সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের

কাব্যগুণ প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং, ইহাকে অনুপযোগী ভাষা বলিবার আগে পরিস্থিতির মূল-প্রেরণার অর্থ আমাদিগকে বুঝিতেই হইবে। প্রেরণা যেখানে বিরুদ্ধ ভাবের আকস্মিক প্রকাশপথপ্রাপ্তির অগ্ন্যুদ্গীরণ, ভাষায় সেখানে কবিত্ব থাকিবেই।

এই পর্যন্ত আমরা 'আলমগীর' নাটকের আলোচনা করিয়া নিরস্ত হইব। দেখা গেল 'আলমগীর' নাটকে দোষ ও গুণ উভয়ই রহিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও চরিত্র-চিত্রণে, অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে এই নাটকে নাট্যকার যে দক্ষতা দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহার রচনায় যুগান্তকারী অভিনবত্ব আনিয়া দিয়াছে। তাই এই নাটকে তাহার প্রতিভার চরমোৎকর্ষের পাশাপাশি রহিয়াছে চিরাচরিত দুর্বলতা। একদিকে চরিত্র-বিশ্লেষণে তিনি নরনারীর মনের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া অতুল রহস্যের সন্ধান দিয়াছেন, অন্যদিকে চিরদিনের রোমান্‌স্-প্রীতির পক্ষিরাজে আরোহণ করিয়া অবিশ্বাস্য-প্রায় আকস্মিকতা ও আবেগ-উদ্দামতার কল্পলোকে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ধরণীর মৃত্তিকার স্পর্শ গন্ধ উভয়ই সেখানে দুষ্প্রাপ্য। তাই চরম কবিত্বের পাশাপাশি রহিয়াছে ক্ষমার অযোগ্য ব্যর্থতা।

এইবার আমরা নাট্যকারের 'পৌরাণিক' নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই প্রসঙ্গে একটা কথা জানিয়া রাখা প্রয়োজন। পৌরাণিক নাটকে তখন গিরিশচন্দ্র দক্ষতার চরম শিখরে উঠিয়াছেন। তাঁহার নাটকের ভাব, ভাষা ও চরিত্রসৃষ্টি অন্যান্য নাট্যকারের রচনাকে প্রভাবিত করিতেছে। সুতরাং ক্ষীরোদপ্রসাদের রচনায় যে গিরিশ-প্রভাব থাকিবে তাহা স্বাভাবিক। 'রামানুজ', 'ভীষ্ম' প্রভৃতি নাটকে ক্ষীরোদপ্রসাদের উপর গিরিশচন্দ্রের প্রভাব অতি স্পষ্ট। কিন্তু কোনো কোনো নাটকে তিনি নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য দেখাইয়াছেন। এবং তাহা অতি আশ্চর্য ভাবে। ক্ষীরোদপ্রসাদের পৌরাণিক নাটককে তাই তিনটি বিশেষ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীতে গিরিশ-প্রভাব তত আসে নাই। ক্ষীরোদপ্রসাদের চিরাচরিত রোমান্‌স্-প্রিয়তা পৌরাণিক চরিত্র ও কাহিনীকে এই সকল নাটকে অভিনবত্ব দান করিয়াছে। চরিত্র-বিশ্লেষণের চেয়েও কাহিনী-বিন্যাসের চমৎকারিত্ব এই নাটকগুলির আকর্ষণীয় গুণ। 'সাবিত্রী' এবং 'উলূপী' এই শ্রেণীর প্রতিনিধি। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে 'ভীষ্ম', 'রামানুজ' প্রভৃতি নাটক যেখানে তিনি গিরিশচন্দ্রের ভাব, ভাষা ও চরিত্র-চিত্রণের বৈশিষ্ট্য অনেকখানি স্বীকার করিয়া

লইয়াছেন। তৃতীয়টিকে ঠিক শ্রেণী বলিতে পারি না, উহা একক ; তাঁহার শেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক,—'নর-নারায়ণ'। 'আলমগীরে'র ন্যায় এই নাটকেও তাঁহার প্রতিভা যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং 'উলূপী', 'ভীষ্ম' এবং 'নর-নারায়ণ' এই তিনখানি নাটকের আলোচনা করিলেই পৌরাণিক নাটকে ক্ষীরোদ-প্রতিভার দিগ্‌দর্শন করা হইবে বলিয়া আশা করি।

'উলূপী'—এই নাটকে নাট্যকার পৌরাণিক কাহিনীকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া নিজের ইচ্ছামতো গড়িয়া লইয়াছেন। কাহিনীর মধ্যে কল্পনার আশ্রয় যথেষ্টই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা হইয়াছে একখানি পৌরাণিক রোমান্‌স্‌-নাট্য। নাগকন্যা 'উলূপী' 'অর্জুন' কর্তৃক পরিণীতা এবং ইলাবন্তের জন্মের পর পরিত্যক্তা। প্রোষিত-ভর্তৃকার মর্মবেদনার সুযোগ কবি-নাট্যকার অপূর্বভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার সঙ্গে স্বামী-প্রেম ও পুত্র-স্নেহের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিবার জন্য তিনি ইলাবন্ত প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধি ত্যাগ করিয়াছেন। উলূপীর পুত্র ইলাবন্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেই প্রাণ ত্যাগ করেন। নাট্যকার ইলাবন্তকে হত্যা করাইয়াছেন অশ্বমেধ পর্বে। পুত্রের জীবন বলি দিয়াও যে পতিপ্রাণা স্ত্রী স্বামীকে রক্ষা করিলেন তাহা দেখাইবার জন্যই এই প্রসিদ্ধি ত্যাগ। অন্য দিকে অর্জুনের সঙ্গে সত্যকার যুদ্ধ হইল বভ্রুবাহনের। কিন্তু সমস্ত কাহিনীর রশ্মি দৃঢ়হস্তে ধরিয়া রহিয়াছে উলূপী। ভীষ্মদেবের পতনের পর গঙ্গা অভিশাপ প্রদান করেন যে অর্জুন পুত্রের হস্তে নিহত হইবেন। কিন্তু তিনি যে অনন্ত নরকে গমন করিবেন, একথা মহাভারতে নাই। নাট্যকার উলূপীর কর্তব্যবোধ, স্নেহ ও প্রেমের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব তুলিবার জন্যই এই প্রসিদ্ধি ত্যাগ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধিত্যাগ নাট্যকার করিতে পারেন, যদি পৌরাণিক চরিত্রের উপর আমাদের যে শ্রদ্ধা ও সমবেদনা আছে, তাহা আহত না হয়। এখানে তেমন ভয়ের সম্ভাবনা নাই।

তবুও এই প্রসিদ্ধি ত্যাগ কেন ? পৌরাণিক নাটকের বেলায় দেখিতেছি, মহাভারতের বিশৃঙ্খল, বিপর্যস্ত কাহিনীকে একটা নাট্যশৃঙ্খলায় বাঁধিবার জন্য নাট্যকার মাঝে মাঝে প্রসিদ্ধিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অনেক সময় নির্জলা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন। যে নাট্যে যেটি নায়ক বা নায়িকা, তাহার জীবনকে অতিমাত্র আকর্ষণীয়, দ্বন্দ্ববহুল ও সুশৃঙ্খল করিবার জন্য নাটকের কাহিনীকে তাহারই চরিত্রের মাধ্যমে ঘটাইতে গিয়া তিনি ঘটনার সজ্ঘটনের স্থান ও কাল বিষয়ক প্রসিদ্ধি ত্যাগ করেন। তাহাতেও যদি না কুলায়,

তখন কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কাহিনী সৃষ্টি করেন। কখনও তাহা দোষের, কখনও বা গুণের হয়। এই রীতি শেক্‌স্‌পীয়রীয়। মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়ার ঐতিহাসিক বা উপকথার কাহিনীকে এক নায়ক চরিত্রের মধ্য দিয়া ঘটাইবার জন্য অনেক নাটকে কাহিনী ওলট্‌-পালট্‌ করিয়াছেন, নিজের ইচ্ছামতো কাহিনী সৃষ্টিও করিয়াছেন।

'উলূপী' নাটকের কাহিনী-ভাগে প্রসিদ্ধি ত্যাগ হইলেও তাহা নাটকীয় শৃঙ্খলাবোধে ও চরিত্রের মহনীয়তায় সুন্দর হইয়াছে। কাহিনীর গ্রন্থণ-পটুতা, চরিত্রের দ্বন্দ্ব-বিকাশ ও ভাবোচ্ছ্বাসের তরঙ্গ-বিক্ষোভ নাটকখানিকে কম আকর্ষণীয় করে নাই।

নাগকন্যা 'উলূপী' যৌবনের রঙীন স্বপ্নে যখন বিভোরা, তখন তাঁহার সৌন্দর্যে এক শক্তিমান মহাপুরুষ আকৃষ্ট হইলেন। আর্যভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর 'অর্জুন' পথচারীর বেশে একদিন নাগরাজের গৃহপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। মহাভারতের নায়ক শ্রীকৃষ্ণের সখা গাণ্ডীবীকে এই অনার্যা নাগকন্যা স্বামিত্বে বরণ করিল। কিন্তু মিলন-সুখ স্বপ্নের মতো ক্ষণস্থায়ী। কর্তব্যপ্রাণ বীর সদ্যোজাত শিশুর মুখের দিকে সতৃষ্ণনেত্রে তাকাইতে তাকাইতে হৃদয়কে কঠোর করিয়া প্রস্থান করিলেন। পিতৃরাজ্যে পরিত্যক্তা প্রোষিতভর্তৃকা উলূপী। সান্ত্বনার স্থল একমাত্র স্বামীর প্রতিচ্ছবি ঐ পুত্র। নাটকে যেখান হইতে আমরা উলূপীকে দেখিতে আরম্ভ করি, তখন তাঁহার এই বিষাদময় অবস্থা। নিজের মনের বেদনা পিতা বা পুত্র কাহাকেও তিনি জানিতে দেন না। অরণ্যচারিণী তপস্বিনী কাননদেবীর মতো তিনি এই বনরাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী। তাঁহার হৃদয়ের বিষাদের প্রতিবিম্বই বনানীর ঐ ঘনান্ধকার ছায়া। তাঁহার বেদনার উদ্দামতা পর্বতশৃঙ্গে ধাবমান অশ্বের গতির মতো। তাই নিতান্ত নির্জনে নিজের অশান্ত মনকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য বিদ্যুদ্বরণা এই সুন্দরী এলোকেশে গতির ঝড় তুলিয়া কখনো বা অশ্বপৃষ্ঠে পর্বতে আরোহণ করেন, কখনো বা গভীর বনানীর অভ্যন্তরে আনমনে একাকী প্রবেশ করেন। নাট্যকার উলূপীর মনোবিকলনে বা অবস্থার বিশ্লেষণে একটি মাত্র স্বগতোক্তির আশ্রয়ও নেন নাই। এতটুকু মর্মবেদনা-জ্ঞাপক সংলাপের মধ্য দিয়া নিজের মনের ভাব উলূপী প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার নীরব বেদনা না-বলার মধ্য দিয়াই বেশী ফুটিয়াছে। প্রকাশের চেয়ে ইঙ্গিতের মধ্যে যে আরো তীব্রতা আছে, নীরবে বেদনাকে সহ্য করার মধ্যে

যে মাধুর্য আছে, নাট্যকার তাহা দেখাইয়াছেন। বালক পুত্র ইলাবন্ত শক্তিমান অর্জুনের সন্তান। শর-চালনায় সে পিতারই ন্যায় সুদক্ষ। মায়ের মনোবেদনা বালকের বুঝা শক্ত। কিন্তু সে জানে, মাতামহের নিষেধ উপেক্ষা করিয়া মাতা বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায়। সুতরাং হিংস্র-জন্তুর মুখ হইতে মাকে রক্ষা করিবার জন্য সে অরণ্যকে শ্বাপদহীন করিতে শরযোজনা করে। বালকত্ব, বীরত্ব ও মাতৃভক্তির সমন্বয়ে চরিত্রটি অতি মনোরম। যদিও ইলাবন্তের বাক্যে ও কার্যে বহু স্থানে বালকত্বের সীমা রক্ষিত হয় নাই, তবুও সেই অসঙ্গতির মধ্যেও যে সৌন্দর্য আছে তাহা আমরা উপেক্ষা করিব না। নাটকের আরম্ভে একদিকে বালকের অদ্ভুত আচরণে মনে কৌতূহল জাগায় অন্যদিকে তাহার মাতৃভক্তির জন্য মনটিকে তাহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করিয়া তোলে। সঙ্গে সঙ্গে এই আনন্দের মধ্যে বিষাদের অবতারণা হয় ব্যথিতা উলূপীর উদাস-ভ্রমণের বর্ণনায়। এই বেদনা আরো মধুর হইয়া ওঠে যখন গণক-বেশী নারদ জানাইয়া যান, উলূপী স্বামীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিলেও, তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইলেও, তিনি চাহেন না যে কর্তব্য ত্যাগ করিয়া অর্জুন তাঁহার নিকট আগমন করেন। এই যে সর্বত্যাগিনী স্বামিভক্তি, ইহারই পরীক্ষা দিতে চলিলেন উলূপী। স্বামীর জন্য তিনি নিজের সুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়াছেন। এবার রাক্ষসী যাহা পারে না, নাগিনী উলূপীর তাহাই করিতে হইবে। স্বামীর জন্য নিজের হাতে নিজের পুত্রকে তাঁহার বলি দিতে হইবে। উলূপী জানিলেন, সে-ই তাহার স্বামীর প্রাণবধের কারণ হইবে। তাই দুর্বার নিয়তিকে রোধ করিবার জন্য তিনি আত্ম-বিসর্জন দিতে চলিলেন, কিন্তু পারিলেন না। আজ উলূপীর সম্মুখে গঙ্গায় আরো কঠিন সমস্যা। স্বামীর মৃত্যু ও অনন্ত নরক এই দুইটির মধ্যে কোনটি শ্রেয়? পতিপ্রাণা স্ত্রী স্বামীর মৃত্যু চিন্তা করিতেই শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন, প্রাণ-বিসর্জন দিতে ছুটিয়াছিলেন। সেই স্বামীর মৃত্যুর চেষ্টা আজ উলূপীর নিজেরই করিতে হইবে। অদৃষ্টের কী নিষ্ঠুর পরিহাস। স্বামীর মৃত্যু ঘটাইয়াই আজ তিনি স্বামিপ্রেমের পরীক্ষা দিবেন। শোকাতুরা গঙ্গা অর্জুনকে পুত্রের হস্তে নিধনের অভিশাপ দিয়াছিলেন। সেই প্রসিদ্ধিকে এতটুকু ঘুরাইয়া দিয়া নাট্যকার উলূপীর কী তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। উলূপীর জয় হইল। পুত্রকে বলি দিয়া উলূপী স্বামীকে রক্ষা করিলেন। মণিদান করিয়া নারদ তাঁহাকে যে পরীক্ষায় ফেলিয়াছিলেন, সাধ্বী সতী সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

কাহিনী-বিন্যাসে নাট্যকারের অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় পাই এই নাটকে। সমস্ত কাহিনীকে উলুপী-চরিত্রের মধ্য দিয়া তিনি ঘটাইয়াছেন। পাণ্ডবের অশ্বমেধের আয়োজন, তাহাও যেন প্রতীক্ষমানা উলুপী-চিত্রাঙ্গদার মনোবাসনা পূরণের জন্য দৈব লীলায় ঘটিয়া গিয়াছে। বভ্রুবাহনের হস্তে অর্জুনের পরাজয়, সেখানেও মূল-প্রেরণা যোগায় উলুপী। যদিও বভ্রুবাহনের সঙ্গে উলুপীর সাক্ষাৎ অনেকখানি আকস্মিক। অপরিচিতার অভিনয়ে তিনি বভ্রুবাহনকে চালিত করেন। কিন্তু উলুপীর আত্মপরিচয়ের মধ্য দিয়া বভ্রুবাহন-উলুপী-চিত্রাঙ্গদার কর্তব্য নির্ধারণের দ্বন্দ্ব ঘটিতে পারিত, সেই অপূর্ব সুযোগ নাট্যকার ত্যাগ করিয়াছেন। হয়তো ইলাবন্তকে বভ্রুবাহনের দ্বারা হত্যা করাইবার জন্যই এই গোপনতা। কিন্তু তাহার অনিবার্য প্রয়োজন কিছুই ছিল না। যে পুত্র মায়ের সম্মানের জন্য পিতাকে হত্যা করিতে প্রস্তুত, সে কেন সেই একই কারণে ভ্রাতৃনিধন করিতে পারিবে না?

অন্যান্য কয়েকটি পার্শ্বচরিত্র চিত্রণেও যথেষ্ট দুর্বলতা রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের উল্লেখমাত্র নাটকে আছে, কিন্তু প্রয়োজন কিছুই দেখানো হয় নাই। বভ্রুবাহনের সঙ্গে যুদ্ধে মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের প্রাধান্য রক্ষিত হইয়াছে। দ্বারকা হইতে তাঁহাকে মণিপুর আসিতে হইয়াছিল। অবশ্য নাট্যের পরিবেশ ও পরিস্থিতি রক্ষায় শ্রীকৃষ্ণকে বেশী প্রয়োজন হয় নাই। তবে নাটকে তাঁহার উপস্থিতি না ঘটাইয়া উল্লেখেই সারিয়া দেওয়া যাইত। অর্জুনকে অনেক জায়গায়ই অনর্জুন করা হইয়াছে। অশ্ব-রক্ষার ভার গ্রহণের সময় তাঁহার বাক্যে যে অহমিকা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নিতান্ত স্থূল এবং অশোভন। এই অহঙ্কারই যে তাঁহার পতনের কারণ, নাট্যকার তাহা প্রকাশ করিয়া কোথাও বলেন নাই। সেই অহঙ্কার যখন চূর্ণ হইতে চলিল, তখনও কিন্তু অর্জুনের কোনো অন্তর্দ্বন্দ্ব নাই। বভ্রুবাহনের সঙ্গে আলাপে অর্জুন তাহাকে আকস্মিক এবং অসংযতভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। নাগরাজ অনন্তের মধ্যে কন্যা-স্নেহ ও দৌহিত্র-স্নেহ অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে। কিন্তু নারদের সঙ্গে আলাপে নাগরাজকে একটি গণ্ডমূর্খ করিয়া দেখানো হইয়াছে মাত্র। ব্যঙ্গের মধ্য দিয়া শ্রেষ্ঠ-চরিত্রের দ্বারা হাস্যরস ফুটানোর চেষ্টা প্রশংসনীয় নহে।

কিন্তু মাঝে মাঝে অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশে, পরিস্থিতি ও পরিবেশ বর্ণনায় ভাষার কবিত্ব এবং প্রকাশ-ক্ষমতা আমাদিগকে অভিভূত করে।

প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য। ইলাবন্ত মায়ের রক্ষার জন্য যখন সমস্ত হিংস্র প্রাণীকে হত্যা করিতে শর-যোজনা করে, নারদ তখন তাহাকে ভয় দেখাইয়া ভৎর্সনা করিয়া বলেন, "জানিস্ আমি মুহূর্তে তোর হস্ত স্তম্ভিত করতে পারি।" বীর বালক তখন অতি বুদ্ধিমানের মতো উত্তর দিয়া তাঁহাকে স্তব্ধ করিয়া দেয়,—

> "চোখ রাঙাও কেন ঠাকুর, কর না? আর এতই যদি শক্তির অহঙ্কার, তাহলে ঐ প্রাণিগুলোকে ফল-মূলাশী কর না কেন?"

প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য। নারদ উলূপীর প্রশংসা করিয়া বলেন, কি অপূর্ব সুন্দরী কন্যা তোমার নাগরাজ! অনন্ত উত্তর দেন,—

> "অপূর্ব সুন্দরী কন্যা ঠাকুর, অপূর্ব সুন্দরী। উন্মাদিনী মা আমার কেশ এলো করে ঐ সব পাহাড়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে যখন ছুটোছুটি করে বেড়ায়, তখন মনে হয়, যেন দেবতারা পাহাড়ে বসে মেঘে জড়ানো চাঁদ লোফালুফি করছে।"

নিরক্ষর-প্রায় অনন্তরাজের মুখে এ ভাষা বেমানানো বটে, কিন্তু উলূপীর রূপ বর্ণনায় এর চেয়ে সুন্দর ভাষা আর হয় না।

পুত্রের হস্তে নিহত না হইলে অর্জুনের নরক-গমন রোধ হইবে না জানিয়া উলূপী নিজে স্বামিহত্যার চেষ্টা করিবেন। স্বগতোক্তিতে তাঁহার অন্তর-বেদনা ফাটিয়া পড়ে। মনের তীব্র দ্বন্দ্বকে নাট্যকার রূপ দিতেছেন। ভাষা সংযত, উচ্ছ্বাস নাই। অথচ তাহা কত বিষণ্ন!

> "বিধবা হবার এত লোভ—হাস্যমুখে স্বামিহত্যার পথে ছুটে যাব। পিতৃবধের জন্য কত কৌশলে পুত্রকে নীতি শিক্ষা দেব।...... হারে বিধিলিপি! এমন কার্য করবো যে, এ নাগিনীর নামে প্রতি কার্যে আমার কার্যের তুলনা করবে। আর আমার জন্য শুধু নাগবংশকে জগতের জীব ঘৃণা করবে। মরণ মঙ্গল—না নরক মঙ্গল?......এই মাত্র জানি, একদিন না একদিন মৃত্যু আছে। ......তার সঙ্গে নরক আসবে কেন? যার প্রতিকার আছে, আমার দেবতার কাছে তাকে আসতে দেব কেন? নারায়ণ! আমাকে স্বামিঘাতিনীর বল দাও।"

সুন্দর! তবে একটু দীর্ঘ হইয়াছে মাত্র।

আর একটি মাত্র বিষয়ের আলোচনা করিয়া 'উলূপী' নাটক শেষ করিতেছি। 'শাহাজাদী', 'বরুণা' প্রভৃতি নাটকের যে জাতি, 'উলূপী'রও তাহাই। 'উলূপী' নাটকেও দেখিতেছি, নাট্যকার কাহিনীর চমক সৃষ্টির জন্য চরিত্র বিশ্লেষণ এড়াইয়া চলিতেছেন। যেখানে যেখানে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব আসিতে পারিত, কর্তব্যাকর্তব্যের আলোচনায় মন ও হৃদয়ের তরঙ্গ-বিক্ষোভ সৃষ্টি হইতে পারিত, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির প্রভাবে সেখানে অতি শীঘ্রই কর্তব্যনির্ণয় করিয়া চরিত্র পরবর্তী ঘটনার রূপায়ণে তৎপর হইতেছে। সুতরাং নাট্যঘটনা কর্মাভিঘাতী না হইয়া কাহিনীবিকাশী হইয়াছে। তাই ইহা নাট্যীকৃত রোমান্‌স্‌।

এইবার 'ভীষ্ম' নাটকের আলোচনা করা যাক্‌। এই নাটকে গুণ যেমন অনেক রহিয়াছে, দোষও তেমনি কম নয়। ইহার ঘটনার দিকে আমাদের দৃষ্টি প্রথম আকৃষ্ট হয়। ঘটনাটি অতি বিস্তৃত এবং বিপর্যস্ত। পাঁচ পুরুষের কাহিনী-পরম্পরাকে নাট্যকার একই নাটকে স্থান দিয়াছেন। নায়ক ভীষ্ম পিতা শান্তনু হইতে আরম্ভ করিয়া প্রপৌত্র অভিমন্যু-ঘটোৎকচ পর্যন্ত দেখিয়াছেন। ইচ্ছামৃত্যু এই অক্ষয়বটের জীবনী নাটকে রূপায়িত করা সত্যই দুঃসাহসিক কাণ্ড। সে দুঃসাহস নাট্যকার করিয়াছেন। কালের এই অতি-পরিসরে যে বহুবিস্তৃত ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাকে ঐক্য ও পারম্পর্যের শৃঙ্খলে গাঁথিয়া তোলা একখানি নাটকের পক্ষে সম্ভবপর নহে। যে কাহিনী অবলম্বনে ভিন্ন ভিন্ন কয়েকখানি স্বয়ংসম্পূর্ণ নাটক হইতে পারিত, সারস্বত এবং পৌরাণিক বিশ্বাসের ক্ষীণ সূত্র অবলম্বন করিয়া নাট্যকার তাহাই একখানি নাটকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তাহার ফলে এই নাটকের কাহিনী-বিন্যাসের দুর্বলতা অতি প্রকট হইয়া ধরা দেয়; অনেক সময়ে মনে হয়, 'ভীষ্ম' নাটক যেন কয়েকখানি একাঙ্কিকার সমষ্টি, অর্থাৎ ইহার প্রত্যেক অঙ্কে পূর্বাপর-নিরপেক্ষী এক একটি স্বতন্ত্র ঘটনা বা পরিস্থিতির সঙ্গে নায়ক যুক্ত হইতেছেন। অঙ্কের শেষ হইলে ঐ কাহিনীর আকর্ষণ লুপ্ত হইল। তারপর পরের অঙ্কে পূর্বাঙ্কের কাহিনীর ক্রমানুসরণ না হইয়া প্রায়ই হইয়াছে নূতন কাহিনীর গোড়াপত্তন। এই নাটকের গল্পের গাঁথুনি খুব শিথিল।

আলোচনা করা যাক।—

নাটকের প্রস্তাবনায় আমরা দেখিতেছি, বিপন্ন,অভিশপ্ত অষ্টবসু পত্নীসহ গঙ্গাতীরে উপস্থিত। তাঁহাদের কাতর ক্রন্দনে গঙ্গার আবির্ভাব হইল। তিনি

প্রতিজ্ঞা করিলেন, জননীরূপে তিনি অষ্টবসুকে গর্ভে ধারণ করিবেন। জন্মমাত্রে সপ্তবসু মুক্তি পাইবে। কিন্তু অষ্টম মুক্তি পাইবে না। এই অষ্টম বসুই পরজীবনে 'ভীষ্ম' হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। মহাভারতে এ পর্যন্ত কাহিনী ঠিক আছে। কিন্তু অষ্টম বসু যে পরজন্মে স্ত্রী গ্রহণ করিবেন না তাহা মহাভারতে, বসুর দেবতনু-ত্যাগের পূর্বে, বলানো হয় নাই। 'ভীষ্ম' যে পরবর্তী কালে চিরকুমার থাকিবেন, নাট্যকার বসুর প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়া তাহা জানাইয়া গেলেন। পূর্বজন্মের ভূমিকা এইখানেই শেষ। আমরা তারপর নাটকে সরাসরি ভীষ্মকে দেখিতে পাই। ষোড়শবর্ষীয় যুবক অস্ত্রশিক্ষা শেষ করিয়া গুরু পরশুরামের নিকট হইতে বিদায় হইতেছেন। বিদায়-মুহূর্তে পরশুরাম জানাইয়া দেন,—

> "ভাগ্যদোষে,
> যদি কভু গুরু-শিষ্যে হয় মহারণ,
> শুন পুত্র, জয়ী হবে তুমি।"
>
> —প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য।

গুরু-শিষ্যে যুদ্ধ বাধিবার কোনো সম্ভাবনাই যখন দেখা যাইতেছে না, তখন এই ভবিষ্যদ্বাণীর আকস্মিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে। নাট্যকারের মনে যে এ প্রশ্ন জাগে নাই তাহা নহে। তাই তিনি নিতান্ত দৈবের দুর্জ্ঞেয় লীলার কথাই উল্লেখ করেন এ কৈফিয়ৎ রামের নয়, নাট্যকারের। কিন্তু আমরা জানি, পরবর্তীকালে অম্বা-প্রসঙ্গে গুরু-শিষ্যে যে মহারণ সঙ্ঘটিত হইবে, আগে হইতে নাট্যকার তাহার জন্য ভূমিকা প্রস্তুত করিতেছেন। কিন্তু নাটকের ঘটনা একটি বিশেষ নিয়মে ঘটে। পরবর্তীকালে যে ঘটনা ঘটিবে, অন্তর-সংস্কার রূপে নায়কের অন্তরে তাহার বীজ অঙ্কুরিত হইতে থাকে। তাহাই একদিন কর্মের আকারে বাহিরে প্রকাশিত হইয়া আসে মাত্র। দ্বিতীয় অঙ্কে ভীষ্ম অম্বা-প্রসঙ্গে জড়াইয়া পড়িতেছেন; কিন্তু তাহার জন্য প্রথম অঙ্কে প্রদর্শিত ভীষ্মের বাসনা-সংস্কার দায়ী নহে। প্রথম অঙ্কে উদ্ধৃত পরিস্থিতিও নহে। প্রথমাঙ্কের আরম্ভ ও পরিণতি একটা বিশেষ কাহিনীর আদ্যন্ত রূপায়ণে নিঃশেষিত হয়। ভীষ্মের অস্ত্রলাভ, পিতার সহিত পরিচয় এবং রাজ্যত্যাগও চিরকুমার থাকিবার প্রতিজ্ঞা এই অঙ্কের আখ্যানভাগ। যদিও ইহা ভীষ্ম-জীবনের এক বৃহত্তর এবং গৌরবময় অংশ, তবুও ইহা নাটকীয় সম্ভাবনায় নিজের মধ্যে নিজেই সম্পূর্ণ। এই অঙ্কে নাটকীয় কৌতূহল

ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার পরই শেষ হইয়া যায়। পরবর্তী অঙ্কে যে অম্বা-কাহিনী তাহা এই প্রতিজ্ঞা টলাইবার জন্য নহে। যদি বুঝিতাম, ভীষ্মের চিরকুমারত্ব ভঙ্গ করাইতে অম্বা চেষ্টা করিতেছে, এবং মহর্ষি পরশুরামও ভীষ্মকেই অম্বাকে বিবাহ করিতে বলিতেছেন, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞায় অটল দেবব্রতকে ঘিরিয়া অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং বহির্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইতে পারিত। আর তাহা হইতেই যদি ভীষ্ম ও রামের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিত, তবে তাহা নিতান্ত আকস্মিক বা অপ্রাসঙ্গিক হইত না। একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একাঙ্কিকার আকারে প্রথম অঙ্কটি শেষ হইয়া যায়। তারপর আরম্ভ হয় দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অঙ্ক ঠিক একাঙ্কিকা নহে। এই দুই অঙ্ক জুড়িয়া অম্বা-কাহিনী। দ্বিতীয় অঙ্কের আরম্ভে আমরা কুমারী অম্বাকে পাই। কুমারী প্রগল্‌ভা নায়িকা। পিতার বিনা অনুমতিতেই সে শাল্বকে আত্মদান করিয়াছে। পিতার সহিত আলাপেও তাহার সংযমের পরিচয় পাওয়া যায় না। রাজকন্যা যে পূর্ণমাত্রায় পুংশ্চলী তাহা তাহার কথাবার্তা এবং আচরণেই বুঝা যায়। কন্যা ও অতিথি শাল্বের আচরণে ব্যথিত বৃদ্ধ কাশীরাজ অভিমানে তিনটি কন্যাকেই বীর্যশুল্কা করিতেছেন। এই স্বয়ম্বরে ভীষ্মের আগমন হইল। তারপর ভীষ্মের নিকট শাল্বের পরাজয়, কাশীরাজ-কন্যাদের হস্তিনায় আনয়ন, অম্বা কর্তৃক শাল্বকে আত্মদানের কাহিনী প্রকাশ, শাল্ব কর্তৃক ভীষ্ম-বিজিতা অম্বাকে প্রত্যাখ্যান এবং নির্যাতিতা অম্বার পরশুরামের আশ্রয় গ্রহণ প্রভৃতি ঘটনা আসিয়া ভীড় করিতেছে। ভীষ্ম পরশুরামের অনুরোধেও অম্বাকে গ্রহণ করিলেন না, সুতরাং গুরু-শিষ্যের যুদ্ধ হইল। পরশুরামের হইল পরাজয়। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে যে কাহিনীর আরম্ভ, তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যে তাহার সমাপ্তি। আবার ঘটনা-বিন্যাসে দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ ও তৃতীয় অঙ্কের আরম্ভে কাহিনীর ক্রমবিকাশের কোনো স্পষ্ট ভেদরেখা দৃষ্ট হয় না। প্রথম অঙ্ক শেষ হইলে যেখানে দ্বিতীয় অঙ্কের সূচনা হয়, নাট্যকার সেখানে প্রথমাঙ্কের কাহিনীকে একেবারে যবনিকার পশ্চাতে ফেলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে যেখানে তৃতীয়াঙ্কের সূচনা হইল, সেখানে দেখিতে পাই, পূর্বাঙ্কের অবিচ্ছিন্ন ক্রমানুসরণই চলিতেছে। দ্বিতীয়াঙ্কের শেষে ভীষ্মের সঙ্গে পরশুরামের যুদ্ধ তো আরম্ভ হইয়াই গিয়াছে। সুতরাং তৃতীয় অঙ্কে সেই যুদ্ধ ও তাহার ফলাফল বর্ণনা চলিল। তাই যদি বলা যায়, একটি অঙ্ককে অকারণে ভাঙ্গিয়া দুইটি অঙ্কে

রূপায়িত করা হইয়াছে, তাহা হইলে খুব ভুল করা হইবে না। সুতরাং মোটামুটি ইহাও একখানি সম্পূর্ণাঙ্গ একাঙ্কিকা।

তৃতীয় অঙ্কের সত্যকার সমাপ্তি হয় ভীষ্ম ও রামের যুদ্ধ সমাপ্তিতে। এই দুই অঙ্ক জুড়িয়া নাটকের যাহা কৌতুহল, রামের পরাজয়ে তাহা সমাপ্ত হইয়া যায়। তারপর অম্বার সাধনায় সিদ্ধি, মহাদেবের বরদান, ভীষ্মকে হত্যা করিবার জন্ত অম্বার পুনর্জন্ম-গ্রহণ নিতান্ত তাড়াতাড়ি ঘটিয়াছে। রাম-ভীষ্মের যুদ্ধের আয়োজন ও বর্ণনায় আমরা এতই নিমগ্ন ছিলাম যে অম্বার সাধনাকে লক্ষ্য করিয়াও এড়াইয়া গিয়াছে। নাট্যকার এখানে হঠাৎ ভীষ্মের শেষ পরিণতি ঘটাইবার জন্ত এক নিমেষে অম্বাকে মারিয়া ফেলিলেন।

বস্তুতঃ অম্বার গোটা চরিত্রটাই বিশৃঙ্খল। বিশৃঙ্খল চরিত্রের রূপায়ণে যে শৃঙ্খলা প্রয়োজন, নাট্যকার তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। নষ্ট চরিত্রেরও একটা স্বকীয় সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু অম্বা যে ভাবে নাটকে চিত্রিত হইয়াছে তাহাতে তাহার আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষিত হয় নাই। একটু বিশ্লেষণ করা যাক।

নাটকে অম্বার প্রথম প্রকাশে আমরা তাহার স্বৈরাচার, প্রগল্‌ভতা এবং পুংশ্চলনের আলোচনা করিয়াছি। সত্যকার প্রেমের মধ্যে যে সংযম এবং দুঃখবরণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুস্যূত থাকে অম্বার চরিত্রে তাহা নাই। এই উগ্র আধুনিকা কন্যাটির মধ্যে প্রেম নাই, আছে মোহ। সে মোহ নারীকে আকস্মিকভাবে পুরুষের ছলনার ফাঁদে জড়াইয়া দেয়। রাজা শাল্বকে আধুনিক যুগের কোর্ট্‌শিপের নায়ক করিয়া অম্বাকে করা হইয়াছে তাহার স্বৈরাচারের শিকার। যদি শাল্বের প্রতি তাহার সত্যকার প্রেমই থাকিত, তাহা হইলে স্বয়ম্বর-সভার মধ্যে অকস্মাৎ বীরবেশে ভীষ্মের উদয়ে তাহার চিত্তচাঞ্চল্য হইবে কেন? এই শক্তিমান রূপবানের আবির্ভাবে শাল্ব তলাইয়া গেল। ইহা কি প্রেম? আর্য নারী যাহাকে ভালবাসিয়া বরণ করে, প্রাণবিনিময়েও তাহাকে ত্যাগ করে না। দ্বিচারিণী-ভাব তাহার অশ্রদ্ধেয়। অম্বা এখানে প্রেমের ব্যবসায় করিতেছে। যে ভালবাসা সে শাল্বকে দিয়াছিল, গলার হারের মতো খুলিয়া সে তাহাই আবার ভীষ্মের নামে উৎসর্গ করিতেছে। মহাভারতের অম্বা ভীষ্মকে বলিয়াছিলেন, শাল্বরাজকে তিনি মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। সে-কথা ক্ষীরোদ-প্রসাদের অম্বাও বলিতেছে। কিন্তু কী ভাবে? যখন দেখিল, ভীষ্ম

তাহাকে বিবাহ করিবে না, করিবে এক দুগ্ধপোষ্য শিশু, তখন সে দুইজনের মধ্যে তুলনা করিয়া ভাবিতেছে শাল্বকেই বরণ করিবে। এখন এই যে ব্যাপারটি ঘটিল, ইহার জন্য দায়ী কে? শাল্বকে হৃদয় সমর্পণের কথা আগে প্রকাশ করিলে ভীষ্ম তাহাকে আনিতেনই না। সুতরাং অপরাধ যে একান্ত করিয়া অম্বার তাহা স্বীকার করিতে হইবে। গঙ্গার মুখ দিয়া নাট্যকার এই অপরাধের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু যে সমস্যার অর্থ সকলেই বুঝিতে পারে, তাহা যে ঋষিসঙ্ঘ এবং ষষ্ঠ-অবতার ভৃগুপতি পরশুরাম কেন বুঝিলেন না, এবং না বুঝিয়া প্রিয়শিষ্য ভীষ্মের সঙ্গে কেন যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন তাহাই জিজ্ঞাস্য। এ জিজ্ঞাসার নিরসন নাট্যকার কিছুই করিতে পারেন নাই। তিনি অম্বার পর অহেতুক অনেক করুণা বর্ষণ করিয়াছেন। একটি কামা-চারিণী রমণীর সাধনায় মহাদেবেরও আসন টলিয়া উঠিল এবং তাহার অবরুদ্ধ কাম হইতে সঞ্জাত ঈর্ষ্যার অনলে প্রাজ্ঞ ব্রহ্মচারী ভীষ্ম জীবনাহুতি দিলেন, ইহা ভাবিতে আমাদের নীতিবোধ পীড়িত হয়। আবার অম্বা যদি ভীষ্মের প্রতি সত্যকার অনুরাগিনী হইত, তাহা হইলে সে দয়িতের ধর্মপালনে নিজেও চিরকুমারী থাকিত। যাহাকে ভালবাসি, তাহার মৃত্যুর জন্য সাধনা করিতে পারি না। সুতরাং অম্বার ভীষ্ম-প্রেম আকস্মিক, অমনস্তাত্ত্বিক এবং অবিশ্বাস্য। ইহা কামুকীর কুহক মাত্র।

'অম্বা' মরিয়া 'শিখণ্ডী' হইল। নাটকের চতুর্থাঙ্ক ও পঞ্চমাঙ্ক জুড়িয়া ভীষ্মের যে জীবনটুকু বর্ণনা করা হইয়াছে তাহার অধিপতি গ্রহ শিখণ্ডী। তাই যুবক ভীষ্মের জীবনে অম্বা-প্রসঙ্গ যেখানে শেষ হয়, নাটকে তৃতীয় অঙ্কের শেষ সেখানে হইয়াছে। আর চতুর্থ অঙ্কের যেখানে আরম্ভ হয়, যুবক ভীষ্ম সেখানে সুবৃদ্ধ,—পিতামহ। চার পুরুষের জীবন অতিক্রম করিয়া কাহিনী এখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বক্ষণ সূচনা করে। নাট্যকার নায়ক ভীষ্মের চরিত্র অঙ্কন করিতেছেন। তাই মহাভারত-কাহিনীর যেটুকু ভীষ্মের জীবনচরিত বর্ণনায় টানিয়া আনা যায়, সেটুকু গ্রহণ করিয়া বাকীটুকু বর্জন করিতেছেন। ইহা বিচারবুদ্ধির পরিচায়ক বটে, কিন্তু নাট্যকার যদি সুকৌশলে পূর্বগামী ঘটনাকে পরগামী ঘটনার অনিবার্য কারণ হিসাবে দেখাইতে পারিতেন, তবে শক্তির পরিচয় আরো সুন্দরভাবে পাওয়া যাইত। কিন্তু তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা এই—অম্বা মরিয়া শিখণ্ডী হইয়াছে, শিখণ্ডীর হস্তে ভীষ্মের মৃত্যু। সুতরাং চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কে যে ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা যেন

শুধু অম্বার তপস্তার ফলপ্রাপ্তির জন্ম। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে শিখণ্ডী অতি গৌণ চরিত্র। সুতরাং নাটকে তাহার এতখানি প্রাধান্ত অপৌরাণিক। নিষ্ঠুর নিয়তির লীলায় এক নপুংসকের হাতে মহাভারতের মহান্ পিতামহের মৃত্যু হইবে। ইহার কল্পনা করিতে গিয়া নাট্যকার তাল সামলাইতে পারেন নাই। শিখণ্ডীকে ভীষ্ম হঠাৎ মৃত্যু-মূর্তিতে দেখিলেন। ইহা দিব্যদৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু সার্থক নাট্যসৃষ্টি নয়। একটি অপরিজ্ঞাত বালক সম্মুখে আবির্ভূত হইতে না হইতেই ভীষ্মদেব তাহার মুখে মৃত্যুর ছায়া দেখিয়া ফেলিলেন। ভীষ্মদেবকে দেখিয়া শিখণ্ডী অতিমাত্রায় জাতিস্মর হইয়া উঠিল। কিন্তু যখন আমরা শিখণ্ডীকে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তখন তাহার মধ্যে এই জাতিস্মরত্বের কোনো সুপ্ত সম্ভাবনাও দেখি নাই। ভীষ্মকে দেখিয়া ধীরে-সুস্থে অবচেতন মনের আন্দোলনের মধ্য দিয়া এই জাতিস্মরত্ব আসে নাই। ইহা নিতান্ত অপ্রত্যাশিত। তাই ইহা চমকপ্রদ, কিন্তু নাট্য বা চরিত্র-বিকাশী নহে। আবার শিখণ্ডীর হাতে ভীষ্মের মৃত্যু ঘটাইতে গিয়াও নাট্যকার অনেক জোড়াতালি দিয়াছেন। মহাভারতের ভীষ্ম অমঙ্গল দেখিলে অস্ত্র ত্যাগ করেন। তাই শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া অর্জুন যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু নাটকে শিখণ্ডীকে দেখিয়া ভীষ্ম যে কেন অস্ত্রত্যাগ করিবেন, তাহার কারণ তিনি কিছু দেখান নাই। হইতে পারে, ধীরে ধীরে ভীষ্মদেবের মনে মৃত্যু-ইচ্ছা জাগিয়াছিল। কিন্তু সে ইচ্ছাও উৎকট হইয়া জাগিয়া গেল শিখণ্ডীর পরিচয় পাইবার পর অনিচ্ছায় এবং আকস্মিকভাবে। আর তাহার কৈফিয়ৎটিও সুন্দর নহে। তিনি জীবনে প্রথম মানবী-মুখ দেখিলেন, তাই তাঁহার মৃত্যু-ইচ্ছা জাগিল। ইহার পূর্বে ভীষ্মদেব নারীমুখ দেখেন নাই, মহাভারতে এমন কথা আছে কি? অবশ্য অন্য কৈফিয়ৎও আছে। দ্যুতির আবির্ভাবে ভীষ্মদেব জানিতে পারেন যে তিনি শাপভ্রষ্ট বসু। তাই স্বস্থানে ফিরিবার ইচ্ছা তাহার মনে জাগে। প্রিয় পাণ্ডবদের নিধনের চেয়ে আত্মত্যাগ শ্রেয়, ইহাও তিনি ভাবিয়াছিলেন। তাই মৃত্যুকে তিনি ডাকিয়া আনিলেন। কিন্তু সে আসিল নিষ্ঠুর নিয়তির বেশে। ভীষ্ম চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

শেষের অঙ্ক দুইটিও একখানি সম্পূর্ণাঙ্গ নাটকের উপকরণ বহন করে। ইহারও আদি হইতে শেষ পর্যন্ত ঘটনা অনবচ্ছিন্ন, অভিন্নগতি। সুতরাং ইহাকেও দুই অঙ্কে ভাগ না করিয়া একাঙ্কিকায়, স্বয়ং-সম্পূর্ণ একখানা নাটকে রূপ দেওয়া যাইত। তাই যদি বলা যায় যে 'ভীষ্ম' নাটক মূলতঃ কয়েকখানা

ভিন্ন-নাটকের সমষ্টি তাহা হইলে খুব অন্যায় হয় না। কাহিনীর শিথিল বন্ধনের জন্য যেমন এই দৈন্য নাটকে ঘটিয়াছে, তেমনি এই তিনখানি ভিন্ন-নাটকের উপাদানবাহী কাহিনীর মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ কিছুই নাই। ইহার বিকাশ জৈব নহে, যান্ত্রিক,—organic নহে mechanical. স্নায়ুমণ্ডলীর নাভিকেন্দ্রী বা মস্তিষ্ককেন্দ্রী ঐক্যবন্ধনে জীবদেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন মূলগ্রন্থির সঙ্গে যুক্ত, নাটকের কাহিনী হইবে সেইরূপ। রেলগাড়ীর স্বয়ংস্বতন্ত্র কামরার মতো প্রয়োজনমাফিক কাহিনীগুলিকে নাটকে জুড়িয়া দেওয়া বা বিচ্ছিন্ন করা যায় না। নাটকের কাহিনী-ভাগ হইতে একটি সামান্যতম অংশও ছিন্ন করিয়া লইলে উহার সমগ্র-সত্তা প্রাণঘাতী আঘাত প্রাপ্ত হইবে। ঘটনার এই নাড়ীর যোগ 'ভীষ্ম' নাটকের অঙ্কে অঙ্কে নাই। নাই তাহার কারণ এই যে, এই নাটকের ঘটনা নায়ক ভীষ্মের চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া ঘটিয়াছে, কিন্তু ভীষ্ম-চরিত্রের ক্রমবিকাশের অনিবার্য প্রয়োজনে ঘটে নাই। নাট্যকার যদিও কাহিনীকে ভীষ্ম-চরিত্রের সংস্পর্শে আনিতে ব্যস্ত ছিলেন; কিন্তু তাহা তিনি পারেন নাই। তাই নাটকটিকে চরিত্র-প্রাণ না বলিয়া সংস্থিতি-ধর্মী বলিতে পারি। নাট্যকার কয়েকটি বিশেষ মুহূর্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। পূর্বাপর সম্বন্ধ চিন্তা না করিয়া আমরা যদি ঐ মুহূর্তগুলির গুরুত্ব বিচার করি, তবে দেখিব, তিনি অনেক স্থানে চমক সৃষ্টি করিতে বা কবিত্বপ্রদর্শনে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার রোমান্টিক বা ঐতিহাসিক নাটক সৃষ্টিতে আমরা এ-গুণের পরিচয় পাইয়াছি। এখানেও দেখিতেছি, নাট্যকারের একটা বড় গুণ, তিনি একই দৃশ্যের মধ্যে সংলাপের সুকৌশলে সঙ্ঘাতপূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতির সৃষ্টি করিতে পারেন। চরিত্রের যে দিক আমাদের আপাততঃ অজ্ঞাত ছিল, সামান্য সংলাপে হঠাৎ সেই দিকে তিনি আলোকপাত করেন। সংলাপ সহজ সরল ভাবে চলিতে চলিতে হঠাৎ এমন একটি চমৎকার ভাবসঙ্ঘাত সৃষ্টি করে যাহা আকস্মিক হইয়াও মনোরম,—কেন না মানব-হৃদয়ের অন্তস্তল পর্যন্ত তাহা স্পর্শ করে। উপস্থাপিত পরিস্থিতির ঐ ভাব-বিকাশী সংলাপ আমাদিগকে বর্তমান পরিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করাইয়া হয়তো কখনো প্রসঙ্গচ্যুতি ঘটায়, কখনো বা চিন্তার কঠোর মানস-লোক হইতে অনুভূতির কল্পলোকে লইয়া যায়। কিন্তু সামান্য প্রসঙ্গচ্যুতি হইলেও তাহা অনেক সময় এমন সাধারণীকৃত চিরন্তন হৃদয়াবেগের পরিচয় বহন করে, যে জন্য তাহা সুন্দর, গ্রাহ্য এবং উপভোগ্য হয়।

আলোচনা করিয়া দেখা যাক।—নাটকের প্রস্তাবনাই একটি বিষাদময় মুহূর্ত। বিপন্ন বসু ও বসুপত্নীগণের আগমন। প্রস্তাবনার গান, বসু ও বসুপত্নীগণের গঙ্গাকে আহ্বান এবং পরিস্থিতি প্রকাশের ভাষা এতই আবেগময় হইয়াছে যে তাহাদের বিষাদ ছন্দের স্পন্দনে, বাক্য-বিন্যাসের ব্যাকুলতায় বেশ ফুটিয়া ওঠে। গঙ্গা তাহাদিগকে মুক্তির আশ্বাস দিলেন। একটি পরিস্থিতি সমাধানের দিকে চলিল। কিন্তু নাটকের শেষে প্রথম বসু ও দ্যুতির আলাপের মধ্য দিয়া পাই আর একটা বিষণ্ন পরিস্থিতির আভাস। প্রথম বসু পত্নীর প্রতি অভিমানে তাহাকে ত্যাগ করিতে চলিল বটে, কিন্তু অপরাধিনী হইলেও পতিপ্রাণা পত্নী ছায়ারূপে স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকখানি সংলাপের মধ্য দিয়া সাধ্বী নারীর পত্যনুসরণের চিরন্তন সত্য-রূপটি হৃদয়গ্রাহী ভাবে ফুটিয়া ওঠে। দ্যুতি-চরিত্র নাট্যকারের অপূর্ব মৌলিক কল্পনা। দ্যুতির অদৃশ্য গানে, স্বপ্ন-আবির্ভাবে, আর সেই সংস্পর্শে ভীষ্মের অন্তর্দ্বন্দ্ব-সঞ্জাত স্বগতোক্তিতে নাটকের মধ্যেও গীতি-কবিতার মাধুর্য এবং কোমলতার আস্বাদন হয়। কিন্তু ইহা নাটকীয়তা খর্ব করে নাই, বরং সুন্দর করিয়াছে। নারী-চিন্তাবিরত, আকুমার ব্রহ্মচারীর অন্তরেও এমন সুন্দরভাবে প্রেম-স্মৃতির অপরিজ্ঞেয়, স্বপ্নাভিভূত আন্দোলন সৃষ্টি করা অসমসাহসিক উচ্চ কবি-কল্পনার পরিচয় বহন করে। এই মানসী কন্যাটি সঙ্গীত-রূপিণী ছায়াদেহী রহিয়া পরিস্থিতিকে আরো সুন্দর করিয়াছে। কিন্তু নাট্যকার এই অন্তর্দ্বন্দ্বকে মুহূর্তের জন্য জাগাইয়া মুহূর্তেই শেষ করিয়াছেন। সুতরাং ভীষ্মের জীবনব্যাপী অন্তর্দ্বন্দ্বের অবকাশে নাট্যকার এই জীবনটিতে অভাবনীয় ট্রাজেডী ঘটাইবার সুযোগ গ্রহণ করেন নাই।

তারপর যেখানে নাটকের সত্যকার আরম্ভ হইল, সেই প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে নাট্যকার সংলাপের কৌশলে ভাবান্তর ও প্রসঙ্গান্তর সৃষ্টির সুযোগ লইয়াছেন। পরশুরাম অস্ত্রশিক্ষাদান শেষ করিয়াছেন। ভীষ্মকে আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া যাইবার সময় কথায় কথায় তিনি উল্লেখ করেন, যদি গুরু-শিষ্যে কোনো দিন যুদ্ধ হয়, শিষ্যই যুদ্ধে জয়ী হইবে। ভীষ্মের জিজ্ঞাসা করা স্বাভাবিক, গুরু-শিষ্যে যুদ্ধের কারণ কি? পরশুরাম যাহা বলেন, তাহাও স্বাভাবিক সত্যকথা। অদৃষ্টের উপর কাহারও হাত নাই। প্রসঙ্গতঃ তিনি প্রকাশ করিলেন, ষষ্ঠ-অবতার ভৃগুপতি নিজের হাতে মাতৃহত্যা করিয়াছেন। কাহিনীর প্রসঙ্গচ্যুতি হইল। মাতৃভক্ত ভীষ্ম আহত হইলেন। মাতৃঘাতী

মহাপাপী আজ তাঁহার গুরু। ইহার নিকট হইতে তিনি যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছেন তাহার সমস্তই ফিরাইয়া দিবেন। মুহূর্তটি সত্যই সজ্ঘাতপূর্ণ। একদিকে শ্রেষ্ঠ অস্ত্রশিক্ষা, অন্য দিকে মাতৃভক্তি। প্রসঙ্গ চলিতে চলিতে বাধা পাইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কোন্ দিকে তাহার গতি ফিরিবে? মুহূর্তটির সংক্ষুব্ধ অবকাশ নাট্যকার গ্রহণ করিয়াছেন। একদিকে ভীষ্মের উচ্ছ্বসিত মাতৃভক্তি, অন্যদিকে সত্যনিষ্ঠ পরশুরামের দৃপ্ত ভাষণ। ভীষ্মের জ্বালাময় আক্রমণে আহত রামের মুখে ভাষা সরলভঙ্গী ত্যাগ করিয়া কাব্যধর্মী হইয়া উঠিল,—

> "জ্যোতির্ময় হেরিয়া বদন,
> ভেবেছিনু সত্য পাবে এখানে আদর।
> সত্য কথা শুনে
> প্রাণে যদি জাগেরে যন্ত্রণা—
> এই দণ্ডে বিদ্যা মোর ফিরে দে আমারে।"

কিন্তু এইখানেই বাক্য শেষ হইল না। পুত্রের অস্ত্র লাভের শুভ মুহূর্তে শিষ্যের মাতৃভক্তি ও গুরুর সত্যবাদিতা যে দ্বন্দ্ব তুলিয়াছে, তাহার সমাধান করিতে গঙ্গার আগমন হইবে। রামের বর্ণনায় গঙ্গার আকস্মিক আগমনের সঙ্গতি স্থাপিত হয়।—

> "সম্মুখে জাহ্নবী জল।—টল টল—
> আজি দেখি পূর্ণোল্লাসে ভরা।
> লহ ত্বরা, কর আচমন,
> শিক্ষা মোর করহ অর্পণ—
> চলে যাই অন্য দেশে—।"

এইরূপ পরিস্থিতির আকস্মিক পরিবর্তন ও ভাবের তীব্র সজ্ঘাত তিনি আরো বহুস্থানে সৃষ্টি করিয়াছেন। সবগুলির বিস্তারিত আলোচনা করিবার অবকাশ নাই। কয়েকটি প্রসঙ্গের উল্লেখমাত্র করিব। দ্বিতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যে স্বয়ম্বর-সভার মধ্যে ভীষ্মের আকস্মিক আগমনে অম্বার চিত্ত-চাঞ্চল্য; তৃতীয় অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্যে ভীষ্মের প্রথম অস্ত্রক্ষেপের সুযোগে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইল, নারদ, বসু ও গঙ্গার আগমনে তাহা সজ্ঘাতময় হইয়া ওঠে। চতুর্থ অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্যে ভীষ্ম ও শিখণ্ডীর সাক্ষাতের সময় জাতিস্মর শিখণ্ডীর ভাষা অপূর্ব কবিত্বপূর্ণ ও দ্বন্দ্বময়।

দুইটি মাত্র স্থানের আলোচনা করিব। দ্বিতীয় অঙ্ক, সপ্তম দৃশ্য। ভীষ্ম-ভার্গবের যুদ্ধ স্থির হইয়াছে। রোষান্বিত ভার্গব অতি নির্মমভাবে মায়ের সম্মুখে পুত্রের মৃত্যু ঘোষণা করিতেছেন। মৃতপুত্রের দেহের উপর শোকার্তা মাতাকে অশ্রু বিসর্জনের নিমন্ত্রণ—

"দেব-সিদ্ধ-চারণ-সেবিতে জহ্নুসুতে।
হাসিমুখে সপ্তশিশু করেছ বর্জন,
বুঝ নাই শোক কারে বলে।
এবারে কিঞ্চিৎ তার লহ আস্বাদন।
রণক্ষেত্রে মৃতপুত্র দেহের উপরে এস
শোকাশ্রুর স্রোতরূপে বহিতে জাহ্নবী।"

কিন্তু ইহার উত্তরে ভীষ্ম যাহা বলেন, তাহার মধ্য দিয়া ভার্গব-জীবনের ট্রাজেডী সুন্দরভাবে ফুটিয়া ওঠে। এই শক্তিমানের মৃত্যুতে শোকাশ্রু-বিসর্জনেরও লোক নাই।—

"যাও বিপ্র, সঙ্গে যাও,
পুত্রহীন কুমার ভার্গব।
কুরুক্ষেত্রে যেই স্থানে
পিতৃপুরুষের পিণ্ড দিয়াছেন ঋষি,
সেথা বসি গলদশ্রু দানে
পুত্ররূপে ভার্গবের করিও তর্পণ।"

নাটকের শেষ দৃশ্য। পাণ্ডব-বধের প্রতিজ্ঞা করিয়া ভীষ্ম অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, কূটকৌশলী কৃষ্ণ তাহা ব্যর্থ করিয়াছেন। প্রতিজ্ঞা-রক্ষণে অসমর্থ দেবব্রতের 'ভীষ্ম' নাম সর্বপ্রথম আহত। তাই তিনি অভিমানে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করাইবেন। পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রণক্ষেত্রে ভীষ্মের সাক্ষাৎ। স্নেহ, ভক্তি ও অভিমানের তীব্র সঙ্ঘাত অতি সামান্য কথায় নাট্যকার কি সুন্দর ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিবার মতো। যুদ্ধের আরম্ভে অর্জুন এবং ভীষ্মের ভক্তি ও আশীর্বাদ বিনিময়। তারপর অভিমানক্ষুব্ধ ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকে বাণে বাণে জর্জরিত করিতেছেন। কপট কোপে শ্রীকৃষ্ণ উত্তেজিত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া ভীষ্মের যে বাণী' তাহার মধ্যকার অভিমান আঘাত করিতে গিয়া ভক্তিতে প্রণত হয়,—

"অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী প্রাণী
ভীমা রণচণ্ডীর মন্দিরে
বলি দিতে এসেছ নির্দয় !
বালক-অর্জুন-রথে করি আরোহণ
অশ্ব-রজ্জু করিয়া ধারণ
হাস্যমুখে সে সংহারে সাক্ষী রবে তুমি ?
এই লও পুনঃ উপহার।
কোমলাঙ্গ বিঁধিয়া তোমার
সেই সব ক্ষত্রিয়ের মৃত্যুর যাতনা
প্রতি লোমকূপে
তোমারে করাব আমি পান।"

গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডব-গৌরব' নাটকে ভীমের ভক্তিমিশ্র অভিমানের ভাষার তীব্রতা আমরা দেখিয়াছি। এখানে ভীষ্মের সংলাপে ছন্দে ও ভাবে গিরিশ-প্রভাব সুস্পষ্ট। যাতনায় অস্থির শ্রীকৃষ্ণ চক্র গ্রহণ করিয়া যখন ভীষ্মকে হত্যা করিতে চলিলেন, অর্জুন তখন তাঁহাকে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু ভীষ্ম! অকুতোভয় মহারথ বিজয়ের আনন্দে উৎফুল্ল। কুরুক্ষেত্রের রণভূমিতে তিনি পরম-পুরুষের চরণস্পর্শ করাইয়াছেন। এখন মৃত্যু আসিলে সে মৃত্যু তাঁহার গৌরবের। পরিস্থিতির চাঞ্চল্য ভক্তবীরের এই আত্মপ্রসাদের বাণীতে যখন শান্তভাব ধারণ করে, ঠিক সেই সময়ে আগমন হয় শিখণ্ডীর। ভীষ্ম অস্ত্র ত্যাগ করিলেন। তাঁহার পতন ঘনাইয়া আসিল। সর্বশ্রেষ্ঠ রথী বৃদ্ধ পিতামহের পতন হিমালয়ের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়ার মতো। পুত্রের ভাবী মৃত্যুর আশঙ্কায় বিহ্বলা জননীর করুণ চিত্রের কল্পনা করিয়া নাট্যকার পূর্বকার প্রশান্তিকে অত্যন্ত করুণ করিয়া তোলেন—

"চালাও সারথি রথ—
দিব্যনেত্রে দেখিতেছি আমি—
ওই দূরে জননী আমার
একান্তে বসিয়া নিজ তীরে—
সন্তানের শেষক্ষণ করিয়া স্মরণ
আনত বদনে, অবিরাম অশ্রু বরিষণে
আপনি আপন অঙ্কে

রচিছেন তীব্র প্রবাহিনী।
এ দৃশ্য দেখিতে নারি।
সম্মুখে চালাও রথ—
যতক্ষণ জীবনের না হবে বিরাম,
রণক্ষেত্রে ঘুরাও আমারে।"

ভীষ্ম শর-শয্যায় শায়িত। সত্যব্রত সাধকের অভাবে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ কলির আক্রমণে জর্জরিত হইবে। সুতরাং ভীষ্মের পতন সমস্ত জগতের অকল্যাণ সূচনা করে। তাই দেব-ঋষিগণের প্রতিনিধি জামদগ্ন্য রাম আজ কাতর অনুরোধ করিতে আসিয়াছেন, সূর্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত ভীষ্মদেব শর-শয্যাশায়ী থাকিয়া জগৎকে অকল্যাণের আক্রমণ থেকে রক্ষা করুন। ঋষিদের এই ব্যাকুল আহ্বানে ভীষ্মের পতনও মহনীয় হইয়া ওঠে।

এইরূপে নাটকের বহুস্থানে নাট্যকার যে উৎকৃষ্ট কবি-কল্পনার পরিচয় দিয়াছেন, নাটকের দোষ-বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তাহাও যেন আমরা স্মরণ করি।

উপরি-উক্ত পরিস্থিতিগুলির আলোচনা হইতে একটি সত্য স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রকাশিত হয়। কবি-নাট্যকার জ্ঞাতেই হোক আর অজ্ঞাতেই হউক, সংস্কৃত নাট্যশৈলীর দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। সংস্কৃত নাট্যশৈলী রস-নিষ্পত্তির জন্য ব্যাকুল। ঘটনাকে গৌণ করিয়া দিয়া বাহিরের পরিস্থিতির যেটুকু অংশ মাত্র আমাদের অন্তরের ভাব প্রকাশে সহায়ক, সেইটুকু অবলম্বনে স্থায়িভাবের গীতিমুখর অভিব্যক্তি সংস্কৃত নাটকে করা হয়। যে কর্মময় পটভূমিকায় ঐ ভাবাবেগ প্রকাশ পাইত তাহার উল্লেখ থাকে মাত্র ইঙ্গিতে অথবা গৌণ ভাবে। উল্লিখিত উদাহরণগুলিতে সংস্কৃত নাটকের এই শৈলীরই রূপায়ণ দেখি।

আবার এমনি কতকগুলি ভাব-ঘন মুহূর্ত সৃষ্টিতে নাট্যকার যেমন কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তেমনি দুর্বলতার পরিচয়ও দিয়াছেন অনেক। প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে সত্যবতীর সঙ্গে পরশুরামের সাক্ষাৎ। পরশুরাম সত্যবতীকে ব্যাস-জননী বলিয়া যে ভক্তি দেখাইয়াছেন, তাহার প্রয়োজন এখানে বা নাটকের কোথাও অনুভূত হয় নাই। পরে একবার মাত্র নাটকে আমরা ব্যাসের আবির্ভাব দেখিয়াছি। ভীষ্ম যখন রামের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত, সেই সময়ে সাধনরত ব্যাস একবার মায়ের ডাকে সাড়া দিয়াছিলেন। কিন্তু যে মহাভারত

রচনার ইঙ্গিত সেখানে আছে, তাহার সার্থকতা নাটকের কোথাও দেখি না। যাহা হউক, এখানে আবার ঋষির আবির্ভাবেই সত্যবতীর জ্ঞান নয়, গন্ধ নয়, ভাষারও পরিবর্তন হইয়া গেল। অবশ্য এই দৃশ্যে ও অন্যত্র শান্তনু-চরিত্রের প্রসিদ্ধি-ত্যাগ করিয়া নাট্যকার শান্তনুকে অনেকখানি মহান্ করিয়াছেন। মহাভারতের ভীষ্মকে চিরকুমার থাকিতে হইয়াছিল পিতার রূপ-মোহ চরিতার্থ করিবার জন্য। এখানে ভ্রমে পতিত নিরুপায় পিতার প্রতিজ্ঞা ও সম্মান রক্ষার জন্য পিতার নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভীষ্ম রাজ্য ও দাম্পত্যজীবন বিসর্জন দিতেছেন। সুতরাং মহাভারতের শান্তনু হইতে ভীষ্ম নাটকের শান্তনু মহান্। চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে—দ্রুপদ এবং দশার্ণরাজের আলাপ রাজোচিত নয়। সস্তা হাস্যরসের অবতারণা করিতে গিয়া নাট্যকার পরিস্থিতি ও চরিত্র দুইটিকে হাস্যাস্পদ করিয়াছেন। আবার এই অঙ্কে দ্বিতীয় দৃশ্যে, গিরিশচন্দ্রের অনুসরণে নাট্যকার ভক্তিরস সৃষ্টি করিতে গিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। বলরাম একটি মাতাল এবং ভাঁড়। বলরামের সহিত আলাপে সাত্যকি গুরুজনের মর্যাদা রক্ষা করে নাই।

কিন্তু নাট্যকার ভাষায় এই নাটকে গিরিশচন্দ্রের সার্থক অনুকরণ করিয়াছেন। গৈরিশছন্দের ও তাহার ভাবাভিব্যক্তির যে বৈশিষ্ট্য গিরিশ-নাট্যপ্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি তাহার সহিত 'ভীষ্ম' নাটকের গৈরিশ-ছন্দ মিলাইয়া দেখিলে আমার বক্তব্যের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হইবে। বাহুল্য-ভয়ে বিস্তৃত আলোচনায় বিরত রহিলাম।

উপসংহারে বক্তব্য, 'ভীষ্ম' নাটক ক্ষীরোদপ্রসাদের শ্রেষ্ঠ নাটক নহে। নাট্য হিসাবেও উহা উৎকৃষ্ট নহে। কিন্তু ক্ষীরোদ-প্রতিভার দোষ ও গুণ উভয়ই উহাতে বর্তমান। গিরিশচন্দ্রের সার্থক অনুসরণ ও অক্ষম অনুকরণ দুইটিই সামান্য হইলেও নাটকটিতে রহিয়াছে।

এইবার ক্ষীরোদপ্রসাদের সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নাটকের আলোচনা করিব। শেক্‌স্‌পীরীয় চরিত্র সৃষ্টি এবং কাহিনী-বিন্যাস, গিরিশচন্দ্রের ভক্তিবাদ, যাত্রার সঙ্গীতপ্রবণতা এবং ক্ষীরোদপ্রসাদের কবি-কল্পনা এই সব কিছু মিলিয়া 'নর-নারায়ণ' নাটককে অপূর্ব গৌরব দান করিয়াছে। এই গুণাবলীর সমন্বয়ে উহা শুধু ক্ষীরোদপ্রসাদেরই শ্রেষ্ঠ রচনা নয়, বাংলা নাট্য-সাহিত্যে অদ্বিতীয় এবং অতুলনীয়।

আলোচনা করিতেছি। শেক্‌স্‌পীয়ারের নাট্য-রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য.

এই যে নাটকে কাহিনীটি ঘটে নায়ক-চরিত্রের মধ্য দিয়া। পারিপার্শ্বিকের সঙ্ঘাতে নায়কের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের যে বিকাশ হয়, নাটকীয় ঘটনা বলিতে তাহাই বুঝি। ঘটনার আরম্ভেই কোনো একটা বিশেষ বাসনা-সংস্কার নায়ককে পাইয়া বসে। তাহারই সমাধান বা রূপায়ণে নায়ক পারিপার্শ্বিকের সংস্পর্শে আসে। তখন অন্তর ও বাহিরের দ্বন্দ্বীভূত সম্পর্কের মধ্য দিয়া যে পরিস্থিতির প্রবাহ ছুটিতে থাকে, তাহাই নাটকের ঘটনা। 'নর-নারায়ণ' নাটকে আমরা এই শৈলীর সার্থক অনুবর্তন দেখিব। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রস্তাবনা-সঙ্গীত' এখানেও অপূর্বভাবে নাটকের প্রতিপাদ্য সত্যটিকে প্রকাশ করে—

"দৈব কিংবা পুরুষকার
বিশ্বরাজ্য কোন্ রাজার"

ইহাই এই নাটকের জিজ্ঞাস্য।

প্রস্তাবনা-সঙ্গীত শেষ হওয়ার পর নাট্যকার 'সূচনা' নাম করিয়া একটি দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন। নর-নারায়ণ নাটকের ইহাই সত্যকার সূচনা বা ভূমিকা। দৈব-পুরুষকারের যে দ্বন্দ্বে মহারথ কর্ণ অবতীর্ণ হইতেছেন, তাহার আরম্ভেই দৈব-বিড়ম্বনা। অস্ত্র-শিক্ষা অবসানের দিনেই তিনি মৃত্যু-অভিশাপ লাভ করেন। কিন্তু কর্ণ পুরুষ, তিনি দৈবের সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন, অভিশাপ:ক তিনি বিধি-নির্দেশ বলিয়া মানিয়া লইলেন না। হোমধেনু-বধের জন্য তাপস অভিশাপ দানকালে বলেন, কর্ণ যাঁহাকে মনে মনে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিবার জন্য অস্ত্র-শিক্ষা করিতেছেন, তাঁহার সঙ্গে দেহধারী নারায়ণ রহিয়াছেন। পার্থ-সখা শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণ বলিয়া মানিয়া লইতে কর্ণের প্রথম আপত্তি। কর্ণের ধারণা সর্বব্যাপী বিষ্ণুরূপী ভগবান কি করিয়া সাড়ে-তিন-হাত পরিমিত নরদেহে আবদ্ধ হইবেন ?—

"প্রতিদ্বন্দ্বী মোর ধনঞ্জয়—
সমরে পাড়িতে তারে
এত ক্লেশে আয়ত্ত করেছি ধনুর্বেদ।
মূর্খ ব্রাহ্মণের এই শাপের প্রলাপে
সেই শিক্ষা হইবে নিষ্ফল ?
বলে কি না—নারায়ণ নরদেহ-ধারী
দেহরক্ষী গাণ্ডীবীর্!

সর্বত্রগ, অনির্দেশ্য, কূটস্থ অচল
যেই ব্রহ্ম—
আচ্ছাদন করে আছে অনন্ত ভুবন,
বলে কি না—
সে পশেছে চৌদ্দপোয়া পঞ্জর-পিঞ্জরে !"

সুতরাং নারায়ণ নরদেহে অবতীর্ণ হইতে পারেন কি না ইহাই হইবে কর্ণের পরীক্ষার বিষয়। আবার গুরু পরশুরাম অভিশাপকালেও আশীর্বাদ করিয়া যান, কর্ণ যদি সত্য সত্যই সূতপুত্র হয় তবে সে সকলের অজেয়। কর্ণের বিশ্বাস, তিনি সত্যই সূতপুত্র। তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া ওঠেন।

"আশ্রমে আবদ্ধ রাখ তব অভিশাপ।
বিষাদে বিপুল হর্ষ—
সত্য—সত্য—যথা ব্রহ্ম সূতপুত্র আমি।"

কর্ণের মনে রহিয়াছে উচ্চাশা। অর্জুন-বিজয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্ব তিনি অর্জন করিবেন। দৈব আসিয়া তাঁহার পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইল বটে, কিন্তু দৈব তাঁহাকে আশীর্বাদও করিয়া গেল। সমস্ত নাট্যের যাহা বহির্দ্বন্দ্ব তাহার বীজ উপ্ত হইয়াছে এই সূচনায় নায়কের অন্তরে। সুতরাং নাটকের যাহা কিছু ঘটনা তাহা কর্ণের অন্তর্দ্বন্দ্বেরই রূপ। তাই প্রথম অঙ্কে নাটকের সত্যকার আরম্ভ হয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বাভাসে। ভীষ্ম-দ্রোণাদি দুর্যোধনকে জ্ঞাতিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু উৎসাহদাতা শকুনি এবং কর্ণ। শকুনির কোনো উদ্দেশ্য দেখা যায় না। নাটকে শকুনি-চরিত্র অস্পষ্ট, চপল, অসুন্দর। কিন্তু কর্ণের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে অর্জুনের সঙ্গে কর্ণের মহারণ হইবেই। শক্তিপরীক্ষার এবং কৃষ্ণের ভগবত্তা পরীক্ষার ইহা অপেক্ষা আর সুযোগ আসিতে পারে না। এ-সুযোগ কর্ণ কিছুতেই নষ্ট হইতে দিবেন না। কর্ণের উক্তি,—

অন্তর্যামী বিভু নারায়ণ, বাসুদেব!
তুমি যদি সেই নারায়ণ, যদি এই
অসম্ভব সত্যই সম্ভব হয়,—ওই
ক্ষুদ্র দেহের ভিতরে সত্যই যদি হে
বিরাট পশিয়া করে লীলা, এ অন্তরে
কি আছে আমার, সমস্ত অবশ্য জান

তুমি, এই যে আমার দেহ-আবরণ—
এই বর্ম সহজাত, দেবেরও অচ্ছেদ্য—
এ ত পারিবে না—
কোনো মতে পারিবে না,
এ হৃদয়ে তোমার দর্শনে দিতে বাধা।
এই সত্য আবিষ্কারে করেছি সর্বস্ব-
দান পণ। এই সত্য আবিষ্কারে আমি
জীবন-মরণ যুদ্ধে করিতে চলেছি
একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী তোমার সথায়।"

—প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য।

কিন্তু কেন? কর্ণ জানেন, সহজাত-কবচ-কুণ্ডল-ধারী কর্ণ দেবেরও অবধ্য। তাহা ছাড়া সত্যবাদী রামের অভিশাপ-মুখে সেই আশীর্বাণী, কর্ণ সত্য সত্য সূত্রপুত্র হইলে তিনি অপরাজেয়,—

"ব্রহ্মর্ষি রামের সেকথা যদ্যপি
সত্য হয়, হে মায়া-মনুষ্য-নারায়ণ
তোমারও অবধ্য আমি।
সেই আমি
কবচ-কু ণ্ডধারী রাধার নন্দন,
যদি মরি অর্জুনের বাণে—যদি—যদি
মরি, তবে, সেই মৃত্যু-মুখে বাসুদেব,
তোমারে বলিব নারায়ণ।" —প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য।

কিন্তু কর্ণের বিশ্বাস যে ধ্রুবতারার মতো স্থির নয়, সংশয়ের দোলা যে কর্ণের হৃদয়ে লাগিয়াছে, তাহা বুঝা যায় যখন এই দৃশ্যে তিনি পদ্মাবতীর সঙ্গে আলাপ করেন। পদ্মাবতীর ধারণা, দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার পাপে কৌরব এবং কৌরব-বন্ধু সকলেই মরিয়া গিয়াছে। কর্ণ তাহা জানিয়াও অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন। পদ্মাবতী বলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সহায়। কর্ণের অবিশ্বাসী মন অমনি আহত হইয়া ওঠে,—

"এই
অতি অশ্রদ্ধেয় বাণী কে তোরে শুনালো
পাগলিনী?

পদ্মাবতী মহর্ষি ব্যাস এবং সর্বার্থদর্শী সঞ্জয়ের উল্লেখ করেন। প্রশ্নানোন্মত কর্ণ স্বীকার করিয়া যান,—

"পদ্মাবতী!
আমিও শুনেছি ঋষি মুখে
ধনঞ্জয়-বাসুদেব নর-নারায়ণ।
বিশ্বাস না করি, প্রীতি করি।......
তথাপি তোমারে বলি, শুন পদ্মাবতী,
সত্য আমি হই যদি রাধার নন্দন,
অধিরথ যদি মোর পিতা, শুনে রেখো—
নিশ্চয়—নিশ্চয় আমি পরাস্ত করিব
রণে নর-নারায়ণে।"

কর্ণের অন্তরে যে সন্দেহের প্রতিক্রিয়া শুরু হইয়াছে, ঐ 'যদি' কথায় তাহা ধরা পাড়য়া যায়। 'হই যদি রাধার নন্দন' কথাটি পদ্মাবতীও ধরিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু স্বামীর ভবিষ্যৎ অকল্যাণ তিনি ভাবিতেও পারেন না। তিনিও নিজের মনে রাধার ঐ মাতৃস্নেহের আলোচনা করিতে গিয়া দৈব-প্রেরণায়ই যেন বলিয়া বসেন,—

"ওই যে অপূর্ব স্নেহ—বাৎসল্য অপূর্ব—
তুল্য যাহা কেবল—কেবল যশোদার—"

পরে তিনি নিজের মনেই প্রশ্ন করেন.—'যশোদার?' যশোদাও ত মা নহেন, ধাত্রী নাট্যকার এখানে একটি dramatic irony-র সৃষ্টি করিয়া ভবিষ্যৎ পরিণতি আভাস দিয়া যান।

কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের আন্দোলন শুরু হইলেও কর্মের মধ্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্ত প্রমাণিত না হইলে কর্ণ কেন বিশ্বাস করিবেন? কর্ণ শুনিলেন, শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনায় দূতরূপে আসিতেছেন। শুনিয়াই তিনি তাঁহাকে বন্দী করিতে আদেশ করিলেন। সম্মানার্হ, অবধ্য দূতকে নির্যাতন কাপুরুষোচিত জানিয়াও কর্ণ কেন এই আদেশ দিলেন? কারণ যিনি ভগবান, তিনি অন্তর্যামী। শ্রীকৃষ্ণ যদি ভগবান, তিনি নিশ্চয়ই দুর্যোধনের মনোবাসনা এবং শক্তি সম্বন্ধে সজাগ। সুতরাং হস্তিনায় তাঁহার দূতরূপে আগমন দুঃসাহসিক। দুর্যোধনের অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ করিতে

হইলে একাকী শ্রীকৃষ্ণকে ঐশী শক্তির সাহায্য লইতেই হইবে। কর্ণ তাহা পরীক্ষা করার জন্যই এই অন্যায় আদেশ দিলেন। কর্ণের কৌতুহল—

"একাদশ-অক্ষৌহিণী-পতি দুর্যোধন,
তদুপরি প্রকৃতি তাহার সবিশেষ
জ্ঞাত আছ তুমি! জানিয়াও আজ তুমি
এসেছ স্বয়ং দৌত্যে হস্তিনা-নগরে
যদুপতি! এ সাহস যার—কি বলিব—
হয় সে নিতান্ত জড়, নয় নারায়ণ।
... ... জেগেছিল তীব্র
ইচ্ছা দেখিবার, আপন আয়ত্তে পেয়ে
ভীম শক্তিধর ঐ দুরন্ত কৌরব
কেমনে তোমায় বন্দী করে।..."

কিন্তু কর্ণের অবচেতন মন যে জাগ্রত-মনের অজ্ঞাতে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্ত বিশ্বাস করিয়া লইয়াছে, তাহা নিদ্রিত কর্ণের স্বগতোক্তির মধ্য দিয়া জানা যায়। যোগী কর্ণের হৃদয়ে কৃষ্ণমূর্তি বিরাজিত। সেই ধ্যেয় মূর্তি স্বপ্নের মধ্য দিয়া রূপায়িত হয়। কেন না, নিদ্রার রাজ্যে চেতন মনের সংস্কার অবলুপ্ত হইয়া অতন্দ্র, বিশ্বাসী মনের জাগরণ হয়। স্বপ্নে কর্ণ দেখেন,—

"ও কি ও সুন্দর, ও কি মধুরূপা-রেখা!
ও কি বর্ণ, নবীন নীরদ ও কি আঁখি—
আয়ত-মধুর? বাসুদেব—বাসুদেব—
এমন কিশোর তুমি?"

দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণকে যে বাঁধিতে পারিবে না এ ধারণা কর্ণের মনে সুপ্ত ছিল। কিন্তু জাগ্রত কর্ণের মুখে মনের ঐ কথা ফুটিয়া বাহির হয় নাই; সন্দেহ সেখানে বিশ্বাসকে চাপা দিয়া রাখিয়াছে। স্বপ্নের মধ্য দিয়া সেই বিশ্বাসী মনের জাগরণ হইল,—

"মৃণাল-তন্তুর
স্পর্শে কম্পিত তোমার তনু হে কঠোর!
এতই কোমল তুমি!—তোমারে বাঁধিবে?
কে বাঁধিবে?—কে বেঁধেছে?—কবে?
সে কি ওই... ... ...ক্ষমতার

গ্রন্থিতে কঠোর অহঙ্কার-
রজ্জুমূর্তি দুর্যোধন ?"

বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের এই তীব্র দ্বন্দ্বের খেলা এমন করিয়া বাংলা নাটকে আর কেহ দেখান নাই।

কিন্তু স্বপ্নাভিভূত কর্ণ যাহাই করুক না কেন, জাগ্রত কর্ণ কৃষ্ণের ভগবত্ত্ব স্বীকার করিবেন না। তবুও ইহার মধ্যে দুইটি অপূর্ব কাণ্ড ঘটিয়া গেল। কৃষ্ণ বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া দুর্যোধনের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিলেন। ওদিকে দেবরাজ ইন্দ্র আসিয়া কর্ণের কবচ-কুণ্ডল ভিক্ষা করিয়া লইলেন। সূর্যের নিকট হইতে স্বপ্নে ইন্দ্রের ষড়যন্ত্রের কথা কর্ণ জানিয়াছিলেন। জানিয়াও দাতৃশিরোমণি নিজের হাতে কবচ-কুণ্ডল দান করিয়া শক্তিহীন হইলেন। বিস্মিত দেবরাজ কর্ণকে একঘ্ন বাণ দান করিয়া গেলেন। কর্ণ একদিকে যেমন কৃষ্ণের বিশ্বরূপকে ভোজবাজী বলিয়া উড়াইয়া দিতেছেন অন্যদিকে তেমনি ভাবিতেছেন,—

"কবচ-কুণ্ডল গেছে—যাক—
আছে কর্ণ—আর তার উপাধি রাধেয় !"

—দ্বিতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য।

কিন্তু তাহাও আর থাকিল না। শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া কর্ণের জন্ম-রহস্য প্রকাশ করিলেন। নিয়তির কি নিষ্ঠুর লীলা ! কর্ণের কবচ-কুণ্ডল গিয়াছে, এবার 'রাধেয়' উপাধি গেল। সুতরাং একবিঘাতিনীও যে একদিন তাঁহাকে প্রতারণা করিবে আজ আর কর্ণের তাহা মনে করিতে বাধা নাই। কৌন্তেয় কর্ণ যে অর্জুনের বধ্য। কর্ণকে অর্জুনের বাণ তো বধ করিবে না,—করিল কৃষ্ণের দেওয়া এই সংবাদ,—

"জানিয়া পরম শত্রু মোরে
বধিতে কি এলে কৃষ্ণ ? হেসো না ?—হেসো না—
এ হইতে সুতীক্ষ্ণ নয় গাণ্ডীবীর বাণ।"

—দ্বিতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য।

নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়াও কর্ণ পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করিলেন না। পৌরুষের সঙ্গে এবার অভিমান দেখা দিল। সত্য যদি তিনি কৌন্তেয়, তবে অসহায় সদ্যোজাত নিরপরাধ শিশুকে যে বিসর্জন দিয়াছে, তাঁহার জন্যই আজ কর্ণ জগতের ঘৃণিত সূতপুত্র। সুতরাং এই আকস্মিক সম্মানজনক সৌভাগ্য

কর্ণকে আরো ব্যথিত করিল। অদৃষ্টের তীব্র ব্যঙ্গ আজ তিনি বুঝিতে পারিলেন। তাই কর্ণের দারুণ অন্তর-জ্বালা,—

"প্রতিযোদ্ধা-জ্ঞানে এতকাল যার বধে
নিশিদিন করিয়াছি উপায় কল্পনা—
অদৃষ্টের তীব্র পরিহাস—
আজ সে আমার কৃষ্ণ কনিষ্ঠ সোদর!
দূর হতে যারে দেখে প্রমত্ত কামনা
ছুটিবে বাঁধিতে বক্ষে মুগ্ধ আলিঙ্গনে,
হে প্রিয়, হে প্রিয়তম—
এক হস্ত চক্ষে দিয়া,
অন্য বাহু প্রসারিয়া,
বিঁধিতে হইবে মোরে মর্মহীন শরে—
প্রাণাধিক সেই ধনঞ্জয়ে।"

—দ্বিতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য।

অর্জুনকে পরাজিত করিয়া পৌরুষ অর্জনের বাসনা আজ দুইদিক হইতে বাধা পাইতেছে। একদিকে দুর্বার নিয়তি কর্ণের শক্তি ও বিশ্বাস খর্ব করিয়া দিতেছে, অন্যদিকে প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত মমতার সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হওয়ায় ভ্রাতৃবৎসল হৃদয় পৌরুষে জলাঞ্জলি দিয়া পরাজয় বরণ করিতে অনুরোধ জানায়। কিন্তু কর্ণের অবহেলিত, অনাদৃত মনুষ্যত্ব তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে আহ্বান করে।—

মর্ম চায় পরাজয়, সত্য চায় জয়,
মনুষ্যত্ব চায় নিষ্ঠুরতা…………।" —দ্বিতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য।

মনুষ্যত্বের অভিমান উদ্দীপ্ত হইল।

কর্ণের সকলই গিয়াছে। সম্বলমাত্র বাসবদত্তা একঘ্নী শক্তি। কিন্তু তাহাও তাঁহাকে ফাঁকি দিতে বিলম্ব করিবে না।—তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য। জয়দ্রথ নিহত হইয়াছে। কর্ণ পদ্মাবতীর নিকট সেই আশ্চর্য কাহিনী বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তায় আজ আর কর্ণের অবিশ্বাস নাই। সুদর্শন-চক্রের আচ্ছাদনে সূর্যকে ঢাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের প্রাণ রক্ষা করিলেন। বিশ্বরূপ-দর্শন কর্ণ বিশ্বাস করেন নাই। তিনি তখন উপস্থিত ছিলেন না। দৈব-প্রদত্তা শক্তিও তখন তাঁহার নিকট হইতে অন্তর্হিত হয়

নাই, কিন্তু এবার যুদ্ধে কর্ণ নিজে উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শনে সূর্য-আচ্ছাদনের প্রসঙ্গটি তিনি বিশ্বাস করিয়াছেন। কিন্তু তবুও তিনি মুখে তাহা প্রকাশ করিবেন না। সম্ভাব্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়া তিনি প্রসঙ্গটির অলৌকিকত্ব ঢাকা দিতে চাহিতেছেন।—

"কেহ বলে—উল্কার প্রবাহ
রশ্মি-আগমন-পথ রোধ করেছিল।
কেহ বলে—অস্তমুখে রাহু-আক্রমণ,
কিন্তু অনেকেই বলে সূর্য ঢেকেছিল
সুদর্শন।"

অনেকে যাহা বলিতেছে, বক্তার নিজের স্বীকৃতিও তাহারই সঙ্গে। তবুও মুখে তিনি তাহা স্বীকার করিতেছেন না। মনস্তাত্ত্বিক নাট্যকার ধীরে ধীরে কাহিনীর ও চরিত্র-বিকাশের-মধ্য দিয়া কর্ণের অবিশ্বাসী মনকে বিশ্বাসী করিয়া তুলিতেছেন। কর্ণ মুখে সোজাসুজি প্রকাশ না করিলেও ঘুরিয়া ফিরিয়া স্বীকারই করিতেছেন। তাই পদ্মাবতী যখন বলেন,—

"আমিও তাহাই বলি প্রভু—
ঢেকেছিল সুদর্শন।"

পৌরুষাভিমানী কর্ণ তখন বলেন,—

"ঢাকুক, তথাপি নয় তোমার কেশব।
সত্য, যতদিন
নিজে নাহি উপলব্ধি করি, ততদিন,
বিধাতাও দিলে সাক্ষী, মানব বলিব
বাসুদেবে। মানব, মানব—তবে রাণী,
মুক্তকণ্ঠে বলি আমি—অপূর্ব মানব!
ধরণীতে বিধাতার সর্বশ্রেষ্ঠ দান!
সৃষ্টি হতে আজিও পর্যন্ত এমনটি
আসে নাই আর—এই পূর্ণ মানবতা।"

শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা কর্ণ উপলব্ধি করিবেন নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়া। কিন্তু একবিঘাতিনী থাকিতে তাঁহার মৃত্যু নাই। আজ তিনি 'বক্ষের পঞ্জর-সনে' সেই মহাস্ত্রকে বাঁধিয়া লইয়াছেন। নিজের শক্তিতে বিশ্বাসী কর্ণের

আজ সন্দেহ কত প্রবল! আজ তিনি নিয়তির নিকট কেমন অসহায়ভাবে মাথা নত করিতেছেন। অর্জুনের মৃত্যু ও নিজের মৃত্যুর মধ্যে শেষটির কথাই বারে বারে তাঁহার মনে জাগিতেছে। ওদিকে মহাস্ত্রে বিশ্বাসও তিনি হারাইতেছেন না। তিনি ভাবিতেছেন, হয় অর্জুনের, না হয় কর্ণের আজ শেষ রাত্রি। কিন্তু এতদিন কেন কর্ণ এই একঘ্ন বাণের সদ্‌ব্যবহার করেন নাই? নিয়তির ক্রুর হাসিকেও তিনি দিব্যাস্ত্র প্রভাবে এক মুহূর্তেই ভস্ম করিয়া দিতে পারিতেন। সুতরাং নিয়তি বাহির হইতেই শুধু কর্ণকে বাধা দেয় নাই। নিয়তি বাসা বাঁধিয়াছে কর্ণের অন্তরে। ভগবান কৃষ্ণের দৈব-প্রেম কর্ণকে এই অস্ত্র গ্রহণে বাধা দিয়াছে। বিশ্বরূপ কৃষ্ণ ইষ্টরূপে কর্ণের হৃদয়-আসন অধিকার করিয়া বসেন,—

> "প্রতি রাত্রিকালে, মনে করি পদ্মাবতী,
> এই অস্ত্র সঙ্গে লয়ে যাব রণস্থলে
> বধিতে অর্জুনে! কিন্তু কি আশ্চর্য রাণী,
> শয্যা-ত্যাগ-কালে যেমনি করিতে যাই
> ইষ্টের স্মরণ, অমনি কেমন করে
> তোমার কেশব আসি সম্মুখে দাঁড়ায়।
> নবীন-নীরদ-শ্যাম সেই আবরণে,
> ইষ্ট দিবাকর পড়ে যেন, দূরে দূরে—
> সুদূর পশ্চাতে। অমনি এ অস্ত্র কথা
> মুছে যায় স্মৃতি হতে!......"

সুতরাং দেখিতেছি, শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা আজ আর বাহিরে নয়, কর্ণের অন্তরেও প্রতিষ্ঠিত। কর্ণ সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা বিজিত। কর্ণ নিয়তির দ্বারা পরাভূত নয়, পরাভূত নিজের অন্তরের দ্বারা। কর্ণের অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের এই আবির্ভাব কি নিতান্ত দৈব ঘটনা? তাহা নয়। শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক শক্তির পরিচয় বিশ্বরূপ প্রকাশে, ভীষ্মদেবের নিধনে, জয়দ্রথ বধে। সুতরাং কার্য-কারণ-সম্বন্ধের সংস্কারে কর্ণের অনবধানেই এই বিশ্বাস তাঁহার অন্তরে বাসা বাঁধিতেছে। তাই সেই বিশ্বাসপ্লুত হৃদয়ে স্বাভাবিক ভাবে ইষ্টমূর্তিরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আর ইহাতে সাহায্য করিয়াছে তাহার সহধর্মিণী পদ্মাবতীর কৃষ্ণনিষ্ঠা। সুতরাং ইহা অলৌকিক নয়, স্বাভাবিক; অকারণ নয়, সকারণ। আজ তাই কর্ণ নিজের

জীবনে ও একঘ্ন বাণের শক্তিতে সংশয়ী। যুদ্ধযাত্রার প্রাক্‌কালে তিনি তাই পদ্মাবতীর নিকট গোপন চরম সত্য প্রকাশ করিয়া যান।

কর্ণের সম্মুখে নিয়তির আবির্ভাব হইল। সত্যদ্রষ্টা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সৈন্য-চালনার যে নির্দেশ দিলেন, তাহাতে সেনাপতি অর্জুন নয়। ঘটোৎকচকে উৎসাহ দিয়া তিনি কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন। ঘটোৎকচকে হত্যা করিয়া একবিঘাতিনী বিদায় লইল।

শেষ দৃশ্য। রণক্ষেত্রে ভগ্নরথে পৃষ্ঠ দিয়া কর্ণ উপবিষ্ট। শক্তিমান পুরুষ আজ জীবন-সায়াহ্নে স্মৃতির সঙ্কলন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ ধারণ, সুদর্শনে সূর্য-আচ্ছাদন ও একঘ্ন-বাণ ব্যর্থকরণ তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। আজ শেষ দিনে দেখিলেন বাসুকি-প্রদত্ত নাগ-অস্ত্রকে শ্রীকৃষ্ণ কি করিয়া ব্যর্থ করিলেন। তাই মৃত্যুমুখে তিনি স্বীকার করেন,—

"আর ত মানব বলা চলে না তোমায়
বাসুদেব! দেবের যা সাধ্য-বহির্ভূত,
বাঁচাতে সখারে তুমি সে-কার্য করিলে।
ওই নমনীয় দেহে ধরে কি বিশ্বের
ভার, হে কৃষ্ণ করিলে তুমি কপিধ্বজে
ভূতলে প্রোথিত ?............
সেই বাসব-প্রদত্তা
শক্তি—জ্বালাময়ী নাগের নিশ্বাসে গেলো
ভৈরব হুঙ্কারে শূন্যে ছুটে, ফিরে এলো
শুদ্ধ মাত্র কিরীটীর কিরীট কাটিয়া ?"

কিন্তু শুধু শ্রীকৃষ্ণই কি কর্ণকে ব্যর্থ করিয়াছেন? তাহা নহে। নিজের স্নেহ-দৌর্বল্যও কর্ণের মৃত্যুর অন্যতম কারণ। পুরুষকার মমতার নিকটও পরাজিত হইয়াছে। কর্ণের মৃত্যুরূপা নিয়তি তাহার মাতা কুন্তী। যে-মায়ের প্রভাব তিনি স্বীকার করিবেন না বলিয়াছেন সেই মায়ের প্রভাবই তাঁহাকে মানিতে হইয়াছে। অর্জুনকে রক্ষা করিয়াছে কর্ণের সোদর-মমতা।

"অমরত্ব করিয়া আশ্রয়
যতবার তুলিতে গেছে সে মৃত্যু-শর,
অমনি তাহারে দিতে বাধা—ওই—ওই—
আবার আকাশে প্রিয়তম—ওই সেই

দর-বিগলিত-আঁখি, ম্লানতারূপিণী
ভিক্ষার অঞ্জলি-ভরা, যেন কত চৌর্য
অপরাধ-রূপা, আমার কৌমার্যময়ী
মাতা। ওই—ওই তীব্র মাতৃ-আবির্ভাবে
অমরত্ব বিলায়েছি, অস্তিত্ব সযত্নে
লুকায়েছি, এ অন্তরে বিস্মৃতি ঢেলেছি
ভারে ভারে—………।'

আর তাহারই ফলে কর্ণের মৃত্যু ঘনাইয়া আসিল। শেক্‌স্‌পীয়রীয় দৃষ্টি-ভঙ্গীতে দেখিতে গেলে নাটকখানা ট্রাজেডী। এই ট্রাজেডী আসিয়াছে দুইদিক দিয়া। কর্ণ পৃথিবী-বিজয়ের ক্ষমতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রতিকূল দৈব তাঁহাকে বারংবার বিড়ম্বিত করিয়াছে। ব্রাহ্মণের অভিশাপের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। ব্রহ্মর্ষি রামও তাঁহাকে অভিশাপের মধ্য দিয়া যে আশীর্বাদ করিয়া গেলেন, তাহাও নিয়তির ব্যঙ্গে ব্যর্থ হইয়া গেল। কর্ণ কুন্তীপুত্র। শেষ সম্বল একবিঘাতিনী। তাহাও শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে শক্তির প্রহসনে পর্যবসিত হইল। তবে কি ইহা গ্রীক-ট্রাজেডী? কেন না নিয়তি-নির্যাতিত মানবাত্মা পৌরুষ সম্বল করিয়া ভাগ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু ইহা বিশুদ্ধ গ্রীক-ট্রাজেডী নহে। কর্ণের চারিত্রিক মহনীয় দুর্বলতাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। একদিকে মৃত্যুরূপা জননী, অন্যদিকে ইষ্টরূপী কৃষ্ণ। তাই নাটকটি শেক্‌স্‌পীয়রীয় ট্রাজেডীর উপকরণ বহন করে; কিন্তু ভারতীয় ভক্তিবাদ ও আদর্শবাদে ট্রাজেডীর বিষণ্ণতা একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়। মৃত্যুর মধ্য দিয়াও নর-নারায়ণের প্রেম-পরিচয়ে কর্ণের শূন্য জীবন পূর্ণ হইয়া ওঠে। ট্রাজেডীর বেদনাকে ঢাকিয়া দিয়া মহামিলনের সুর বাজিয়া ওঠে। সুতরাং ইহা ট্রাজেডীও নহে।

কাহিনী বিন্যাসে ইহা যে শেক্‌স্‌পীয়রীয় নাট্য-শৈলীর সার্থক অনুবর্তন তাহা আমরা স্বীকার করিবই। কেন না, নাটকের কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে নায়কের চরিত্র-বিকাশের মধ্য দিয়া। অন্যান্য চরিত্র আসিয়াছে কর্ণ-চরিত্রেরই প্রয়োজনে। 'ভীষ্ম' নাটকের কাহিনী-বিন্যাসে এবং নায়ক-চরিত্র-বিশ্লেষণে আমরা যে দুর্বলতা দেখিয়াছি, এই নাটকে তাহা নাই। তাহার কারণও রহিয়াছে। 'নর-নারায়ণ' নাটকে ঘটনার কালের পরিসর অতি সঙ্কীর্ণ। অষ্টাদশ-পর্বের অতি সামান্য অংশই মাত্র এখানে গৃহীত হইয়াছে।

তাহাও সবটুকু নয়। কর্ণের উপস্থিতি ঘটনায় যেখানে যেটুকু প্রভাব-বিস্তার করিয়াছে, ততটুকু মাত্র। মধ্যের যে ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা সুকৌশলে নাটক হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ঘটনার শৃঙ্খল হইতে দুই চারিটি বলয় তুলিয়া লইলে তাহার সংহতি ভঙ্গের যে-সম্ভাবনা আসিতে পারে, এই নাটকে তাহা আসে নাই। কেন না, প্রত্যেক পূর্ববর্তী ঘটনাই পরবর্তী ঘটনাকে অনিবার্য প্রয়োজনে আমন্ত্রণ করিয়া চলিয়াছে। সুতরাং কাহিনীর অভ্যন্তরে নায়কের অন্তর্দ্বন্দ্বের গতিবেগ অনুপ্রবিষ্ট হইয়া উহাকে সরল ও সবল করিয়া রাখে। একটি ঘটনা অন্যটির অবশ্যম্ভাবী আকর্ষণ। বিশ্লেষণ করিলেই আমরা তাহা বুঝিতে পারিব। আদি পর্বের অস্ত্র-শিক্ষারত কর্ণ হইতে আমরা একেবারে সভাপর্বে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সম্ভাবনায় আসিয়া পৌঁছিলাম। কেন? কেন তাহার উত্তর এই যে, সূচনা-দৃশ্যে কর্ণের যে উচ্চাশা ও দুর্ভাগ্য আমরা যুগপৎ লক্ষ্য করিয়াছি, তাহারই একটা কিছু ঘটমানতা আমরা আশা করিয়াছিলাম। নাট্যকার মধ্যে অন্য কোনো ঘটনার বিবৃতি করিয়া আমাদের সেই প্রতীক্ষমানতাকে বিলম্বিত করেন না। কর্ণের সাহায্যের ও শক্তির উপর নির্ভর করিয়া দুর্যোধন হিতার্থী গুরু ও পিতামহের বাণী উপেক্ষা করিয়াছিলেন ইহা মহাভারতের সত্য। সুতরাং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যে কর্ণেরই সৃষ্টি, নাটকে কাহিনীর এই ব্যাখ্যা দিতে নাট্যকারের কষ্টকল্পনার দরকার হয় না। কিন্তু কল্পনা ঐখানে যে তিনি ইহাতে কর্ণের অন্-আর্যোচিত দুর্ব্যবহার দেখান নাই। সমবেদনা ও কবি-কল্পনা দিয়া কর্ণ-চরিত্রে মহত্ত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের বন্ধনেও কর্ণের উদ্দেশ্য মহৎ হইয়া ওঠে। কর্ণ-চরিত্র বিকাশে ভীষ্মের সহিত কলহ, কবচ-কুণ্ডল-দান, বিশ্বরূপ দর্শন, কৃষ্ণ কর্তৃক কর্ণের পরিচয়-দান এবং ঘটোৎকচ-বধ, এই কয়টি প্রসঙ্গের প্রয়োজন ছিল। ইহার প্রত্যেকটি কর্ণের ধারণা-ভাবনায় যুগান্তর আনিতে, বিশ্বাসকে আন্দোলিত করিতে এবং হৃদয়-বৃত্তির দ্বন্দ্বের বিকাশে অপরিহার্য। নাট্যকার সেই কয়টি প্রসঙ্গকে গ্রহণ করিয়া নির্বাচন-কৌশলের ও সংযমের পরিচয় দিয়াছেন। আবার এগুলি ঠিক প্রসঙ্গও নয়, এক একটি মুহূর্ত মাত্র। কেন না, প্রসঙ্গগুলির বহির্দ্বন্দ্বের রূপ নিতান্ত গৌণ। প্রতিটি পরবর্তী কাহিনী পূর্ববর্তী কাহিনীর অনিবার্য আকর্ষণে আনীত হইলেও শুধুমাত্র নায়কচরিত্রেরই সজ্ঘাতে যে উহাদের একটি আর একটির সৃষ্টি, তাহা বলিতে পারি না। অনেক সময়ে

বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে কতকগুলি বহিরাগত প্রেরণা আসিয়া আকস্মিকভাবে নায়কের হৃদয় আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছে। অন্তরের সেই ভাববিক্ষুব্ধ আন্দোলনের মাধ্যমেও নায়কের চরিত্র বিকাশ হইয়াছে। কবচ-কুণ্ডল দান হইতে একঘ্ন বাণ প্রাপ্তি কর্ণ-চরিত্রের পূর্বগামী অধ্যায়ের অনিবার্য সৃষ্টি নহে, আবার ঘটোৎকচ-বধে সেই শক্তির অপচয় নায়ক বা প্রতিনায়কের সৃষ্ট কর্ম-সঞ্জাতে হয় নাই। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধি-কৌশলকে নাট্যকার যবনিকার অন্তরালে রাখিয়া বহির্দ্বন্দ্ব এড়াইয়া গিয়াছেন। তাই দেখা যায়, কর্ণের হৃদয়কে তড়িৎ-শক্তির মতো স্পর্শ করিয়া এই মুহূর্তগুলি যতটুকু আলোড়িত করিয়াছে, তাহার ভিতরেই ইহাদের সার্থকতা। এই প্রসঙ্গগুলি কর্মময়রূপে নাটকে ততখানি উপস্থিত হয় নাই, যতখানি আসিয়াছে আবেগময় ভাব-সত্তায়।

প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে সভামণ্ডপে ভীষ্মাদি হিতার্থিগণ দুর্যোধনকে যুদ্ধে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিতেছেন, কিন্তু বাধা দিতেছেন কর্ণ। এই দৃশ্যে বিশেষ কোনো অন্তর্দ্বন্দ্বও নাই, বহির্দ্বন্দ্বও নাই। কর্ণের প্রতি ভীষ্মের স্বাভাবিক অশ্রদ্ধা এবং ভীষ্মের প্রতি কর্ণের শ্রদ্ধাহীন উক্তিমাত্র এই দৃশ্যে রহিয়াছে। ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে পুত্রস্নেহ এবং অর্জুন-ভীতি আছে বটে, তাহাও অস্পষ্ট। কেন যে কর্ণ বিরোধিতা করেন, তাহা এই দৃশ্যে বুঝিবার উপায় নাই। তাহার কারণও রহিয়াছে। এই নাটকের দ্বন্দ্বও পরিস্থিতিঃ বহিরঙ্গ সঞ্জাত নয়। দ্বন্দ্ব চলিতেছে কর্ণের মনে। উপযুক্ত পরিবেশ না পাইলে তো অন্তরের কপাট খুলিয়া দেওয়া যায় না! কেন যে কর্ণ কুরুক্ষেত্রের ভীষণ যুদ্ধ ঘটাইয়া তুলিতেছেন, তাহা দুর্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ কাহারও নিকট খুলিয়া বলা সম্ভব নহে। বলা যায় একমাত্র নিজের অন্তরের কাছে এবং সেই অন্তরের অংশভাগিনী অন্তরঙ্গা স্ত্রীর নিকট। তাই দেখা যায়, কর্ণ-চরিত্র রূপায়ণে নাট্যকার প্রায়ই স্বগতোক্তির আশ্রয় লইয়াছেন। যেখানে স্বগতোক্তিতে কুলায় না, সেইখানে তিনি পদ্মাকে আনিয়াছেন। পদ্মা কর্ণের সহধর্মিণী। কর্ণ যে সত্যকে জীবন দিয়া উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছেন, পদ্মা স্থিরবিশ্বাসের মধ্য দিয়া তাহা আগেই জানিয়া লইয়াছে। কিন্তু আত্ম-সমর্পিতা স্ত্রী সে। স্বামীর বিশ্বাসে সে এতটুকুও আঘাত করে না। শুধু কান্তাসম্মিতভাবে নিজের ধারণা ব্যক্ত করে। স্বামীর নিকট নিজের বিশ্বাস উপস্থাপিত করে সে সেবিকার বিনয় ও শ্রদ্ধায় অভিষিক্ত করিয়া। তাই

তাহার এই মধুর অথচ বজ্রকঠোর বিশ্বাসের নিকট কর্ণের পৌরুষ-দীপ্ত পরীক্ষমানতাও বিশ্বাসের মাধুর্যে অবনমিত হয়। কর্ণ সংশয়ের চাঞ্চল্য, পদ্মা বিশ্বাসের মৌনা ধৃতি। তাই কর্ণের অন্তর-বিশ্লেষণে পদ্মার অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা। নিজের শক্তিতে কর্ণ যে অটলবিশ্বাসী নন, শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তায় তাঁহার সন্দেহের অন্তরে অন্তরে যে বিশ্বাসের ফল্গুস্রোত বহিয়াছে, তাহা আমরা জানিতে পাই প্রিয়তমা পত্নীর স্থির বিশ্বাসের সংস্পর্শে আসিয়া কর্ণ যখন তাঁহার নিকট নিতান্ত নিরুপায়ের মতো নিজের অন্তরের কথা ব্যক্ত করেন তখন। কর্ণের সঙ্কল্প একমাত্র স্ত্রীর নিকটেই প্রকাশ পাইতে পারে, কেন না পদ্মাকে কর্ণ জানেন। পদ্মা কোনো দিন স্বামীর চিন্তায় ও কর্মে ব্যাঘাত ঘটায় নাই। তাই কর্ণ তাহাকে ভালবাসেন। পদ্মার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্নের কৌতূহল মিটাইতে গিয়া, তাঁহার অটল বিশ্বাসকে এতটুকু আঘাত দিতে গিয়া কর্ণ নিজেকেই প্রকাশ করিয়া ফেলেন। তাই এই নাটকে কর্ণ-চরিত্র প্রকাশে পদ্মা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়। এবং উহাতেই পদ্মা-চরিত্রের সার্থকতা।

আর একজনকে কর্ণ বিশ্বাস করেন, ভালওবাসেন। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধেই কর্ণের সবচেয়ে বেশী সন্দেহ। পুরুষকার অবলম্বন করিয়া তাঁহাকেই তিনি পরীক্ষা করিবেন। পুরুষকারের শক্তি ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া নিষ্ঠুর নিয়তির মতো তাঁহারই আবির্ভাব হইল কর্ণের গৃহে। কর্ণ শ্রীকৃষ্ণের মুখে শুনিলেন, তিনি রাধেয় নন্। তাঁহার অন্তর-সত্য জানিবার এই দ্বিতীয় সুযোগ। কর্ণের ধারণা ও মনোভাবের পরিবর্তন হইল। এবার আর পৌরুষ-পিপাসা নয়,—অনাদৃত সন্তানের অভিমান। ইহা যে কত তীব্র তাহা শুধু কৃষ্ণেরই বোধগম্য। কৃষ্ণের নিকট তাই তিনি অন্তর খুলিয়া দেন। বিশ্বরূপ দর্শনে মুগ্ধ লোকের মুখে তিনি যাঁহার কথা শুনিয়াছিলেন, আজ তিনি সম্মুখে। আর তাঁহারই মুখে সমস্ত জীবনের সাধনা ব্যর্থ করা যে জন্ম-পরিচয় তাহাই তিনি শুনিলেন। সুতরাং অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই। কৃষ্ণ-চরিত্রও নাট্যকারের অপূর্ব কৌশলে কর্ণের অন্তর্দ্বন্দ্ব বিকাশের ও কর্ণ-চরিত্রের পরিণতির প্রয়োজনে নাটকে রূপায়িত হইয়াছে।

কবচ-কুণ্ডল-দানে শক্তিহীন হইয়াও শক্তিমান কর্ণ এক-বিঘাতিনীর ভরসা করিয়াছিলেন, ঘটোৎকচ-বধে তাহাও গেল। সুতরাং ঘটোৎকচ কর্ণ-জীবনে নিয়তির অভিশাপ। এই নাটকে এমন কোন প্রসঙ্গ বা চরিত্র নাই

যাহা কর্ণ-চরিত্র বিকাশের অনিবার্য প্রয়োজনে আসে নাই। এইখানেই নাট্যকারের কৃতিত্ব।

প্রশ্ন হইতে পারে, অর্জুনকে উপাংশুব্রতের প্রসঙ্গ কি নাট্যকারের মধ্যে অবাঞ্ছিত ও আকস্মিক নয়? প্রধান কাহিনীকে একটুখানি স্তব্ধ করিয়া রাখিয়া এই গৌণ প্রসঙ্গটি খানিকক্ষণ স্থান জুড়িয়াছে বটে, কিন্তু ইহাও যে কর্ণবধে একান্ত প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণ যখন সেই প্রয়োজনের ব্যাখ্যা করেন, তখন আর ইহাকে গৌণ বলিয়া মনে হয় না।

যাহা হউক আমরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম যে, এই নাটকের প্রধান আকর্ষণ কর্ণের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং তাহার অবলম্বন কয়েকটি বিশেষ মুহূর্ত। মুহূর্ত কয়টির উল্লেখ আমরা করিলাম। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিবার প্রয়োজন আছে। পূর্বেই খানিকটা বলিয়াছি যে, কর্ণের চরিত্র-বিকাশে ঐ মুহূর্তগুলির অনিবার্য প্রয়োজন থাকিলেও উহাদিগকে অবলম্বন করিয় কর্ণ সৃষ্ট হইয়াছেন, কর্ণ উহাদিগকে সৃষ্টি করেন নাই। তাই বলিয়া ইহাকে 'ভীষ্ম' নাটকের মতো সংস্থিতিপ্রাণ বলিতে পারি না। সংস্থিতিগুলি চরিত্র-বিকাশের বিভাব মাত্র। তাই ইহা আমাদিগকেও সংস্কৃত নাটকের রস-নিষ্পত্তি ও কাব্য-প্রবণতা ধরাইয়া দেয়। বস্তুতঃ এই নাটকখানি যতখানি নাট্য, ঠিক ততখানি কাব্য। আর ঐ কাব্যত্বই নাটকখানির প্রধান আকর্ষণ।

সংস্কৃত নাটকের মতো এই নাটকেও আমরা দেখিতে পাই, কি নায়ক-চরিত্র, কি পার্শ্ব-চরিত্র সকলের বেলায় উপস্থিত পরিস্থিতির অবলম্বনে স্থায়িভাবের জাগরণ ও বিভিন্ন অনুভাব-বিভাবের সঙ্ঘাতে কর্ম চাপা পড়িয়া যায়, পাত্রপাত্রীর মনের চেয়েও আমরা হৃদয়ের পরিচয় পাই অনেক। পরিস্থিতি অবলম্বনে পাত্র-পাত্রীর যতখানি না মনোবিকলন হইয়াছে, তাহার বেশী হইয়াছে ভাব-বিশ্লেষণ। কৌরবের সহিত সন্ধি-প্রস্তাবনায় কৃষ্ণসনাথ পাণ্ডবের বুদ্ধি ও মহত্ত্বের পরিচয় আমরা পাইতে না পাইতে ঐ প্রসঙ্গ-উদ্দীপনে দ্রৌপদীর রৌদ্ররস-যুক্ত সংলাপ সমস্ত পরিস্থিতিকে গম্ভীর ও বিষণ্ন করিয়া তোলে। হস্তিনায় আগত শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করিতে পরামর্শ দান করেন কর্ণ। কিন্তু তাঁহার ষড়যন্ত্রের কূট-বুদ্ধির প্রাচুর্যকে ম্লান করিয়া দেয় আন্দোলিত চিত্তের অবচেতনে সঞ্চিত বিশ্বাস ও ভক্তির শান্ত দাস্তরস। কর্ণ-কর্তৃক জয়দ্রথ-বধের বর্ণনায় বিষয়ের গুরুত্বকে অতিক্রম করিয়া যায়। কর্ণ-পদ্মাবতীর ভক্তি-বিশ্বাস-জাত বিস্ময়। এই দৃশ্যেই

একদিকে রহিয়াছে কর্ণের সংশয়ী হৃদয়ের আন্দোলন, অন্যদিকে ধ্যানলব্ধ শ্রীকৃষ্ণ-মূর্তি আবেগ-মুখর ছন্দে ঝঙ্কৃত বর্ণনা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সংহার-মূর্তি অর্জুনের বর্ণনার পার্শ্বেই শ্রীকৃষ্ণের নবীন-নীরদ-শ্যাম আবির্ভাব, মধ্যে রহিয়াছে বিজয়ে সংশয়ী কর্ণের আন্দোলিত মন। এই তিনটি প্রসঙ্গ শুধু বর্ণনার মধ্য দিয়া অপূর্ব কাব্য-রূপ পাইয়াছে।

বস্তুতঃ কর্ণ-চরিত্রের দ্বন্দ্বীভূত অংশের বিকাশ কর্মে নয়, কাব্যমুখর বাক্যে। হয় কর্ণের আত্ম-জিজ্ঞাসু স্বগতোক্তিতে, না হয় অন্য-কর্তৃক কর্ণের প্রসঙ্গ আলোচনায়। কর্মের গৌণত্ব নাটকে যে অসুন্দরত্ব সৃষ্টি করিতে পারিত, উচ্চ গ্রামের কবিত্ব তাহা রোধ করিয়াছে।

এই নাটকের আর একটি লক্ষ্য করিবার মতো বিষয় আছে। ক্ষীরোদ-প্রসাদ তাঁহার অনেক নাটকে নায়ক-নায়িকার দিকে বেশী দৃষ্টি দিতে গিয়া পার্শ্ব-চরিত্রগুলিকে স্বমহিমায় ফুটাইতে পারেন নাই। কিন্তু এই নাটকের ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই। ঘটোৎকচ এবং শকুনি-চরিত্রে তরল হাস্যরস সৃষ্টির প্রচেষ্টা একটু অসুন্দর হইয়াছে। ইহা ভিন্ন অন্যান্য চরিত্র অতি সুন্দর এবং সম্পূর্ণ কর্ণ-পদ্মাবতীকে ঘিরিয়া মহান্ শ্রীকৃষ্ণ, শক্তিমান্ অর্জুন, অভিমানিনী দ্রৌপদী, কর্তব্য-প্রাণ সহদেব প্রভৃতিকে আমরা দেখি। ইহাদের চরিত্র যত অল্পপরিসর হউক না কেন, তাহার মধ্যেই রহিয়াছে পরিপূর্ণতা।

আবার মনোমোহন-গিরিশচন্দ্র হইতে বাংলা পৌরাণিক নাটক যে ভক্তিবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিল, ক্ষীরোদপ্রসাদ তাহার মধ্যে যুক্তি প্রবেশ করাইয়াছেন। এ-ভক্তি স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্বাস নয়, এ ভক্তি অর্জিত। কর্ণ-পত্নী পদ্মাবতীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণে স্বাভাবিকী ভক্তি দেখিতেছি। কিন্তু ঋষি ও সত্য-দ্রষ্টা মনীষীর বাণী রহিয়াছে তাহার পটভূমিকায়। কৃষ্ণসখী কৃষ্ণা যে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবন বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহার কারণ, নিজের জীবনের অনুভূতির মধ্য দিয়া লাঞ্ছনার চরম-মুহূর্তে তিনি শ্রীকৃষ্ণের ঐশী শক্তির প্রকাশ দেখিয়াছেন। ভক্ত-চূড়ামণি কর্ণ নিজের জীবন বলি দিয়া কৃষ্ণভক্তি অর্জন করিয়াছেন। তাই ক্ষীরোদপ্রসাদের বৈষ্ণবতার মধ্যেও রহিয়াছে শক্তি-সাধনা। 'পাণ্ডব গৌরবে'র ভীমের কৃষ্ণভক্তি আর 'নর-নারায়ণে'র কর্ণের কৃষ্ণভক্তির মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। ভীমের অন্তরে করুণাময়, ধর্মপ্রাণ শক্তিমান যে পাণ্ডব-রক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ রহিয়াছেন, বাহিরের পরিস্থিতির আঘাতে সেই বিগ্রহ টলিয়া ওঠেন বলিয়া ভীমের অভিমান ও অন্তরজ্বালা। আর

অবিশ্বাসী কর্ণ ধীরে ধীরে নিয়তির দুর্বার আকর্ষণে নিজের দুর্দান্ত ব্যক্তিত্বের তিল তিল পরাজয়ের মধ্য দিয়া মানবায়িত ভগবানের ঐশী শক্তির পরিচয় পান। তাই তিনি মরণের মধ্য দিয়া পরমপুরুষকে শেষ নমস্কার জানান। বরং পাণ্ডব-গৌরবের অভিমানাহত ভীমের ভক্তির সঙ্গে তুলনা হইতে পারে স্থির-বিশ্বাসিনী, অভিমানিনী কর্ণপত্নী পদ্মাবতীর,—কর্ণের নহে।

'নর-নারায়ণ' নাটকের সমালোচনা-প্রসঙ্গে সকলে একমত হইতে পারেন নাই। কোনো কোনো সমালোচক নাটকখানির মধ্যে 'সার্বজনীন কৃষ্ণভক্তি' আবিষ্কার করিয়াছেন। এমন কি শকুনির উক্তির মধ্যেও ইহারা কেহ কেহ এই কৃষ্ণভক্তির সন্ধান পাইয়াছেন। তাঁহাদের মতে দুর্যোধন ও দুঃশাসন যখন শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিবার উদ্যোগ করিলেন, তখন তিনিও (শকুনি) ভক্তি-বিগলিতচিত্তে বলিয়া উঠিলেন,—

'ধীরে—অতি ধীরে—
ওরে, নবনীত হ'তে
অতি যে কোমল অঙ্গ তার !'

কিন্তু ইহা যে শকুনির নিতান্ত ব্যঙ্গোক্তি, তাহা বুঝিতে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না। অতি সাধারণ দর্শকও এই ব্যঙ্গোক্তির মর্মার্থ গ্রহণ করিতে পারেন। সমালোচক যদি এই উক্তির আদিস্থিত 'কিঞ্চিৎ করুণভাবে' বাক্যটি লক্ষ্য করিতেন এবং ইহার সঙ্গে শকুনির অন্যান্য উক্তি মিলাইয়া দেখিতেন, তাহা হইলে কিছুতেই ইহাকে শকুনির কৃষ্ণভক্তি-মূলক উক্তি বলিয়া মনে করিতে পারিতেন না।

'নর-নারায়ণ' নাটকের প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্যে শকুনির একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করিতে চাই। শ্রীকৃষ্ণকে হস্তিনার কারাগারে বন্ধন করিয়া রাখিবার জন্য কর্ণ দুর্যোধনকে পরামর্শ দিতেছেন। কারণ, কর্ণ শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা পরীক্ষা করিতে চান। তিনি জানেন, শ্রীকৃষ্ণ যদি সত্য সত্যই ভগবান হন, তাহা হইলে তিনি দৈবশক্তির সাহায্যে অবশ্যই এই বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিবেন। কিন্তু প্রস্তাবটি শুনিয়া শকুনি বলিয়া উঠিল যে সেও দুর্যোধনকে ঐ একই পরামর্শ দিয়াছে। শকুনির উক্তি—

"সমবুদ্ধি প্রিয় অঙ্গরাজ,
আমিও বলেছি এই কথা—ওই কথা।
'ব' দন্ত্য-'ন'য়ে-'ধ'য়ে, তাহাতে দন্ত্য-'ন' দিয়ে

থট্যার.শ্রীপাদ সঙ্গে শ্রীরজ্জু-সংযোগে
সপ্রেমে জড়ায়ে রাখা শ্রীগোপীবল্লভে।"

এখানে এতগুলি 'শ্রী' এবং 'শ্রীগোপীবল্লভ' 'সপ্রেমে' জড়াইয়া রাখিবার প্রস্তাব যেমন তীব্র ব্যঙ্গ, এবং শ্রীমধুসূদনের সম্মানজনক 'শ্রী'-শব্দ বারে বারে উল্লেখ করিয়াই যে শকুনি ব্যঙ্গ করিতেছে, আশা করি কোনোও সমালোচক, দর্শক বা পাঠককে তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন হইবে না। 'নবনীতসম কোমল' অঙ্গের উল্লেখ যদি শকুনির কৃষ্ণভক্তির পরিচয় হয়, তাহা হইলে এখানেও তো 'সপ্রেমে' জড়াইয়া রাখিবার কথা এবং শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীগোপীবল্লভ বলিয়া উল্লেখ করায় বৃন্দাবনের নন্দদুলালের প্রতি ভক্তির পরিচয় পাওয়া সম্ভব ছিল। মনীষী সমালোচক এখানে শকুনির কৃষ্ণভক্তির পরিচয় পাইলেন না কেন? তিনি বলিতেছেন, "এই সার্বজনীন কৃষ্ণভক্তির মধ্যে স্বভাবতঃই নাটকীয় দ্বন্দ্বটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবার সুযোগ পায় নাই।" আমরা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিব, সার্বজনীন শব্দটির অর্থ কি? ইহার অর্থ কি 'সর্বজন-সম্বন্ধীয়'? তাহা যদি হয়, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব, এই নাটকের 'সর্বজন'তো দূরের কথা, বহুজনই কৃষ্ণভক্ত নন। ভীষ্ম-দ্রোণের পাণ্ডবস্নেহ এবং কৃষ্ণভক্তি মহাভারতেই পাওয়া যায়। বিদুরের তো কথাই নাই। গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া জানিতেন এবং ন্যায় ও ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য 'যাঁহাদের পক্ষে জনার্দন আছেন সেই পাণ্ডুপুত্রদের জয় হউক'—"জয়োঽস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দনঃ"—বলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন একথা মহাভারতের পাঠকমাত্রই জানেন। সুতরাং নাটকে ইহাদিগকে কৃষ্ণভক্ত করিয়া নাট্যকার যে অপরাধজনক কিছু করেন নাই একথা বলাই বাহুল্য। ধৃতরাষ্ট্র একটি পরিষ্কার 'ভিজে বিড়াল'। ভীষ্ম দ্রোণের কথায় তিনি শ্রীকৃষ্ণকে "কেশব কেশব" বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। তিনি জানেন, ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ যদি দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে কৌরবদের বিজয় অনিবার্য। তাই তিনি দুর্যোধনকে অবাধ্য পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া ছাড়িয়া দিতেছেন। তাহাকে সন্ধি করিতে বাধ্য করিতেছেন না বা দুর্বিনীত পুত্রকে বন্দী করিয়া রাখিয়া শান্তিস্থাপনের চেষ্টাও করিতেছেন না। তিনি বারে বারেই সঞ্জয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছেন, অর্জুন কি বলিয়াছে? অর্থাৎ, এই স্নেহান্ধ কপট ধার্মিক ব্যক্তিটি শ্রীকৃষ্ণের ভয় করিতেছেন না। তাঁহার ভয় অর্জুনের অস্ত্র হইতে।

সুতরাং ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণভক্ত বা কৃষ্ণভীত কিছুই নন। আমরা আর একটু গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বলিব, ভীষ্ম-দ্রোণও কৃষ্ণভক্ত নন। শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান এবং অবতার পুরুষ বলিয়া মুখে স্বীকার করাই কৃষ্ণভক্তির পরিচয় নয়। সমস্ত ধর্মাধর্ম কৃষ্ণপদে বিসর্জন দিয়া ('সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য') একমাত্র নরদেহধারী শ্রীভগবানের নির্দেশ পালন করিয়া যাওয়াই ('মামেকং শরণং ব্রজ') কৃষ্ণ-ভক্তির পরিচায়ক। ভীষ্ম-দ্রোণ নিজেরা যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহা হইতে এতটুকুও সরিয়া আসেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে তো সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন যে দুর্যোধনের অন্যায়ের নীরব সমর্থন করিয়া তাঁহারা পাপের ভাগী হইতেছেন। কিন্তু সে আহ্বানে উঁহারা সাড়া না দিয়া বলিলেন, তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাই দুর্যোধনকে ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। দুর্যোধনের সমর্থন করিয়া ভীষ্ম-দ্রোণ শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ বা অনুরোধ যখন উপেক্ষা করিতেছেন এবং কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ পরোক্ষে সম্ভব করিয়া তুলিতেছেন, তখন তাঁহারা ভক্ত কোথায়? তাঁহারা তো পরিষ্কার মনে করিতেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পরামর্শ দিয়া ধর্ম হইতে পতিত হইতে বলিতেছেন। ইহা কি শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান মনে করিবার ফল? ভগবানের নিকট যেখানে নিঃসংকোচে আত্মসমর্পণ নাই, ভারতবর্ষের মতে সেখানে ভক্তির 'ভ'-পর্যন্ত নাই। সুতরাং ভীষ্ম-দ্রোণ আদৌ কৃষ্ণভক্ত নহেন। বাকি রহিলেন, কর্ণ, পদ্মাবতী ও বৃষকেতু। পদ্মাবতী ও বৃষকেতু নাটকে সত্য সত্যই কৃষ্ণভক্ত। কিন্তু মূল মহাভারতে এই দুইটি চরিত্রের প্রসঙ্গতঃ নামোল্লেখ ভিন্ন ইহাদের জীবন-কাহিনীর এমন কোনো বিস্তৃত আলোচনা নাই যাহার ফলে তাঁহারা মহাভারতের অতি প্রসিদ্ধ চরিত্র বলিয়া দাবী করিতে পারেন। সুতরাং নাট্যকার নিজের ইচ্ছামতো এই চরিত্রগুলিকে ভাঙিয়া-গড়িয়া সিদ্ধরস-বিগ্রহকে চুর্ণ-বিচূর্ণ করিয়াছেন ইহা বলিবার উপায় নাই। যদি আমরা দেখিতাম যে নাটকের দুর্যোধনপত্নী ভানুমতীকে দ্রৌপদীর মতো কৃষ্ণভক্তিপরায়ণা বা কৃষ্ণসখী করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা হইলে প্রসিদ্ধিত্যাগের প্রশ্ন উঠিতে পারিত। বিপরীতক্রমে পদ্মাবতী যুগপৎ স্বামিভক্তির ও কৃষ্ণ-ভক্তির দ্বারা আপন কোমল মধুর চরিত্রের প্রভাবে কর্ণচরিত্রকে কেমন ধীরে ধীরে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছি। পদ্মাবতী কেন কর্ণের আসন্নমৃত্যু জানিয়াও স্বামিশোকবিহ্বল হইলেন না, সমালোচক এই প্রশ্ন করিয়াছেন। স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর মৃত্যুতে

অধীর হওয়া উচিত। কিন্তু যে নারী শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিতপ্রাণা, তিনি অবশ্যই 'স্থিতপ্রজ্ঞ'। তিনি যে 'সামান্যা নারীর মতো স্বামিশোকে বিলুণ্ঠিতা' হইতে পারেন না, মৃত্যুর পূর্বে কর্ণ নিজেও সে-কথা বলিয়া গিয়াছেন। যিনি শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা পরীক্ষার জন্য নিজের প্রাণ দিলেন, পদ্মাবতী যে তাঁহারই স্ত্রী। ইঁহার পক্ষে অন্য আচরণ সম্ভব নয়। দেবরের জীবনের বিনিময়ে তিনি স্বামীর জীবন প্রার্থনা করিতে পারেন না।

এখন কর্ণের কথা। মহাভারতের কর্ণ যেমন কৃষ্ণভক্তও ছিলেন না, তেমনি অকারণ কৃষ্ণবিদ্বেষীও ছিলেন না। কর্ণ নিজে জানিতেন যে তিনি কুন্তীপুত্র। তাহা জানিয়াও তিনি দুর্যোধনের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ কৌরবপক্ষ ত্যাগ করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ যখন হস্তিনাপুর হইতে ফিরিবার পথে কর্ণকে নিজ রথে তুলিয়া লইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে কর্ণ সূতপুত্র নয়,—কুন্তীপুত্র, তখনই তো কর্ণ কৌরবপক্ষ ত্যাগ করিতে পারিতেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মুখে নিজ জন্মবৃত্তান্ত শুনিয়া কর্ণ বিস্ময় প্রকাশ করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি একথা জানি।' জানিয়া শুনিয়া মানুষের প্রতি মানুষের সহজ কৃতজ্ঞতাবোধে তিনি আমরণ দুর্যোধনের সেবা করিয়াছেন। তাই বলিয়া শিশুপালের মতো অকারণ গাত্রদাহে কর্ণ কখনও শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করেন নাই। যিনি নিন্দুকও নন, ভক্তও নন, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়া নাট্যকার যদি সেই চরিত্রকে ধীরে ধীরে কৃষ্ণভক্ত করিয়া তোলেন, তাহা হইলে আমরা নাট্যকারের সেই কার্যকে অপরাধজনক বলিতে পারি না। প্রসিদ্ধ চরিত্রকে ঢালিয়া সাজিবার অধিকার নাট্যকারের আছে। তবে তাহা মূল চরিত্রের সঙ্গে সমূহ বিরোধ সৃষ্টি না করিলেই হইল। আমরা অনুবাদ-কাব্যে এবং যাত্রা, কথকতা এবং নাটকে সীতাহরণকারী রাবণকে মহাগুণধর এবং পরম রামভক্ত সাজাইয়া যদি অপরাধ না করিয়া থাকি, দুশ্চরিত্র, লম্পট, মিথ্যাবাদী, কাপুরুষ দুষ্মন্তকে মহাকবি কালিদাস যদি ঘষিয়া-মাজিয়া আদর্শ রাজা এবং প্রেমিক স্বামীতে রূপান্তরিত করিয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলে ক্ষীরোদপ্রসাদ কর্ণকে কৃষ্ণভক্ত করিয়া অন্যায় করেন নাই। বরং বলিব, মহাভারতের কর্ণ-চরিত্রে যে মহত্ত্ব ছিল না, ক্ষীরোদপ্রসাদের কর্ণে আমরা তাহা পাইতেছি। ক্ষীরোদ-প্রসাদ, কোনো কোনো সমালোচকের মতে, যদি নিজেকেই কর্ণ-চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাতে মহাভারতের কর্ণ-চরিত্র অভিনবমাহাত্ম্যমণ্ডিত হইয়া আরো গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছে, যেমন

হইয়াছে মহাভারতের দুষ্মন্তচরিত্র মহাকবি কালিদাসের হাতে। মহাভারতের কর্ণচরিত্রকে যদি নাট্যকার স্ব-স্বরূপে গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে আমরা হয়তো বড় একটি যোদ্ধাকেই পাইতাম। তাঁহার বহু কার্য আমরা ন্যায়-নীতির দিক দিয়া সমর্থন করিতে পারিতাম না। কৃষ্ণভক্তির পরীক্ষা করিতে গিয়া কর্ণ যাহা করিয়াছেন বা করাইয়াছেন, তাহার সমস্ত কিছুই তাই আমাদের নিকট চক্রী রাজপুরুষের জঘন্য ষড়যন্ত্ররূপে প্রতিভাত না হইয়া এক পরীক্ষাব্রতী মানব-মনের সংকল্প-বিকল্প-জনিত পুণ্যকার্য রূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ সংঘটন করাইবার জন্য দুর্যোধনকে পরামর্শ দান, শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিবার আদেশ নর-নারায়ণের কর্ণের নিষ্ফল কদর্য রাজনীতির খেলা নয়। উহা শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা পরীক্ষার আয়োজন মাত্র। এই ভগবত্তা-পরীক্ষার তীব্র বাসনা যদি কর্ণের সমস্ত সত্তা আলোড়িত করিয়া না তুলিত, তাহা হইলে কর্ণের অন্তর্দ্বন্দ্বের কোন্ অবকাশ নাটকে থাকিত? অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণার্জুন' এবং ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নর-নারায়ণ' নাটকের কর্ণ-চরিত্রের পার্থক্য এইখানে। কর্ণার্জুনের কর্ণ শক্তিমান, বীরপুরুষ বটে, তাঁহার কার্যের মধ্যে দুর্যোধনের প্রতি বন্ধুপ্রীতি ভিন্ন অন্য কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নাই। কিন্তু দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় তিনি অপমানিত হইয়া অভিমানী বালকের মতো আত্মত্যাগ করিতে ছুটিয়া যান। অতি ইতরজনের মতো সেই অপমানের প্রতিশোধ লইতে কৌ· সভায় লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীর প্রতি অশোভন ব্যঙ্গোক্তি করেন। ইহাই তো মহাভারতের কর্ণ-চরিত্র। এই চরিত্রে এমন মহত্ত্ব কোথায় যাহাতে সজ্জনচিত্ত শ্রদ্ধায় অভিভূত হইতে পারে? অদৃষ্ট-বিড়ম্বিত মানবাত্মার শোচনীয় পতনেই ট্রাজেডী সৃষ্টি হয় না যদি ঐ নিপীড়িত হতভাগ্য মানুষটির মধ্যে মহনীয় গুণের সমাবেশ না থাকে। অপরেশচন্দ্রের কর্ণার্জুনের কর্ণের মৃত্যুতে একটি নিয়তি-নির্যাতিত মহামানবের শোচনীয় মৃত্যু হইল বলিয়া দর্শক চোখের জল ফেলিবার অবকাশ বেশী পায় না। দর্শক মনে করে একটি শক্তিমান পুরুষ জীবনে চরম উচ্চাশাবশে আত্মপ্রতিষ্ঠা চাহিয়াছিল এবং পাইয়াছিল। সে শক্তিমান এবং কীর্তিমান, সন্দেহ নাই। জন্ম তাঁহাকে যে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা দিতে পারে নাই, একজন মানুষ আপন ঔদার্যে, তাহাকে সেই সম্মান দিয়া পরম গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাই দুর্যোধনের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশে কর্ণ তাহার সখা। কিন্তু এই সখার সমর্থন করিতে গিয়া সে সৎ ও মহৎ মানুষের পীড়ার কারণ হইয়াছে এবং অসহায়া কুলবধূর

লাঞ্ছনা করিয়াছে। সুতরাং অন্যায়ের সমর্থনকারী এই নীচচরিত্র ব্যক্তিটির মৃত্যুতে দর্শকের চক্ষু সমবেদনার অশ্রুতে ভারাক্রান্ত হয় না। 'কর্ণার্জুন' তাই ট্রাজেডী হয় নাই।

নর-নারায়ণের কর্ণ ইহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্র। অপরেশচন্দ্র 'নিয়তি' নামে একটি চরিত্র সৃষ্টি করিয়া তাহার দ্বারা কর্ণচরিত্রের পরিণতি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কর্ণের চরিত্রে এই নিয়তির কার্য প্রকটিত করিয়া তুলিতে পারেন নাই। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদ কর্ণ চরিত্রকেই নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেখাইয়াছেন। মানবচরিত্রের নিবিষ্ট বা বিশেষ গতি (নি+যৎ+ক্তি) হইতেছে উহার নিয়তি। অর্থাৎ মানুষের সত্তার বিকাশানুযায়ী ঝোঁক বা প্রবণতা পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সংঘাত এবং সহযোগিতার মধ্য দিয়া, মানুষের ধারণা-ভাবনা, কর্ম-চিন্তা অনুভূতি প্রকাশ ও কার্যকারিতার মাধ্যমে তাহাকে যে বিশেষ জীবন গতি দান করে, প্রতিনিয়ত তাহাকে প্রকাশ করিবার যে যত্ন করে, তাহাই হইল ঐ মানুষের জীবনে নিয়তির কার্য। ইহার জন্যই বলা হয় 'character is destiny'। জীবন-পরিণতি সম্ভাবিত করিয়া তুলিতে হইলে তাই মানুষের চাল-চলন, বাক্য ও কার্যের মধ্যে এই জীবনবিকাশী গতির আবেগ ক্রিয়াশীল হওয়ার প্রয়োজন। কর্ণের জীবনে ভগবৎ-জিজ্ঞাসা ঠিক এই নিয়তির কার্য করিয়াছে। এই জিজ্ঞাসাই তাহার জীবনের সমস্ত কর্ম-চিন্তা অনুভূতির মূলে। 'নর-নারায়ণ' নাটকের কর্ণ-চরিত্রের কৃষ্ণভক্তি কর্ণের জীবনকে ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়া নিশ্চিত পরিণামের দিকে লইয়া গিয়াছে। 'মর্ম চায় পরাজয়, সত্য চায় জয়, মনুষ্যত্ব চায় নিষ্ঠুরতা', এই ত্রিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া কর্ণচরিত্র ক্ষত-বিক্ষত এবং বিমথিত হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত ভ্রাতৃস্নেহ এবং ভ্রাতৃভক্তিই কর্ণের মর্মকে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে কর্ণের হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তির যে জাগরণ হইয়াছে তাহার জন্যই কর্ণ ইন্দ্রদত্ত একবিঘাতিনী শক্তিকে বারে বারে বিস্মৃত হইয়াছেন। অন্তরনিহিত এই মাতৃভক্তি ও ভ্রাতৃস্নেহই কর্ণের জীবনে নিয়তির কার্য করিয়াছে। কর্ণার্জুনের মধ্যে ইহা নাই বলিয়া ঐ নাটকে কর্ণ-চরিত্র এতখানি মহিমান্বিত নয়। নর-নারায়ণের কর্ণের পরাজয় দৈবের নিকট ততখানি নয়, যতখানি তাহার নিজের স্নেহভক্তির নিকট। এই চরিত্র তাই সর্বতোভাবে মানবিকতার বিকাশে সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। যে মাতা তাঁহাকে নির্মমভাবে পরিত্যাগ করিয়াছেন তাঁহার প্রতি ভক্তির

অন্তরনিহিত দুর্বার আকর্ষণে এবং যে ভ্রাতৃগণ শত্রু, তাঁহাদের প্রতি জ্যেষ্ঠভ্রাতার স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহের আবেদনে কর্ণ ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। এতখানি মানবিকতায় দ্বন্দ্ব-সংঘাতে কর্ণ-চরিত্রকে আর কোনো নাট্যকারই রূপায়িত করিয়া তুলিতে পারেন নাই। ক্ষীরোদপ্রসাদের এই শক্তিমত্তার প্রতি দৃষ্টি না দিয়া 'নর-নারায়ণ' নাটকের আলোচনা করিতে গেলে নাট্যকারের প্রতি অবিচার করা হয় বলিয়া আমি মনে করি।

'নর-নারায়ণ' নাটকের কৃষ্ণচরিত্রের মধ্যে 'মানবিকতার বিকাশ' দেখিতে না পাইয়া যদি কেহ মন্তব্য করেন যে, "নর-নারায়ণ নাটকে 'নর' নাই, 'নারায়ণই' আছেন" আমরা তাহাতেও আপত্তি করিব। এই ধরনের মন্তব্যের সমর্থনে কোনো যুক্তি এবং তথ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। 'নর' বলিতে আমরা কি বুঝিব এবং 'নারায়ণ' বলিতেই বা কি বুঝায়, সমালোচক সে বিষয়েও কিছু খুলিয়া বলেন নাই। তাই তাঁহার বক্তব্য কি তাহা বুঝিতে আমাদের অসুবিধা হয়। তিনি হয়তো 'নর' বলিতে রক্তমাংসের দেহধারী সাধারণ মানুষকে বুঝিয়াছেন, যে মানুষ কাম-ক্রোধাদি রিপুনিচয়ের একান্ত বশীভূত না হইলেও ঐ গুলির দ্বারা বিচলিত, উত্তেজিত হয় অথচ স্নেহ-মমতা-কর্তব্যবোধ, নীতিজ্ঞান, ধর্মজ্ঞান প্রভৃতিকেও জীবনে অনুসরণ করিতে চেষ্টা করে। এই ধরনের মানুষের মধ্যে ভাল-মন্দের অর্থাৎ 'সু' ও 'কু'-এর দ্বন্দ্ব রহিয়াছে। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির দ্বন্দ্বে এই মানুষের জীবন জটিল, রহস্যময় এবং আলোড়িত হইয়া ওঠে। বলা বাহুল্য, ভারতবাসীর দৃষ্টিতে 'নারায়ণ' বা অবতারপুরুষ এই ধরনের 'নর', অর্থাৎ রাম-শ্যাম-যদু-মধুর মতো ব্যক্তি নন। তাঁহারা হৃষীকেশ অর্থাৎ প্রবৃত্তির অধীশ্বর। তাঁহারা দ্বন্দ্ব সংঘাতময় জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজেদের সাধনা, জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করেন। কিন্তু সব মানুষ তো তাঁহাদিগকে অনুসরণ করে না। যাহারা প্রবৃত্তির কুহকে একেবারে মুগ্ধ হইয়া আছে, জ্ঞাননেত্র যাহাদের একেবারেই তমসাচ্ছন্ন, তাহারা এই অবতার-পুরুষদের আহ্বানে সাড়া দিতে পারে না। বরং ইঁহাদিগকে নির্যাতিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিয়া নিজেদের প্রবৃত্তির জয় ঘোষণা করিতে তৎপর হয়। কিন্তু অসীম ধৈর্য, করুণা ও শক্তির অধীশ্বর এই অবতার-পুরুষগণ সমস্ত বাধা-বিপত্তি-লাঞ্ছনা-অপমানের মধ্য দিয়াও নিজেদের কর্মপথে ছুটিয়া চলেন। শেষ পর্যন্ত বিজয় তাঁহাদেরই হয়। মানুষ অনেক সময় বুঝিতে

পারে না, কি করিয়া এই সব পর্বতপ্রমাণ বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কী কৌশলে এই অবতার পুরুষগণ জগতে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। ইহা তো সাধারণ মানুষের অসাধ্য। তাই তাঁহাদের কার্যকে মানবীয় কর্ম বলিয়া মানিয়া লইতে সাধারণ মানুষের মন চায় না। সেইজন্য তাঁহাদের ঘিরিয়া নানা প্রকার অলৌকিক কাহিনী সৃষ্টি হয়। মানবসভ্যতার আদি হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত মহাপুরুষদের কার্য সম্বন্ধে মানুষের ঐ একই ধারণা চলিয়া আসিয়াছে। বিজ্ঞানের এত উন্নতি সত্ত্বেও মানুষের এই ধরনের ধারণার খুব বেশী একটা পরিবর্তন হয় নাই। কিন্তু মহাপুরুষেরা সত্য সত্যই মানুষের অবোধ্য, দুর্জ্ঞেয় কোনো কৌশল অবলম্বনে কাজ করিয়া যান না। তাঁহাদের জীবনধারা বুঝিবার মতো ধীর স্থির জ্ঞান আমরা যদি লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে দেখিব যে তাঁহারা যাহা করিয়াছেন তাহা মানবীয় শক্তি-বুদ্ধির দ্বারাই করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে মনুষ্যবুদ্ধি, মানুষের ভালবাসা ও কর্মের চরমতম বিকাশ হইয়াছে বলিয়াই তাঁহারা 'পুরুষোত্তম',—অর্থাৎ তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ মানুষ হইতে পারে না। ক্ষীরোদপ্রসাদও 'নর-নারায়ণ' নাটকে কর্ণের মুখ দিয়া সেই কথাই বলাইয়াছেন,—

"এমনটি আসে নাই আর,—
এই পূর্ণ মানবতা।"

ক্ষীরোদপ্রসাদ দেখাইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে 'নর' এবং 'নারায়ণ' এক হইয়া গিয়াছে। মানবীয় শক্তি বুদ্ধি ও ভালবাসার মধ্যে দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় দৈবী মায়া মিলিয়া মিশিয়া এক অপূর্ব মহামানব-চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছে।

আমরা এইবার 'নর-নারায়ণ' নাটকের শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব। এই নাটকের প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্যে, পাণ্ডবশিবিরে আমরা প্রথম শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাই। কৌরব-রাজসভা হইতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের দূত ফিরিয়া আসিয়াছে। দুর্যোধন স্পষ্ট বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে তিনি বিনাযুদ্ধে পাণ্ডবগণকে সূচ্যগ্র-প্রমাণ ভূমিও দান করিবেন না। এই সংবাদে যুধিষ্ঠির ভীত ও বিচলিত হইয়াছেন। যুধিষ্ঠিরের ভয় দুর্বলব্যক্তির ভীরুতা বা যুদ্ধভীতি নয়। বিশ্বকল্যাণকামী ধর্মরাজ যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম কল্পনা করিয়াই ভীত হইয়া উঠিয়াছেন। কারণ, তিনি কল্পনার চোখে দেখিতেছেন, এই যুদ্ধে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, বালক-বৃদ্ধ অনেকেই মৃত্যু বরণ করিবে। ভীষ্ম, দ্রোণ কৃপের মতো পূজনীয়

ব্যক্তিও নিহত হইতে পারেন। এত বড় অনর্থের সূচনা তিনি করিতে চাহেন না। তাই যুধিষ্ঠির সন্ধিপ্রার্থী। মহাভারতের ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের চরিত্র-মাহাত্ম্য নাট্যকার অতি অল্পকথায় এখানে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ভবিষ্যৎ অনর্থের আশঙ্কায় ব্যাকুলচিত্ত যুধিষ্ঠির আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে সঞ্জয়ের দৌত্যের এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবিতার কথা বলিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের উক্তিগুলি সেই তুলনায় সংক্ষিপ্ত। তিনি এতটুকুও বিচলিত নন। তিনি স্থিতধী পুরুষ। সুতরাং আসন্ন মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখিয়াও এতটুকু চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছেন না। তবে বিশ্বকল্যাণের জন্য তিনি শেষ চেষ্টা কি করিতে পারেন, তাহাই দেখিতেছেন। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান নারায়ণের মতো মানবের দুর্বোধ্য বা মানুষের অসাধ্য কোনো কার্য সম্পাদনের কথা ভাবিলেন না। এইক্ষেত্রে বুদ্ধিমান, স্থিরবুদ্ধি, শান্ত, শিষ্ট মানুষ যাহা ভাবিতে ও করিতে পারে, তিনি তাহা ভাবিলেন ও করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি স্থির করিলেন, একবার কৌরব-সভায় গিয়া কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে সন্ধি-স্থাপনের চেষ্টা করিবেন। যুধিষ্ঠির-ভীমার্জুন প্রভৃতি সকলেই দুর্যোধনের চরিত্র সবিশেষ জানেন, শ্রীকৃষ্ণ তো জানেনই। তাই যুধিষ্ঠিরাদি এই প্রস্তাবে শঙ্কিত হইলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সঙ্কল্প হইতে বিচলিত হইলেন না। তিনি পরম বুদ্ধিমান মানুষের মতো বলিলেন, তাঁহার সন্ধির প্রয়াস যদি ব্যর্থ হয় তাহা হইলেও তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইবে। কারণ, জগদ্বাসী লোকগণ জানিবে যে যুধিষ্ঠির যুদ্ধ পরিহার করিয়া চলিতে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কৌরবই তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করিয়াছে। ইহা শ্রীকৃষ্ণের নরত্বেরই পরিচায়ক,—নারায়ণত্বের নয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মানব হইলেও অতিমানব। তিনি মনস্তত্ত্বজ্ঞ, অন্তর্যামী পুরুষ। যুধিষ্ঠির ভিন্ন অন্য চারি পাণ্ডব যে সন্ধি চাহেন না, শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানেন। তাই তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলিয়া উত্তেজনাপূর্ণ প্রশংসা-বাক্যের মাধ্যমে ভীমাদির মনের কথা জানিয়া লইতেছেন। তিনি লক্ষ্য করিতেছেন যে দ্রৌপদী এই সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া মাথা নত করিয়া আছেন। তাঁহাকে কোনো সান্ত্বনা তিনি দিতে পারেন নাই। কিন্তু সহদেব যখন নিজের মতামত ব্যক্ত করিতে চাহিলেন, তখনই অন্তর্যামী পুরুষ দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিবার অবকাশ খুঁজিয়া পাইলেন।—

"হেঁটমুণ্ডে সখী মোর—দাও
ভাই, শুনাইয়া তাঁরে বক্তব্য তোমার।"

সহদেবের বক্তব্য যে দ্রৌপদীর মনের কথা প্রকাশ করিবে, কৃষ্ণ তাহা আগে হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। দ্রৌপদী এতক্ষণ সন্ধির প্রস্তাব শুনিয়া ক্ষোভে, অভিমানে মাথা নীচু করিয়া ছিলেন। সহদেবের সমর্থন পাইয়া তিনি অন্তরের প্রচণ্ড জ্বালা ভাষায় প্রকাশ করিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাহাতে জনার্দনের চক্ষুও সমবেদনায় অশ্রুপূর্ণ হইল। ব্যথিত, বিপন্ন মানুষের ত্রাণের জন্য যাঁহার আবির্ভাব, সেই নরদেহধারী নারায়ণ মানুষের বেদনায় কাঁদিয়া উঠিলেন। কৃষ্ণ-চরিত্রের এই অংশে অন্ততঃ মানবতার প্রকাশ আছে, সমালোচক এইটুকু স্বীকার করিয়াছেন।

ইহার পর নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্যে আমরা আবার শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাইতেছি হস্তিনাপুরীর রাজসভায়। শ্রীকৃষ্ণ এখানে ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ্ মহাবাগ্মী গদাধর ('গদ্' ধাতুর অর্থ 'বাক্য'; তাই যিনি সুকৌশলী বাক্য-বিন্যাসে পটু তিনিই প্রকৃত গদাধর)। কৌরবসভায় সমবেত সকলকে তিনি আসন্ন যুদ্ধের এবং সন্ধির ফলাফল বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন। এই যুদ্ধে পাণ্ডবের পরাজয় হইবে না, কৌরবেরই সমূহ সর্বনাশ হইবে। তাই তিনি স্নেহান্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বিচার-বিবেচনা করিয়া সন্ধি করিতেই অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু স্নেহদুর্বল রাজা ধৃতরাষ্ট্র শ্রীকৃষ্ণের হিতবাক্য শুনিলেন না। তিনি অক্ষমের কৈফিয়তের মতো বলিলেন, অবাধ্য পুত্র দুর্যোধন তাঁহার কথা শোনে না। শ্রীকৃষ্ণ ওজস্বিনী ভাষায় ধৃতরাষ্ট্রকে দুর্বলতা পরিত্যাগ করিয়া ন্যায়-নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন, দুর্যোধন যদি দুর্বৃত্তই হ'ন এবং ধৃতরাষ্ট্র যদি তাঁহার শাসনে অক্ষম হন, তাহা হইলে তিনি আদেশ করিলে ভীষ্ম-দ্রোণাদি দুর্যোধনকে বাধ্য করিতে পারিবেন। ভীষ্ম-দ্রোণ প্রভৃতিকেও সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন যে তাঁহারাও দুর্যোধনের নীরব সমর্থন করিয়া অপরাধী হইতেছেন। সুতরাং তাঁহারা দুর্যোধনকে শাসন করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য করুন। একজন ধুরন্ধর রাজ-নীতিবিদ্ রাজদূতের পক্ষে যেমন কথা বলা সম্ভব, কৌরবরাজসভায় আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাই করিতেছেন। এখানেও তিনি নর,—নারায়ণ নহেন। অবশ্য এই দৃশ্যেই বিশ্বরূপ-দর্শনের কথা আছে। কিন্তু উহা তো মহাভারতের ঘটনা। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিশ্বস্তভাবে মহাভারতের অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র। কোনো কোনো সমালোচক আবার এমন কথাও বলিয়াছেন যে এই বিশ্বরূপ-দর্শন ব্যাপারটি কর্ণের অনুপস্থিতিতে হইয়াছে বলিয়া উহা কর্ণের মনে শ্রীকৃষ্ণের

ভগবত্তা সম্বন্ধে বিশেষ কোনো প্রতীতি জন্মাইতে পারে না। তাঁহাদের নিকট আমাদের বক্তব্য এই যে, মূল মহাভারতেও এই ঘটনাটি কর্ণের অনুপস্থিতিতেই ঘটিয়াছিল।

দ্বিতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য। কর্ণের গৃহে কর্ণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ। ইহা লইয়াও সমালোচনার ঝড় উঠিয়াছে। এই দৃশ্যটি রবীন্দ্রনাথের কর্ণ-কুন্তী সংবাদের মতো নাটকীয় হইয়া ওঠে নাই বলিয়া অনেকে অভিযোগ করিয়াছেন। আমাদের বক্তব্য, ইহা কর্ণ-কুন্তী সংবাদের মতো হইতে পারে না বা হওয়া উচিত নয়। 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' মুখ্যতঃ কাব্য এবং গৌণতঃ নাটক। যে আবেগ চাঞ্চল্য গীতিকবিতায় সঙ্গীতের মূর্ছনা জাগায় নাটকে তাহাই কর্মময়তা কমাইয়া দেয়। কর্ণ-কুন্তী সংবাদে ভাবাবেগ যতখানি উচ্ছ্বসিত, কর্মগতি ততখানি প্রবল নয়। তাই উহা যতখানি কাব্য, ঠিক ততখানি নাট্য নয়। এই দৃশ্যটিকে 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ'-এর মতো সঙ্গীতমুখর করিয়া তুলিতে গেলে দৃশ্যটির কলেবরও এত বাড়িয়া যাইত যে সমগ্র নাট্য-কাহিনীর সঙ্গে তাহা সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারিত না। মধুসূদনের 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' কবিতার সঙ্গে তাল রাখিয়া 'জনা' নাটকের জনার ভূমিকা রচনা করিতে গিয়া গিরিশচন্দ্র যে নাটকখানিকে অসার্থক করিয়া তুলিয়াছেন ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। রবীন্দ্রনাথের সুরময়তার আশ্রয় লইতে গেলে ক্ষীরোদপ্রসাদকেও নাটকের ঘটনা ও চরিত্রের ভারসাম্য হারাইয়া ফেলিতে হইত। সুদক্ষ নাট্যকার তাহা করেন নাই। তিনি ঘটনার প্রবহমানতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া এখানে সংক্ষেপে, অল্প কথায় কর্ণের অন্তর্দ্বন্দ্ব যেমন সুন্দর করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। কেহ কেহ আবার এ-কথাও বলিয়াছেন যে কর্ণের জন্মরহস্য শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া না বলাইয়া কুন্তীকে দিয়া বলাইলে মাতা-পুত্রের অন্তরের দ্বন্দ্ব-ব্যাকুলতা আরো বেশী করিয়া ফুটিয়া উঠিত। আমাদের বক্তব্য, এই নাটকে সে অবকাশ কোথায়? হস্তিনাপুরীতে কর্ণের গৃহে আসিয়া কুন্তী তো কর্ণকে কোনোদিন কোনো কথা বলেন নাই বা বলিতে পারেন না। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণও কর্ণের গৃহে উপস্থিত হইয়া কর্ণকে তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত শুনান নাই হস্তিনাপুর হইতে ফিরিবার পথে শ্রীকৃষ্ণ কর্ণকে আপন রথে তুলিয়া লইলেন এবং তাঁহার নিকট তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। অবশ্য ইহাতে কর্ণের মনে ভাল-মন্দ কোনো প্রকার প্রতিক্রিয়াই দেখা দেয় নাই। কারণ, শ্রীকৃষ

বলিবার পূর্বেই কর্ণ এই সংবাদ জানিতেন। নাট্যকার এখানে পথের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া কথাটি না-বলাইয়া কর্ণের গৃহে বসিয়া বলাইয়াছেন। এই জন্মবৃত্তান্ত জানানোর পিছনে শ্রীকৃষ্ণের দুইটি উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। কর্ণের নিকট তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া দিয়া এবং সাম্রাজ্যের প্রলোভন দেখাইয়া তিনি যদি কর্ণকে পাণ্ডবপক্ষে আনিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। তিনি তাহা করিয়াছেনও। কর্ণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে এই সৌভাগ্যের প্রলোভন তাঁহার ইষ্টদেবও কোনদিন তাঁহার সম্মুখে তুলিয়া ধরেন নাই। কিন্তু তিনি মায়ের প্রতি প্রচণ্ড অভিমানে এবং পৌরুষ ও বন্ধুপ্রীতির জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন না। তবে ইহাতে কূট-কৌশলী শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। নিজের জন্মবৃত্তান্ত জানার পর কর্ণের অন্তর হইতে বিজয়ের আশা অন্তর্হিত হইল। তিনি আর 'রাধেয়' নন। সুতরাং পরশুরামের বরের জন্য অপরাজেয়ও নন। সুনিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এই শক্তিমান পুরুষ অগ্রসর হইয়া চলিলেন। হয়তো তাঁহার পৌরুষ এবং ইন্দ্রদত্ত একবিঘাতিনী শক্তি তাঁহাকে অদৃষ্টের উপর জয়ী করিয়া তুলিতে পারিত। কিন্তু এই জন্ম-পরিচয় কর্ণের অজ্ঞাতসারেই যেন তাঁহার মনকে পাণ্ডবপক্ষপাতী করিয়া তুলিয়াছে। তিনি যুদ্ধে অর্জুন-ভিন্ন আর চারি ভাই পাণ্ডবকে পরাজিত ও বন্দী করিয়াও হত্যা করিলেন না; মুক্তিদান করিলেন। এই উদারতা ভ্রাতৃস্নেহেরই জন্য। দুর্যোধনের প্রতি বন্ধুপ্রীতি এবং কৃতজ্ঞতা-বোধ এখানে সত্য সত্যই শিথিল হইয়াছে। একমাত্র অর্জুনকে বধ করিবার সংকল্প লইয়াই তিনি বাঁচিয়া রহিলেন। কিন্তু একবিঘাতিনী শক্তিতে হাত দিতে গেলেই তাঁহার অন্তরে মাতা কুন্তীর মূর্তি জাগিয়া ওঠে। তিনি আর এই অস্ত্র গ্রহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে পারেন না। ইহার মূলে তো ঐ শ্রীকৃষ্ণ-কথিত জন্মপরিচয়। অথচ শ্রীকৃষ্ণ এখানে কোনো অলৌকিক বা অমানবীয় উপায়ে কর্ণের অন্তরে এই দ্বন্দ্ব জন্মাইয়া দেন নাই। এখানেও তিনি নর,—ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ্ এবং মনস্তত্ত্ববিদের কাজই করিয়াছেন। তিনি সুদর্শন-চক্রী। 'সু' বা সুন্দর দর্শনের বলে তিনি কর্ণের অন্তরের অবচেতন স্তরে সঞ্চিত মাতৃভক্তি ও ভ্রাতৃস্নেহ দেখিতে পাইয়াছিলেন বলিয়াই কর্ণের দুর্বলতার অস্ত্রে কর্ণকেই নিহত করিয়া গেলেন।

তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্যে আমরা আবার শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাইতেছি। তিনি পাণ্ডবশিবিরে দ্রৌপদীর সঙ্গে আলাপরত। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণার এই

আলাপের মাধ্যমে আমরা জানিতে পারিব, শ্রীকৃষ্ণ অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন বিশ্বরূপ 'নারায়ণ' হইয়াও কতখানি 'নর'। দ্রৌপদী কৌরবসভায় শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ ধারণের কাহিনী শুনিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছেন। সর্বোপরি তিনি আনন্দিত হইয়াছেন এইজন্য যে সন্ধির সংবাদের পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের সম্ভাব্যতার বার্তা বহন করিয়াই ফিরিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের দৌত্যের দ্বারা কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ আসন্ন হইয়া আসিল। ইহাতে দ্রৌপদীর সবচেয়ে বেশী আনন্দ। কারণ, এই যুদ্ধ ঘটিলে দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিশোধ হইবে। নারীনির্যাতনকারী নর-পশুগণ এই যুদ্ধে বলির পশুর মতো নিহত হইবে। দ্রৌপদী অন্তরে-অন্তরে জানেন যে, যিনি চরমতম সংকটের মুহূর্তে বিপন্না নারীর লজ্জানিবারণ করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ ঘটাইয়া সেই নারীকে অপমানের জ্বালা হইতে অব্যাহতি দিবেন। তাহাই যখন ঘটিল, তখন কৃতজ্ঞতার অশ্রুজলে দ্রৌপদীর নেত্র অভিষিক্ত হইল। দ্রৌপদী একদিকে শ্রীকৃষ্ণের বিরাট রূপ ধারণের কথা বিস্ময়-বিহ্বল চিত্তে আলোচনা করিতেছেন, অন্যদিকে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু আনন্দ বা বেদনা কোনো ভাবেই অভিভূত না হইয়া, ধীরে, সংক্ষিপ্ত ভাষায় দ্রৌপদীর কথার উত্তর দিয়া চলিয়াছেন। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে 'বিরাট'-রূপ দেখাইতে চাহিলেও দ্রৌপদী কিন্তু তাহা দেখিতে চাহিতেছেন না। তিনি মানবী। ভগবানের বিরাট রূপ ধারণ করিবার মতো বিরাট হৃদয় তাঁহার নাই। তিনি ভগবানকে সখারূপে, মানবরূপে, একান্ত আপন অন্তরের আত্মার বা ভালবাসার পাত্ররূপেই পাইতে চান। নরকে বাদ দিয়া নারায়ণের আস্বাদন দ্রৌপদী কেন, কাহারও করিবার উপায় নাই, আমরা এখানে দেখিব, শ্রীকৃষ্ণ একান্ত করিয়া মানুষেরই দরদী বন্ধু। বিপন্ন মানব-মানবীর বেদনায় তাঁহার অন্তর ব্যাকুল হইয়া ওঠে। কৌরবরাজসভায় লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীর দীর্ঘনিশ্বাসেই যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত হইতে চলিয়াছে তাহা শ্রীকৃষ্ণের কথায় স্পষ্ট হইয়া ওঠে।

"বিধাতা সহিতে পারে—
দানব-মানব-কৃত সর্ব উপদ্রব,
সহিতে পারে না শুধু, অনাথ ক্রন্দন,
অনশনে জাতির মরণ,

আর পারে না পারে না—কোনমতে—
কার্যে, বাক্যে, কল্পনায় নারীর লাঞ্ছনা।"

ইহা অলৌকিক শক্তিশালী ব্রহ্মস্বরূপ, অবতার পুরুষের উক্তি নয়। ইহা মানবের বেদনায় ব্যথিত দয়ার্দ্রহৃদয় মানুষেরই উক্তি। এইখানেই শ্রীকৃষ্ণের মানব-মহিমার সার্থক পরিচয়।

তৃতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্যে, কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে আমরা আবার শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাইতেছি। যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের আলাপের মাধ্যমে আমরা জানিতে পারিলাম, কর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, সোমক, পাঞ্চাল প্রভৃতি কর্ণের যুদ্ধে পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ। মহারাজ যুধিষ্ঠির অর্জুনকে সংবাদ দিতে আসিয়াছেন। এই সমূহ বিপদের মুখে শ্রীকৃষ্ণ কি করিলেন? তিনি অর্জুন-ভিন্ন আর চারি পাণ্ডবকে যুদ্ধে পাঠাইয়া দিলেন। ঘটোৎকচের মতো অখ্যাত ব্যক্তিকে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া তিনি কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে পাঠাইয়া দিলেন। অথচ পাণ্ডবদের মধ্যে যিনি কর্ণকে পরাজিত করিতে সমর্থ, সেই অর্জুনকে নারায়ণী সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লইয়া গেলেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের চিরভক্ত অর্জুন পর্যন্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ কেন বালক ঘটোৎকচকে কর্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ কিছুই খুলিয়া বলিলেন না। অর্জুনকে নিঃসন্দেহে তাঁহার নির্দেশ পালন করিতে বলিলেন।

এখানে প্রশ্ন উঠিবে, ইহা তো সাধারণ মানুষের কাজ নয়। শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই তাঁহার দিব্যদৃষ্টির দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলেন যে, কর্ণ আজ অর্জুন-বধের সংকল্প লইয়া একবিঘাতিনী শক্তি সঙ্গে করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসিবেন। সুতরাং ঘটোৎকচের উপর দিয়া আজিকার বিপদ চলিয়া যাক। এ-কথার উত্তরে বলিব, মহাপুরুষেরা যে দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন তাহা তো অতি স্বীকৃত সত্য। কিন্তু দিব্যদৃষ্টির অধিকারী হইয়াও তাঁহারা স্বাভাবিক মানবিকতা বিসর্জন দেন কি? সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁহারা মানুষের মতোই চলা-ফেরা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনার্থী কোনো গৃহস্থবধূকে তাহার বিধবা ননদ অতিশাসনের দ্বারা অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়া তাহার সংসারে অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট সে কথা আগে হইতে বলিয়া না-দিলেও দ্রষ্টাপুরুষ কিন্তু নিজে সমস্ত জানিয়াছিলেন। শত্রু সৈন্যের সহিত কোন এক বিশেষ দিনের যুদ্ধে জয় হইবে না চরম পরাজয় হইবে, প্রভু মোহাম্মদ তাহা বলিয়া দিয়াও

শেষ পর্যন্ত শিষ্যদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি বলিয়া দিলেন, ঐ যে পর্বতটি দেখা যাইতেছে, উহার উপর হইতে শত্রু সৈন্যের কোনো আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা নাই বলিয়া মনে হইতে পারে; তাঁহার নিকট হইতে পুনরাদেশ না পাওয়া পর্যন্ত সত্তর জন তীরন্দাজ যেন সশস্ত্র হইয়া উহার উপর দাঁড়াইয়া থাকে। বিজয়ের উল্লাসে মত্ত সত্তর জন তীরন্দাজের মধ্যে ষাট জন মোহাম্মদের আদেশের অপেক্ষা না করিয়া ঐ পর্বত হইতে যখন নামিয়া আসিল এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে মোহাম্মদের অনুচরদের যখন চরম পরাজয় হইল, তখন কি মানুষ উপলব্ধি করিয়াছিল যে দ্রষ্টাপুরুষ কেন ঐ পর্বতের উপর সত্তর জন লোককে দাঁড়াইয়া থাকিতে বলিয়াছিলেন? প্রভু মোহাম্মদ আমাদের জানা ঐতিহাসিক যুগের লোক। তাঁহার সম্বন্ধে কাহিনী তো অলৌকিক উপকথা নয়। ইহা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে অবতার পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ দিব্যদৃষ্টিতে কেন দেখিতে পাইবেন না যে কর্ণ ঐ দিন অর্জুন-বধের সংকল্প করিয়া একঘ্নবান লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন? সুতরাং আমরা দেখিতে পাইব এই নাটকে 'নর' ও 'নারায়ণ' উভয়ে মিলিয়া-মিশিয়া এক হইয়া গিয়া এক 'নর-নারায়ণ' মূর্তি ধারণ করিয়াছেন। নাট্যকার শ্রীকৃষ্ণের মানব-সত্তাকে বরং এত বড় করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাঁহাকে নারায়ণ রূপে মানুষের জগৎ হইতে দূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখি না। তিনি পাণ্ডবের সখা, দ্রৌপদীর পূজনীয় বন্ধু এবং আরাধ্য দেবতা। শুধু তাহাই নয়। যে-কর্ণ পাণ্ডবদের শত্রু, তিনিও শ্রীকৃষ্ণের ভালবাসার পাত্র। কর্ণের গৃহে কর্ণের সহিত সাক্ষাৎকারের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ যে জ্যেষ্ঠভ্রাতৃজ্ঞানে কর্ণকে নমস্কার জানাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে রাজনৈতিক ধূর্ততা থাকিতে পারে। কিন্তু 'মগ্নরণে পৃষ্ঠ দিয়া' যুদ্ধে পরাজিত কর্ণ যখন বিষণ্ণমনে মৃত্যুর জন্ম প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণই কর্ণের জন্য অশ্রুপাত করিতে আসিয়াছেন। ইহা তো কৃষ্ণের ভগবত্তার পরিচয় নয়; মানবিকতারই প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ 'জনার্দন'। জনগণের, অর্থাৎ মানুষের জীবনের ব্যথা-বেদনা দারিদ্র্য প্রভৃতি তাঁহাকে প্রতি মুহূর্তে পীড়া দেয়। তিনি দেখিয়াছেন, দানবীর কর্ণ দানের দ্বারা মানুষের এই বেদনা ও অভাব-অভিযোগ দূর করিতে সারাজীবন চেষ্টা করিয়াছেন। এই মানব-প্রেমিক মানুষটির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার জন্ম মানুষের ভগবান কর্ণের নিকট ছুটিয়া আসিয়াছেন। তাই আমরা বলিতে পারি 'নর-নারায়ণ' নাটকে ক্ষীরোদপ্রসাদ

শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণত্ব অক্ষুন্ন রাখিয়াও নরত্ব যতখানি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, অন্য কোনো নাট্যকার ততখানি পারেন নাই; পারিতেনও না। বরং বিংশ শতাব্দীর নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ শ্রীকৃষ্ণের জীবনের কোনো কোনো ঘটনাকে বিশ্বাসযোগ্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়া ঐ ঘটনার অবিশ্বাস্য অলৌকিক ব্যাখ্যা দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঘটোৎকচ-বধের সময় যে সূর্যাস্তের পর অকস্মাৎ সূর্যের উদয় হইল, ইহাতে সকলেই কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়াছেন। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদ এই অলৌকিক ঘটনার সম্ভাব্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন।—

> "কেহ বলে—উল্কার প্রবাহ রবি-
> রশ্মি-আগমনপথ রোধ করেছিল!
> কেহ বলে—অস্তমুখে রাহু আক্রমণ!
> কিন্তু অনেকেই বলে, সূর্যে ঢেকেছিল
> সুদর্শন।"

অনেক সময় এমন হয় যে মহামানবের কার্যাবলী বাস্তব কর্মপন্থীয়, বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়াই ঘটিয়া যায়। কিন্তু সাধারণ মানুষ অত বিচার-বিশ্লেষণ করিতে যায় না। তাহারা মনে করে, শক্তিমান মহাপুরুষগণের অলৌকিক শক্তির বলে মনুষ্য বুদ্ধির দ্বারা যাহা বিশ্লেষণ করা যায় না এমন ঘটনাও ঘটিয়া যায়। হয়তো জয়দ্রথ-বধের দিনের সূর্যাস্ত কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয়। উল্কার প্রবাহ সাময়িকভাবে সূর্যের কিরণ রোধ করিয়া রাখিতে পারে। অথবা দিবসের শেষ প্রহরে সূর্য গ্রহণ হওয়ায় সন্ধ্যার আকাশের মতো অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা সূর্যাস্তের পূর্বেই ঘটিতে পারে। হয়তো দিব্যজ্ঞানের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ জানিয়া থাকিবেন যে ঐ দিন সূর্যাস্তের মুখে সূর্য গ্রহণের ঐ অবস্থাটি জয়দ্রথ-বধের অনুকূল হইবে। যুদ্ধোন্মত্ত কৌরব ও পাণ্ডবদের কেহই তাহা জানিতে পারেন নাই। জানিতে পারিলে জয়দ্রথ নিশ্চয়ই সূর্যাস্তের পূর্বে অর্জুনের সম্মুখে আসিত না। কূট-কৌশলী শ্রীকৃষ্ণ জয়দ্রথ-বধের প্রয়োজনেই হয়তো এই সূর্যগ্রহণের কথাটি গোপন রাখিয়াছিলেন। কিন্তু জয়দ্রথকে রক্ষার সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ করিয়া দিয়া অর্জুন যখন তাহাকে বধ করিলেনই, তখন সাধারণ মানুষ আর শেষ-সূর্যরশ্মির আবির্ভাবের বৈজ্ঞানিক কারণ খুঁজিতে না গিয়া ধরিয়া লইল, ইহা শ্রীকৃষ্ণেরই কাজ। তিনি সুদর্শন-চক্র দ্বারা সূর্যকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছেন।

অনুসরণ করিয়াছেন। নিজের ব্যক্তিগত বোধবিশ্বাসের দ্বারা কোনো চরিত্রকে অভিভূত বা বিকৃত করেন নাই। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের অসীম ধৈর্য, ক্ষমা, তিতিক্ষা এবং মানব-মঙ্গলবোধ নাট্যকার অতি সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। যুধিষ্ঠির অক্রোধী, অমানী এবং ঈর্ষ্যাহীন। তিনি যুদ্ধ পরিহার করিয়া সন্ধি করিবার সর্ববিধ চেষ্টা করিয়াছেন। শেষে অনুপায় হইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন। এই শিষ্টবাক্ ব্যক্তিটি পরম শত্রু দুর্যোধনকেও 'সুযোধন' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয়ী শত্রু কর্ণকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়াছেন, সূতপুত্র বলিয়া ঘৃণা করেন নাই। ভীমের অসীম পরাক্রম, দুর্যোধনাদির প্রতি দুর্নিবার ক্রোধ প্রভৃতি তাঁহার বাক্য ও কার্যে প্রতি মুহূর্তে অভিব্যক্ত হইলেও জ্যেষ্ঠভ্রাতার আদেশ পালনের জন্য তিনি অসীম ধৈর্য ধারণ করিয়াছেন। কর্ণের হাতে পরাজিত ও বন্দীকৃত হইয়াও তিনি সূতপুত্রকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নমস্কার জানান নাই। তারপর যখন সেই সূতপুত্রই পাণ্ডবাগ্রজ বলিয়া পরিচিত হইলেন তাহাতে সবচেয়ে বেশী বিস্মিত এবং অভিভূত হইয়াছিলেন ভীম। তাই কর্ণও মৃত্যুমুহূর্তে একমাত্র ভীমকেই শেষ সম্বোধন জানাইয়া গেলেন। কারণ তিনি দেখিলেন, তিনি আর ভীম, এই দুইজনই মাত্র মহাভারতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া পুরুষকারের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। মহাভারতের অর্জুন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখিয়া তাঁহার ভগবত্তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি তোমার শিষ্য, আমাকে শাসন কর।' এই নাটকে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের বিনীত শিষ্যের বেশেই দেখিতে পাই। এমন কি তিনি যখন নিজের শক্তির কথা প্রকাশ করেন তখনও তাঁহার অসীম কৃষ্ণনির্ভরতা আমরা দেখিতে পাই। তিনি নিজের ইচ্ছার কথা বলেন না ; বলেন, "কেশব যদ্যপি ইচ্ছা করে।" মহয়সী নারী দ্রৌপদীর চরিত্র অঙ্কনে ক্ষীরোদপ্রসাদ মহাভারতকে সম্পূর্ণভাবে ও সর্বতোভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। অগ্নিসম্ভবা যাজ্ঞসেনী দেহেমনে অগ্নিজ্বালা বহন করিয়া মহাভারতের কাহিনীতে বিচরণ করিয়াছেন। কর্ণের ব্যঙ্গবাণী, কৌরবরাজসভায় অপমান, কোনো কিছুই তিনি ভুলিতে পারেন নাই। তাই কৌরবগণের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাবের তিনি বিরোধিতা করিয়াছেন। জ্বালাময়ী ভাষায় তিনি নিজের অপমানের কথা প্রকাশ করিয়া শুধু পাণ্ডবদিগকেই যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করেন নাই, তাঁহার বেদনাপূর্ণ বাক্যাবলীর দ্বারা তিনি পরম-সহিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণকেও কাঁদিতে বাধ্য করাইয়াছেন। অথচ এই মহাতেজস্বিনীকে যখন বিনীতা কৃতজ্ঞতামুগ্ধা সখীর মতো শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আলাপ করিতে দেখি,

তখনই আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে অনুভব করি, এত তেজস্বিনীর মধ্যেও এতখানি কোমলতা এবং মাধুর্য কোথায় লুকাইয়াছিল? ঘটোৎকচের মৃত্যুতে শোকাকুলা দ্রৌপদীর মাতৃহৃদয়ের বেদনার প্রকাশ দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি, ইনি শুধু বীরাঙ্গনা নন; স্নেহময়ী জননীও। মহাভারতের দ্রৌপদী-চরিত্রের প্রতি নাট্যকার সম্পূর্ণ সুবিচার করিতে পারিয়াছেন। এই নাটকে গান্ধারী-চরিত্র খুব প্রাধান্য পায় নাই। তবে ঐটি পার্শ্বচরিত্র বলিয়া নাটকের মূল কাহিনীর ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছুই করে নাই। নাটকে সহদেবের ভূমিকা খুব কম। কিন্তু সামান্য একটি-তুইটি উক্তির মাধ্যমে সহদেব নাট্য-কাহিনীকে দ্বন্দ্বীভূত করিয়া তুলিয়াছেন। চরিত্রটির নাটকীয় সার্থকতা অনেক। অল্পের মধ্যে সু-অঙ্কিত এই চরিত্রটি নাট্যকারের শক্তিমত্তার পরিচয় দেয়। অন্য একটি চরিত্র অঙ্কনে নাট্যকার খুব দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। উহা শকুনির চরিত্র। 'কর্ণার্জুন' নাটকের শকুনির চরিত্রে নাট্যকার একটি বিরাট উদ্দেশ্য আরোপ করিয়াছেন। 'হস্তিনার রাজকারাগার' বন্দী পিতা ও উনশত ভ্রাতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্যই যে শকুনি কপট হিতার্থীরূপে কৌরবরাজ-সভায় অবস্থান করিতেছেন, তাহা তাঁহার প্রতিটি কার্যে ও বাক্যে অভিব্যক্ত হইয়া ওঠে। অথচ কৌরবগণ তাহা কখনও বুঝিতে পারে নাই। অপরেশচন্দ্র যেমন দক্ষতার সঙ্গে এই চরিত্রটিকে ধীর, স্থির ভাবে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন, ক্ষীরোদপ্রসাদ তাহা পারেন নাই। নর-নারায়ণের শকুনি শকুনি-চরিত্রের অন্তরালে থাকিয়া কোনো গুরুতর উদ্দেশ্যে কাজ করিয়া যায় নাই। শকুনিকে তিনি এই নাট্যকাহিনীর ক্রমবিকাশের অনিবার্য প্রয়োজনে নিযুক্ত করিতে পারেন নাই। বরং তাঁহার মধ্য দিয়া যাত্রাসুলভ তরল হাস্যরসের অবতারণা করিতে গিয়া চরিত্রটিকে অকারণ ভাঁড় সাজাইয়া তুলিয়াছেন। এইরূপ সামান্য একটু-আধটু ত্রুটি 'নর-নারায়ণ' নাটকে হয়তো আছে। এইটুকু উপেক্ষা করিলে আমরা 'নর-নারায়ণ'কে একখানি উচ্চাঙ্গের নাটক বলিব।

সুতরাং যে-কথা কয়টি বলিয়া 'নর-নারায়ণ' নাটকের সমালোচনা শুরু করিয়াছি, সেই কথা কয়টি দিয়াই ইহা শেষ করিব। কাহিনী বিন্যাসের দক্ষতায়, চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বসৃষ্টিতে ভক্তির রসোচ্ছ্বাসে এবং অপূর্ব কবিত্বে 'নর-নারায়ণ' বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।
